NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : HISTORY
(PGHI)

PAPER - VII (B)
&
PAPER - VIII (B)

POST GRADUATE HISTORY

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনো পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2015

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ইতিহাস

স্নাতকোত্তর স্তর

পাঠক্রম : পর্যায়

PG History 7 (B) : 1-4 & 8 (B) : 1-4

(PGHI)

PG History 7 (B) : 1

		রচনা	সম্পাদনা
একক	1-4	ডঃ রূপকুমার বর্মন	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

PG History 7 (B) : 2

একক	1-4	ড. নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়	ড. চন্দন বসু

PG History 7 (B) : 3 & 4

পর্যায় 3

একক	1-4	ড. নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়	ড. চন্দন বসু

পর্যায় 4

একক	1-4	ড. নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়	ড. চন্দন বসু

PG History 8 (B) : 1

একক	1-3	নূপুর দাশগুপ্ত	ড. চন্দন বসু

PG History 8 (B) : 2

একক	1-4	ডঃ রূপকুমার বর্মন	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

PG History 8 (B) : 3

একক	1-4	ড. নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়	ড. চন্দন বসু

PG History 8 (B) : 4

একক	1	শ্রী সুরজিৎ গুপ্ত	ড. চন্দন বসু
একক	2	শ্রীমতী নিবেদিতা পাল	ড. চন্দন বসু
একক	3	শ্রীমতী নিবেদিতা পাল	ড. চন্দন বসু
একক	4	শ্রী সুরজিৎ গুপ্ত	ড. চন্দন বসু

সার্বিক রূপান্তর, পরিমার্জনা ও সম্পাদনা ❐ ড. চন্দন বসু

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG History 7 (B) : 1-4 & 8 (B) : 1-4
(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)
(PGHI)

PG History 7 (B) : 1-4

পর্যায় 1

একক 1 ❐ সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো : বিবর্তন ও সমস্যা — 10

একক 2 ❐ সুলতানি ব্যবস্থার তত্ত্ব ও স্বরূপ : সুলতানি, খলিফা ও সুলতানির বৈধতা — 16

একক 3 ❐ কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ — 21

একক 4 ❐ রাষ্ট্র ও সমাজ — 30

পর্যায় 2

একক 1 ❐ আঞ্চলিক রাজ্যের সূত্রপাত — 40

একক 2 ❐ রাজপুতনার সমাজ ভাই—বন্তপ্রথা — 69

একক 3 ❐ বিজয়নগর—একটি বিভাজিত রাজ্য — 92

একক 4 ❐ বাংলা — 116

পর্যায় 3

একক 1 ❒ আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ 155

একক 2 ❒ উদারনৈতিক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 165

একক 3 ❒ জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ও রসায়ন 181

একক 4 ❒ প্রগতির নবদিগন্ত (পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক) 195

পর্যায় 4

একক 1 ❒ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সমন্বয় 208

একক 2 ❒ খাদ্য, পানীয় এবং পোষাক-পরিচ্ছদ 221

একক 3 ❒ দর্শন 233

একক 4 ❒ যৌগিক ভারতবর্ষ—খ্রিস্টীয় শতক 245

PG History 8 (B) : 1-4

পর্যায় 1

একক 1 ❒ আদি মধ্যযুগ : সংজ্ঞা ও পরিধি—প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ 258

একক 2 ❒ কারণগত উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য 261

একক 3 ❒ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বিতর্ক এবং ইতিহাসচর্চা 274

পর্যায় 2

একক 1 ❐ কৃষি কাঠামো 288

একক 2 ❐ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি 293

একক 3 ❐ কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য 298

একক 4 ❐ ইক্তাদারি ব্যবস্থা 302

পর্যায় 3

একক 1 ❐ পূর্বালোকন : প্রাচীন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদিযুগ 307

একক 2 ❐ ব্যবসা-বাণিজ্য, বণিকগোষ্ঠী, বাণিজ্যপথ, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বিনিময়ের মাধ্যমে 316

একক 3 ❐ নগরায়ণ এবং নগরের অবক্ষয় 329

একক 4 ❐ শ্রেণি ও জাতিগোষ্ঠীর বিস্তার 342

পর্যায় 4

একক 1 ❐ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনীতি 354

একক 2 ❐ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাহমনি রাজ্যের অর্থনীতি 369

একক 3 ❐ ভারতের বহিঃবাণিজ্য (৫০০-১৩০০ খ্রিঃ) 387

একক 4 ❐ উপর থেকে সামন্ততন্ত্র ও নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র 394

সপ্তম (খ) পত্র

পর্যায়—১

একক-১ ❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো : বিবর্তন ও সমস্যা।

❑ গঠন

১.০. ভূমিকা
১.১. আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিকাশ
১.২. রাজনৈতিক বিবর্তনের চরিত্র
১.৩. সামাজিক বিবর্তনের ধারা
১.৪. গ্রন্থপঞ্জি
১.৫. অনুশীলনী

১.০. ❑ ভূমিকা

খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য পর্যায়। একদিকে শক্তিশালী ও সংগঠিত সাম্রাজ্যরাষ্ট্রের (Empire State System) অবক্ষয় ও অন্যদিকে আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিস্তার এবং রাজনৈতিক অন্তঃকলহ ভারতের রাজনীতিতে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল, তার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে মধ্য-এশিয়া থেকে আগত নতুন শাসকগোষ্ঠীর হাতে স্থানান্তরিত হয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ। এবং ত্রয়োদশ শতক থেকে উত্তর ও পূর্ব ভারতে শুরু হয় সুলতানি শাসন, যা চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ ভারতের ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সমাজ-কাঠামোর (Structure of the society) পরিবর্তন। সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তন। গুপ্ত ও গুপ্ত-পূর্ববর্তী যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষিকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি আবর্তিত হতে থাকে যেখানে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক ও মূল উৎপাদকের সামাজিক সম্পর্ক হয়ে পড়ে সামন্ততান্ত্রিক। পাশাপাশি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয় চতুর্থ শতক থেকে। ফলে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রকে পরিণত হন সামন্তপ্রভুগণ। রাজনৈতিক কাঠামোর এই পরিবর্তনের সঙ্গে চলতে থাকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতির চরিত্রগত পরিবর্তন।

১.১. ❑ আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিকাশ

গুপ্ত সাম্রাজের অবক্ষয়ের সময় অর্থাৎ পঞ্চম শতক থেকে ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার (State System) বিবর্তনের ইতিহাসে যে ধারার সৃষ্টি হয়, তা ছিল মূলত বিকেন্দ্রীভূত (Decentralised)।

এটা ছিল আঞ্চলিক শক্তিসমূহের বিকাশের সহায়ক। স্বাভাবিকভাবেই গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটে অতি দ্রুত।

পরাক্রমশালী গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭) হূন আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেও তার মৃত্যুর পর হূননেতা তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হূনদের রাজ্য গড়ে ওঠে ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে। পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত হূন রাজ্যের মূল ভিত্তি ছিল অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ। ফলে এদের রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হূনদের সমসাময়িক মৈত্রকগণ বলভী (গুজরাট)-তে এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এদের উত্থান ঘটেছিল সামন্তপ্রভুর পর্যায় থেকে। মৈত্রক রাজা শিলাদিত্য (৬০৬-৬১১) বলভীর শক্তিবৃদ্ধির যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন, সপ্তম শতকের গোড়ায় তা অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত টিকেছিল। মৈত্রকদের মতই মৌখরীগণ সামন্তশক্তিকে রাজশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। একইভাবে মন্দাশোরে প্রতিষ্ঠিত হয় যশোধর্মনের রাজ্য (৫৩০-৫০)। পাশাপাশি মালবের সামন্ত শাসকগণও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ষষ্ঠ শতকের গোড়ায়। এই রাজ্যগুলির প্রধান দুর্বলতা ছিল পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধবিগ্রহ।

ষষ্ঠ শতকের শেষ দশক ও সপ্তম শতকের গোড়ায় উত্তর ভারতের কয়েকটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যের বিস্তার ঘটে। থানেশ্বর-এর মৌখরীগণ প্রভাকর বর্ধন (৫৮০-৬০৫)-এর নেতৃত্বে হূন মালবের রাজাদের পরাজিত করে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হর্ষবর্ধন (৬০৬-৪৭) আত্মীয়তার সূত্রে প্রাপ্ত কনৌজ-এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তার নেতৃত্বে কনৌজ হয়ে ওঠে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক গৌড় (বাংলা) ও কামরূপ (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা নিম্ন অসম ও হিমালয়-সংলগ্ন বাংলা) উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তির আকাশে আবির্ভূত হয়। গৌড়ের শাসক শশাঙ্ক তার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে হর্ষবর্ধনের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল দখল করতে আগ্রহী হন। অন্যদিকে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে দমন করতে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের (৬০০-৬৫০) সঙ্গে মিত্রতাবন্ধ হন। হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মনের মিলিত চাপে শশাঙ্ক পরাজিত হন। তার মৃত্যুর পর (৬৩৭) বাংলায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ভাস্করবর্মনের কামরূপ উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকে পরিণত হয়। হর্ষবর্ধনের কনৌজ হয়ে ওঠে রাজনীতির মূল কেন্দ্র। তবে এই শক্তিব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শশাঙ্ক, ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র নৃপতিগণের বিশেষ করে সামন্তরাজাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সপ্তম শতকের শেষভাগে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজপুত, গুর্জর, প্রতিহার ও কাশ্মীরের উত্থান ঘটে।

উত্তর ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেও কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীনকালের চোল, পাণ্ড্য ও চেরা শক্তি চতুর্থ শতকের পর রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উপস্থিত না-থাকলেও খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে পল্লবগণ এক শক্তিশালী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৩০) প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৮) শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতেরই রাজ্যবিস্তার

করে ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁরা সিংহল বিজয়ের জন্যও সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। শিল্প-স্থাপত্য, ধর্ম-সাহিত্য ও কৃষির বিস্তারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাতাপির চালুক্যশক্তি। সাতবাহন-বাকাটকদের উত্তরাধিকারী চালুক্যগণ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের প্রথম পুলকেশি (৫৩৫-৬৬) ও দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৬৪২) পল্লবদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এমনকী সমকালীন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬৩৪)। এরপর তিনি 'পরমেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। তবে চালুক্যদের এই শক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অষ্টম শতকে তবে চালুক্যগণ তাদেরই সামন্ত রাষ্ট্রকূটদের দ্বারা উৎখাত হন।

অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের মধ্যে ভারতে আবার কয়েকটি সাম্রাজ্যতুল্য (Empire type) শক্তির বিকাশ ঘটে পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে। এই সময় কনৌজকে কেন্দ্র করে পূর্ব ভারতের পাল সাম্রাজ্য, পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব (Tripartite Struggle) শুরু হয়। পালরাজ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০), প্রতিহাররাজ নাগভট্ট (৮০০-৮২৫) ও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ দখল করার জন্য যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিলেন, তাতে কোনো পক্ষই চূড়ান্ত সফলতা পায়নি।

এখানে বলা দরকার যে, এই তিনটি শক্তির সূচনা হয়েছিল অতি নগণ্য সামন্ত শাসকের ভিত্তি থেকে। বাংলায় পালবংশের সূচনা করেছিলেন গোপাল (৭৫০-৭৭০), যিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন সুনিপুণ যোদ্ধা ও সামন্ত শাসক। এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ধর্মপালের মৃত্যুর পর দেবপাল (৮১০-৫০), মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮) ও রামপাল (১০৭৭-১১৩০) বাংলায় পালদের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

অন্যদিকে, গুর্জর-প্রতিহারগণ মিহিরভোজ (৮৩৬-৮৫), প্রথম মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯১০) ও মহীপাল (৯১২-৯৪৪)-এর নেতৃত্ব পশ্চিম ও উত্তর ভারতে শক্তিবিস্তার করেছিলেন। পালদের মতোই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ তাদের রাজ্যগঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন সামন্তপ্রভূর অবস্থান থেকে। এই বংশের প্রথম কৃষ্ণ (৭৫৮-৭৭৩), ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩), তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪), অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৮) ও তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৪০-৬৮) রাষ্ট্রকূট শক্তির বিস্তার করেছিলেন। দশম শতকের শেষদিকে এর অবসান ঘটে।

তবে দশম-একাদশ শতকে ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল দক্ষিণ ভারতের চোল সাম্রাজ্য। প্রাচীন চোল রাজ্যের পুনরুত্থান ঘটে বিজয়ালয়ের হাত ধরে। প্রথম আদিত্য (৮৮০-৯০৭), প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৪) অপেক্ষাকৃত ছোটো রাজ্যের শাসক হলেও প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪) ও প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৪-১০৪০) চোলদের শক্তি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। এমনকী সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ-অভিযানের দ্বারা সাম্রাজ্যবিস্তারে চেষ্টা করেন এরা।

একাদশ শতকের শেষদিকে ও দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতে কোনো শক্তিশালী রাজ্য না থাকার জন্য তুর্কিদের পক্ষে ভারতে রাজ্যবিস্তার সহজ হয়েছিল। দশম শতকের শেষদিকে গজনির সুলতান সবুক্তগীন ভারত আক্রমণের সূচনা করেন, যা সুলতান মামুদ পরপর চালিয়ে যান (১০০০-২৭)। তবে এরা কেউই রাজ্যবিস্তারে উৎসাহী ছিলেন না। তবে মহম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২) জয়লাভ করে ভারতে সুলতানির শাসনের সূচনা ঘটান। মহম্মদ ঘুরী বিজিত অঞ্চলের দায়িত্ব তার অনুচর কতুবউদ্দিনের হাতে সমর্পন করে দেশে ফিরে যান। কুতুবউদ্দিন সামরিক অভিযান চালিয়ে উত্তর ভারতে তুর্কিদের আধিপত্য বিস্তার করেন। অন্যদিকে, বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করে সেখানে মুসলমান শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহম্মদ ঘুরীর মৃতুর পর কতুবউদ্দিন দিল্লির সুলতান হন (১২০৬-১০)। এই সুলতানি রাজ্য ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সুযোগ্য নেতৃত্বে এক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১.২. ❑ রাজনৈতিক বিবর্তনের চরিত্র

খিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতে যে সমস্ত রাজ্য বা সাম্রাজ্যতুল্য শক্তির উত্থান ও বিকাশ ঘটেছিল তাদের গঠন প্রক্রিয়ার চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের শেষ নেই। রাষ্ট্র ও সমাজ বিকাশের বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐতিহাসিকগণ এই সময়কার রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহের উত্থানকে মূলত বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বর্ধিত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় একদল ঐতিহাসিকের মধ্যে। বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশের প্রক্রিয়া। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আদলে সৃষ্ট ভারতীয় সামন্ততন্ত্র (Indian Feudalism) ধারণাটির প্রবক্তাদের মতে, সমাজ ও অর্থনীতি সামন্ততান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহণ (Feudalisation of society and economy)-এর ফলে পূর্বতন কেন্দ্রীভূত রাজ্যসমূহ থেকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছিল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের দ্বারা শাসনতান্ত্রিক অধিকারসহ ভূমিদানের মধ্যে দিয়ে। আমরা লক্ষ করেছি যে, আদি মধ্যযুগীয় ভারতের অনেকগুলি শক্তিশালী রাজ্যের আদিপুরুষগণ ছিলেন সামন্তশাসক। ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল প্রচারক D.D. Koshambi (An Introduction to the study of Indian History) ও রামশরণ শর্মা (Indian Feudalism 1965) এবং তাদের অনুসরণকারীদের এই ধারণাটি সমালোচিত হলেও পুরোমাত্রায় অস্বীকার করার চেষ্টা করেননি কেউই।

তবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে (অর্থাৎ পল্লব পাণ্ড্য) বিশেষ করে চোল সাম্রাজ্যকে সামন্ততন্ত্রের বাইরে অন্য একটি অভারতীয় সমাজরাষ্ট্রের আদলে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষ করা

যায় বিংশ শতকের শেষ সিকিভাগে। আফ্রিকীয় সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রে তৈরি কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্য (Segmentary State) ধারণাটির প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে। এই ধারণার প্রবক্তা বিশেষ করে Burton Stein (Peasant State and Society 1980) ও R.G. Fox (Kin, Clan, Raja and Rule, 1971)-এর মতে, পল্লব, চোল ও পরবর্তীকালের বিজয়নগর সাম্রাজ্যগুলির কেন্দ্রীয় সরকার সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ভোগ করলেও বিভিন্ন ভূ-অঞ্চলে অবস্থিত কৃষক অঞ্চল (Peasant region) বা প্রত্যন্ত অঞ্চল (Peripheral zone)-গুলো ছিল মূলত স্বয়ংশাসিত। কেন্দ্রীয়ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত মধ্যবর্তী অঞ্চল (Middle zone)। তবে এই কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্যের প্রকল্প দক্ষিণ ভারতের আদি মধ্যযুগীয় বা মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

১.৩. ❑ সামাজিক বিবর্তনের ধারা

আদি মধ্যযুগের সমাজ গঠন ও বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি (dynamics) নিহিত ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের মধ্যে। রাষ্ট্রব্যবস্থার সামন্তিকীকরণ বা কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্যের বিকাশ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার যে পরিবর্তন এনেছিল, তার ফলে গুপ্ত ও গুপ্ত-পূর্ববর্তী যুগের সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণির বা বর্ণের অবস্থানগত বিন্যাসের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

ব্রাহ্মণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রভূত পরিমাণে ভূমিদান করার ফলে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে কৃষি উৎপাদনে বেশি উৎসাহিত হয়। সামন্তরাজ বা আঞ্চলিক রাজাদের দ্বারা ভূমিদান হিসাবে দেওয়া গ্রামগুলিতে দানগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে দেয়। কৃষিকাজের মূল উৎপাদনগুলির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ভূমিদান গ্রহীতা (ব্রাহ্মণ, বল্লাল, মান্দ-মর্ত ইত্যাদি)-দের হাতে। অন্যদিকে, কৃষকরা হয়ে ওঠেন আজ্ঞাধীন কৃষিশ্রমিক (Servile agricultural labour)। এমনকী তারা বাধ্যতামূলক বেগার শ্রম (ভিষ্টি)-দানেও বাধ্য থাকতেন। সেচব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেগার শ্রমদানের প্রথা চালু হলেও ধীরে ধীরে তা মন্দির বা রাজপ্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

ব্যাবসাবাণিজ্যের অবক্ষয়ের ফলে বণিকশ্রেণি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়. এবং বণিক ও কারিগর শ্রেণিও কৃষিকাজে ভিড় করে। তবে কৃষিক্ষেত্রে ভূমি-নিয়ন্ত্রকদের অতিরিক্ত কঠোর মনোভাব কৃষিপণ্যের প্রকৃত উৎপাদকদের বিক্ষুব্ধ করত মাঝে মাঝে।

উৎপাদন ব্যবস্থায় ও উৎপাদক উৎপাদন-নিয়ন্ত্রকদের সম্পর্ক পরিবর্তনের ফলে ভারতের চিরাচরিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জাতিব্যবস্থার বিভিন্ন জাতির (casts) অবস্থানগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় বিভিন্ন মিশ্রজাতিসমূহের সৃষ্টি হয়। মিশ্রজাতির মধ্যে কায়স্থরা শিক্ষিত শ্রেণি হিসাবে ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। অক্ষত্রিয়

জাতির দ্বারা রাজ্যগঠনের ফলে তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়করণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ফলে ক্ষত্রিয়জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে অসম, ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য জাতিব্যবস্থা (Brahmical caste system)-বহির্ভূত অঞ্চলে আর্যসংস্কৃতির বিকাশের ফলে সেখানকার বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি (social class) জাতিব্যবস্থার (caste system) সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন জাতি হিসাবে নিজেদের প্রকাশ করতে থাকে।

১.৪. ❑ গ্রন্থপঞ্জি

১. R. K. Barman : From Tribalism to State (Delhi, 2007).

২. J. S. Grewal (ed) : State and Society in Medieval India (New Delhi, 2005).

৩. R. S. Sharma : Early Medieval Indian Society (Calcutta, 2001).

৪. Burton Stein : Peasant State and Society in Medieval South India (Delhi, 1980).

৫. D. D. Koshambi : An Introduction to the study of Indian History (Bombay, 1956).

৬. Romila Thapar (ed) : Recent Perspectives on Early Indian History (Mumbai, 2002).

১.৫. ❑ অনুশীলনী

১. খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বিকশিত রাজ্যসমূহের বিবরণ দিন।

২. আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চরিত্র কী ছিল?

৩. আদি মধ্যযুগে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের চালিকাশক্তি কী ছিল?

—

একক-২ ❑ সুলতানি ব্যবস্থার তত্ত্ব ও স্বরূপ : সুলতানি, খলিফা ও সুলতানীর বৈধতা

❑ গঠন

২.০. প্রস্তাবনা
২.১. সুলতানির স্বরূপ
২.২. সুলতান, খলিফা ও সুলতানির বৈধতা
২.৩. গ্রন্থপঞ্জি
২.৪. অনুশীলনী

২.০. ❑ প্রস্তাবনা

ভারতে সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা নিসঃন্দেহ একটি নতুন রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০) দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু একে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কৃতিত্ব ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬)। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে ইলতুৎমিস দিল্লি সুলতানিকে মুসলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশের মানচিত্রে উদ্‌ভাসিত করেন। তার মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে দিল্লি সুলতানি অপেক্ষাকৃত হীনবল হলেও বলবন (১২৬৫-৮৭) একে পুনরায় শৃঙ্খলাবন্ধ করে তোলেন। আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির সুলতানি শাসনকে দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে দেন। তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক একে শৃঙ্খলাবন্ধ করেন।

২.১. ❑ সুলতানির স্বরূপ

ত্রয়োদশ শতকে স্থাপিত দিল্লি-সুলতানির স্বরূপ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। সাধারণভাবে দিল্লি সুলতানিকে দিব্যতন্ত্রের (Theocracy) সঙ্গে তুলনা করা হয়। দিব্যতন্ত্র হল— a form of government in which God (or a diety) is recognised as the king or immediate ruler., and his laws are taken as the statiute book of the kingdom, these laws being usually administered by a priestly order as his minister are agents (Shorter Oxford Dictionary). তাই ইসলামিক রাষ্ট্রে আল্লাহ (ঈশ্বর)-কে সর্বশক্তিমান শাসক মনে করা হয়, যার মুখনিঃসৃত বাণী বা কোরান হচ্ছে সেই রাষ্ট্রের আইন। ইসলামিক আইনের মূল উৎস হচ্ছে সারা (Shara), যা হজরত মহম্মদয়-এর মধ্যে দিয়ে মুসলমানগণের কাছে পৌঁছেছে। *সারা*

পরিবর্তনযোগ্য নয়। এমনকি মহম্মদের *সারা* পরিবতর্নের অধিকার ছিল না। তিনি কেবলমাত্র *সারার* ব্যাখ্যা করেছেন, যা *হাদিস* নামে পরিচিত। এই *সারা* ও *হাদিস* হচ্ছে ইসলামিক দিব্যতন্ত্রের মূল আধার।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আদর্শ ইসলামিক সমাজব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে কোরান বা হাদিস-নির্দেশিত আইনগুলি যথেষ্ট নয়। তাই মহম্মদ ও তার উত্তরসুরি খলিফা (উমর, সৈমান এবং আলি)-দের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে মুসলমান রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে পারস্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেক বেশি সাযুয্যপূর্ণ তাই ইসলামিক ব্যবস্থায় 'সুলতান' (রাজা) নামক প্রতিষ্ঠানটি গৃহীত হল ইসলামের দ্রুত বিস্তারের জন্য, যা মহম্মদ নিজে কখনোই প্রচার করেননি। সুলতান নিজেও ইসলাম-বিচ্যুত জীবন যাপনের কালিমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই সুলতানের কার্যাবলিকে বৈধতাদানের জন্য সৃষ্টি হল 'উলেমা' নামের আর একটি প্রতিষ্ঠানের। উলেমাগণ সুলতানের রাজনৈতিক কার্যাবলির ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিতেন। উলেমাগণ মনে করতেন যে, সুলতানের দ্বারা ইসলামের শত্রুকে দমন করা একান্ত প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলাম কখনোই পুরোহিততন্ত্রকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, উলেমাগণ ইসলাম ও আল্লাহ সম্পর্কে তাঁদের অগাধ পান্ডিত্যের মধ্যে দিয়ে শাসকের প্রেরণাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বারবার। তাই উলেমাগণ ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার ও অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন।

উলেমাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ও দিল্লিতে স্থাপিত সুলতানির রাজনৈতিক তত্ত্ব পরস্পর এমনভাবে জড়িত যে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা চিন্তাই করা যায় না। কুতুবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিস দিল্লির সুলতান হিসাবে উলেমাদের সবসময় শান্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (১২৪৫-৬৫) বাংলা জয় করার পর উলেমাদের খুশি রাখার জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ তাদের মধ্যে দান করেছিলেন। সুলতান বলবনও খুব ভালভাবে অবহিত ছিলেন যে, উলেমাগণ ইচ্ছে করলে সুলতানিতে সুলতানের ক্ষমতার কর্তৃত্বের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। তিনিও তাই উলেমাদের সন্তুষ্ট রাখাই যুক্তিসংগত মনে করতেন। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রাজনীতির ক্ষেত্রে উলেমাদের হস্তক্ষেপ কখনোই বরদাস্ত করেননি। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে উলেমাদের প্রতিপত্তি কখনোই ক্ষুণ্ণ করেননি তিনি। আলাউদ্দিনের মতো মহম্মদ-বিন-তুঘলকও উলেমাদের অন্যান্য সরকারি কর্মচারী হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সফলতা অর্জন করতে পারেননি। অন্যদিকে ফিরোজ তুঘলকের আমলে উলেমাগণ পুনরায় স্বমহিমা অর্জন করেন। পাশাপাশি আফগান সুলতানগণও উলেমাদের সমীহ করে চলতেন এবং উলেমাদের ধর্মীয় প্রভাব তাদের শক্তির স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকাল বাদ দিয়ে দিল্লি- সুলতানির আমলে উলেমাগণ সুলতানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মদত গড়ার ভূমিকা পালন করেছেন। তাই দিল্লি-সুলতানি অবশ্যই ইসলামিক চরিত্র অর্জন করেছিল বিশেষত ইসলামের

প্রচারক ও মুসলমানদের রক্ষাকর্তা হিসাবে। অমুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা জিহাদ ঘোষণা করবেন—এটাই ছিল স্বাভাবিক, যার স্বরূপ লক্ষ করা যায় অমুসলমানগণের উপর 'জিজিয়া' নামক কর স্থাপনের মধ্যে।

২.২. ❑ সুলতান, খলিফা ও সুলতানির বৈধতা

দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত দিল্লির মুসলমান শাসকগণ নিজেদের 'সুলতান' হিসেবে পরিচয় দিতেন। যদিও ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথমদিকে 'সুলতান' পদটির অস্তিত্ব স্বীকার করা হত না, কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে এই পদটির উৎপত্তি ঘটে। প্রথমদিকে এই পদটির বিভিন্ন অর্থ প্রচলিত ছিল। কোরানে 'সুলতান' কথাটির অর্থ হল সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু মিশরে এর অর্থ ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা। অর্থের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের শাসক হিসাবে 'সুলতান' নামের প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি হয়েছিল সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে।

ইসলামের বিকাশের প্রথমদিকে খলিফা বলা হত আমির-উল-মুমিনিম (commander of believers), যিনি মুসলমানদের সভা *জমাইত*-এর কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। খলিফা হিসাবে তিনি ছিলেন ইসলামি দুনিয়ার শাসক আর ইমাম হিসাবে তিনি ধর্ম ও সমাজের বিধান দিতেন। কিন্তু যখন খলিফার রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়, সেই সময়ে মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন শাসক 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করে নিজেদের স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকার স্বগর্বে ঘোষণা করেছিলেন। একইভাবে গজনির মহম্মদ 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন—যার অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইলতুৎমিস (১২১০-১২৩৬) এই সুলতানিকে প্রকৃত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইলতুৎমিসের কাছে প্রশ্ন ছিল—ভারতে কীভাবে সুলতানি সাম্রাজ্যের শাসক বা সর্বময় কর্তা হিসাবে তার শাসন মুসলিম দুনিয়ায় গ্রহণযোগ্য হবে? এক্ষেত্রে দিল্লির প্রায় সমস্ত সুলতানিই একমত ছিলেন যে, তাদের রাজ্য হল মূলত খলিফার সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ। যেহেতু প্রথানুযায়ী তখনও পর্যন্ত খলিফা ছিলেন ইসলামি দুনিয়ার সবময় কর্তা তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মুসলমান শাসকগণ নিজেদের খলিফার প্রতিনিধি (deputy) হিসাবে চিহ্নিত করতেন। স্বাভাবিকভাবেই বাগদাদের খলিফার স্বীকৃতি ছাড়া কোনো সুলতানের শাসনই বৈধতা অর্জন করত না। দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠার সময় খলিফার রাজনৈতিক আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়লেও, রাজনৈতিক তথা সাম্রাজ্যকে বৈধতাদানের (Legitimacy of political authority) কারণে দিল্লির সুলতানগণ খলিফার প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রদর্শনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ইলতুৎমিস প্রথম বাগদাদের খলিফার কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তার মুদ্রায় খলিফার নাম অঙ্কিত করে 'খুৎবা' পাঠ করেন (১২২৯)। ইলতুৎমিসের এই পদক্ষেপ সুলতান হিসাবে তার শাসন দিল্লি-সুলতানি তথা মুসলিম

দুনিয়ায় বৈধতা দান করেছিল। দিল্লির পরবর্তী সুলতানগণও ইলতুৎমিসের পদকে অনুসরণ করেছিলেন।

তবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬) খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেননি। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকও আলাউদ্দিনের রীতি অনুসরণ করেছিলেন তার রাজত্বকালের প্রথমদিকে। তবে তার নানাবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে দিল্লি-সুলতানিতে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি খলিফার স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে তার শাসনকে বৈধতাদানের চেষ্টা করেছিলেন। তবে খলিফার প্রতি ফিরোজ শাহ তুঘলকের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল অকুণ্ঠ। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতানগণ খলিফার সঙ্গো সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রপরিচালনায় শাসকের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতা (legitimacy of political authority) শুধুমাত্র খলিফার মতো ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ওপর নির্ভরশীল নয়। শাসিতের (ruled বা Subject) মধ্যে সুলতানকে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজন ছিল। এর প্রয়োজনীয়তার জন্যই দিল্লির সুলতানগণ 'সুলতান' সম্পর্কে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুলতান নিজেকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী করে গড়ে তোলার জন্য তারা কতকগুলি তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন।

জিয়াউদ্দিন বরণীর *ফতোয়া-ই-জাহান্দারি* ও *তারিফ-ই-ফিরোজশাহি* থেকে দিল্লি-সুলতানিতে সুলতানের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। উলেমাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বরণী প্রচার করেছিলেন যে, সুলতান তার পদটিতে আসীন থাকার অপরাধে ক্ষমার অযোগ্য। পাপী কারণ কোরানে সুলতানের পদ বৈধ নয়। কিন্তু তিনি এই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন যদি তিনি মুসলমানদের রক্ষা এবং উলেমাদের ওপর কঠোর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

অন্যদিকে বরণীর মতে, সুলতান হচ্ছেন 'আল্লাহর দূত'। তাই তিনি তার ও তার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে পূরণ করেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দিল্লি-সুলতানির অবস্থা ছিল ভিন্ন। সুলতান যতদিন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারতেন ততদিনই তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত থাকত। আল্লাহর ইচ্ছা নয় ববং তলোয়ারই শেষ কথা বলত।

বরণীর মতে, আর-একটি কারণে সুলতানের প্রয়োজন ছিল বিশেষ করে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। শাসনব্যবস্থায়, নিয়োগ বা বরখাস্ত করা বা Stale laws রক্ষার দায়িত্ব ছিল সুলতানের ওপর। Zawabit বা State law in the technique of administration means pursuing a line of action which the king imposes as an obligatory duty on himself and from which he never deviates.

সুলতান বলবন সুলতানের মর্যাদা, অধিকার ও বৈধতা নিয়ে তার স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন তার পুত্র বুখরা খাঁর সঙ্গো আলোচনায়। বলবন মনে করতেন—King's heart is the

reflection of God. এটা কিন্তু সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন তার প্রতিফলন নয়। কাজেই সুলতান জনগণের ইচ্ছাধীন নন। সুলতান হিসাবে আল্লাহর ইচ্ছাকে পূরণ করাই তার কর্তব্য। শাসকের মনন যেহেতু আল্লাহর দ্বারা পরিচালিত, তাই তিনি কেবলমাত্র তাঁর কাছেই দায়বদ্ধ। সুলতান অবশ্য তার পদটির জন্য আল্লাহর কাছে ঋণী। এই ঋণ শোধ করা যাবে সুলতানের পদের সঙ্গে যুক্ত কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদনের মাধ্যমে। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন সম্ভব। তবে বলবন অমুসলমানদের 'জনগণ' থেকে বাদ দিয়েছেন।

বলবনের মতো আলাউদ্দিন খলজিও মনে করতেন যে, 'সুলতান' হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি। তাঁর মতে, Kingship knows no kingship. তাই রাষ্ট্রের অন্যান্যরা প্রত্যেকেই সুলতানের প্রজা বা কর্মচারী। এমনকি উলেমাদেরও তিনি শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে দিতে রাজি ছিলেন না।

২.৩. ☐ গ্রন্থপঞ্জি

১. U. N. Dey : The Government of the Sultanate (New Delhi, 1972).

২. K. A. Nizami : Some Aspects of Religion and Politics in India during the Thirteenth Century (Aligarh, 1961).

৩. J. S. Grewal (ed) : The State and Soceity in Medeival India (New Delhi, 2005).

৩.৪. ☐ অনুশীলনী

১. সুলতানির স্বরূপ নির্ণয় করুন।

২. খলিফার সঙ্গে দিল্লি-সুলতানির সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩. দিল্লির সুলতানগণ কীভাবে শাসনতান্ত্রিক বৈধতা অর্জন করতেন? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

—

একক-৩ ❑ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ

❑ গঠন

৩.০. প্রস্তাবনা
৩.১. প্রথাগত কেন্দ্রীভূতরাজ্য
৩.২. চোল রাষ্ট্র
৩.৩. কেন্দ্রীভূত দিল্লি-সুলতানি
৩.৪. গ্রন্থপঞ্জি
৩.৫. অনুশীলনী

৩.০. ❑ প্রস্তাবনা

প্রথাগত ঐতিহাসিকগণ ভারত ইতিহাসচর্চার সময় থেকে ভারতের রাজ্য বা রাষ্ট্রসমূহকে মূলত রাজা বা সম্রাটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা প্রচার করে আসছেন। কেন্দ্রীকরণের মূল উৎস ছিল রাজা। তার অধীনস্থ আমলা ও কর্মচারীর দ্বারা চালিত হত প্রাদেশিক ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শাসন। রাজ্যরক্ষা বা বিস্তারের হাতিয়ার সেনাবাহিনীতে থাকত রাজার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু প্রথাগত ঐতিহাসিকদের এই সরলীকৃত ব্যাখ্যা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বা কেন্দ্রীকৃত গঠনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে না। বরং আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণায় দেখা যায় যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্রসমূহতে বিকেন্দ্রীভূত শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। বিকেন্দ্রীকরণের পরিণতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ। আমরা ইতিপূর্বে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল—বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চালু থাকলেও গুপ্ত-পরবর্তী ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত গঠনের ধারাও চালু ছিল। কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চোল সাম্রাজ্য ও দিল্লি সুলতানির ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে লক্ষ করা যায়। কেন্দ্রীভূত গঠনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ধারা এখানে আলোচনা করা হল।

৩.১. ❑ প্রথাগত কেন্দ্রীভূত রাজ্য

প্রথাগত ধারণায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা হল শাসক বা শাসকগোষ্ঠির দ্বারা রাষ্ট্রের সমস্ত স্তরের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় এটা ছিল রাজা বা সম্রাট ও সহযোগীদের দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে ছিল বিভিন্ন

স্তরবিশিষ্ট একটি শাসকগোষ্ঠী যা সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দর্শনের দ্বারা বৈধতা অর্জন করত।

সমসাময়িক ভারতীয় এবং চিনা ও আরবিয় পর্যটকদের ওপর ভিত্তি করে প্রথাগত ঐতিহাসিকগণ রাজা বা সম্রাটকে সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিয়েছেন। শাসকগণ সাধারণত উচুস্থানের মর্যাদাযুক্ত উপাধি গ্রহণ করতেন। যেমন—*মহারাজা-ধিরাজ* বা *পরম ভট্টারক* ইত্যাদি। শাসনকার্য পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকত রাজার হাতে। প্রজার মঙ্গলসাধন ছিল রাজার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তবে রাজারা প্রজাদের কল্যাণের জন্য তৎপর থাকতেন। কারণ ছিল ধর্মীয় দর্শনের প্রভাব। হিউয়েন সাঙের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাই ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধনকে 'প্রজাকল্যাণকামী' শাসক বলা হয়েছে।

রাজার কাজে সহযোগিতার জন্য প্রতিটি রাজ্যেই থাকত একটি করে মন্ত্রীপরিষদ, যারা বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দায়িত্বে থাকতেন। তা ছাড়া থাকতেন বিভিন্ন ধরনের সরকারি কর্মচারী। যেমন—হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থায় ছিল অবন্তি (পররাষ্ট্রবিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক), *সিংহনাদ* (প্রধান সেনাপতি), *কুন্তল* (অশ্ববাহিনীর প্রধান), *মহাসামন্ত, মহারাজা, মহাস্থানীয়, কুমারামাত্য, উপরিক, বিষয়পতি* ইত্যাদি।

রাষ্ট্রকূটদের শাসনব্যবস্থাতেও এই ধরনের পদগুলির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। বাংলার পাল শাসনব্যবস্থাতেও *রাজা, রাজন্যক, রানিক, সামন্ত, মহাসামন্ত, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, রাজস্থানীয়,* দূত, *অঙ্গরক্ষ* ইত্যাদি বিভিন্ন পদের কথা জানা যায়।

কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকত প্রাদেশিক যা আঞ্চলিক শাসকগণ। *ভুক্তি* (প্রদেশ) ও *বিষয়* (জেলা) ছাড়াও আরও কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক এককের কথা জানা যায়।

রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষার জন্য রাজাও নিয়ন্ত্রণ করতেন সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজা রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের কর ও রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব জনকল্যাণ, শাসনতান্ত্রিক ও ধর্মীয় দর্শনের প্রচারের কাজে ব্যয় করত, রাষ্ট্র যাকে এককথায় কেন্দ্রীকৃত উদ্‌বৃত্তের পুনর্বিতরণ (Redistribution of concentrated surplus)-এর পদ্ধতি বলা যায়। এটা শাসকের শাসন করার অধিকারকে বৈধতা দান করত।

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রথাগত এই ধারণা উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন বিংশ শতকের অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, A. S. Altekar-এর *The Rashrakutas and Their Times* (1935) ও *State and Government in Ancient India,* R. K. Mokherjee-র Local Government in Ancient India, R. C. Majumdar-এর History of Ancient Bengal, ইত্যাদির কথা। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ আলোচিত সময়ের রাষ্ট্রসমূহকে কেন্দ্রীভূত বা কেন্দ্রীকৃত বলার পক্ষপাতী হন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মৌখরী, পাল, রাষ্ট্রকূট বা গুর্জর প্রতিহার এবং চালুক্য রাজ্য বা সাম্রাজ্যসমূহ উপস্থিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের বিকেন্দ্রীভূত শক্তির দ্বারা। ফলে এই রাজ্যগুলোকে

কেন্দ্রীভূত বলার পক্ষপাতী নন। R. S. Sharma, B.N.S. Yadav, R. M. Srimali বা তাদের সমর্থকগণ। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্র বিশেষ করে পল্লব ও চোলদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাষ্ট্রব্যবস্থার (Segmentary State System) উপস্থিতির কথা জাহির করেছেন Burton Stein, বা R. G. Fox-এর মতো ঐতিহাসিকগণ। এদের মতে, চোল বা পরবর্তীকালের বিজয়নগর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হলেও আদতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন-এর কর্তৃত্বকে এরা খণ্ডন করতে পারেননি। বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য চোল ও সুলতানি রাষ্ট্রব্যস্থার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী অংশগুলিতে।

৩.২. ❑ চোল রাষ্ট্র

আদি চোলদের পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক থাকলেও এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, চোল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা ছিলেন বিজয়ালয়। ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঞ্জোর দখলের মধ্য দিয়ে চোলদের রাজ্যবিস্তার শুরু হয়। নবম শতকের মধ্যে কাঞ্চীর পল্লব এবং দক্ষিণ তামিল দেশ বা তোণ্ডমণ্ডল এর পাণ্ড্যদের দুর্বল করে দিয়ে চোল রাজগণ সেখানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু সমসাময়িক রাষ্ট্রকূট শক্তি চোলদের বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ৯৬০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর সুদূর দক্ষিণে চোলদের দ্রুত রাজ্যবিস্তার ঘটে।

চোলদের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন রাজারাজা (৯৮৫-১০১৪) এবং তার পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৪-১০৪৪)। রাজারাজা তাঁর পিতার বর্তমানেই শাসক হিসাবে নির্বাচিত হন। রাজ্য অভিষেকের পূর্বেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা ও শাসনকার্যের প্রভূত অভিজ্ঞতা তাঁকে রাজ্যবিস্তারে সহযোগিতা করেছিল। চেরাদের নৌবাহিনীকে পরাজিত করে ত্রিবান্দ্রম (তিরুবনন্তপুরম) অধিকার করেন তিনি। পাণ্ড্য রাজাকে পরাজিত করে তিনি মাদুরাই দখল করেন ও শ্রীলঙ্কায় নৌ-অভিযান পাঠান। উত্তরদিকে ভেঙ্গি ও কর্ণাটকের গঙ্গাদের রাজ্য আক্রমণ করেন রাজারাজা। রাজারাজার নীতি অনুসরণ করেন তার সুযোগ্য পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র। চেরা ও পাণ্ড্যদের রাজ্য সম্পূর্ণভাবে চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি এবং শ্রীলঙ্কা বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

চোল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথমদিকে অর্থাৎ নবম-দশম শতকে চোল সম্রাট একাই তোণ্ডমণ্ডলের শাসক ছিলেন না। সেখানে প্রথাগত কিছু গোষ্ঠীপ্রধান রাজার আধীনস্থ হিসাবে শাসন করতেন। এই গোষ্ঠীপ্রধান নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ছিলেন প্রায় স্বাধীন। এমনকী তাদের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা ও সেনাবাহিনীও ছিল। তবে তারা চোল সম্রাটের বিরোধিতা করতেন না বরং সাম্রাজ্যবিস্তারে চোল সম্রাটদের সহযোগিতা করতেন। কিন্তু দশম শতকের শেষ ও একাদশ শতকের এই গোষ্ঠীপ্রধানগণদের নির্মূল করে তাদের অধিকৃত অঞ্চল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন রাজারাজা ও প্রথম রাজেন্দ্র। অঞ্চল হারানো এই প্রধানদের চোলদের নতুন শাসনব্যবস্থায় স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বাদশ শতকে পুনরায় এই প্রধানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

রাজ্যের আঞ্চলিক বিস্তৃতির সঙ্গো সঙ্গো চোলরাষ্ট্রের গঠনে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রাজারাজা (১ম) অধিকৃত অঞ্চলের পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি নতুন নামকরণ করেন। জয়ীকৃত অঞ্চল সমূহকে বলা হতে থাকে বলনাড়ু। রাজারাজার শাসনতান্ত্রিক আর-একটি উদ্ভাবন ছিল 'মণ্ডলম' নামের শাসনতান্ত্রিক এককের সৃষ্টি। বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের পূর্বতন নামের পরিবর্তে এখন *মণ্ডলম* নামে পরিচিত হতে থাকে। তাই পন্ডিনাড, পাণ্ড্যদেশ, পরিচিত হয় রাজারাজা মন্ডলম হিসাবে। একইভাবে তোণ্ডাইনাড়ু ও চোলনাড়ু পরিচিত হয় যথাক্রমে জয়গোণ্ডা-চোলমণ্ডলম ও চোলমণ্ডলম হিসাবে। এই মণ্ডলমগুলি শুধুমাত্র নতুন নাম ছিল না, বরং প্রধানদের অঞ্চলসমূহকেও এখানে সংযুক্ত করা হয়। যেমন চোলমণ্ডলম-এ পূর্বতন চোলনাড়ু (core area) ছাড়াও পার্শ্ববর্তী মালনাড়ু, কোনাড়ু, ইরাঞ্জুনা পাড়ি ইত্যাদি যোগ করা হয়। তবে চোল শাসনব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি ছিল নাড়ু। যদিও নাড়ুকে সাধারণভাবে বৃহত্তর রাজনৈতিক একক (political territorial unit) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাড়ু ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মাপের কৃষি অঞ্চল (agricualtural micro region)।

চোল রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বতোভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্র। যেহেতু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের নৃপতির পদ থেকে চোল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি, তাই দশম-একাদশ শতকে চোল সম্রাটগণ উচ্চমর্যাদাযুক্ত উপাধি করতেন। এখন থেকে তারা *পেরুমান* বা মহান পুত্র (Peruman or great son) হিসেবে পরিচিত হতে থাকনে। দশম শতকের মধ্য থেকে রাজা ও প্রজার মধ্যে সামাজিক পার্থক্যও বাড়তে থাকে। প্রজারা রাজাকে *উণ্ডাইয়ার* (Undaiyar) বা 'আমাদের প্রভূ' বলে সম্বোধন করতে থাকে। একাদশ শতকের শেষ ও দ্বাদশ শতকের গোড়ায় চোল সম্রাটগণ 'চক্রবর্তী' (সম্রাট) এবং *ত্রিভুবন চক্রবর্তী* (ত্রিলোকের সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপাধি গ্রহণের প্রসঙ্গো মনে রাখা দরকার যে, তৎকালীন কতকগুলি দেবদেবীর উপাধি রাজার উপাধির সমতুল ছিল। এমনকি কোনো কোনো। রাজা দেবদেবীর Tolan বা বন্ধু (comrades) হিসেবেও পরিচয় দিতেন।

চোল সম্রাটগণ প্রত্যেকেই বহুবিবাহের অনুসারী ছিলেন। প্রথমদিকে সাধারণ পরিবারের বা দেবদাসীদের সঙ্গো রাজাদের বিয়ে হলেও পরবর্তীকালে গোষ্ঠীপ্রধান বা আঞ্চলিক প্রধানদের পরিবারের সঙ্গো রাজাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই বিবাহগুলি চোল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পক্ষেও সহায়ক ছিল। অগ্রজের অধিকার ছিল উত্তরাধিকারের নিয়ম। অভিষেক সম্পন্ন করতেন ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণ।

চোল শাসনব্যবস্থায় রাজার অবস্থান ছিল সর্বোচ্চে। তিনি আইন বা সর্বোচ্চ আদেশ জারি করার অধিকারী ছিলেন। রাজাদেশকে বলা হত Tiru-aanai (বা the sacred command). চোল লিপিগুলিতে রাজাদেশ বা রাজাজ্ঞা প্রচারের সঙ্গো বিভিন্ন ধরনের আধিকারিকদের কথা বলা হলেও আইনব্যবস্থা নির্ণয়ের কোনো স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না এগুলিতে। তবে একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হত সর্বোচ্চ আধিকারিক (অধিকারী) থেকে শুরু

করে সর্বনিম্ন সেনার দ্বারা।

চোল শাসনের প্রথম শতকে সরকারি আধিকারিক বা আমলাদের সংখ্যা ও পদ ছিল অতি অল্পসংখ্যক। কিন্তু আঞ্চলিক বিস্তৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো রাজকর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও সামরিক বিভাগে। *তিরুমন্দিরা-ওলাই* ছিলেন রাজার মুখ্য সহায়ক (ব্যক্তিগত সচিব)। এই পদটি চোলদের সমগ্র শাসনকালে প্রচলিত ছিল। *অধিকারী* পদাধিকারী আধিকারিকগণ ছিলেন প্রধান বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। প্রথমদিকে এদের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছিল। *নাড়ু তিরুক্কাই* ছিল বিচারব্যস্থার সঙ্গো যুক্ত কতকগুলি দপ্তর। এদের প্রধানদের বলা হত ভট্ট (বা শিক্ষিত ব্রাহ্মণ)। একাদশ শতকে *সেনাপতি* ছিল আর-একটি উল্লেখযোগ্য পদ। দ্বিতীয় শ্রেণির সামরিক পদকে বলা হত *দণ্ডনায়গম*। পাশাপাশি ছিল ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের দপ্তর বা *পুরাবুভাড়ি-তিনাইক্কালাম* (Puravuvari-Tinaiikkalam) যা দশম শতকে গঠিত হয়েছিল।

কর সংগ্রাহকদের নীচে ছিলেন আঞ্চলিক আধিকারিকগণ (Nadu-level officials) যাদেরকে বলা হত *নাড়ু-ভাগই*। এদের প্রধান কাজ ছিল কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রহ করা। এছাড়া ছিল শ্রীকারিয়মগণ যাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করা।

আধুনিক গবেষণায় চোলদের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের কর সংগ্রহের বিষয়ে জানা যায়। *Kadamai, Kudimai* কারিগর বণিকদের থেকে সংগ্রহিত করা বিবিধ কর (Miscellaneous taxes) ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায় চোল ইতিহাসের উপাদানগুলিতে। *কাদামাই* ছিল মুখ্য ভূমিকর। এর অন্যান্য নাম ছিল *পুরাভু, ঈরাই, কানিক-করণ, মেলভারম, অপাড়ি* ইত্যাদি। কুদিমাই ছিল বিনাবেতনের শ্রম (বা Corvee বেগাড়)। যা *ভেত্তি* (সংস্কৃত ভিস্তি), *অমনজি, মুত্তাইয়ালি* এবং *ভীতিনাই* নামেও পরিচিত ছিল। এছাড়া ছিল *কারিগর* ও বণিকদের ওপর আরোপিত *পাট্টম* এবং *আয়ম* নামের কর। চতুর্থ শ্রেণির কর ছিল *চৌকিদার কর*, জরিমানা, উপহার, সাময়িক কর ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত।

ভূমিকর সাধারণত ভূমির মালিক (কানিয়ালির সরাসরি সরকারকে প্রদান করত, যা নির্ধারিত হত ভূমি পরিমাপের পর। *Ulukudi* বা প্রকৃত কৃষক ও *আদিমাই* (দাস শ্রমিক), গণ করদান করত তাদের ওপরওয়ালা বা কানিয়ালরদের। বেগার শ্রম (বুদিমাই)-এর দ্বারা সাধারণত সেচব্যবস্থার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হত চোল শাসনের প্রথমদিকে। কিন্তু রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো ও রাজ প্রাসাদ ও মন্দির-এর ক্ষেত্রেও কুদিমাই আদায় প্রযোয্য হয়। ফলে প্রকৃত কৃষকের (Ulukudi) ওপর দায়ভার বেড়ে যায় এবং সামান্য ঘটনাতেই তারা রাষ্ট্রশক্তি তথা ভূমিমালিকের বিরোধিতা করে, যারা মূলত ছিলেন ব্রাহ্মণ বা বেল্লাল। অন্যদিকে নিষ্কর ভূমিদানের (ব্রাহ্মদেওয়া ও দেবদান) প্রথা রাষ্ট্রের আয় কমে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে দানপ্রাপ্ত জমির জন্যও দানগ্রহীতা সর্বোতোভাবে কর থেকে রেহাই পেতেন না।

চোল শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় ছিল স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সভাসমূহের

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ব্রাহ্মণদের গ্রামসমূহ (অগ্রহার)-তে তাদের সভা রাজার একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে স্থানীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি করত। তবে রাজার গ্রামীণ প্রতিনিধি (উড়-আলবান)-র ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। এমন চোল শাসনের শেষার্ধে এই *ব্রাহ্মদেওয়া* গ্রাম ছাড়া এর অস্তিত্ব ছিল না। উড়-*আলবানের* প্রধান কাজ ছিল করসংগ্রহের তদারকি করা। সাধারণ গ্রামসমূহে উড়-*আলবান* পদের অস্তিত্ব ছিল না। কর সংগ্রহের জন্য এক্ষেত্রে উড়িল-তাণ্ডিনিনরাম, কৌমুরার্ভার ও মুদালিগলি নামের রাজকর্মচারীগণ ছিলেন। গ্রামের হিসোবরক্ষার জন্য গ্রামগুলি নিয়োগ করত উড়কারনমদের। এরা গ্রামের কর্মচারী ছিলেন, সরকারের নয়। স্থানীয় শাসনের জন্য গ্রামগুলির নিজস্ব বিচার ও পুলিশব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামেও সেনাবাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় যারা স্থানীয় শাসনের অংশীদার হয়ে ওঠে।

চোল রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিকদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতো ঐতিহাসিক এই ব্যবস্থাকে 'Highly Centralised State' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু গত কয়েক দশকে নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতকে সমালোচনা করে তিনটি নতুন মতামত উঠে এসেছে চোল শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের বিষয়ে। এগুলি হল সামন্তরাষ্ট্র, কেন্দ্রীভূত বিভাজিত রাষ্ট্র (Segmentary State) এবং আদি রাষ্ট্র (Early State)। তবে এটা কখনই আদি রাষ্ট্র নয়, কেননা শুন্য থেকে এর শুরু হয়নি। বরং প্রাক্ চোল রাষ্ট্রব্যবস্থা (পল্লব, পাণ্ড্য, চেরা ইত্যাদি)-র চলমানতাই ছিল চোল রাষ্টব্যবস্থা। আর কেন্দ্রিনিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাষ্ট্র এর ধারণা আফ্রিকায় নৃতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত Burton Stein-এর হাত ধরে চোলদের শাসনব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে, যা স্বায়ত্ত শাসনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এটা অবশ্য সমস্ত রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রিভূত শাসনের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, চোল রাষ্ট্রের তিনটি পর্যায় ছিল—

(১) প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী (৮৫০-৯৪৫), (২) সাম্রাজ্যবাদী (৯৮৬-১১০০) ও (৩) সাম্রাজ্যোত্তর (১১০০-১২৫০)।

প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে রাজার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল এবং স্থানীয় শাসকগণ ছিলেন বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। শাসনব্যবস্থায় জটিলতাও ছিল কম। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে রাজা হয়ে ওঠেন শাসনব্যবস্থার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রক। সংগঠিত আমলা, সেনাবাহিনী ও শাসনযন্ত্রের দ্বারা তৈরি হয় এক-কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। অন্যদিকে সাম্রাজ্যোত্তর পর্যায়ে প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের দায়ভার বৃদ্ধি পায় ও রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতার জন্যও তারা সাহসী হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বের দ্বারা কেন্দ্রীভূত চোল শাসনকে বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র (Decentralised State) হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিসংগত নয়।

৩.৩. ❑ কেন্দ্রীভূত দিল্লি-সুলতানি

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল দিল্লি-সুলতানি যা বিকেন্দ্রীভূত ভারতীয় সামন্তরাষ্ট্রের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে তুর্কিরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে সুলতানি শাসনের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, যা ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এককেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল-এর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় এর থেকে আর নতুন নতুন ছোটো রাজ্যের উত্থান ঘটে।

যদিও দিল্লির সুলতানদের অনেকেই নিজেদের বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার অধীনস্থ সামরিক নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং খলিফার নাম ও *খুতবায়* খোদাই করেছেন, কিন্তু খলিফা কখনোই দিল্লি সুতানির বৈধ শাসক ছিলেন না। দিল্লির সুলতানিরা দিল্লি সুলতানিকে মুসলিম জগতের অংশ হিসাবে মাঝে মাঝে ঘোষণা করতেন এবং এখানে খলিফার কেবলমাত্র প্রতীকী উপস্থিতি ছিল। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক, আইনগত ও সামরিক কর্তৃত্বের মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন সুলতান নিজে। রাষ্ট্রের বিকাশ ও নিরাপত্তার দায়িত্বও ছিল তাঁর। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তথা সেনাবাহিনীর প্রধান নায়কও ছিলেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা তথা বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতাও ছিল তাঁর হাতে। সুলতানগণ সাধারণত বিচারব্যবস্থাতে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেন। সুলতান বলবন ও আলাউদ্দিন খলজির নিরপেক্ষ বিচার সুবিদিত ছিল। মহম্মদ-বিন-তুঘলক এক্ষেত্রে আরো বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি উলেমাদেরও সমবিচারে (Uniformity of law)-র আওতায় নিয়ে আসেন।

দিল্লি-সুলতানির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না। সুলতানের যে-কোনো পুত্রই পরবর্তী সুলতান হতে পারতেন। এমনকি ইলতুৎমিস তাঁর পুত্রদের পরিবর্তে তার কন্যা রাজিয়াকে (১২৩৬-৪০) সুলতান নির্বাচিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক মুসলিম বা হিন্দু কোনো রাজনৈতিক আদর্শেই অগ্রজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। দিল্লি-সুলতানিতে সুলতানের বৈধতার প্রশ্ন থাকলেও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুলতানি দখলও অবৈধ ছিল না। দিল্লি-সুলতানির ক্ষেত্রে এর একাধিক উদাহরণ বিদ্যমান। তাই সামরিক ক্ষমতা সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল।

সুলতানকে সাহায্য করার জন্য সুলতান তার ইচ্ছানুসারে মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন, যারা সুলতানের ইচ্ছানুসারেই পদচ্যুতও হতেন। মন্ত্রীদের সংখ্যা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হত। তবে ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে দিল্লি সুলতানিতে একটা নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। শাসনব্যবস্থায় সুলতানের পর মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন উজির (Wazir)। প্রথমদিকে উজিরগণ ছিলেন মূলত সামরিক নেতা। কিন্তু চতুর্দশ শতকে উজির সামরিক দায়িত্বের চেয়ে রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ের বেশি গুরুত্ব পান। মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলক এক্ষেত্রে বিশেষ

ভূমিকা নিয়েছিলেন।

উজির পর প্রধান সরকারি বিভাগ ছিল *দেওয়ান-ই-আরজ* বা সামরিক বিভাগ। এই বিভাগের প্রধানকে বলা হত *আরজ-ই-মমালিক*। তবে তিনি কিন্তু সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপাতি ছিলেন না, যেহেতু সুলতান নিজের হাতেই রেখেছিলেন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ। কেননা সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সুলতানের অস্তিত্বই তৎকালীন যুগে সম্ভব ছিল না। বলবনই প্রথম পৃথক সেনাবিভাগ (arz) স্থাপন করেছিলেন, যা আলাউদ্দিন খলজির আমলে আরো সংগঠিত রূপ ধারণ করেছিল। আলাউদ্দিন খলজি সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন এবং দুর্নীতি দমনের জন্য দাগ (Branding) প্রথা চালু করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজি নানাবিধ পরীক্ষানীরিক্ষা ও পদ্ধতির মাধ্যমে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন। তবে এটা দিল্লি সুলতানির সাধারণ কোনো ব্যবস্থায় পরিণত হয়নি।

দিল্লি-সুলতানির উল্লেখযোগ্য আরও দুটি দপ্তর ছিল—*দিওয়ান-ই-রিসালাত* (Diwan-i-risalat) ও *দিওয়ান-ই-ইনসা* (Diwan-i-insha)। *দিওয়ান-ই-রিসাল*-এর কাজ ছিল ধর্মীয় ব্যাপার, পবিত্র সংগঠন ও গুণীজনদের ভাতার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করা। এই বিভাগটি সাধারণত একজন মুখ্য *কাজি* বা *সদ্‌র* -এর দ্বারা পরিচালিত হত। তিনি আবার বিচারবিভাগেরও সর্বোচ্চ আধিকারিক ছিলেন। কাজীগণ বেসামরিক (civil) বিচারের জন্য ইসলামি আইন (বা শারিয়া)-এর ওপর নির্ভর করতেন। হিন্দুদের বিচারের জন্য আলাদা বিচারব্যবস্থা ছিল না, তাদের জাতি-সভা বা গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হত। *দেওয়ান-ই-ইনসার*-এর প্রধান কাজ ছিল সরকারের মধ্যে ও সুলতানির সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগাযোগ রাখা।

উল্লিখিত বিভাগগুলি ছাড়াও দিল্লি-সুলতানিতে আর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল। প্রধান *বারিদ* বা গুপ্তচরের অধীনে সুলতানির বিভিন্ন প্রান্তে কাজ করত অন্যান্য বারিদগণ। সুলতানের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাসাদ, *হারেম* ও *কারখানা* তদারকির জন্যও আলাদা বিভাগ ছিল। ফিরোজ তুঘলক দাসদের জন্যও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য পৃথক পূর্তবিভাগ সৃষ্টি করে ছিলেন।

দিল্লি-সুলতানির কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণে ছিল আঞ্চলিক বা স্থানীয় শাসন। সামরিক অভিযানের দ্বারা সৃষ্ট রাজ্যকে সুলতানগণ কতগুলি বদলি অঞ্চল বা ইক্তাতে ভাগ করেছিলেন। ইক্তার শাসককে বলা হত *মুক্তি* বা *ওয়ালি*। প্রথমদিকে মুক্তিগণ ছিলেন মূলত স্বাধীন। এরা শাসনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতেন এবং অতিরিক্ত উদ্‌বৃত্ত (Fazail) কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠাতেন। প্রয়োজনে সুলতানকে সামরিক সাহায্য দিতেন। কিন্তু সুলতানের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিদের ওপর সুলতানের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। মহম্মদ-বিন-তুঘলক মুক্তিদের সামরিক ক্ষমতা খর্ব করে তাদের কর সংগ্রাহক ও শাসনতান্ত্রিক আধিকারিকের পর্যায় নামিয়ে আনেন।

ইক্তার পরবর্তী শাসনতান্ত্রিক একক ছিল সিক্, যাদের নীচে ছিল পরগনা। সিক্ ও পরগনার ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য আমাদের কাছে নেই। পরগনার শাসক ছিল আমিলগণ। গ্রাম-শাসনে খুৎ ও মকদ্দমদেরও ভূমিকা ছিল।

দিল্লি-সুলতানিতে সুলতানের অবস্থান, শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি ও গঠনের প্রেক্ষিতে একে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বলা যায়। তবে প্রথমদিকে বা গঠনের সময় (Formative phase) সুলতানের অবস্থান ততটা শক্তিশালী ছিল না বরং অভিজাত, উলেমা ও মুক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। কিন্তু বলবনের আমল থেকে সুলতান হয়ে উঠেন সর্বশক্তিমান শাসন-নিয়ন্ত্রক। আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলক সুলতানিকে কেন্দ্রীকরণের শিখরে পৌঁছে দেন। কিন্তু ফিরোজ তুলঘলকের সময় এর অবক্ষয় শুরু হয়। চতুর্দশ শতকে লোদি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সুলতানির সূত্রপাত ঘটে।

৩.৪. ❑ গ্রন্থপঞ্জি

১. Romila Thapar (ed) : Recent Perspectives of Early Indian History, Mumbai, 2002.
২. J. S. Grewal (ed) : The State and Society in Medievel India (New Delhi, 2005).
৩. Hermaun Kulke (ed) : The State in India 1000-1750 (New Delhi, 1995).
৪. R. C. Majumdar : History of Ancient Bengal.
৫. K. A. Nilkantha Sastri : The Cholas (Madras, 1835-37).
৬. R. S. Sharma : Indian Feudalism, (Calcutta, 1965).
৭. U. N. Day : The Government of the Sultanate, (New Delhi, 1972).
৮. K. A. Niazmi : Some Aspects of Religion and Politics in India During the Thirteenth Century, (Aligarh, 1962).
৯. Y. Subbarayalu : The Chola State, Studies in History, Vol-IV, No 2, pp-265-306.

৩.৫. ❑ অনুশীলনী

১. আপনি কি মনে করেন যে আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত?
২. চোল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গঠন আলোচনা করুন।
৩. দিল্লি সুলতানিকে কি কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা যায়?

একক-৪ ❑ : রাষ্ট্র ও সমাজ

❑ গঠন

৪.০. ভূমিকা
৪.১. আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র
৪.২. আদি মধ্যযুগীয় সমাজ
৪.৩. দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্র ও সমাজ
৪.৪. গ্রন্থপঞ্জি

৪.০. ❑ ভূমিকা

আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ভারতের সর্বত্র একরকম ছিল। সময় ও অঞ্চলভেদে তাদের রূপ ছিল ভিন্ন। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো সমাজব্যবস্থার স্বরূপ ছিল ক্রমশ পরিবর্তনশীল। তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট (Fixed or Rigid) তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির (conceptual framework) দ্বারা খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক ও তাদের স্বরূপ নির্ণয় করা অসমীচীন। আলোচ্য এককে আলোচ্য সময়ের প্রেক্ষিতে ভারতীয় রাষ্ট্র ও স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে।

৪.১. ❑ আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র

আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে বর্তমান পর্যায়ের পূর্ববর্তী এককগুলিতে ইতিপূর্বেই সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে দেখা যায় যে, গুপ্ত বা প্রাকগুপ্ত যুগের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত শক্তির প্রভাবে বিকেন্দ্রীভূত রূপ পরিগ্রহ করেছিল পঞ্চম শতক থেকে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাই আবার কেন্দ্রীকরণের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে কেন্দ্রীভূত সুলতানি ও দক্ষিণ ভারতে কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত চোল শাসনের স্তরে উন্নত হয়েছে।

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বিংশ শতকের গোড়ায় আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। A. S. Altekar বা K. A. Nilkantha Sastri বা R.K. Mukherjee প্রমুখ তাঁদের গবেষণায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। কিন্তু মার্কসবাদী ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসের 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি' (Asiatic Mode of Production) দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের দ্বারা সীমাবদ্ধ, স্বৈরাচারী শাসকের দ্বারা পরিচালিত ও উদ্‌বৃত্ত শোষণকারী, কিন্তু প্রজাকল্যাণমুখী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তারা। কিন্তু বাস্তবে আলোচ্য সময়ের

রাজ্য বা রাজ্যসমূহ কোনোভাবেই নির্দিষ্ট (Fixed) বা অপরিবর্তনীয় কোনো বিষয় ছিল না। ফলে মার্কসের 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি'র ধারণা ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা বার্জিত হয়। কিন্তু সমাজ রাজনীতি বিবর্তনের ধারার সামন্ততন্ত্র-বিষয়ক মার্কসের ধারণা আদি মধ্যযুগীয় বা মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ব্যপকহারে প্রয়োগ করেছেন। ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সামন্ততন্ত্র ভারতের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের দ্বারা ভারতীয় সামন্ততন্ত্র (Indian Feudalism) হিসাবে প্রচারিত হয়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত নতুন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত R. Coulborn সম্পাদিত '*Feudalism in History*' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে Daniel Thorner মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতের সামন্ততন্ত্র বিষয়ে কোনো গ্রন্থ এমনকি কোনো প্রবন্ধও লেখা হয়নি। Thorner এই মন্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে ওই বছরেই প্রকাশিত হয় সামন্ততন্ত্র তথা প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাস-বিষয়ক D. D. Kosambi-র বিখ্যাত গবেষণা '*An Introduction to the study of Indian History*'. (Bombay, Popular Prakashan, 1956)। ওই একই বছরে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বিষয়ে Kosambi-র আরও দুটো প্রবন্ধ *On the Development of Feudalism in India* (Annals of the Bhandarkar Oreintal Research Institute, 36 (1956), pp-258-69) এবং *Origin of Feudalism in Kashmir* (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. 31/32 (1956), pp-108-20) প্রকাশিত হয়। Kosambi-র An Introduction to the study of Indian History-র দুটো অধ্যায় *Feudalism From Above* এবং *Feudalism from Below* ছিল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাটির প্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এর দু বছর পর R. S. Sharma ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ-বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তবে Sharma-র বিখ্যাত *Indian Feudalism* (Calcutta, 1965) প্রকাশিত হয় 1965-তে।

Sharma-র মতে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তির কারণ ছিল পুরোহিত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মচারীদের নিষ্কর ভূমিদানের মধ্যে দিয়ে। ভূমিদানের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক অধিকার দান করার ফলে দানপ্রাপ্ত ভূমিতে দানগ্রহীতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত উৎপাদন করে দানগ্রহীতা অতিরিক্ত ভূমিকর আদায়ে উদ্‌গ্রীব হয়। পাশাপাশি মুদ্রাব্যবস্থা ও বাণিজ্যের অবক্ষয় বণিক ও কারিগরদের ভূমিমুখী করে তুলেছিলেন। ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদিত উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহ ও ভোগ করার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ছিল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূল কথা।

Sharma বক্তব্যের সমর্থনে ও বিপক্ষে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় 1964 সাল থেকেই। D. C. Sirkar, Sharma-র যুক্তিকে খণ্ডন করে '*Landlordism Confused with Feudalism*' প্রকাশ করে 1966 খ্রিস্টাব্দে। Sirkar-এর মতে, আদি মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ বা রাষ্ট্রে সামন্ততন্ত্র খুঁজতে যাওয়া অসমীচীন, কেননা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য

(Historical sourecs)-সমূহ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র এর অস্তিত্বকে সমর্থন করে না। একথা সত্যি যে, পুরোহিত শ্রেণিকে নিষ্কর ভূমি দান করা হত। কিন্তু এই দানগুলির বেশিরভাগই ছিল পতিত জমি। ফলে Sharma-র বক্তব্যকে Sirkar সমর্থন করেননি। তাই সামগ্রিকভাবে 'Indian Feudalism'-এর ওপর গবেষণা ধামাচাপা পড়ে। এমনকি পরবর্তীকালের Indian Feudalism-এর সমর্থক ও Sharma-র সুযোগ্য ছাত্র D. N. Jha তাঁর Ph. D.-র গবেষণায় Indian Feudalism বিষয়ক একটি শব্দও প্রয়োগ করেননি (Revenue system in Post Maurya and Gupta Times–(1967).

তবে সাতের দশকে আবার Indian Feudalism-এর ওপর ভারতীয় ঐতিহাসিকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। 1973 খ্রিস্টাব্দে B.N.S. Yadav-এর *Society and Culture in North India in the Twelfth Century* (Allahabad, 1973) প্রকাশিত হয়। Yadav নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ভূমিদানের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের বিষয়কে প্রমাণ করেন। Yadav-এর মতে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল *সামন্ত*, যারা ষষ্ঠ শতক থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। Yadav-এর পর *Indian Historical Review*-তে Indian Feudalism-বিষয়ক R. S. Sharma ও তার সমর্থকদের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু এদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে B. D. Chattapadhyay তার *'Trade and Urban Centres in Early Medieval North India'* (Indian Historical Review pp-203-9) প্রকাশ করেন এবং ভারতে সামন্ততন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও নগরের অবক্ষয়ের যুক্তিকে খণ্ডন করেন।

1979 ও 1980 সাল ভারতীয় সামন্ততন্ত্র চর্চার উল্লেখযোগ্য সময়। ওই বছরগুলিতে Indian History Congress অধিবেশনে D. N. Jha (*Early Indian Feudalism : A Historiographical Critique,* 1979), Harbans Mukhia (Was there Feudalism in Indian History, 1979) এবং B.N.S. Yadav (*The Problem of the Emergence of Feudal Relations in Early India,* 1980) ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য মতামত জ্ঞাপন করেন। Harbans Mukhia Jha ও Yadav-এর বক্তব্য সমর্থন না-করে বলেন যে, ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আজ্ঞাধীন কৃষিশ্রমিক ছিল, ভারতের ক্ষেত্রে তা ছিল না। কেননা ভারতের উর্বর ভূমি কৃষকদের স্বনির্ভর করে রাখত।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র-বিষয়ক গবেষণা দেশীয় বাতাবরণের বাইরে 1985 খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার সুযোগ পায় যখন Journal of Peasant Society বিশেষ সংখ্যা *Feudalism and Non-Eurpean societes* প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি D. N. Jha সম্পাদিত *Feudal social Formation in Early India* (1987) প্রকাশিত হয়। তবে এইজাতীয় আর-একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা ছিল V. K. Thakur-এর Historiography of Indian Feudalism (1989)। *Indian Feudalism* তথা ভারতীয় প্রাক্ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রবিষয়ে আর-একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা হল Hermann kulkue-এর *The State in India 1000-1700.*

আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রকে যারা সামন্ততন্ত্রের আমলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তাদের মূল দুর্বলতা হল যে, উপযুক্ত তথ্যের অভাব এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সর্বভারতীয় ভাবা এবং কয়েক শতাব্দীর সময় ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করা। অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রের বিরোধী ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র সামন্তন্ত্রের অস্তিত্বে যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন, রাষ্ট্র বিষয়ে নতুন কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো দেননি।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ছাড়া আদি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র-বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক অবদান হল কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাষ্ট্র (Segmentary state)-এর ধারণা। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মতো Segmentary State-এর ধারণাটিও 1956 খ্রিস্টাব্দে প্রথম অত্মপ্রকাশ করে যখন A. W. Southall-এর আফ্রিকায় প্রেক্ষিতে *Alur society : A Study in Processes and Types of Domination* (Cambridge, 1956) প্রকাশিত হয়। তবে 1971 খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতের ইতিহাসে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু রাজপুত রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে R. G. Fox-এর *Kin, Clan, Raja and Rule* (Barkley, 1971) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত বিভাজিত রাজ্যের ধারণা ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। তাছাড়া B. Subbarao-এর The Personality of India (1956) এবং Burton stein-এর *Integration of the Agrarian System of South India* ও অন্যান্য রচনা এবং Y. Subbarayalu-র *Political Geography of the Chola Country* (1973) Segmentary state-এর ধারণাটিকে আরও মজবুত করে। তবে এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল Stein-এর *Peasant State and Society in Medeival South India* (1977)।

Burton Stein-এর মতে, পল্লব, চোল ও পরবর্তীকালের বিজয়নগর সাম্রাজ্য এর রাষ্ট্রব্যবস্থা তিনটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল (zone)-এ বিভাজিত ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্রীয় (Central), মধ্যবর্তী (Intermeidiate) এবং প্রত্যন্ত (Peripheral) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি অঞ্চল (Micro-Peasant region) যেখানে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রায় ছিলই না বলা চলে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে রাজা ও তার সহযোগী গোষ্ঠী মধ্যবর্তী অঞ্চলকে নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। রাজার ক্ষমতাই ছিল সার্বভৌম। মধ্যবর্তী অঞ্চল কেন্দ্রীয় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রাখত।

Burton Stein ও তার সমর্থকদের এই ধারণা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ বিনাবিচারে মেনে নেননি। R. S. Sharma এই ধারণার গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিরোধীরা আরও মনে করেন যে, আফ্রিকীয় সমাজ-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে Stein-এর জবাব হল ইউরোপীয় সমাজ-রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে ভারতে কষ্টকল্পিতভাবে প্রয়োগে কোনো দোষ না-থাকলে আফ্রিকার সমাজ-রাষ্ট্রের মডেল ভারতের সমাজ-রাষ্ট্রে পরীক্ষাতে কোনো দোষ থাকার কথা নয়। যুক্তি ও প্রতিযুক্তির ধাক্কায় দক্ষিণ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল স্বরূপকে চাপা না দিয়েও এক কথায় বলা যায় যে, সময় ও অঞ্চলভেদে

রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন কখনও কেন্দ্রীভূত আবার কখনও কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত কিন্তু বিভাজিত।

৪.২. ❏ আদি মধ্যযুগীয় সমাজ

আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি ছিল দুটি—উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রথাগত জাতি ব্যবস্থা (Caste system)। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতা সমাজব্যবস্থাতেও পরিবর্তন সূচিত করেছিল। ফলে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী (Class) ও জাতি (Caste)-র অবস্থানগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

যথেচ্ছ সংখ্যায় ভূমিদান ও ব্যাবসাবাণিজ্য, নগর, শিল্প এবং মুদ্রাব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে রাষ্ট্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। ফলে বণিক ও কারিগর শ্রেণির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। এমনকি তাদের মুক্ত চলাচলও স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ দানপ্রাপ্ত এলাকায় দানগ্রহীতা *ধনজনসহিত* বা *প্রতিবাসী* জনসমেত অধিকার পেতেন। পাশাপাশি কৃষকগণও বহির্গমনের সুযোগ পেতেন না। তবে ভূ মিদানের ফলে নতুন নতুন অঞ্চলে কৃষির বিকাশ ঘটে এবং সেখানে কৃষক ও কারিগরদের বসতিও স্থাপিত হয়।

ভূমিদানের আর-একটি পরিণতি ছিল সামন্ত শ্রেণির বিকাশ। এরাই ছিলেন শাসকশ্রেণির প্রধান স্তম্ভ। সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপাদানগুলিতে সামন্তপ্রভুদের পদ ও সামাজিক মর্যাদার একটা আভাস পাওয়া যায়। মহামণ্ডলেশ্বর, মাণ্ডলিক, মহাসামন্ত, সামন্ত, লঘুসামন্ত, কউত, বণিক, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধি থেকে তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। পাশাপাশি বণিক ও কারিগর গণও তাদের মর্যাদার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের উপাধি গ্রহণ করতেন। হিসাবরক্ষক বা ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহকগণ (যারা মূলত কায়স্থ জাতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন) বিভিন্ন ধরনের উপাধি গ্রহণ করতেন, যেমন—করণ, করণিক, পুস্তপাল, চিত্রগুপ্ত, লেখক, দিবর ইত্যাদি। শিক্ষিত শ্রেণি হিসাবে কায়স্থদের উত্থান ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদায় আঘাত করেছিল। কায়স্থগণ আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষক ছাড়াও চান্দেল্য ও কলচুরীদের দরবারে মন্ত্রী হিসাবেও আসীন ছিলেন।

তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, মূল উৎপাদক (কৃষক) ও উৎপাদনের উপায়- সমূহের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বেড়ে যায়। পুরোহিত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নিষ্কর ভূমিপ্রদানের ফলে তাদের হাতে চলে যায় উৎপাদনের উপায়সমূহ। অন্যদিকে প্রকৃত উৎপাদকদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। বেগার, (Rudimai, Vishthi) শ্রমদানে বাধ্যবাধকতা কৃষকদেরকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিলে। ফলে সামান্য ঘটনাতেই কৃষকবিদ্রোহ ঘটত। তকে কৃষকশ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি গ্রামপ্রধান শ্রেণির বিকাশ ঘটে এই সময়। উত্তর ভারতের গ্রামগুলিতে এদের বলা হত মহত্তর। গ্রামের চাষযোগ্য জমির একটা বড়ো অংশও

গ্রামের শাসনব্যবস্থা এদের নিয়ন্ত্রণে থাকত। ৯২০ খ্রিস্টাব্দে রচিত হরিষেণাচার্য্যের *বৃহৎকথা কোষে* মহত্তরদের সামাজিক প্রতিপত্তির একটা স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতে এই গ্রামপ্রধানদের বলা হত *পট্টকিলাস*। আর দক্ষিণ ভারতে এদের সমগোত্রীয় ছিল *গাবুন্দাগণ*।

সামাজিক শ্রেণির কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার চিরাচরিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জাতিব্যবস্থারও কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এই সময়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি মূল জাতির মধ্যে উপজাতি (Sub-caste) ও মিশ্র জাতি (Mixed caste)-র সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

গুপ্তযুগ থেকেই ব্রাহ্মণরা বহুবিধ পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়। পেশার সঙ্গেই তাদের পরিচিতি নির্ভর করত। তাই পুরোহিতের কাজ ছাড়াও অন্যান্য পেশা গ্রহণ করার ফলে এই সময়ে ব্রাহ্মণদের শাখা-প্রশাখার সংখ্যা বেড়ে যায়। বাংলায় এই সময় মোট ৫৬টি ব্রাহ্মণ উপজাতি (Sub-caste)-এর অস্তিত্ব ছিল।

ক্ষত্রিয়দের উপজাতি বা শাখাজাতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়। তার প্রধান কারণ ছিল অক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা রাজ্য বা সাম্রাজ্য গঠন। অক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা সৃষ্ট রাজার শাসনকে বৈধ করে তোলার জন্য ব্রাহ্মণগণ তাদের ব্যবস্থাপত্র ও বংশাবলি রচনার মধ্য দিয়ে 'ক্ষত্রিয়' বলে প্রচার করতেন। এই বংশাবলিগুলিতে এই অ-ক্ষত্রিয় শাসকদের আদি পুরুষকে হিন্দুদের কোনো দেবতা বা কোনো ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের সঙ্গে যুক্ত করা হত। বিনিময়ে ব্রাহ্মণরা শাসকের কাজ জমিসহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার পেতেন। মধ্য-এশিয়া থেকে আগত হূণ বা গুর্জরগণ এইভাবেই ক্ষত্রিয় হিসাবে সামাজিক পরিচিতি লাভ করে। একই কথা বলা যায় কামরূপে বর্মন, ম্লেচ্ছ ও পাল বংশ এবং ওড়িশার শাসকদের ক্ষেত্রেও। পশ্চিম ভারতের সোলাকি, পরমার, চাহমান, তোমার, গাহরবাল ইত্যাদি ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টিও এই পদ্ধতির দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতে জাতি-সংস্কৃতির (caste-culture) প্রবেশ করার ফলে শাসক কূল 'ক্ষত্রিয়োজনোচিত' উপাধি গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন।

জাতি-কাঠামোতে নবসংযুক্ত মিশ্রজাতি হিসাবে এই সময়ে কায়স্থরা উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করে। তবে বণিক শ্রেণির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাওয়ায় বৈশ্য জাতির সামাজিক অবস্থান অধোগামি হয়। কিন্তু গুপ্ত-পরবর্তী যুগে শূদ্ররা আর নিজেদের দাসসুলভ কৃষিশ্রমিক বা কারিগরের কাজে সীমাবদ্ধ রাখেননি। হিউয়েন সাঙ (সপ্তম শতক) তাঁর বিবরণে শূদ্রদের স্বাধীন কৃষক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সমসাময়িক স্মৃতিকারগণ শূদ্রদের অন্নদাতা (অন্যাদা), গৃহস্থ ও কুটুম্বিন (আত্মীয়/বন্ধু) হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। শূদ্রদের মধ্যে আবার এই সামাজিক বিভাজন ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে রচিত *বৃহৎধর্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ শূদ্রদের বা মিশ্র জাতিকে সৎ ও অসৎ বা উত্তম, মধ্যম ও অধম সংকর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সংকর বা মিশ্র জাতির উৎপত্তি ও তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে এই দুটি পুরাণ সমসাময়িক কালের প্রধান উৎস ছিল।

সৎ শূদ্র বা উত্তম এবং মধ্যম সংকর জাতির সামাজিক অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ হলেও অসৎশূদ্র বা অধম সংকর জাতির সামাজিক মর্যাদা ছিল অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্যদের সমতুল। অন্ত্যজ জাতির সংখ্যাও আদি মধ্যযুগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। অন্ত্যজ, ব্যাধ, বরাত, ভিল, চণ্ডাল,

চর্মকার, দাস, রজক, ডোম, হাড়ি, বাগদি, সুরী প্রভৃতি জাতি অস্পৃশ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন স্মৃতি বা পুরাণ- গুলিতে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তরভারতীয় সভ্যতার জাতি সংস্কৃতি দক্ষিণভারতেও বিস্তারলাভ করেছিল। এর ফলশ্রুতিতে জাতিব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতের সমাজ বিশ্লেষণের সূচকে পরিণত হয়। এখানকার জাতিকাঠামো ছিল একটু আলাদা। ব্রাহ্মণ, বেল্লাল (অব্রাহ্মণ ভূস্বামী), বলনগাই (স্থায়ী কৃষক), ইরনগাই (বণিক, কারিগর ও ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায়), পল্লার ও পারাইয়ার (অন্ত্যজ/দাসসুলভ শ্রমিক) এবং আদিমাই (দাস ?)-দের নিয়ে গঠিত ছিল এখানকার সমাজ-কাঠামো। এখনকার ব্রাহ্মণগণ পুরোহিত-এর কাজ ছাড়াও প্রভূত পরিমাণ জমির নিয়ন্ত্রক ছিলেন। বেল্লালগণও ছিলেন ভূমির নিয়ন্ত্রক। ব্রাহ্মণ ও বেল্লালদের জমির কৃষিশ্রমিকদের (পল্লার, পারাইয়ার) অবস্থান উত্তর ভারতীয় অন্ত্যজদের সমতুল ছিল। তা ছাড়া আদিমাইদের অস্পৃশ্য ও দাস বর্ণনা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিকদের মধ্যে।

৪.৩. ❑ দিল্লি-সুলতানি ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ

প্রথমদিকে দিল্লি-সুলতানি ছিল গজনির সুলতান সিহাবুদ্দিনের সাম্রাজ্যের বর্ধিত অংশ। কিন্তু ১২১০ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিস (১২১০-৩৬) দিল্লি-সুলতানিকে স্বাধীন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অসামান্য কূটনৈতিক চালের দ্বারা তিনি মোঙ্গল আক্রমণ থেকে সুলতানিকে রক্ষা করেন (১২২১)। তাছাড়া সিন্ধু থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সুরক্ষার ব্যাপারে সদাজাগ্রত ছিলেন তিনি। তার ব্যক্তিগত দাস বাহিনী (Mulk-i-Shamshi)-র সাহায্যে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতেন। মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্থানের অভিজাতদের ঠাঁই দিয়েছিলেন তার দরবারে। সুলতানির অধিকাংশ অঞ্চল তিনি 'ইক্তা' হিসাবে মুক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তারা ভূমি ও উপঢৌকন সংগ্রহ করে সেনাবাহিনী ও ইক্তার শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত এবং উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব (ফাজাইল) সুলতানের দরবার পাঠাত। দিল্লিও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল সুলতানের নিজের অধীনে (খালিসত)। ইলতুৎ নিজস্ব সেনাবাহিনী (hashm-i-qalb) রক্ষা করতেন ভূমিভোগের অধিকারদানের মাধ্যমে।

ইলতুৎমিসের আমলে দিল্লি ভারতের অন্যতম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিভাসী, বণিক, কারিগর ও অর্থের সমাগম ঘটে দিল্লিতে। যারা দিল্লির অর্থ সামাজিক বিবর্তনে সহায়তা করে। ইলতুৎমিস সোনা, রূপা ও তামার প্রামাণ্য মুদ্রা প্রচলন করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রাধান্য ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেন।

১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর ত্রিশ বছরে বেশ কয়েকজন সুলতান দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজিয়া (১২৩৬-৪০) ও নাসিরুদ্দিন (১২৪৬-৬৬)। এই সময়ে অভিজাতদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মুক্তিদের উচ্চাকাঙ্খা সুলতানির ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল, কিন্তু সুলতান বলবন (১২৬৬-৮৭) সুলতানিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর

স্থাপন করেন। সুলতান বলবন নিজেকে উচ্চবংশ জাত আখ্যা দিয়ে সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তার মতে, সুলতান হচ্ছেন আল্লাহর প্রতিনিধি। বলবন তার ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য নিজ জাতিভক্তদের বেশি করে ঠাঁই দেন তার দরবারে। তবে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সম্ভাবনা ও মোঙ্গল আক্রমণের ভয় থাকার জন্য তিনি নতুন কোনো অঞ্চল দখল করেননি। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে দিল্লি-সুলতানির সামাজিক কাঠামোর নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের বিভিন্ন শহর (লাহোর, মুলতান, উচ, ভাক্কর, সেওয়ান)-এর শিক্ষিত মুসলমানগণ দিল্লি-সুলতানিতে ঠাঁই পান। তা ছাড়া গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন শহরে বিশেষ করে বাদায়ুন, কারা, অযোধ্যা ও লক্ষ্মনাবতীতে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়তে থাকে মূলত সামরিক ব্যক্তিবর্গ হিসাবে। হিন্দুদের মধ্যে রনক (যোদ্ধা) ও রাউত (রাজপুত ঘোড়সয়ার)-গণ সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করে নানাবিধ সুবিধা ভোগ করতেন।

সামরিক ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আর-একটি শ্রেণির বিকাশ ঘটে এই সময়। তারা মূলত ছিলেন হিন্দুবণিক ও শেট। সুলতানি বণিকগণ বলবনের আমলে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেন। এরা মুক্তিদের আগাম ঋণ (Advance/Loan) দিতেন এবং বিনিময়ে উচ্চহারে সুদ আদায় করতেন।

বলবনের মৃত্যুর পর সুলতানিতে নানাবিধ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয় যার পরিণতি হিসাবে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে খলজি মালিকদের উত্থান ঘটে। খলজিরা অপেক্ষাকৃত নীচু বংশজাত হলেও দিল্লি-সুলতানির সীমানাবিস্তারে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জালাউদ্দিন খলজি (১২৯০-৯৬), আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬) এবং পরবর্তী শাসকবংশের মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-৫১) দিল্লি-সুলতানির সীমাকে দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত করেন। সীমানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি সুলতানিতে সুলতানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে অতিরিক্ত কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। আলাউদ্দিন খলজি উৎপাদিত শস্যের অর্ধাংশ রাজস্ব নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি স্থানীয় প্রশাসক, *চৌধুরী*, গ্রামপ্রধান ও খুত (*রণক* ও *রাউতদের* উত্তরাধিকার)-দের বিশেষ অধিকার খর্ব করেন। আলাউদ্দিনের এই ব্যবস্থা ও বাজার দরনীতি (Market control) পুরোনো অভিজাতদের পক্ষে ক্ষতিকারক হলেও শাসনশ্রেণি এর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক মুক্তিদের ক্ষমতাও খর্ব করে দিয়ে ইক্তাগুলিতে সুলতানি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেন। তাছাড়া *শারিয়াতি* আইনের পরিবর্তে সুলতানি আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সরকারি উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগের প্রথাও চালু হয়। ফলে উলেমা বা প্রথাগত শারিয়ত ব্যাখ্যাকারী ও সুবিধাভোগী মুসলমান শ্রেণির স্বার্থ বিনষ্ট হয়।

শাসনতান্ত্রিক নীতি পরিবর্তনের ফলস্বরূপ অভিজাত শ্রেণির গঠনগত পরিবর্তন ঘটে। বরণী লিখেছেন যে, মদ প্রস্তুতকারক (শুঁড়ি) থেকে শুরু করে নাপিত, পাঁচক, মালি, তাঁতি, চাষি এবং বাজারী (Market men low born)-গণ অভিজাত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের সেনাবাহিনীতে স্থান দেওয়ায় সেনাবিভাগে তুর্কি অভিজাতদের একাধিপত্য বিনষ্ট হয়।

সুলতানি আমলে বণিক শ্রেণি ও নগরের বিকাশ উল্লেখযোগ্য বিষয়। বণিক ও শাহ্‌দের সম্পত্তিতে আলাউদ্দিন খলজিও হাত দেননি। শরফ (Monenylnder), সুলতানি বণিক মুসলিম বেহড় বণিকদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগরের অন্যান্য সামাজিক শ্রেণি বিশেষ করে কেরানী

দোকানদার, কারিগর প্রভৃতিদেরও উন্নতি ঘটেছিল। এ ছাড়া শহরে গৃহভৃত্য (Domestic labour), দাস (Slave) ও ভিক্ষুকদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল। নগরে কৃষি উদ্‌বৃত্তের (Agricultural surplus) কেন্দ্রীকরণের ফলে নগরের সমৃদ্ধি ঘটে ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু নগরগুলি ছিল সামাজিক অসমতার চূড়ান্ত উদাহরণ।

পাশাপাশি কৃষক শ্রেণির অবস্থাও সুলতানি আমলে মোটেও ভালো ছিল না। মুক্তিদের বা সুলতানের চাহিদা মেটানোর পর কৃষকদের হাতে যা থাকত তা দিয়ে কৃষকদের বেঁচে থাকার মতো অবস্থা থাকলেও উন্নতির পথ স্তব্ধ ছিল। আলাউদ্দিন খলজি ও মহম্মদ-বিন-তুঘলক কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা বাড়িয়ে তাদের অবস্থা করুণ করে তুলেছিলেন। সুলতানদের দেওয়া কৃষিঋণ তাদের খুব একটা কাজে লাগত না। এই বিষয়ে তথ্য ও যুক্তিনির্ভর আরও গবেষণার প্রয়োজন।

৪.৪. ❑ গ্রন্থপঞ্জি

১. Hermann Kulke (ed) : The States in India 1000-1700 (New Delhi, 1995).
২. J. S. Grewal (ed) : State and Society in Medieval India (New Delhi, 2005).
৩. Burton Stein : Peasant State and Society in Medieval South India (OUP, 1980).
৪. D. D. Kosambi : In Introduction to the study of Indian History, (Bombay, 1956).
৫. R.S. Sharma : Indian Feudalism (Calcutta, 1965).
৬. D. N. Jha (ed) : Feudal order (New Delhi, 2000).
৭. V. K. Thakur : Historiography of Indian Feudalism (New Delhi, 1989).
৮. A. S. Allekar : The Rastrakutas and their Times (Poone, 1934).
৯. R. K. Mookherjee : Local Government in Anceint India (Delhi, 1958).
১০. I. H. Quereshi : The Administration of Sultanate of (Delhi/Lahore, 1942).
১১. B. N. S. Yadav : Society and Culture in India during the 12th century, (Allahabad, 1973).
১২. R. K. Barman : From Tribalism to State (Delhi, 2007).

৪.৫. ❑ অনুশীলনী

১. ভারতীয় সামন্ততন্ত্র কী?
২. Segmentary State বা বিভাজিত রাষ্ট্র কি?
৩. আদি ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের গঠন ব্যাখ্যা করুন।
৪. সুলতানি রাষ্ট্র ও সমাজ বিবর্তনের ধারা আলোচনা করুন।

সপ্তম (খ) পত্র

পর্যায়—২

একক ১ ❑ আঞ্চলিক রাজ্যের সূত্রপাত

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ গুপ্তোত্তর যুগ—রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১.২ গৌড় ঃ শশাঙ্কের রাজত্বকাল

১.৩ হর্ষবর্ধন ঃ থানেশ্বর রাজ্য

১.৪ বাংলার পালবংশ

১.৫ বাংলার সেনবংশ

১.৬ হর্ষবর্ধনের পরবর্তী অন্যান্য রাজ্যসমূহ

১.৭ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ

১.৮ দক্ষিণ ভারত

১.৯ কথান্ত

১.১০ অনুশীলনী

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসকে সার্বভৌম গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন এবং হর্ষবর্ধনের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী সময়কাল এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই কালসীমা কেন্দ্রীয়করণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের চিরন্তন টানাপোড়েনের চমকপ্রদ একটি অধ্যায় সূচিত করে। গুপ্ত রাজবংশের রাজত্বের অব্যবহিত পরে সমগ্র উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিহাসে ক্ষমতা বিস্তারের লড়াই অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভারতবর্ষ খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হতে শুরু

করে। এই বিভাজনে উৎপন্ন বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য আধিপত্য স্থাপনের বাসনায় পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এদের মধ্যে কোনো রাজ্যই অবশ্য স্থায়ীভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য ও রাজনৈতিক একতা কায়েম রাখতে পারে নি। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে কিন্তু এই চিত্র পরিবর্তিত হয়, যখন হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে পুষ্যভূতি বংশ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন।

১.১ গুপ্তোত্তর যুগ—রাজনৈতিক পরিস্থিতি

খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে এবং হূণ উপজাতির বারংবার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রচুর রাজ্য গুপ্ত আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই রাজ্যগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন লিপি ও সাহিত্যগত তথ্যের ভিত্তিতে যেটুকু জানা যায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বলভীর মৈত্রক বংশ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে মৈত্রক বংশীয় বলভী রাজ্য গড়ে ওঠে। এই মৈত্রকগণ গুপ্ত রাজগণের অধীনে সামন্ত শাসকরূপে রাজনীতির জগতে আত্মপ্রকাশ করেন।

সৌরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম রাজত্ব স্থাপন করেন প্রধান সেনাপতি ভতর্ক। বলভী তার রাজধানী ছিল। এই মৈত্রক বংশের তৃতীয় পুরুষ দ্রোণসিংহ সর্বপ্রথম 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেন, যা স্বাধীনতার পরিচায়ক। দ্রোণসিংহের রাজত্বকালে বলভীরাজ্য দ্রুতগতিতে সবদিকে তার রাজ্যসীমা বিস্তার করতে থাকে। দ্রোণসিংহের পরবর্তী দুইজন মৈত্রকরাজ সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সেই বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন প্রথম শিলাদিত্য। এই রাজার অধীনে বলভীরাজ্য পশ্চিম ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। অবশ্য এই রাজ্যের আয়তন বা সীমা সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে সমগ্র সৌরাষ্ট্র অঞ্চল এবং মালবের একাংশ বলভী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। একজন আদর্শ রাজা এবং বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রথম শিলাদিত্য হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছেন। মৈত্রকরাজ্যের রাজধানী বলভী সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার একটি পীঠস্থানরূপে অভিহিত হত, শুধু তাই নয়,

একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও বলভীর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। প্রথম শিলাদিত্যের পর মৈত্রক-সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় ধ্রুবসেন। হর্ষবর্ধন তাঁকে আক্রমণ করেন এবং তিনি পরাজিত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য দ্বিতীয় ধ্রুবসেন হর্ষবর্ধনের কন্যাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় ধ্রুব সেনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন চতুর্থ ধরাসেন, ইনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি অর্জন করেন। মৈত্রকদের রাজবংশের শেষ শাসক, যতদূর জানা যায়, ছিলেন সপ্তম শিলাদিত্য। জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বলভী রাজ্যে সৌরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত বন্দর ভৃগুকচ্ছ বা ভরুচ (বর্তমান ব্রোচ) পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডঃ আল্‌টেকরের মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বলভী একটি অংশবিশেষ ছিল। মৈত্রক রাজগণ শৈব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বলভীর সুপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের বিদ্যোৎসাহী জনগণ জ্ঞান অন্বেষণে যেত। এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের অনুশীলন হত বলে জানা যায়।

হূণ অভিযান ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে হূণ আক্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মৌর্য রাজত্বের শেষভাগে বাহ্লীক যবন, শক এবং কুষাণ আগ্রাসনের মুহুর্মুহু আঘাতে ভারতের মাটী যেমন কম্পিত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনই সার্বভৌম গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলিতে বর্বর হূণ জাতির বারংবার আক্রমণ গুপ্ত রাজত্বের ভিত্তিমূলকে শিথিল করে দেয়।

হূণ জাতির আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়, সম্ভবতঃ চিনের সীমান্ত অঞ্চলে। এদের দুর্দমনীয় ঔধত্য এবং বর্বরোচিত কার্যকলাপ ও নিষ্ঠুরতা ভারতের ইতিহাসে গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলহনের রাজতরঙ্গিনী, বাণের হর্ষচরিত, এরান লিপি বর্ণিত তথ্যসমূহে হূণদের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।

প্রথম কুমারগুপ্ত বা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণগণ ভারতের প্রবেশদ্বারে প্রথম আঘাত হানে। হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে রক্তপিপাসু হূণজাতি ভারতবর্ষে আসে, এই আক্রমণ কোন্ হূণ নেতার পরিচালনায় হয়েছিল তা জানা যায় না। গুপ্ত বংশের অন্যতম মহান রাজা স্কন্দগুপ্তের অমিত বিক্রমে এই আক্রমণ প্রতিহত হয়। ভিতরি স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় স্কন্দগুপ্ত দৃঢ় হাতে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয়ী হন। ড. কে. এম. পানিক্কর স্কন্দগুপ্তের হূণ প্রতিরোধকে একটি 'মহান কৃতিত্ব' বলে বর্ণনা করেছেন। এই ঐতিহাসিকের মতে, স্কন্দগুপ্ত হূণদের আক্রমণকে প্রতিহত করে ভারতীয় সভ্যতাকে সুরক্ষিত করেছিলেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার স্কন্দগুপ্তকে 'ভারতের রক্ষাকর্তা' বলে বর্ণনা করেছেন। হূণরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিরোধের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি ; ভারতবর্ষ ত্যাগ করে আফগানিস্তান এবং পারস্য দেশে পলায়ন ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল

না। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের প্রচেষ্টায় হূণগণ সাময়িক ভাবে পরাস্ত হলেও হূণ সেনাপতি তোরমানের নেতৃত্বে উপর্যুপরি এদের আক্রমণ সংঘটিত হতে থাকে। হূণরা গন্ধার ও কাশ্মীর অধিকার করে পথের সব কিছু বাধাকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে, মানুষকে হত্যা করে গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। এরান লিপি থেকে জানা যায়, মালোয়ার একাংশ তোরমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। তবে তোরমান কোন সময়ে মালোয়া আক্রমণ করেন সে সম্পর্কে লিপিভিত্তিক তথ্য বিশেষ আলোকপাত করে না। তোরমানের এরান প্রস্তর লিপির বিবরণে বলা হয়েছে মালোয়ায় তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিলেন ধন্যবিষ্ণুর ভ্রাতা মাতৃবিষ্ণু। এই লিপি তোরমানের রাজত্বের প্রথম বর্ষে লিখিত। অপরপক্ষে, গুপ্তরাজ বুধগুপ্তের এরান স্তম্ভলিপি অনুসারে ৪৮৪ খৃষ্টাব্দে (গুপ্তাব্দ ১৬৫) মধ্যভারতে তাঁর শাসন সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, ৪৮৪ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী কোনো সময়ে তোরমান মালোয়া বা মধ্যভারত অধিকার করেন। ভানুগুপ্তের এরান প্রস্তরস্তম্ভ লিপিতে দেখা যায়, মালোয়ার এই গুপ্ত শাসক তাঁর সেনাপতি গোপরাজের সঙ্গে হূণদের এক যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, যে যুদ্ধে গোপরাজ নিহত হন। গোপরাজের বিধবা পত্নী সহমরণে গমন করে 'সতী' হন। এই লিপির সময়কাল ৫১০ খ্রিস্টাব্দ (গুপ্তাব্দ ১৯১)। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ তোরমান মালোয়ার অধীশ্বর হন।

তোরমানের পরবর্তী শাসক বা রাজা হলেন মিহিরকুল বা মিহিরগুল। সমসাময়িক সাহিত্যগুলি তাঁকে রক্তলিপ্সু দানব হিসাবে চিহ্নিত করেছে। মিহিরকুল গুপ্ত সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ডে হানা দেন মধ্যভারতের গণ্ডি অতিক্রম করে। হিউয়েন সাঙের বিবরণে তাঁকে বহু বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসকারী বৌদ্ধধর্মের প্রবল শত্রু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মগধের রাজা বালাদিত্য মিহিরকুলকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করেন। পরে অবশ্য মুক্তি দেন। মিহিরকুল কাশ্মীর পলায়ন করেন এবং কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন, তবে শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হয়।

মিহিরকুলকে পরাস্তকারী রাজা বালাদিত্যের সঠিক পরিচয় জানা শক্ত। কিছু ঐতিহাসিকের ধারণা, ইনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একজন শাসক ; সম্ভবতঃ পরবর্তী গুপ্তবংশজ কোনো রাজা। দেও—বার্নারক লিপিতে বর্ণিত পরবর্তী গুপ্তরাজবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত 'বালাদিত্য' নামেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এই বালাদিত্য হলেন সার্বভৌম গুপ্তরাজ বংশীয় নরসিংহগুপ্ত।

মিহিরকুল মালোয়া অঞ্চলের গুপ্ত অধীনস্থ সামন্তশাসক যশোধর্মনের কৃতিত্বে মালোয়া থেকে বহিষ্কৃত হন। যশোধর্মনের মান্দাসোর লিপিতে মিহিরকুলকে পরাজিত করার একটি বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ বিধৃত হয়েছে। তবে বালাদিত্য এবং যশোধর্মন একযোগে মিহিরকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। মান্দাসোর লিপির সময় ৫৩২ খ্রিস্টাব্দ—অনুমান করা যেতে পারে এই সময়ের আগে কখনও এই যুদ্ধ হয়েছিল। মিহিরকুল কাশ্মীর ও পাঞ্জাব অঞ্চলে আশ্রয় নেন। তাঁর রাজধানী শাকল অর্থাৎ শিয়ালকোট একটি উন্নয়নশীল নগর ছিল।

মৌখরী রাজের সঙ্গে হূণজাতির বারংবার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। কালক্রমে হূণগণ ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে দেশবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে যায়।

রাজপুতানার গুর্জরগণ ঃ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে গুর্জরগণ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁদের মূল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যোধপুরের নিকট রাজপুতানায়। বস্তুতঃ 'গুর্জররাষ্ট্র' থেকে 'গুজরাট' নামের উৎপত্তি, যা গুর্জরদের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল ছিল। তবে শুধু গুজরাট অঞ্চলই নয়, গুর্জররা পাঞ্জাবেও ছড়িয়ে পড়ে। এদের আদি উদ্ভব সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, গুর্জরজাতি অ-ভারতীয় জনগোষ্ঠী, তবে তার সপক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ নেই, যা আমাদের সংশয়াতীত ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। গুর্জররাজ্য প্রাথমিকভাবে রাজপুতানার যোধপুর অঞ্চলে হরিচন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। হরিচন্দ্রের উত্তরসূরীগণ 'প্রতিহার' নামে পরিচিত হন। হরিচন্দ্রের প্রপৌত্র নাগভট্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নৃপতিবিশেষ।

মৌখরী বংশ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সকল ক্ষমতাশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়, মৌখরীরাজ্য তাদের অন্যতম। এঁদের বংশগরিমা সুপ্রাচীন। মৌখরীগণ সনাতন একটি জাতিগোষ্ঠী থেকে আগত হলেও আদি পরিচয় কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায় না। কানিংহাম মৌখরী নামাঙ্কিত একটি সীল-গয়া (বিহার) জেলা থেকে আবিষ্কার করেন, যা থেকে ধারণা করা হয়, মৌখরীরা প্রকৃতপক্ষে অঙ্গ বা দক্ষিণ বিহার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। মৌখরী জাতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এঁদের সকল সদস্যেরই নামের শেষে 'বর্মন' শব্দটি ব্যবহৃত হত। মৌখরীদের ইতিহাস জানবার উপাদানগুলি হল—মুদ্রা ও লিপি। বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প'।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে মৌখরীরা দক্ষিণ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে পরবর্তী গুপ্তরাজদের অধীনস্থ সামন্তশাসক রূপে কাজ করত। কিন্তু এই শতকেরই মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে মৌখরী বংশীয় ঈশানবর্মন মৌখরী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি অন্ধ্র, উড়িষ্যা এবং গৌড়ে আধিপত্য বিস্তার করেন।

ঈশানবর্মন এবং পরবর্তী গুপ্তরাজশক্তির মধ্যে একাধিকবার যুদ্ধ চলে, কিন্তু ঈশানবর্মন বারবার পরাজিত হন। কিন্তু ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ঈশানবর্মন এবং তাঁর পুত্র সফলভাবে হূণ আক্রমণের মোকাবিলা করেন, হূণগণ মৌখরী রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হরাহ লিপিতে বলা হয়েছে, ঈশানবর্মন শূলিক জনগোষ্ঠীকে পরাজিত করেন। কিছু পণ্ডিত মনে করেন এরা হল 'চোলিক' বা 'চোল'। কলিঙ্গথুপরনির মতে চোলগণ 'শূলিক' বা শূল ব্যবহার করত একটি অস্ত্র হিসাবে; এইজন্য শূলিক নামে আখ্যাত হয়েছে। পরবর্তী দুই মৌখরীরাজ সর্ববর্মন এবং অবন্তীবর্মন পরবর্তী গুপ্ত রাজগণের নিকট থেকে মগধ ছিনিয়ে নেন। অনুমান করা যায়, অবন্তীবর্মনের আমলে মৌখরীগণের শক্তিবৃদ্ধি হয়, তাঁরা ঐতিহাসিক কনৌজ নগরে মৌখরী স্থানান্তরিত করেন। অবন্তীবর্মনের পর সিংহাসনে বসেন গ্রহবর্মন। তিনি থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশীয় প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই বিবাহ পুষ্যভূতি ও মৌখরী বংশের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। গ্রহবর্মন অবশ্য পরবর্তী গুপ্তরাজ দেবগুপ্তের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। দেবগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনকারী গৌড়রাজ শশাঙ্ক কনৌজ আক্রমণ করে রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই গ্রহবর্মনই ছিলেন মৌখরীদের শেষ স্বাধীন রাজা। অতঃপর হর্ষবর্ধন কনৌজ অধিকার করেন। মৌখরী বংশের অপরাপর সদস্যগণ হর্ষের অধীনস্থ সামন্তশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশ ঃ সার্বভৌম গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পরবর্তী গুপ্ত বংশের উত্থান ঘটে। এই রাজবংশের শাসকগণ তাঁদের নামের শেষে 'গুপ্ত' পদবী ব্যবহার করতেন। তবে এই রাজারা সার্বভৌম গুপ্ত বংশের উত্তরসূরী কি না সে বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এঁদের সঙ্গে গুপ্ত সম্রাটগণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে অনেক ইতিহাসকার মনে করেন সার্বভৌম গুপ্তরাজগণের অন্যতম বংশধর পুরুগুপ্ত ছিলেন পরবর্তী গুপ্তবংশের আদি পুরুষ। সার্বভৌম গুপ্ত রাজবংশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে মগধ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। পরবর্তী গুপ্তরাজগণও মূলত উক্ত অঞ্চলেরই শাসক ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁরা গুপ্ত সার্বভৌমত্বের অধীন সামন্ত শাসক ছিলেন অথবা তাঁদেরই বংশধর ছিলেন। এই পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশ সম্পর্কে যে দুটি লিপি আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশি তথ্য সরবরাহ করে তা হল অপসদ্ লিপি এবং দেও-বানারক লিপি। প্রথমোক্ত লিপিটি থেকে আমরা এগারো জন পরবর্তী গুপ্ত শাসকের নাম পাই যাঁরা সর্বসাকুল্যে দুইশত বছর রাজত্ব করেন, দ্বিতীয় লিপিটি তিনজন ঐ বংশীয় রাজার উল্লেখ করেছে। মধুবন লিপিতে দেবগুপ্ত নামে একজন শাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কৃষ্ণগুপ্ত, এরপর

গুপ্ত সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে হর্ষগুপ্ত এবং প্রথম জীবিতগুপ্ত। এই তিন পরবর্তী গুপ্ত শাসক সম্পর্কে বিশেষ তথ্য নেই। চতুর্থতম শাসক কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে এই বংশ ইতিহাসের আলোয় আসে, মৌখরীবংশ এবং আলোচ্য গুপ্ত শাসকগণ উভয়েই সার্বভৌম গুপ্ত সাম্রাজ্যের আদলে নিজেদের রাজ্য গড়ে তুলতে ব্যগ্র ছিলেন ; এই উক্ত রাজবংশদ্বয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল প্রবল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বংশানুক্রমিক ভাবে চলে এসেছিল। অপ্সদ লিপি থেকে জানা যায়, আলোচ্য বংশের চতুর্থ রাজা কুমারগুপ্তের সময় এই রাজা গুপ্ত সার্বভৌম সাম্রাজ্যকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মৌখরীরাজ ঈশানবর্মন কুমারগুপ্তের কাছে পরাজিত হন। কুমারগুপ্ত এলাহবাদ জয় করেন। দামোদরগুপ্ত নামক অপর গুপ্তরাজ পুনরায় মৌখরী শক্তিকে পরাস্ত করে মগধ তথা অগ্রবর্তী গুপ্তসাম্রাজ্যের পূর্ব দিক এবং মালোয়া অধিকার করেন। কিছু পন্ডিত বলেছেন, সর্ববর্মন মৌখরী দামোদরগুপ্তকে হত্যা করেন। দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত পূর্বে সুদূর ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি কামরূপের রাজাকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ তাঁর রাজ্য পূর্বে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে মালোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মহাসেনগুপ্তের অধীনে পরবর্তী গুপ্ত রাজ্য বাংলাদেশে কীর্তিবর্মন চালুক্যের আক্রমণে এবং বিহার ও উত্তরপ্রদেশে তিব্বতী অভিযানে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশ যখন বৈদেশিক আক্রমণে জর্জরিত ঠিক তখনই মালোয়াও তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মৈত্রকগণ পশ্চিম মালোয়া দখল করে এবং কলচুরীগণ উজ্জয়িনী নগরসহ ঐ প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

মহাসেনগুপ্ত মালোয়া (পশ্চিম-ভারত) হারিয়ে কেবলমাত্র পূর্বদিকস্থ মগধ ও গৌড়ে প্রাধান্য বজায় রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক পরবর্তী গুপ্তরাজবংশের এই শেষ আশ্রয়টুকুও করায়ত্ত হয়। বাণভট্টের হর্ষচরিত থেকে জানা যায়, মহাসেনগুপ্তের দুই পুত্র পৈতৃক রাজ্য হারিয়ে থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকরবর্ধনের দরবারে আশ্রয় নেন। মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত সম্ভবতঃ প্রভাকরের পুত্র হর্ষবর্ধনের সাহায্যে মগধের পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ড. রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন মাধবগুপ্ত হর্ষের অধীনস্থ করদ রাজা ছিলেন না, তাঁর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে এবং তিনি স্বাধীন ছিলেন। মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেনের সম্পর্কে দেও-বার্নারক লিপি বিশেষ আলোকপাত করে। ড. বসাকের মতে, মহাসেনগুপ্তের ভগ্নী ছিলেন প্রভাকর বর্মনের মাতা। আদিত্যসেনগুপ্ত 'পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন, রাজত্ব করেন ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে। মগধ ছাড়াও অঙ্গ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। আদিত্যসেনের উত্তরসূরীরা হলেন দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত এবং জীবিতগুপ্ত। চালুক্য

লিপিতে এঁদের একজনকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' বলা হয়েছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের রাজগণ পরবর্তী গুপ্ত রাজ্য ধ্বংস করেন।

পরবর্তী গুপ্তবংশের অন্যতম শাখার সদস্য দেবগুপ্ত মালোয়া অধিকার করে সেখানকার রাজা হন। তাঁর সঙ্গে থানেশ্বর রাজ্যের শত্রুতা ছিল। এর ফলস্বরূপ মহাসেনগুপ্তের পুত্রগণ থানেশ্বর দরবারের প্রীতিভাজন হন। দেবগুপ্ত অত্যন্ত কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। মহাসেনগুপ্ত ছিলেন শশাঙ্কের সুবিদিত শত্রু। শশাঙ্কের সঙ্গে দেবগুপ্তের এই মৈত্রী স্থাপন, প্রভাকরবর্মনের মৃত্যুর পরবর্তী যুগে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

বঙ্গ-সমতটের স্বাধীন রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দুটি স্বাধীন রাজ্য প্রাচীন বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে—প্রথমটি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠশতকের প্রথমভাগে বাংলার দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত ভূভাগের কিয়দংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যটির শাসক হিসাবে তিনজন রাজার নাম জানা যায়—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব।

অনুমান করা হয় বাংলার শাসক হিসাবে গোপচন্দ্রের অভিষেক হয় বৈণ্যগুপ্তের শাসনকাল শেষ হবার পর। গোপচন্দ্র প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন বলে জানা যায়, তাঁর ফরিদপুর তাম্রফলক লিপিটি অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ। গোপচন্দ্র ছিলেন পরবর্তী গুপ্ত শাসক প্রথম জীবিতগুপ্তের সমসাময়িক। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, গোপচন্দ্র ৫২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল স্থায়ী হয়। Hoernle-র মতে, গোপচন্দ্র হলেন নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের পৌত্র এবং ভিতরি সীলে উল্লিখিত শেষ গুপ্তরাজ তৃতীয় কুমারগুপ্তের পুত্র। কিন্তু এই মতবাদের সপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

জয়রামপুর (রাজ্যাঙ্ক-১), মল্লসারুল (রাজ্যাঙ্ক-৩) এবং ফরিদপুর (রাজ্যাঙ্ক ১৮ বা ১৯) তাম্রফলকে উল্লিখিত গোপচন্দ্রকে রাজা গোপ বলে মনে করা হয়, যাঁর উল্লেখ পূর্বপ্রান্তের একজন রাজা হিসেবে 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে' পাওয়া যায়।

যাইহোক, জয়রামপুর তাম্রফলকে দণ্ডভুক্তির একটি ভূখণ্ড দানের উল্লেখ রয়েছে। দণ্ডভুক্তি নামক অঞ্চলটি উড়িষ্যা ও প্রাচীন বাংলার মধ্যবর্তী একটি আর্দ্র স্থলভূমি যা বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত ছিল। খুব সম্ভবতঃ গোপচন্দ্রের আদি রাজ্যের অংশ বিশেষ

ছিল উক্ত দণ্ডভুক্তি অঞ্চল। মল্লসারুল (বর্ধমান জেলার গলসীর সন্নিহিত) লিপির প্রাপ্তিস্থান থেকে ধরা যায়, গোপচন্দ্রের আধিপত্য রাঢ় অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল। অষ্টাদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ফরিদপুর লিপি থেকে প্রমাণিত হয় রাজত্বের শেষ দিকে গোপচন্দ্র বঙ্গ অঞ্চলেও প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, রাজা গোপচন্দ্র প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং দুই দশক ধরে রাজত্ব করেন। রাঢ় অঞ্চল থেকে রাজত্ব শুরু করে বঙ্গ-সমতট অঞ্চল পর্যন্ত একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সমগ্র কৃতিত্বের অধিকারী গোপচন্দ্র ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

ধর্মাদিত্য ঃ গোপচন্দ্রের পরবর্তী শাসক ধর্মাদিত্য ৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ফরিদপুর লিপিতে 'মহারাজাধিরাজ' ও সেই সঙ্গে 'অপ্রতিহত'— এই উপকথাটিও তাঁর নামের অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর তারিখ সম্বলিত লিপিসমূহ বরাকমণ্ডলে ধর্মাদিত্যের আধিপত্যের সাক্ষ্য বহন করে, পক্ষান্তরে তারিখহীন ফরিদপুর লিপি থেকে বোঝা যায় নব্যাবকাশিকা তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, নব্যাবকাশিকা হল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশীয়া-নি অঞ্চল এবং বরাকমণ্ডল ফরিদপুরেরই গোয়ালন্দ এবং গোপালগঞ্জ মহকুমার একাংশে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। নলিনীকান্ত ভট্টশালী অবশ্য ঢাকা জেলার সভর নামক অঞ্চলকে প্রাচীন নব্যাবকাশিকা বলে ধারণা করেন, তবে এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। যাইহোক, এটুকু অনুমান করা যায় পূর্বসুরী গোপচন্দ্রের রাজ্যসীমার তুলনায় ধর্মাদিত্যের রাজ্য অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। একমাত্র তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ফরিদপুর লিপিটি ছাড়া ধর্মাদিত্যের অন্য কোনো লিপি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সম্ভবতঃ তাঁর রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী ছিল। অনুমান করা হয় ৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ এই দশ বছরকাল আন্দাজ তিনি রাজত্ব করেন। ৬১১ খ্রিস্টাব্দের হরাহ লিপিতে বলা হয়েছে মৌখরীরাজ ঈশানবর্মন গৌড়দের পরাজিত করলে তারা সমুদ্রতীরে আশ্রয় নেয় (গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান)। ঈশানবর্মনের সমসাময়িক রাজা হিসাবে সম্ভবতঃ ধর্মাদিত্যই তখন ছিলেন তাঁর গৌড় প্রতিপক্ষ।

সমাচারদেব ঃ ধর্মাদিত্যের উত্তরসূরী সমাচারদেবের প্রথম লিপিটি তাঁর রাজত্বের সপ্তমবর্ষে উৎকীর্ণ কুরপাল তাম্রফলক, যা প্রকাশিত হয় নি। চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ঘুগরাহাটি তাম্রফলকটি সমাচারদেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে। কোটালিপাড়ার অন্তর্গত ঘুগরাহাটি গ্রামে প্রাপ্ত এই লিপিতে সমাচারদেবকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে এবং 'পৃথিব্যাম্ অপ্রতিরথ' আখ্যাটি উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর শাসিত প্রশাসনিক বিভাগটি নব্যাবকাশিকা বরাকমণ্ডল।

সমাচারদেবের রাজত্বকালে নব্যাবকাশিকার প্রশাসক ছিলেন জীবদত্ত, মহারাজ স্থানুদত্ত সমাচারদেবের অধীনে ঐ অঞ্চলেরই রাজপ্রতিনিধি হিসাবে শাসনভার পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। সম্ভবতঃ স্থানুদত্তের পর জীরদত্ত উত্তরাধিকার সূত্রে নব্যাবকাশিকার প্রশাসক হন।

শুধুমাত্র লিপিগত প্রমাণ সাপেক্ষে নয়, আবিষ্কৃত মুদ্রা এবং সীলগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকেও সমাচারদেবের রাজ্যবিস্তৃতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যতদূর মনে হয়, সমাচারদেবের রাজত্বকাল নিরুপদ্রবেই অতিবাহিত হয়েছিল, তিনি গোপচন্দ্রের পূর্ব-অধিকৃত রাঢ় অঞ্চলের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। গৌড়রাজ শশাঙ্কের পূর্বে সমাচারদেবের উত্থান ঘটে। প্রাপ্ত মুদ্রাভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, সমাচারদেব সার্বভৌম গুপ্তবংশের অন্তিমদিকের রাজাদের কাছাকাছি সময়ের লোক। ঘুগ্রাহাটি/ঘোষবট লিপি বর্ণিত রাজা জয়নাগের পূর্বেই তাঁর অস্তিত্ব ছিল। সমাচারের রাজত্বকাল জয়নাগের পূর্বে এবং ধর্মাদিত্যের পরবর্তী সময়ে। সমাচারদেব রাজত্ব করেন অন্ততপক্ষে পনের বছর। সুতরাং, সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে বঙ্গের রাজাগণ তাঁদের স্বাধীনতাকে সংহত করেন গুপ্তরাজত্বের শেষদিকে যখন সার্বভৌম গুপ্তবংশের জ্ঞাত শেষ দুই রাজা তৃতীয় কুমারগুপ্ত এবং বিষ্ণুগুপ্ত (৫৩৫-৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

সমাচারদেবের পরবর্তী শাসকগণ পূর্ব বাঙলার কয়েকটি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে শাসন করেন, গুপ্তদের অনুকরণে তৈরী কিছু মুদ্রা থেকে তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায়।

১.২ গৌড় ঃ শশাঙ্কের রাজত্বকাল

বঙ্গের স্বাধীন রাজ্য কিভাবে বিলুপ্ত হল সঠিকভাবে বলা যায় না। অনুমান করা যেতে পারে চালুক্যবংশীয় কীর্তিবর্মনের আক্রমণ এবং তিব্বতীরাজ স্রোঙ্গা-সান-গাম্পো (Sron-tsan-Gampo)-র অভিযানে বঙ্গের রাজ্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। সম্ভবতঃ শেষ আঘাতটি আসে গৌড়রাজ শশাঙ্কের নিকট থেকে, পূর্ব প্রান্তে তাঁর রাজ্যবিস্তৃতির কালে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্কের স্থান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর অধীনে গৌড় রাজ্য উত্তরভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। শশাঙ্কের প্রথম জীবন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে তিনি সিংহাসনে বসেন তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেক সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, শশাঙ্কের অপর নাম

ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত এবং তা থেকে ধারণা করা যায় তিনি গুপ্ত রাজপরিবারের সঙ্গো সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, হর্ষচরিতের টীকাকার শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ করেছেন। যশোরে (বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত) আবিষ্কৃত কিছু মুদ্রায় "নরেন্দ্র" নামটি দেখা যায়। এগুলি সম্ভবতঃ শশাঙ্কের উৎকীর্ণ। শশাঙ্কের কিছু মুদ্রায় বৃষবাহন শিবের চিত্র মুদ্রিত রয়েছে, এই প্রকার মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনা লক্ষ্মীর চিত্র মুদ্রিত। আমরা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় এইরূপ চিত্র দেখতে পাই। শশাঙ্কের মুদ্রায় গুপ্তমুদ্রার অনুরূপ প্রতিফলন বা সাদৃশ্য দেখে অনেক ইতিহাসবিদ্ তাঁকে গুপ্ত বংশোদ্ভুত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গুপ্তমুদ্রায় উৎকীর্ণকারীর নাম যেভাবে লেখা থাকত, শশাঙ্কের মুদ্রায়ও তার অনুকরণ দেখা যায়। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে, শশাঙ্ক মগধের পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশের উত্তরসূরী ছিলেন। কিন্তু ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এই ধারণা সমর্থন করেন না।

সাধারণভাবে, সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ অনুসারে, রোহতাসগড়ে প্রাপ্ত শশাঙ্ক উৎকীর্ণ সীল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় মহাসেনগুপ্তের অধীনস্থ সামন্ত প্রধান হিসাবে শশাঙ্ক তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ড. রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন গৌড় রাজা জয়নাগের উত্তরসূরী ছিলেন শশাঙ্ক তবে এই ধারণার সপক্ষে বিশেষ তথ্য নেই। যাইহোক, মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাজ্যের যবনিকাপাত ঘটে, গৌড়ের সিংহাসনকে উক্ত রাজশক্তির কবল থেকে মুক্ত করে গৌড়ের রাজা হন শশাঙ্ক।

শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ নগরে। পূর্বে ঐতিহাসিক Beveridge কর্ণসুবর্ণকে সনাক্ত করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী বহরমপুরের নিকটস্থ রঙ্গামতী নামক স্থানে। পরবর্তীকালে পুরাতাত্ত্বিক অধ্যাপক সুধীররঞ্জন দাস সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার আধুনিক চিরোটি নামক স্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই সনাক্তকরণ করা হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণের সাহায্যে। মুর্শিদাবাদ জেলার চিরোটি রেলষ্টেশনের নিকট অবস্থিত যদুপুর গ্রামে খননকার্যের ফলে একটি লিপি সম্বলিত সীল আবিষ্কৃত হয়, এই লিপিটি হল—"শ্রী রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার"। হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায়, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শশাঙ্কের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রধান উপাদানগুলি হল—(১) হিউয়েন সাঙের বিবরণ (২) বাণভট্টের হর্ষচরিত (৩) বৌদ্ধ গ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' এবং (৪) শশাঙ্কের লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি।

শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাচীন বাংলার উত্তর এবং পশ্চিম অংশ তাঁর শাসনাধীনে ছিল। সম্ভবতঃ বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশ করায়ত্ত করার অভিযানে প্রয়াসী হবার পূর্বেই তিনি সমগ্র বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। দুবি তাম্রফলক থেকে জানা যায় গৌড়রাজ কামরূপ (আসাম)-এর রাজা ভাস্কর বর্মনকে পরাজিত ও বন্দী করেন। এখানে অবশ্য গৌড়রাজের নাম উল্লিখিত নেই, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ইনি শশাঙ্ক ছাড়া অপর কেউ নন।

শশাঙ্ক শুধুমাত্র প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক গন্ডির মধ্যেই রাজ্যকে সীমাবদ্ধ রাখার স্বপ্ন দেখেন নি, তাই দক্ষিণস্থ প্রদেশ উৎকল এবং কঙ্গোদ অভিযানে সচেষ্ট হন। তিনি দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুরের দাঁতন), উৎকল ও কঙ্গোদে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। মেদিনীপুর লিপিতে শশাঙ্ককে সার্বভৌম রাজার সম্মান দেওয়া হয়েছে। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব বংশ শশাঙ্কের আনুগত্য স্বীকার করে। দক্ষিণে শশাঙ্কের রাজ্য চিল্কা হ্রদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্ভবতঃ গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত অঞ্চল তাঁর রাজত্বের দক্ষিণতম সীমা রূপে চিহ্নিত হত। কনৌজের মৌখরীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হবার পূর্বেই এই দক্ষিণ অভিযান শশাঙ্ক সমাপ্ত করেছিলেন।

শশাঙ্কের পশ্চিম অভিযান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কনৌজের মৌখরীগণ গৌড়ের চিরকালীন শত্রু ছিলেন। পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের সময় থেকেই এঁরা গৌড় ও মগধের উপর দখল কায়েম করতে তৎপর ছিলেন। শশাঙ্কের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিমে মৌখরী আগ্রাসন থেকে গৌড়কে রক্ষা করা। তবে কনৌজ ও থানেশ্বরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক জোটগঠনের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়, যা শশাঙ্কের পক্ষে মোটেই স্বস্তিদায়ক ছিল না। এর প্রত্যুত্তরে তিনি মালোয়ার দেবগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন।

শশাঙ্কের পশ্চিমাভিযানের প্রথম পর্যায়ে মগধ অধিকার করে গৌড় রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্মনের মৃত্যুর পর মৌখরীদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেবগুপ্তের সঙ্গে শশাঙ্ক একযোগে কনৌজ আক্রমণ করেন। কনৌজ অধিকৃত হয়, দেবগুপ্ত কর্তৃক মৌখরীরাজ গ্রহবর্মন নিহত হন এবং হর্ষবর্ধনের ভগ্নী প্রভাকরবর্মনের কন্যা, গ্রহবর্মনের বিধবা পত্নী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করা হয়। এই অপমানের প্রত্যুত্তরে থানেশ্বরের নবনিযুক্ত রাজা রাজ্যবর্ধন মালোয়ার দেবগুপ্তকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করতে অগ্রসর হন কিন্তু শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। এইভাবে শশাঙ্ক কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পুরস্কার হিসাবে সমগ্র অঞ্চলটির অধিপতিরূপে

প্রতিষ্ঠিত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক সম্ভবতঃ কনৌজের সিংহাসনে গ্রহবর্মনের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অধিষ্ঠিত করেন। কারণ বিভিন্ন উপাদান থেকে জানা যায়, গ্রহবর্মনের ভ্রাতাকে পরাজিত করে থানেশ্বরের নতুন রাজা হর্ষবর্ধন কনৌজ অধিকার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, শশাঙ্ক স্বভূমি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই কনৌজকে কেন্দ্র করে থানেশ্বর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা না করে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের শত্রুতার একটি দীর্ঘ প্রতিফলন দেখা যায় ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন উপাদানে। হর্ষবর্ধন তাঁর অধীন সকল করদ এবং মিত্র রাজাকে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁর (হর্ষবর্ধনের) সঙ্গে হাত মেলাতে আবেদন করলেন। এই আহ্বানে প্রথম সাড়া দেন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন। 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে' বলা হয়েছে, হর্ষবর্ধন তাঁর পূর্বাভিযানের কালে শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। আবার একই আকর গ্রন্থটি পূর্বদিক থেকে হর্ষকে জোর করে বিতাড়িত করা হয়েছিল বলেও উল্লেখ করেছে। ভাস্করবর্মনের নিধনপুর তাম্রফলকে বলা হয়েছে, হর্ষ ও ভাস্করবর্মনের যৌথ অভিযানে শশাঙ্ক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে সেই মুহূর্তে হর্ষ পূর্ব দিকে অভিযান সমাপ্ত করে ফিরে যান, তৎক্ষণাৎ শশাঙ্ক পুনরায় তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। অধ্যাপক স্মিথের মতে, শশাঙ্ক বিশেষ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকেও মনে হয়, হর্ষের সঙ্গে শশাঙ্কের বিরোধে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের কোনো মারাত্মক ক্ষতি করতে পারেন নি। পুণ্ড্রবর্ধন সম্পর্কে তাঁর বিবরণে হর্ষের গৌড় অভিযান উল্লিখিত হয় নি, পক্ষান্তরে, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ আমৃত্যু শশাঙ্ক মগধে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন—ঐ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে হিউয়েন সাঙের রচনায় বর্ণিত হয়েছে।

শশাঙ্ক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ প্রভাবিত লেখক তাঁকে ধর্মান্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবল শত্রু রূপে চিত্রিত করেছেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অন্যান্য অনেক অভিযোগের সঙ্গে বোধগয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করার কথাও বলা হয়েছে। তবে এই সকল পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যের সপক্ষে কোনো নিরপেক্ষ তথ্য প্রমাণ বা সমর্থিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যধর্মের উগ্র সমর্থক ছিলেন সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিবরণ অনুসারে, শশাঙ্ক গ্রহবিপ্র বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামক একটি সম্প্রদায়কে বাংলায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর আরোগ্যলাভের জন্য ধর্মীয় যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্ত। শশাঙ্কের ব্রাহ্মণ্যধর্মপ্রীতির অপর একটি সম্ভাব্য কারণ, হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ। তা ছাড়া, বৌদ্ধ প্রভাবে সেই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল, ঐ ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসাবে শশাঙ্ক তা থেকে

কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি ; উপরন্তু, একজন বৌদ্ধ ভক্ত রূপে হর্ষবর্ধন তাঁকে কোনঠাসা করে ফেলেছিলেন। রাজত্বের শেষ দিকে শশাঙ্কের খাদ-মিশ্রিত মুদ্রাগুলি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, তাঁর রাজ্য আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এই রাজনৈতিক তথা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও তাঁকে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

যাই হোক, ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শশাঙ্কের অধীন গৌড়রাজ্য একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে নিয়েছিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

১.৩ হর্ষবর্ধন—থানেশ্বর রাজ্য

পুষ্যভূতিবংশীয় রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। হর্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রধান যে উপাদানগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায় তা হল—বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং হিউয়েন সাঙের 'সি-ইউ-কি'। এই সাহিত্যিক উপাদান ছাড়া কতকগুলি লিপি আমাদের যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করে। এই লিপিগুলি হল ঃ বাঁশখেরা লিপি, মধুবন লিপি, সোনপত্ তাম্র সীল লিপি, নালন্দা-সীল এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপি।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজের প্রধানমন্ত্রী পো-নি (ভণ্ডী বা ভনি)-র পরামর্শে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মৌখরী রাজবংশের অধিকৃত কনৌজে হর্ষবর্ধন বিনা বাধায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা উচিত নয়। থানেশ্বর রাজপদে অভিষিক্ত হবার পর কনৌজের অধিকার লাভ করতে হর্ষকে অন্ততঃ ছয় বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যাইহোক, হর্ষের প্রথম সাফল্য হল কনৌজ-এ আধিপত্য বিস্তার। হর্ষের সঙ্গে শশাঙ্কের কূটনৈতিক সম্পর্ক যে নিতান্তই বৈরী ছিল তা শশঙ্কের ইতিবৃত্ত (পূর্বে আলোচিত) থেকে সহজেই বোঝা যায়।

পশ্চিম ভারতে হর্ষবর্ধন বলভী রাজ্য আক্রমণ করেন ; বলভীরাজ পরাজিত হন পুষ্যভূতি বংশীয় হর্ষের কাছে। কিন্তু গুর্জররাজ দ্বিতীয় দ্বন্দের সাহায্যে বলভীরাজ তাঁর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। এই বলভীরাজ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন বা ধ্রুবদত্ত। বলভীর সঙ্গে হর্ষের শত্রুতার অবসান হয় একটি বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে, যেখানে হর্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ধ্রুবদত্ত।

হর্ষবর্ধন যখন উত্তর ভারতে একচ্ছত্র ক্ষমতা বিস্তারে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছেন, ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণের সর্বময় অধিপতি হবার বাসনায় বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন লাট (গুজরাট), মালব ও গুর্জরগণ হর্ষের প্রাচীন শত্রু ছিলেন, তাঁরা স্বেচ্ছায় শক্তিশালী দ্বিতীয় পুলকেশীর অধীনে সামন্তরাজ রূপে অধিষ্ঠিত হন শুধুমাত্র হর্ষবর্ধনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। এতে হর্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় পুলকেশীর সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

হিউয়েন সাঙের বিবরণে দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে হর্ষের সাড়ম্বর যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে পুলকেশী হর্ষবর্ধনের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন বলে জানা যায় না, পক্ষান্তরে হর্ষবর্ধন চালুক্য শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন কি না তাও পরিষ্কার নয়। এ বিষয়ে একাধিক ঐতিহাসিকের বিভিন্ন ধারণা বা মতবাদ রয়েছে। হর্ষবর্ধন সিন্দের শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। হর্ষের সাম্রাজ্যে দুই ধরণের প্রদেশ অন্তর্গত হয়েছিল—(১) বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত ও (২) বিজিত রাজ্য। প্রথমোক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত থানেশ্বর এবং পাঞ্জাবের অধিকৃত প্রদেশ উল্লেখযোগ্য। হর্ষবর্ধন তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে মগধ, উড়িষ্যা, গঞ্জাম এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন বাংলার পশ্চিম অংশ করায়ত্ত করেছিলেন। যদি এই প্রদেশগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে থাকে তবে বলা যায় পুষ্যভূতি-শাসক হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য পূর্ব পাঞ্জাবের কিয়দংশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলার পশ্চিমভাগ এবং উড়িষ্যায় বিস্তৃত ছিল। সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে হর্ষের যে বর্ণনা (সকলোত্তরপথনাথ) চালুক্য লিপিতে পাওয়া যায় তা অতিশয়োক্তি মাত্র। তবে পাঞ্জাব থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার নিঃসন্দেহে হর্ষবর্ধনের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক।

চৈনিক ঐতিহাসিক মা-তোয়ান-লিন্ হর্ষের রাজত্বকালে ভারত-চীন সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে চীন সম্রাটের কাছে হষবর্ধন তাঁর দূত প্রেরণ করেন—প্রত্যুত্তরে চীন রাজদরবার থেকে একটি প্রতিনিধি দল হর্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ভারতে আসেন। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় হর্ষের দরবারে 'ওয়াং-হিউয়েন-সী'র নেতৃত্বে দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল চীন থেকে আগমন করেন। ইতিমধ্যে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে ভারত সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সম্ভবতঃ তাঁর মারফৎ-ই চীনসম্রাটের কর্ণগোচর হয়। ফলতঃ তৃতীয় চৈনিক মিশনটি প্রেরিত হয় হর্ষের দরবারে ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই দূতবাহিনী ভারতে যখন পদার্পণ করে তখন হর্ষবর্ধনের জীবনাবসান হয়েছে।

১.৪ বাংলার পালবংশ

পূর্বকথা ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী বাংলার ইতিহাস তমসাবৃত। বস্তুতঃ এই যুগে একটি রাজনৈতিক অরাজকতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে। শশাঙ্কের অবর্তমানে তাঁর সাম্রাজ্য খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, স্থানীয় শাসকদের অনবরত অন্তর্কলহ, পুনঃপুনঃ শাসক পরিবর্তন এবং এই সুযোগে বৈদেশিক আক্রমণের নিরন্তর চাপে বাংলার রাজনৈতিক তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন জর্জরিত হয়ে পড়ে। এক নিদারুণ নৈরাজ্য সমগ্র দেশের শান্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, যার সমাপ্তি ঘটে পাল-রাজবংশের উত্থানে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পর ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজ্য বিভাজিত হয়ে পাঁচটি স্বাধীন অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়, যথা—কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র পূর্বভারতে একটি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা যায়। শশাঙ্কের পুত্র মানবদেব তাঁর বংশের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত জয়নাগ নামক এক ব্যক্তি গৌড়ের অধিপতি হন এবং তাঁর কৃতিত্বে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের অধিকার থেকে কর্ণসুবর্ণ মুক্তি পায়। সাল তারিখহীন বপ্পটঘোষবট দানফলকে উল্লিখিত মহারাজাধিরাজ জয়নাগ স্বর্ণমুদ্রাও উৎকীর্ণ করেন, যা তাঁকে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী রাজা হিসাবে প্রতিপন্ন করে। জয়নাগের সঠিক সময় জানা যায় না, সম্ভবতঃ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে তাঁর উত্থান হয়। জয়নাগের পতনের পরবর্তীকালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষে কি হয়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ধারণা পোষণ করেছেন। শশাঙ্ক বঙ্গ প্রদেশটি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কি না সঠিক বলা কঠিন। যদি ধরে নেওয়া হয় বঙ্গ গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তবে এ কথা সত্য যে শশাঙ্কের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই তা স্বাধীন হয়ে যায়। হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুসারে, সপ্তম খ্রিস্টীয় শতকের প্রথমভাগে সমতট অঞ্চলে একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাজত্ব করত। ঐতিহাসিকগণ এই রাজপরিবারকে ভদ্র রাজবংশ বলে মনে করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিদিত পণ্ডিত শীলভদ্র এই রাজপরিবারের বংশজাত বলে মনে করা হয়। এই রাজবংশ বিলুপ্ত হয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খড়্গ রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের ফলে।

আস্রফপুর (ঢাকা) লিপি থেকে খড়্গ রাজবংশের সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। চৈনিক উপাদানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে খড়্গ বংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করে। সম্ভবতঃ মগধ, গৌড় এবং সমতট অঞ্চলে ধারাবাহিক বৈদেশিক আক্রমণে অষ্টম খ্রিস্টীয় শতকের

প্রথমার্ধে খড়্গ রাজত্বের অবলুপ্তি ঘটে। বাংলায় বিদেশী অভিযানে সমগ্র ভূখণ্ডটি ভেঙে চুরে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক এককে পরিণত হয়। এই যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস নিরবচ্ছিন্নভাবে বিবৃত করা সম্ভব নয়। লিপিভিত্তিক এবং তিব্বতীয় উপাদানে যে টুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে জীবধরণ এবং শ্রীধরণ নামক রাতবংশীয় দুই রাজার রাজত্বের বিবরণ রয়েছে। এঁরা বাংলার পূর্ব প্রান্তের শাসক ছিলেন। ঐ একই অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এঁদের বেশ কয়েকটি সুদীর্ঘ লিপি পাওয়া গেছে। চন্দ্রবংশের কীর্তিমান শাসকদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক তথ্যপ্রমাণ থেকে আলোচ্য যুগে 'মাৎস্যন্যায়'—এর উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত শব্দটি চরম অরাজক অবস্থাকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই রাজনৈতিক তথা সামাজিক বিশৃংখলতা জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এমতাবস্থায় গোপাল নামক জনৈক পালবংশীয় বীর শক্ত হাতে বাংলার অসহায় পরিস্থিতি দূর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন—গোপালের বাংলার সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে পালবংশের সূচনা হয়। পালবংশের আদি বংশপরিচয় এবং ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের লিপিগুলি প্রায় নীরব। এই রাজবংশের ধারবাহিক ইতিহাস অনুসন্ধানে আমাদের যে সকল উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয় সেগুলি হল ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রফলক সহ আরও বহু লিপি, বৌদ্ধ সাহিত্য 'আর্য মঞ্জুশ্রী' মূলকল্প। তিব্বতীয় লামা তারনাথের বিবরণ, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহ প্রভৃতি।

পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের মূল কৃতিত্ব হল অরাজক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সুসংহত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গোপাল তাঁর পুত্র ধর্মপালকে রাজ্যবিস্তৃতির পথ সুগম করে দেন। গোপালের রাজত্বকাল ৭৫০-৭৭০ খ্রিস্টাব্দ। ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার সুযোগ গ্রহণ করে, বাংলার পালবংশ, রাজপুতানার প্রতিহারগণ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ—এই তিন শক্তির মধ্যে উত্তর ভারতের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ধর্মপালের রাজত্বকালে বাংলার ছোট রাজ্যটি উত্তর ভারতের সিংহভাগ দখল করে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল রাজা হন। তাঁর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর রাজত্বকালে প্রাগজ্যোতিষ, উৎকল, হূণ, গুর্জর, দ্রাবিড় প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান সংঘটিত হয়। দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের অবক্ষয় সূচিত হয়। পুনরায় খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষদিকে (৯৮৮-১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ) মহীপালের রাজ্য প্রাপ্তির পর পাল বংশের পুনরুত্থান ঘটে। মহীপালের সফল

রাজত্বকাল সমাপ্ত হবার পর পাল-সিংহাসনে বসেন নয়পাল (১০৩৮-১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। নয়পালের পরবর্তী শাসক তৃতীয় বিগ্রহপাল, এরপর যথাক্রমে ২য় মহীপাল এবং রামপাল বাংলার শাসনভার নির্বাহ করেন। যতদূর জানা যায় পালবংশের শেষ রাজা মদনপাল। এই রাজার সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। পাল রাজত্বের অন্তিম লগ্নে কামরূপের পাল-অধীনস্থ শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পূর্ব বাংলা স্বাধীন হয় ভোজবর্মনের নেতৃত্বে, কলিঙ্গের গঙ্গারাজ অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ শুধু উড়িষ্যা নয়, দক্ষিণ বঙ্গেও প্রাধান্য বিস্তার করেন। পাল রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে উত্তরপ্রদেশের গোবিন্দচন্দ্র গহড়বাল মদনপালের হাত থেকে পাটনা ছিনিয়ে নেন। তবে পালবংশের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিসাধন করেন কর্ণাটকের দুই রাজবংশ—রাঢ়ের সেনবংশ এবং নন্যদেবের রাজপরিবার। রাঢ়ের বিজয় সেন মদনপালের নিকট থেকে গৌড় অধিকার করেন এবং নন্যদেবের পুত্র গঙ্গেয়দেব জয় করেন উত্তর বিহার অঞ্চলটি। এইভাবে পাল রাজত্বের বিলুপ্তি ঘটে।

১.৫ বাংলার সেনবংশ

পাল-শাসনের অবসানের পর বাংলাদেশে সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজকীয় তথ্য অনুসারে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট প্রদেশের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সদস্য হল এই সেন রাজপরিবার। সম্ভবতঃ পাল-আমলে কিছু কর্ণাট রাজকর্মচারী রাঢ় অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করতেন, এঁরা পাল রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতা বিস্তার শুরু করেন। এই বংশের সামন্তসেন শেষ বয়সে রাঢ় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের সূচনা করে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করার পর বাংলার অন্যান্য প্রদেশে সেন রাজ্য বিস্তৃত হয়।

হেমন্তসেনের পরবর্তী রাজা বিজয়সেন। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকাল যাট বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল (১০৯৫-১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ)। গৌড়, বঙ্গ, আসাম, কলিঙ্গ এবং বিহার জয় করে বিজয়সেন সেন রাজ্যকে সুবিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। বিজয়সেনের কীর্তিগাথা লিপিবদ্ধ হয়েছে উমাপতিধরের কাব্য-প্রশস্তিতে। দেওপাড়া লিপি এবং সম্ভবতঃ শ্রীহর্ষের বিজয়-প্রশস্তিতে এই রাজার সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

বিজয়সেনের উত্তরসূরী বল্লালসেনের আমলকে সাধারণতঃ শান্তি এবং সমাজ সংস্কারের যুগ রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বল্লালের যুগে বাংলাদেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়।

তিনি নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। বল্লালসেনের রচিত দুইটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়—দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের পুঁথিবিহিত ক্রিয়াকর্ম পালনে এবং হিন্দু সমাজের পুনরুত্থানে বল্লালসেন বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। প্রাচীন বাংলায় কুলীন ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে বল্লালসেনের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সম্ভবতঃ তাঁর রাজত্বের শেষ হয় ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

বল্লালসেনের পর সেনবংশীয় রাজা হন লক্ষ্মণসেন। তিনি ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পরিণত বয়সে সিংহাসনে বসেন। লিপিভিত্তিক এবং সাহিত্যিক উপাদানগুলি থেকে জানা যায় লক্ষ্মণসেন একাধিক যুদ্ধাভিযানে সফল হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অন্যতম হল গহড়বালদের পরাজিত করা। এই সেনরাজ পশ্চিমে কলচুরীদের সঙ্গে সংগ্রাম করেন বলে জানা যায় তবে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে অন্তর্কলহ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণে সেন রাজবংশ এবং সেন রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে ডোম্মনপাল বর্তমান চব্বিশপরগণার খাড়িমণ্ডলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সেন কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে। সম্ভবতঃ ঐ একই সময়ে মেঘনার পূর্বে দেববংশ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সেন রাজত্বের এই অবক্ষয়ের যুগে মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা আক্রমণ একটি গৌরবময় রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটায়–সেনরাজবংশের পতন হয়।

১.৬ হর্ষবর্ধনের পরবর্তী অন্যান্য রাজ্যসমূহ

পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশের শেষ শাসক জীবিতগুপ্ত গৌড় শক্তির হাতে কিংবা কনৌজের যশোবর্মনের আক্রমণে মগধের সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হন। অষ্টম খ্রিস্টীয় শতকের প্রারম্ভে কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন যশোবর্মন। এই রাজার রাজত্বকাল সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে বাকপতির রচিত 'গৌড়বহ'। অনেক ঐতিহাসিক যশোবর্মনকে মৌখরী রাজবংশজাত বলে মনে করেন, তাঁদের এই ধারণার মূলে রয়েছে 'বর্মন' পদবীটি যা মৌখরী রাজাদের নামান্তেও ব্যবহার হত। তবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই।

যশোবর্মন মগধ এবং গৌড় অধিকার করেন এ তথ্য গৌড়বহ থেকে পাওয়া যায়। নালন্দা লিপিতে এর সমর্থিত তথ্য পাওয়া যায়। যশোবর্মন দাক্ষিণাত্যের রাজাকে পরাজিত করেন। তিনি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, মরুদেশ (রাজপুতানা), শ্রীকণ্ঠ (থানেশ্বর), হিমালয় গিরিমালা অভিযানের পর কনৌজ প্রত্যাবর্তন করেন। যশোবর্মন উত্তর-পশ্চিমে আরব এবং উত্তর-পূর্বে তিব্বতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার

জন্য কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করেন। এঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় তিব্বতীশক্তি পরাজিত হয়। ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে যশোবর্মন চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে কার্কোট বংশের রাজত্বকালে কাশ্মীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। এই কার্কোট বংশের প্রতিষ্ঠাতা দুর্লভবর্ধন ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের কিয়দংশে শাসন করতেন। তাঁর পৌত্র চন্দ্রাপীড় ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে আরব আক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্যে একটি দূতবাহিনী চীন দেশে প্রেরণ করেন চীন-সম্রাটের নিকট থেকে সহায়তা লাভের আর্জি জানিয়ে। চন্দ্রাপীড় চৈনিক সাহায্য না পেলেও একক শক্তিতে আরব বাহিনীকে প্রতিহত করে কাশ্মীর রক্ষা করেন। চন্দ্রাপীড়ের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাশ্মীররাজ হলেন মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য। রাজতরঙ্গিনীর লেখক কল্হনের লেখনীতে মুক্তাপীড়ের রাজত্বকাল সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ, ইতিহাসধর্মী বিবরণ পাওয়া যায়। তবে মুক্তাপীড়ের রাজ্যবিস্তৃতির যে বর্ণনা রাজতরঙ্গিনীতে রয়েছে তার ঐতিহাসিক যথার্থ প্রসঙ্গে পণ্ডিতমহল নিঃসন্দেহ নন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ইসলামী প্রভাব সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। ইসলাম মতাবলম্বী আরব শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যে সফল অভিযান চালিয়ে ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সিন্দ্ অঞ্চল আক্রমণ করে। এই অঞ্চলের বিখ্যাত বন্দর আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ৭০৮ খ্রিস্টাব্দে সিন্দের ব্রাহ্মণ শাসক দাহিরের সঙ্গে ইরাকের শাসকের মতান্তর হয়। মহম্মদ-বিন-কাশিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন, দাহির পরাজিত হন। দাহিরের পুত্র জয়সিংহ আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। এইরূপে সিন্দে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। তবে আরবদের সিন্ধু প্রদেশ বিজয়ের কোনো চিরস্থায়ী ফলশ্রুতি ছিল না, এটি ছিল একটি সাময়িক বিজয় মাত্র।

রাজপুত শাসককুল যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিহারগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে প্রথম নাগভট্ট প্রতিহার রাজবংশকে ক্ষমতাশালী করে তোলেন, তাঁর সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ অভিযান ঘটে আরবদের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে তিনি জয়ী হন। এই জয়ে মালোয়া, গুজরাট ও রাজপুতানার কিয়দংশ প্রতিহার রাজ্যের অন্তর্গত হয়। পরবর্তী রাজা হলেন বৎসরাজ। তিনি পালরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ধর্মপাল ও বৎসরাজ উভয়কেই পরাজিত করেন। পরবর্তী রাজারা হলেন যথাক্রমে দ্বিতীয় নাগভট্ট, তৃতীয় গোবিন্দ, প্রথম ভোজ, দ্বিতীয় ভোজ, মহীপাল এবং রাজ্যপাল।

প্রতিহার বংশের রাজত্বকাল শেষ হবার পর প্রায় অর্ধশতক কনৌজ রাষ্ট্রকূট প্রশাসকদের দ্বারা শাসিত হত। ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চন্দ্রদেব গহড়বাল রাষ্ট্রকূট রাজা গোপালকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকারপূর্বক গহড়বাল-রাজত্বের সূচনা করেন। এই বংশের শেষ রাজা জয়চন্দ্রের রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

চৌহান বা চহমানগণ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে অজয়রাজের নেতৃত্বে পরমারদের পরাজিত করে উজ্জয়িনী দখল করে। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'অজয়মেরু' বা বর্তমান আজমীর নগর। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের (১১৭৮-১১৯২ খ্রিস্টাব্দ) অধীনে চৌহানরাজ্য সাফল্যময় ইতিহাস রচনা করে। পৃথ্বীরাজ হলেন শেষ হিন্দু বীর যিনি মুসলমান আগ্রাসকদের হাত থেকে স্বদেশ রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এই বীরগাথা কবি চাঁদ বরদাই-এর বিখ্যাত কাব্য 'পৃথ্বীরাজ রস' বা 'পৃথ্বীরাজ বিজয়'-এ অমর হয়ে আছে। রাজা পৃথ্বীরাজ আবু পার্বত্য অঞ্চলে মোহাম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন। তিনি বহু সংখ্যক হিন্দুরাজাকে একত্র সংগঠিত করেন ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরীর পুনরাভিযান প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে শেষ রক্ষা সম্ভব হয় নি। ঘুরীর সৈন্যদল পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বন্দী করে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আলোচনার অবকাশ বিশেষ নেই। উল্লেখযোগ্য রাজপুত গোষ্ঠী হিসেবে চন্দেল্লগণের উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা প্রতিহার সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর বুন্দেলখণ্ডের জেজাকভুক্তিতে রাজত্ব স্থাপন করে। খ্রিস্টীয় নবম শতকে চন্দেল্লরাজ যশোবর্মন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খাজুরাহোর বিখ্যাত মন্দির চন্দেল্ল রাজাদের তৈরি।

নর্মদার দক্ষিণে এবং গোদাবরীর উত্তরে অবস্থিত চেদী রাজ্যে রাজত্ব করতেন কলচুরীগণ, জব্বলপুরের নিকট ত্রিপুরী ছিল এঁদের রাজধানী। খ্রিস্টীয় দশম শতকে পৃথ্বীরাজের সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে চেদী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে কলচুরীরাজ কর্ণের অধীনে চেদীরাজ্য গৌরবের শিখরে আরোহণ করে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে চেদীরাজ্যে ভাঙন ধরে। এই রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে গণপতি, যাদব এবং বাখেলা রাজপরিবারের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে।

মালোয়ার পরমারগণও কনৌজে প্রতিহারদের পতনের পর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক ছিলেন রাজা ভোজ। তাঁর রাজধানী ধরা বা ধারা নগরীটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পরমারগণ একটি আঞ্চলিক শক্তি রূপে তাঁদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল।

১.৭ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ

বিন্ধ্যপর্বতমালা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'দক্ষিণাপথ' বা 'দাক্ষিণাত্য' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাতবাহনরাজবংশের রাজত্ব শেষ হবার পর এই দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করেন বাকাটক রাজবংশ। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে বাদামীর (বিজাপুর জেলা) চালুক্য বংশ দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বিস্তার করে। এদের পুর্ববর্তী পশ্চিমী 'চালুক্য বংশ' নামেও অভিহিত করা হয়।

পশ্চিমী চালুক্য বংশ ঃ ভারত-ইতিহাসের পাতায় চালুক্য বংশ আপন মহিমায় স্থান করে নিয়েছিল এই রাজপরিবারের নেতা জয়সিংহের সময়ে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে জয়সিংহ বাতাপি (বাদামী) বা বিজাপুর অঞ্চলে চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা প্রথম পুলকেশী (৫৩৫-৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ) বাতাপিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি 'মহারাজ', 'সত্যাশ্রয়' উপাধি দুটি গ্রহণ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন বলে জানা যায়। আইহোল লিপি থেকে জানা যায়, এই বংশের চতুর্থ রাজা প্রথম কীর্তিবর্মন বেলারি জেলার নলদের, উত্তর কোঙ্কনের মৌর্যদের এবং বনবাসী (উত্তর কানাড়া)-র কদম্বদের পরাজিত করেন। বাতাপির দুর্গ নির্মাণের কাজ কীর্তিবর্মনের আমলে শেষ হয়। কিছু লিপিতে বলা হয়েছে তিনি উত্তরে মগধ এবং বঙ্গ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য পর্যন্ত সফল যুদ্ধাভিযান করেন। তাঁর রাজত্বকাল ৫৬৬-৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কীর্তিবর্মনের পরবর্তী শাসক তাঁর ভ্রাতা মঙ্গালেশ, তিনি মধ্য ও উত্তর মহারাষ্ট্র জয় করেন। কলচুরীদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলস্বরূপ এই রাজ্যগুলি অধিকৃত হয়। মঙ্গালেশের মৃত্যুর পর ৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ আইহোল লিপিতে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যজয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণে বনবাসীর কদম্ব, মহীশূরের গঙ্গ এবং মালাবারের অলুপগণ পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন। তিনি কোঙ্কনের মৌর্যদের পরাজিত করে তাদের রাজধানী শহর পুরী দখল করেন। পুরী নগরীর অবস্থান ছিল আরব সাগরের উপকূলস্থ এলিফ্যান্টা দ্বীপে। উত্তরে লাট বা গুজরাট প্রদেশ, মালোয়া এবং গুর্জরগণ পুলকেশীর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। গুজরাট জয় পুলকেশীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উত্তর ভারতের সর্বময় অধীশ্বর হর্ষবর্ধনের সঙ্গে ২য় পুলকেশীর সংঘাত শুরু হয় গুজরাটকে কেন্দ্র করে। ড. স্মিথের মতে, উভয় রাজশক্তির এই সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল নর্মদার তীরে। এই যুদ্ধের ফলে পশ্চিমে হর্ষের সাম্রাজ্য বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুলকেশী পূর্ব দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালিয়ে কোশল ও কলিঙ্গ জয় করেন। পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষিণমুখী অভিযানে কুণাল, ইলোরা ও পিথুপুরম রাজ্য দখল করে পুলকেশী পূর্ব দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণের প্রদেশগুলি কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধনের শাসনাধীনে চালুক্যের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

২য় পুলকেশীর সুদূর দাক্ষিণাত্যে পল্লব রাজ্য আক্রমণের মাধ্যমে পল্লব–চালুক্য দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। উত্তর থেকে চালুক্যগণ এবং দক্ষিণপ্রান্ত থেকে পল্লবশক্তি উভয়েই একাধিকবার তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম করেছিল। প্রথম চালুক্য-পল্লব যুদ্ধে পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন পরাজিত হন। পুলকেশী কাবেরী নদী পার হয়ে চোল, পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী সম্পাদন করেন। সাময়িকভাবে পল্লবশক্তি এই সময় বিপর্যস্ত হয়। এই ঘটনার প্রত্যুত্তর স্বরূপ পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন চালুক্য রাজধানী বাতাপি আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। সম্ভবতঃ এই আক্রমণে দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু হয়।

পুলকেশীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য চালুক্য বংশের রাজা হন। তিনি পৈতৃক রাজ্য ও রাজধানী পল্লবদের কবল থেকে মুক্ত করেন (৬৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। চালুক্য সাম্রাজ্য প্রথম বিক্রমাদিত্যের কৃতিত্বে সম্পূর্ণভাবে পল্লব প্রভাবমুক্ত হয়। তিনি পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেন এবং চালুক্য লিপির তথ্য থেকে জানা যায়, উক্ত রাজা পল্লবদের পরাজিত করে কাঞ্চী অধিকার করেন। তবে এ তথ্য সঠিক নয়। পেরুভল্লনল্লরের যুদ্ধে প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের নিকট পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তী রাজা বিনয়াদিত্য (৬৮১ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর পুত্র বিজয়াদিত্য (৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ) পল্লবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিলেন। তিনি কাঞ্চী অধিকার করেন এবং পল্লবরাজ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনকে উপঢৌকন এবং কর প্রদানে বাধ্য করেন—তিনি বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ছিলেন এর পরবর্তী শাসক। তাঁর মূল কৃতিত্ব পল্লবদের পরাজিত করা। ২য় কীর্তিবর্মন পশ্চিমী চালুক্য বংশের শেষ রাজা। পল্লবদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বংশানুক্রমিক সংঘাতে চালুক্যরাজ্য মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রকূট-রাজশক্তির অধীনস্থ শাসক দন্তীদুর্গ চালুক্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণভাগ অধিকার করেন এবং আরও দক্ষিণে পল্লবরাজগণকে পরাজিত করে অগ্রসর হন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ চালুক্য শক্তিকে পরাস্ত করে দাক্ষিণাত্যের অধিপতি হন।

রাষ্ট্রকূট বংশ ঃ চালুক্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে উত্থান ঘটে রাষ্ট্রকূটশক্তির। ড. আলটেকর-এর মতে, মান্যখেতের রাষ্ট্রকূটগণের আদি বাসস্থান কর্ণাটক অঞ্চলে এবং তাঁদের মাতৃভাষা কাণাড়ী। কিন্তু অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক রাষ্ট্রকূটদের মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা বলে অনুমান করেন।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট বংশীয়গণ বাস করতেন। সপ্তম শতকে তাঁরা চালুক্যদের অধীনে সামন্ত শাসক ছিলেন। দন্তীদূর্গ চালুক্য বংশীয় ২য় বিক্রমাদিত্যের অধীনে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, তিনি আরব আগ্রাসকদের বিরুধে এবং কাঞ্চীর পল্লবদের বিরুধে সফল অভিযান সংগঠিত করেন। তিনি দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চালুক্য সাম্রাজ্যের সিংহভাগ দখল করেন। ৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কৃষ্ণ রাজ্যাভিষেকের পর রাষ্ট্রকূট শক্তি প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বিস্তার করে। প্রথম কৃষ্ণের পর রাজা হন দ্বিতীয় গোবিন্দ (৭৭৩-৭৮০ খ্রিস্টাব্দ)। এর পর রাষ্ট্রকূট অধিপতি হন ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ)।

ধ্রুব উত্তর ভারতের দুই অপ্রতিহত শক্তি রাজপুতানার প্রতিহার রাজা বৎসরাজ এবং বাংলার ধর্মপালের সঙ্গে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে ধর্মপালকে পরাজিত করেন। ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজাদের পরাজিত করে ধ্রুবের অধীনস্থ রাষ্ট্রকূট শক্তি অবিসংবাদী ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে দাঁড়ায়। ধ্রুবের উত্তরসুরী তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নাগভট্ট প্রতিহার এবং ধর্মপাল। তিনি উক্ত দুই রাজাকে পরাজিত করে সমগ্র উত্তর ভারত করায়ত্ত করেন। তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন নাবালক পুত্র অমোঘবর্ষ (৮১৪-৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর তেষট্টি বছরের রাজত্বকাল খুব শান্তিপূর্ণ ছিল না। প্রায় কুড়িটি বছর মহীশূরের গঙ্গা সামন্ত শাসকদের সঙ্গে তাঁকে যুধে লিপ্ত থাকতে হয়। অনুরূপভাবে, গুজরাটে প্রথম ধ্রুবের বিদ্রোহ দমনে প্রায় পাঁচিশ বছর অতিবাহিত হয়। তবে অমোঘবর্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে সমরকুশলতা লাভ করতে সক্ষম না হলেও রাষ্ট্রকূট সংস্কৃতিকে গৌরবজনক আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি সমৃধ নগরী মান্যখেত (আধুনিক মালখেদ)-এ তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

অমোঘবর্ষের পর সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে দ্বিতীয় কৃষ্ণ, তৃতীয় ইন্দ্র, তৃতীয় কৃষ্ণ এবং খোট্টিগ। এঁদের রাজত্বকাল ৮৭৮-৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় কর্ক-এর আমলে বিজাপুরের সামন্তরাজা চালুক্য তৈল রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানেন। ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কর্ককে পরাজিত করে তৈল দাক্ষিণাত্যে পরবর্তী চালুক্য রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১.৮ দক্ষিণ ভারত

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণভাগে কৃষ্ণা এবং তুঙ্গাভদ্রাবেষ্টিত ভূভাগটি দক্ষিণ ভারত। প্রাচীন যুগে এই অঞ্চলটি 'তামিলকম্' বা 'তামিলদের রাজ্য' রূপে চিহ্নিত হত। আদি যুগ থেকে দক্ষিণভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তিনটি প্রাচীন তামিল রাজবংশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়—দক্ষিণতম প্রান্তের রাজ্যটি উত্তরে ভল্লরু নদী থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত পাণ্ড্যরাজ্য। এটি মাদুরা এবং তিনেভেল্লি জেলায় অবস্থিত ছিল। পাণ্ড্যরাজ্যের উত্তর-পূর্বে ছিল চোল রাজ্য। এর উত্তরে পেন্নার নদী এবং দক্ষিণে পাণ্ড্যরাজ্য। পূর্ব উপকূলব্যাপী চোলরাজ্য চোলমণ্ডলম্ বা 'করমণ্ডল' নামে অভিহিত হত।

পাণ্ড্যরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে 'চের' বা কেরল রাজ্য অবস্থিত ছিল। মালাবার উপকূল বরাবর বিস্তৃত কেরল রাজ্যের উত্তরে ছিল কোঙ্কন রাজ্য।

পল্লবরাজ্য ঃ পল্লবরাজবংশের ষোলো জন রাজার নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়, এঁদের রাজত্বকাল ৩৫০-৫৭০ খ্রিস্টাব্দ। তবে এঁদের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় না। ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহবিষ্ণু (৫৭৫-৬০০ খ্রিস্টাব্দ) পল্লব-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের (৬০০-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে দীর্ঘপ্রসারী চালুক্য–পল্লব যুদ্ধের সূচনা হয়। সম্ভবতঃ মহেন্দ্রবর্মন দক্ষিণে কাবেরী তীর পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তার করেন। পরবর্তী রাজা প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর আমলে চালুক্য শক্তির পরাজয়ের সুযোগে পল্লব রাজ্য মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ ভ্রমণ করেন ; তাঁর বর্ণনায় এই রাজ্যের ভূয়সী প্রশংসা উল্লিখিত হয়েছে। পল্লববংশের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন, প্রথম পরমেশ্বরবর্মন, দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন, দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন, দ্বিতীয় নন্দীবর্মন প্রমুখের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের বংশধরগণ দক্ষিণ থেকে পাণ্ড্য এবং উত্তরে রাষ্ট্রকূটদের আক্রমণে জর্জরিত হয়ে পড়েন, যা শেষ পর্যন্ত প্রাচীন পল্লব রাজত্বের সমাপ্তি ঘটায়।

চোলরাজ্য ঃ মৌর্য সম্রাট অশোকের লিপিতে চোড় বা চোলদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চোলগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের গৌরবজনক স্থান টিকিয়ে রাখতে পারে নি। সেই কারণে পরবর্তী যুগে প্রায় পাঁচ শতাব্দীকাল যাবৎ চোলগণ পল্লব, চালুক্য এবং রাষ্ট্রকূট রাজশক্তির অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য হিসাবেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে চোল-শক্তি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর দুই শতাধিক বৎসর ধরে চোলরাজ্য তুঙ্গাভদ্রার দক্ষিণে অবস্থিত সমগ্র ভূখণ্ড তথা ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।

চোল শক্তির পুনরুত্থান ঘটে বীর সেনানী বিজয়ালয়ের কৃতিত্বে (৮৫০-৭১ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি পল্লব-পাণ্ড্য সংঘর্ষের সুযোগে তাঞ্জোর অধিকার করেন। পরে সেখানে চোল রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর প্রভু অপরাজিত পল্লবকে পরাজিত করে এবং নিহত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পল্লব রাজত্বের ধ্বংসাবশেষে চোল সার্বভৌম শক্তিরূপে চোলরাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় আদিত্যের নেতৃত্বে।

আদিত্যের পুত্র প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ড্যরাজ রাজসিংহকে পরাজিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আবির্ভাবে চোল রাজ্যবিস্তার সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। পরান্তকের পরবর্তী বত্রিশ বৎসর চোল সিংহাসনে যে সকল রাজা বসেন তাঁদের ইতিহাস বর্ণহীন এবং মোটেই উল্লেখনীয় নয়। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাজরাজচোল (৯৮৫-১০১৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর সময়ে চোল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করে। রাজরাজ চেররাজ্য, পাণ্ড্যরাজ্য এবং কেরল জয় করেন। মালদ্বীপ, সিংহলের উত্তরভাগ তাঁর করায়ত্ত হয়। পশ্চিমী চালুক্যদের বিরুদ্ধে রাজরাজ আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন। রাজরাজের পরবর্তী রাজা হন প্রথম রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিরুমলই প্রস্তর ফলকে তাঁর রাজ্য বিজয়ের বিস্তারিত এবং সম্পূর্ণ তালিকা সন্নিবদ্ধ হয়েছে। রাজেন্দ্র 'চোল-মার্তণ্ড' উপাধি গ্রহণ করেন।

রাজেন্দ্র দক্ষিণ অভিযানে সিংহল অধিকার করেন। কিন্তু এই জয় বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তিনি পশ্চিমী চালুক্যদের বিরুদ্ধে একাধিক সমরাভিযান করেন। শেষ যুদ্ধে চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বর রাজেন্দ্রের হাতে পরাজিত হন। পূর্বভারত অভিযানে রাজেন্দ্র সর্বশক্তি দিয়ে নিয়োজিত করেন। চোল সেনাবাহিনী কলিঙ্গ, উড়িষ্যা, বস্তার রাজ্য জয় করে পশ্চিম বাংলায় এসে উপস্থিত হয়। তারা ধর্মপাল এবং রণসুর ও পূর্ববঙ্গের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করে। বাংলার পাল রাজা মহীপাল রাজেন্দ্রের কাছে পরাজিত হন।

রাজেন্দ্র চোলের অভিনব কৃতিত্ব সফল নৌ-অভিযান সংঘটন। তিনি শৈলেন্দ্র বা শ্রীবিজয় রাজ্যের বিরুদ্ধে নৌসেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্র বা শ্রীবিজয় রাজ্য মালয়, জাভা, সুমাত্রা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ছিল। রাজেন্দ্রের অধীন চোল-রাজ্যে একটি ক্ষমতাশালী নৌসেনাদলের অস্তিত্ব ছিল। এই বাহিনীর কর্মকুশলতায় ভারত মহাসাগরের উপর চোল রাজশক্তি অভূতপূর্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

রাজেন্দ্রের পরবর্তী রাজারা যথাক্রমে প্রথম রাজাধিরাজ, দ্বিতীয় রাজেন্দ্র, বীররাজেন্দ্র, প্রথম কুলোত্তুঙ্গ, তৃতীয় রাজরাজ, তৃতীয় রাজেন্দ্র (আনুমানিক ১০৪৪-১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ)। তৃতীয় রাজেন্দ্রের রাজত্বকালেই চোল-রাজত্বের অবসান হয়। চোল শক্তির শেষ শিখাটুকু নিভে যায় মালিক কাফুরের অভিযানে ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে। এই একই সময়ে হোয়েসল রাজ্যেরও পতন ঘটে। তারা দিল্লী সুলতানশাহীর বশ্যতা স্বীকার করে। এই হোয়েসল রাজ্যের উৎপত্তি হয় দ্বারসমুদ্রে। পরবর্তী চালুক্য এবং চোলদের সংঘাতের সুযোগ নিয়ে প্রথম বল্লাল (১১০০-১১১০ খ্রিস্টাব্দ) হোয়েসল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের খ্যাতকীর্তি রাজা ছিলেন বিষ্ণুবর্ধন বা বিট্টিগ (১১১০-১১৪৮ খ্রিস্টাব্দ)। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বীরবল্লাল এবং সোমেশ্বর। তৃতীয় বীরবল্লালের রাজত্বকালে হোয়েসল রাজ্যে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে মুসলমান অভিযান সংঘটিত হয়, ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে এই রাজত্বের যবনিকাপাত ঘটে।

১.৯ কথান্ত

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অবিচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং বন্দরগুলি বিকশিত হয়ে ওঠার কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল আদি-মধ্যযুগের সূচনায় পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। তবে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের দৃঢ়ীকরণের ফলে বড় বড় রাষ্ট্রজোটের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এর পরিবর্তে ছোট ছোট সামন্ততান্ত্রিক রাজার মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তার পরিণতিতে রাজনৈতিক ভাঙচুরই হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেশের চলতি দৃশ্যপট।

সমগ্র এককটিতে যে সকল রাজ্যের আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্র বলতে ছিল গৌড় (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা) রাজধানী কনৌজ সহ মৌখরী রাজ্য (দোয়াব বা গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ এবং গঙ্গানদী তীরবর্তী এলাকা) এবং রাজধানী থানেশ্বর সহ পুষ্যভূতি রাজ্য (উত্তর দোয়াব, বর্তমান দিল্লীর চারপাশের অঞ্চল)।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনার আগে হর্ষবর্ধনের রাজ্যই ছিল ভারত উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য। তবে এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ গুপ্তযুগের চেয়ে দূর্বল ছিল। সাম্রাজ্যের অল্প একটু অংশই ছিল কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন, অবশিষ্ট বৃহৎ অংশ শাসন করতেন সামন্তরাজপুরুষেরা। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিচালনার ব্যাপারে এই সামন্তরাজাদের ক্ষমতা ছিল প্রচুর। তদুপরি, হর্ষের সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তর ভারত ছাড়িয়ে আর বিস্তৃত হয় নি। এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় প্রায় ত্রিশ বছর।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় এবং অতঃপর কয়েক শতাব্দী জুড়ে টিঁকে থাকে বহুসংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য। এই সব রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি মোটামুটি বৃহৎ ছিল ঠিকই। তবে কোনোটিই মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মত ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়ে অবস্থিত ছিল না। দক্ষিণভারতে এ সময়ে যে প্রধান রাজ্যগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তারা হল চোল, চালুক্য, পল্লব ও পাণ্ড্যরাজ্য। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতের তিনটি প্রধান রাষ্ট্রশক্তি রাষ্ট্রকূট, পাল ও গুর্জর প্রতিহার রাজ্যই অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। এদের অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত ছোট সামন্তরাজ্যগুলির শক্তি ও সামর্থ্য ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা ভূতপূর্ব শাসক রাজ্যগুলিকে হীনবল ও উচ্ছেদ করতে থাকে। গুর্জর-প্রতিহার অধিকৃত ভূখণ্ডে তখন স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল পরমার, চন্দেল্ল, গুহিল, চৌহান এবং চালুক্য বা সোলাঙ্কি রাজবংশ শাসিত রাজ্যগুলি। তেমনই পালবংশ শাসিত ভূখণ্ডও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে সেনবংশ। চৌহান রাজবংশ রাজত্ব করতেন পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলীয় রাজস্থানে ও গুজরাটের অংশবিশেষে। পরমারদের মূলভিত্তি ছিল মালবদেশে। তবে একাদশ শতকের মাঝামাঝি পরমার রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। চন্দেল্ল রাজ্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় বুন্দেলখণ্ড। মধ্য ভারতে সামন্ত কলচুরি (হেহয়) রাজ্য আগে ছিল রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধীন সামন্তশাসিত প্রদেশমাত্র, সে রাজ্যও আলোচ্য সময়ে স্বাধীন হয়ে ওঠে এবং ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তার স্বাধীন অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখে। অপরদিকে চালুক্য বংশ দৃঢ়ভাবে গুজরাটে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

পল্লব এবং পাণ্ড্যরাজ্য দুটির অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগে চোলদের তামিল রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে চোল রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় ক্রমে মাথা তোলে স্বাধীন সামন্তরাজ্যসমূহ। সরকারীভাবে চোল রাজ্যের অধীন হলেও কেন্দ্রীয় শক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই পরস্পরের মধ্যে ইচ্ছামত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধিস্থাপনের কাজ চালাতে থাকে তারা। ক্রমে ক্রমে দক্ষিণভারতে স্ব-প্রধান হয়ে ওঠে দ্বারসমুদ্রের হোয়েসল, দেবগিরির যাদব ও বরঙ্গালের কাকতীয় রাজবংশ এবং তামিলনাড়ুর দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজবংশ। এইভাবে দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে চোলরা শেষ পর্যন্ত তাঞ্জোর এলাকায় নগণ্য একটি সামন্তরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে পড়েন। উত্তর ভারতে এই সময় রাজ্য ভাঙাভাঙির পালা আরও তীব্র বেগে চলে। সেখানে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলে চৌহান ও গহড়বাল রাজবংশের মধ্যে। দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতে কেবলমাত্র একটিই বড় আকারের রাজ্য থেকে যায়, তা হল বঙ্গদেশের সেনরাজ্য। একাদশ শতক থেকেই ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মুসলমান আগ্রাসন

শুরু হয়। মুসলমান আক্রমণ এবং সামন্ত-বিদ্রোহের চাপ সত্ত্বেও সুবিশাল সেন রাজত্ব ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

১.১০ অনুশীলনী

১। গুপ্তোত্তর যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কি জানেন?

২। গৌড় রাজ্যটি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন। শশাঙ্কের রাজত্বকালে গৌড়ের সীমা কতদূর বিস্তৃত হয়?

৩। হর্ষবর্ধন কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার বর্ণনা দিন।

৪। বাংলার পাল বংশ ও সেনবংশ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৫। দাক্ষিণাত্য বলতে কোন্ অঞ্চলটিকে বোঝায়? এখানকার প্রধান রাজশক্তিগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৬। দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলি সম্পর্কে যা জানেন লিপিবদ্ধ করুন।

১.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। R. G. Basak — North East India.

২। Dr. R. C. Majumdar — Classical Age.

৩। Dr. R. C. Majumdar — Ancient India.
— History of Bengal.

৪। R. D. Banerjee — বাংলার ইতিহাস

৫। N. K. Shastri — History of South India.

একক ২ ☐ রাজপুতানার সমাজ ভাই—বন্তপ্রথা

গঠন

২.০ প্রস্তাবনা

২.১ ভৌগোলিক অবস্থান

২.২ রাজপুত জাতির উদ্ভব

২.৩ রাজপুত জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী

২.৪ রাজনৈতিক ইতিহাস

২.৫ রাজপুতানার সমাজ

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ প্রস্তাবনা

হর্ষবর্ধনের মৃত্যু এবং ভারতে মুসলমান-আধিপত্যের মধ্যবর্তী কয়েকটি শতাব্দীকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'রাজপুত যুগ' নামে আখ্যাত করা যেতে পারে। এই সময় রাজপুতদের উত্থান ঘটে এবং তারা সমগ্র উত্তর ভারতে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। অবশ্য এই রাজপুত যুগ কথাটি একটি সামাণ্যীকরণ মাত্র, কারণ এই যুগে নেপাল, কাশ্মীর, কামরূপ প্রভৃতি অ-রাজপুত রাজ্যগুলিরও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বস্তুতঃ আলোচ্য সময়ের ঐতিহাসিক মানচিত্রে রাজপুত জাতির বীরত্ব ও প্রভাব বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, যার রাজনৈতিক অর্থবহতা অপরিসীম।

'রাজপুত' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'রাজপুত্র' থেকে, যার বুৎপত্তিগত অর্থ 'রাজার ছেলে' বা 'যুবরাজ'। তবে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের যোদ্ধৃ-সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করতে ইতিহাসে 'রাজপুত' কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। ১৯১১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট অনুসারে, রাজপুতদের সংখ্যা ৯,৪৩০,০৯৫, অধিকাংশের বসবাস পাঞ্জাব, যুক্তরাজ্য এবং বাংলায়, তবে এদের মূল বাসস্থান হল রাজপুতানা অর্থাৎ বর্তমান রাজস্থান।

২.১ ভৌগোলিক অবস্থান

রাজপুতানা বা বর্তমান রাজস্থান ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রদেশ (২৩°৩´—৩০°১২´ উত্তর, ৬৯°৩০´—৭৮°১৭´ পূর্ব)। এর উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান, পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর-প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট। রাজপুতানা রাজ্যটি ইংরেজ অধিকৃত আজমীর-মৈরবাড়া ও কুড়িটি বিভিন্ন সামন্তরাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল। ভূ-পরিমাণ আন্দাজ ১৩২৪৬১ বর্গমাইল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে অবস্থিত সামন্ত রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপরিমাণ নিম্নে বিবৃত হল ঃ

পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত	বর্গমাইল
জয়সলমীর	১৬,৪৪৭
মারবাড় বা যোধপুর	৩৭,০০০
বিকানীর	২২,৩৪০
উত্তর-পূর্বে অবস্থিত	
আলবার	৩,০২৪
শেখাবতী	জয়পুরের অধীন
পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত	
জয়পুর	১৪,৪৬৫
ভরতপুর	১,৯৭৪
ঢোলপুর	১,২০০
করৌলী	১,২০৮
বুন্দী	২,৩০০
কোটা	৩,৭৯৭
ঝালবার	২,৬৯৪

দক্ষিণে অবস্থিত	বর্গমাইল
প্রতাপগড়	১,৪৬০
বাঁশবাড়া	১,৫০০
দুঙ্গারপুর	১,০০০
মেবার বা উদয়পুর	১২,৬৭০
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত	
সিরোহী	৩,০২০
মধ্যভাগে অবস্থিত	
আজমীর	২,৭১১
কিষণগড়	৭২৪
শাহপুরা	৪০০
টোঙ্ক	২,৫০৯
লাবা	১৮

আরাবল্লী পর্বতমালার মনোহর দৃশ্য ছাড়া এখানে দর্শনীয় আর কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষ কিছু নেই, পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশ মরুময় বলে এই স্থান পুরাণাদিতে মরুস্থলী বা মরুদেশ বলে বর্ণিত আছে। এই রাজপুতানা অঞ্চলটি আরাবল্লী পর্বতের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর দক্ষিণে বা দক্ষিণাংশে আবু পর্বতশিখর। প্রবাদ আছে যে, এখানে বশিষ্ঠ মুনি অগ্নিযজ্ঞ করেছিলেন।

মরুময় রাজপুতানায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। তাই সামান্য বৃষ্টিতেই কৃষিকার্য হয়ে থাকে। লোনী নদী ছাড়া এখানে জল সরবরাহের প্রাকৃতিক উৎস বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র ভূখণ্ডটি রুক্ষ, মরুময় হলেও রাজধানী বা নগরগুলি তুলনায় সমৃদ্ধিশালী। রাজপুতানার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বিন্ধ্যগাত্রবিধৌত শাখানদীসমূহ বনাশ ও চম্বল নদীদ্বয়ে মিলিত হয়ে উত্তরপূর্বাংশকে সুজলা-সুফলা করে তুলেছে। পূর্বদিকে ঝালরা-পাটনের উত্তরে প্রস্তর শৈলের উপত্যকাপ্রদেশ। এর ওপর কোটা রাজ্য অবস্থিত। এখানে লোনী, বাণগঙ্গা, বনাশ, চম্বল, পার্বতী, সাবরমতী, মহী, সোম প্রভৃতি নদী বর্তমান। লবণাক্ত

জলপূর্ণ সম্বর হ্রদ ছাড়া মেবাররাজ্যে কয়েকটি কৃত্রিম হ্রদ দেখা যায়। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজা জয়সিংহ নির্মিত দেবার ও কাঙ্করোলি নামক নগরে দুইটি হ্রদ আছে। প্রথমোক্ত জলাশয়টি 'জয় সমুন্দর' নামে খ্যাত, পরিধি ৩০ মাইল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম প্রাচীন রাজপুতানার তিনটি বিভাগ নির্দেশ করেছেন। এর পশ্চিম বিভাগে রাঠোরগণ শাসিত বিকানীর ও মারবাড় প্রদেশ, যদুবংশী ভট্টি পরিচালিত জয়সলমীর রাজ্য, কচ্ছবাহদের জয়পুর ও শেখাবতী প্রদেশ এবং চৌহান সম্প্রদায়ের আজমীর রাজ্য ; পূর্ববিভাগে নরুক-কচ্ছবাহদের আলবার রাজ্য, জটিরাজদের ভরতপুর ও ঢোলপুর রাজ্য, যাদবগণের করোলী রাজ্য, এছাড়া ইংরাজ অধিকৃত গুরগাঁও, মথুরা, আগ্রাজেলা এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের উত্তরাংশ একসময় রাজপুতদের অধিকারে ছিল। দক্ষিণবিভাগে চৌহানদের অধিকৃত বুন্দী, কোটা, মেবার ও মালবরাজ্য অবস্থিত ছিল।

রাজস্থানের প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা করলে জানা যায় যে, আলবারের আরাবল্লী পর্বতমালা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগের পশ্চিমাংশে মৎস্য, পূর্বে শূরসেন ও দক্ষিণে দশানরাজ্য ছিল। বর্তমান আলবার, জয়পুর, ভরতপুর, বৈরাট ও মাচারী প্রদেশ সেই প্রাচীন মৎস্যদেশের অন্তর্গত। কর্নান, মথুরা ও বায়ানা প্রদেশ শুরসেনের অন্তর্গত। এর পূর্বদিকে অন্তর্বেদী ও রোহিলখণ্ড নিয়ে পাঞ্চালরাজ্য। এই শুরসেনগণ যাদব বা যদুবংশী নামে খ্যাত। শূরসেনগণের অধিকৃত বিস্তীর্ণ রাজ্যের কতকাংশ করোলীর যাদব রাজার অধীন ছিল। গুপ্তরাজবংশের অভ্যুত্থানে যাদব বংশীয় রাজপুতগণ কিছুকাল হীনবল হয়ে পড়েছিল। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ মথুরাধিপতিকে শূদ্রবংশীয় বলে উল্লেখ করেন। কয়েক শতক পরে যাদবগণ পুনরায় রাজপুতানার পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তার করেন।

২.২ রাজপুত-জাতির উদ্ভব

রাজপুতদের মূল উৎপত্তি বা শিকড়ের সন্ধানে বহুদিন ধরে ঐতিহাসিকগণ নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। এদের বংশপরিচয় এবং আদি বাসস্থান সনাক্তকরণের প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকায় কোনো সুনির্দিষ্ট সিধান্তে পৌছানো এখনও সম্ভব হয় নি।

কবি চাঁদ বরদাই তাঁর 'পৃথ্বীরাজ রস' কাব্যে একটি উপকথা লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, আবু পর্বত-শিখরে ঋষি বশিষ্ঠের যজ্ঞবেদীর হোমাগ্নি থেকে পরমার, চৌহান, প্রতিহার এবং

সোলাঙ্কি বা চালুক্য রাজপুত গোষ্ঠীর উদ্ভব। এটিই 'অগ্নিকুল' মতবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু রাজপুতদের অগ্নিকুলোজাত হিসাবে মানতে ড. ভাণ্ডারকার রাজী নন। তাঁর মতে, এই মতবাদ রাজপুতদের বৈদেশিক বংশধারাকেই সমর্থন করে, কারণ তাদেরই অগ্নিশুদ্ধির দ্বারা পবিত্র করে তবেই সমাজে স্থান দেওয়া হত।

কর্নেল টডের মতে, রাজপুতগণ শক, হূণ, কুষাণ ও গুর্জরদের উত্তরসূরী যারা ক্রমাগত হিন্দু আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে শেষপর্যন্ত হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয়। উইলিয়ম ক্রুক এবং ভি. স্মিথ টডের মতবাদকে সমর্থন করেছেন জোরালোভাবে।

কিন্তু গৌরীশঙ্কর ওঝা তাঁর 'History of Rajputana' গ্রন্থে রাজপুতদের অভারতীয় বা বিদেশী বংশোদ্ভুত জাতি রূপে স্বীকার করেন নি।

যাইহোক, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভারতীয় ইতিহাসের চালচিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আর্য বা আর্য-বৌদ্ধ প্রভাবিত ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি তখন সমাপ্তপ্রায়, তার স্থলে আসন পাতা হয় হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির। একমাত্র দু'একটি প্রদেশে (যেমন মগধ) বিচ্ছিন্নভাবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র বৌদ্ধ প্রতিপত্তির দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল এই নবম শতকের গোড়ায়। বৈদিক আর্য সংস্কৃতির প্রভাবও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। রাজপুতগণ ভারতীয় সংস্রবে এসে নিজেদের সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও অগ্নিকুল সম্ভূত বলে প্রচার করতে থাকেন। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, একসময় শাকদ্বীপবাসী (Scythia) শকনৃপতিগণ ভারত সীমান্ত অধিকারপূর্বক শকপ্রাধান্য স্থাপন করেন। এই শকগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। মনুসংহিতার ১০৪৩-৪৪ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণোভাবে তাঁরা বৃষলত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হরিবংশ ও পুরাণাদির মতে, সগর হৈহয়দেরকে বিনাশের দ্বারা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলে, শকগণ বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করে। বশিষ্ঠের কথায় সগর শকদের মাথা মুণ্ডিত করে ছেড়ে দেন। কিন্তু সুদূর শাকদ্বীপবাসী চাতুর্বর্ণ্য সমাজভুক্ত শকক্ষত্রিয়গণ এরূপ নিগৃহীত হন নি। তাঁরা বহুকাল পর ভারতে প্রবেশ করে ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে কুটুম্ব সম্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারের বর্ণিত চতুর্বর্ণের অন্তর্গত দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণের কোনো অস্তিত্ব ভারতে নেই। সেই অর্থে প্রকৃতপক্ষে রাজপুত জাতি ভারতীয় প্রাচীন আর্যক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত নন। কারণ তাঁরা চতুর্বর্ণের অন্তর্গত ক্ষত্রিয়কুলজাতদের বংশধর ছিলেন না। কিন্তু

ব্রাহ্মণদের সহায় হয়ে যে সকল বাহ্লীক বা শক ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, তাদের যুদ্ধনীতি কুশলতা লক্ষ্য করে অনুগ্রহপরবশ হয়ে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের প্রতি ক্ষত্রিয়ত্ব আরোপ করে ক্ষত্রিয়ের আসন দান করেছিলেন। এই কারণেই ব্রাহ্মণেরা সূর্য ও চন্দ্র বংশের ন্যায়-শকদের বৈদেশিক উৎপত্তিবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না করে অগ্নি থেকেই এই ক্ষত্রিয়কুলের উৎপত্তি স্বীকার করে নিয়েছেন।

রাজপুত ইতিহাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ টড্ লিখেছেন যে, জাট, তক্ষক ও অসি প্রভৃতি শকগণ খ্রিস্টজন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতে এসে উপনীত হয়েছিলেন। ভারতীয় হিন্দুগণের সংস্রবে পড়ে তাঁরা ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। এমন কি, ক্রমে নিজেদের পূর্বতন সংস্কার পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দু আচারবিধির অনুকরণ করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা 'মহাক্ষত্রপ' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নিজেদের হিন্দুক্ষত্রিয় বলে পরিচিত করতে বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কনিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি শককুষাণ বংশীয় কোনো কোনো নরপতি 'দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার করতেন। সেই 'দেবপুত্র' সম্ভবতঃ 'রাজপুত্র' হয়ে পড়ে, যা থেকে শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের 'রাজপুত' নামের উৎপত্তি। ঐতিহাসিক টড্ বলেন, রাজপুতানায় আসার আগে রাজপুতরা জাবুলিস্তান ও গান্ধারে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা শকবংশসম্ভূত হলেও হিন্দুক্ষত্রিয় বলে গণ্য হতেন। ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভৌগোলিক ইতিহাসবিদ মাসুদী কান্দাহারকে (গান্ধার) রাজপুত-রাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কিদারকুষাণ বংশীয় শাহীরাজ হূণগণকে পরাজিত করে গান্ধার অধিকার করেন। খ্রিস্টীয় দশম-শতক পর্যন্ত গান্ধার রাজ্য কুষাণ বংশের অধিকারে ছিল। আলবিরুনী কিদারবংশীয় রাজগণকে কণিষ্করাজের বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি রাজতরঙ্গিনীকার কলহনের মত এই কিদারবংশকে তুরুকবংশোদ্ভূত অথচ কাবুলের হিন্দুরাজা বলে ঘোষণা করেছেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের একখানি শিলালিপি থেকে জানা যায়, শকরাজপুতগণ যাদব-পরিবারে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করে ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হয়েছেন। গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্লট ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অর্থ বলে কিদাররাজের হাত থেকে গান্ধাররাজ্য কেড়ে নেন। পরে কিদারবংশ পুনরায় প্রবল হয়ে গান্ধার রাজ্য উদ্ধার করেন। ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে এই রাজবংশের পতন হয়। এই রাজবংশের সঙ্গে কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়রাজগণ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন। কাশ্মীরের অনেক রাজমহিষী এই গান্ধাররাজবংশসম্ভূতা। এই গান্ধার রাজবংশ জঞ্জুহরাজপুত বলেও গণ্য হতেন। টডের মতে, গান্ধারের শকবংশীয় রাজপুতশাখাই রাজপুতানায় আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই শকগণ প্রথমে সূর্যোপাসক ছিলেন। মগ আচার্য জরথুষ্ট্র কর্তৃক অগ্নিপূজাপ্রচার ও পারস্য অধিপতি গণ কর্তৃক তার অবলম্বনে সৌর শকগণ অগ্নিপূজক হন। ভারতে যে সকল শকমুদ্রা পাওয়া গেছে, তাতে সূর্য উপাসনা ও অগ্নিবেদীর চিত্র দেখা যায়। ভারতেও তাঁরা প্রথমে সৌর ও অগ্নিপূজক বলে গণ্য ছিলেন। তাই তাঁদের বংশধর রাজপুতগণ পূর্বপুরুষদের ক্ষীণধর্মস্মৃতির পরিচায়কস্বরূপ নিজেদের সূর্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোদ্ভব বলে পরিচিত করান।

ব্রাহ্মণসহায়ে শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁদের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করার তাগিদে ব্রাহ্মণ ও ভট্টকবিগণ বশিষ্ঠকর্তৃক অগ্নিকুলোৎপত্তির কাহিনী প্রচার করলেন এবং কালক্রমে এই কাহিনীই প্রকৃত বিবরণ বলে রাজপুতসমাজে গৃহীত হয়। ভবিষ্যপুরাণেও দেখা যায়—"অগ্নিজাত্যা মগাঃ প্রোক্তাঃ সোমজাত্যাঃ দ্বিজাতয়ঃ" অর্থাৎ শাকদ্বীপীয় মগগণ অগ্নি হতে উৎপন্ন। এইরূপে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণও 'অগ্নিকুল' বলে পরিচিত হন। এখন আর রাজপুতগণ নিজেদের শক বংশীয় বলে মনে না করলেও টড্ নানা প্রমাণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে, এখনও রাজপুতদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও উৎসবাদিতে ওতপ্রোতভাবে শকপ্রভাব বিদ্যমান আছে।

২.৩ রাজপুত জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী

রাজপুতগণের মধ্যে সূর্যবংশীয় জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা তিনটি।

(১) গ্রহিলোট বা গ্রিহেলোট—এর চব্বিশটি শাখার মধ্যে শিশোদীয়গণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। উদয়পুর বা মেবারের রাণারা গ্রহিলোট ছিলেন।

(২) রাঠোর—কথিত আছে এই রাঠোরগণ রামের পুত্র কুশের উত্তরসূরী। এদের চব্বিশটি শাখা বর্তমান।

(৩) কচ্ছবাহ—এরাও কুশের বংশধর বলে বর্ণিত। এদের অন্তর্গত বারোটি 'কটরি' বা পরিবার আছে। জয়পুরের রাজা কচ্ছবাহ জাতিভুক্ত ছিলেন।

চন্দ্রবংশীয় রাজপুতগণ আটটি শাখায় বিভক্ত, তার মধ্যে কচ্ছের ঝারিজ এবং জয়সলমীরের ভট্টিগণ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। চন্দ্রবংশীয়গণ যদুকেই আদিপুরুষ রূপে কল্পনা করেন। অগ্নিকুল রাজপুতগোষ্ঠী চারটি উপজাতিতে বিভক্ত এবং এদের সাতাশিটি শাখা রয়েছে, যথা—

(১) পরমার—৩৫টি শাখা

(২) পরিহার—১২টি শাখা

(৩) চৌলুক্য—১৬টি শাখা

(৪) চৌহান—২৪টি শাখা

ছত্রিশটি রাজ-উপজাতির বংশপরিচয় সঠিকভাবে জানা যায় না, এরা হল চৌরা, তক্ষক, জাট, হুণ প্রভৃতি।

২.৪ রাজনৈতিক ইতিহাস

চারটি অগ্নিকুল বা অগ্নিসম্ভূত রাজপুত জাতিগোষ্ঠী, যথা চৌহান, সোলাঙ্কি, পরমার বা পাওয়ার এবং পরিহার উপজাতি বর্তমানে উজ্জয়িনী থেকে রেওয়া (বেনারসের নিকট অবস্থিত) পর্যন্ত ভূখণ্ডে প্রধানতঃ বসবাস করে। এই রাজপুত জাতি আক্রমণকারী রূপে ভারতে প্রবেশ করলেও সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণগণের সহায়তায়, প্রাচীন ক্ষেত্রীদের এবং গ্রীক ব্যাকট্রিয়ানদের আনুকুল্য লাভ পূর্বক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অন্যান্য দুরূহ রাজকার্যে সফল হয়। জনশ্রুতি অনুসারে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল অনুরাগী রাজা বিক্রমাদিত্য পাওয়ার তা পরমার বংশজাত ছিলেন।

চহমান বা চৌহানগণ শুধু অগ্নিকুলেরই নয় সমগ্র রাজপুত জাতির স্তম্ভস্বরূপ বিরাজ করতেন। গাথাকারদের বীরত্বকীর্তনে এই জাতির চব্বিশটি শাখার অমর কীর্তিকাহিনী কালজয়ী হয়ে আছে। কথিত আছে চতুর্বাহুবিশিষ্ট যোদ্ধা চতুর্ভুঞ্জ বা চতুর্বাহের অংশ থেকে চৌহানদের উদ্ভব। এই বংশের সন্তান পৃথ্বীরাজ চৌহান রাজপুত তথা ভারতের ইতিহাসে সুবিদিত। চৌহানদের অবস্থান বর্তমান উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় প্রদেশগুলিতে, মালোয়া এবং রাজস্থানে।

পরিহার বা প্রতীহারগণ সমগ্র রাজস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। কোহারি, সিন্দ এবং চম্বলের মোহনায় এদের একটি উপনিবেশ আছে। এই উপনিবেশটি চব্বিশটি গ্রাম নিয়ে গঠিত। পরিহারদের রাজধানী ছিল মুন্দোদ্রি (প্রাচীন মন্দাবর) এবং এটি মেবারের প্রধান নগর ছিল। রাজস্থানের ইতিহাসে এদের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই।

রাঠোরগণ মূলতঃ কনৌজ অধিকার করে বহুদিন রাজ আধিপত্য কায়েম রাখতে পেরেছিল। রাঠোরগণ মারবাড় বা মেবারেও আধিপত্য বিস্তার করে। প্রকৃতপক্ষে, কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের (৬০৭-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুর পর দিল্লীতে তোমরগণ, খাজুরাহোতে বুন্দেলগণ, চিতোরে শিশোদীয়গণ, নরবার ও গোয়ালিয়রে কচ্ছবাহগণ মস্তক উত্তোলন করে রাজপুত শক্তির অমিতবিক্রম চারিদিকে

প্রসারিত করেন। অতঃপর মুসলমান শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে রাজপুতগণ নানা স্থানে চলে যেতে বাধ্য হন। রাজপুত জাতির এই উপনিবেশ থেকে সম্ভবতঃ বিভিন্ন কুল বা গোষ্ঠীর (পূর্বে আলোচিত হয়েছে) সৃষ্টি হয়েছে।

বিক্রমসংবতের প্রারম্ভ থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত রাজপুতগণ অপ্রতিহত প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আজমীর ও দিল্লীর অধীশ্বর পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্তৃক ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত হবার পর থেকে প্রকৃতপক্ষে রাজপুতের প্রাধান্য অপসৃত হয়ে মুসলমান আধিপত্যের সূচনা হয়।

গ্রীক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ম্যাসিডনীয় গ্রীক বীর আলোকজাণ্ডারের ভারত অভিযানকালে পাঞ্জাবের পার্বত্যপ্রদেশের কতোচ জাতীয় রাজপুতের বাস ছিল। ফিরিস্তার মতে, এঁরা কোট্‌কাংরায় রাজত্ব করতেন। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে খলিফা বালিদের রাজত্বকালে আরবগণ সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ পূর্বক সেই দেশের সুম্ম ও সুমরাবংশীয় রাজপুত রাজাদের পরাভূত করে। পরবর্তীকালে এই রাজপুতবংশের অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এখনও বালুচিস্তানের মধ্যবর্তী বালবান প্রদেশে রাজপুতজাতির বাস আছে। মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক বিজিত হবার পূর্বে রাঠোরগণ কনৌজ, সোলাঙ্কিরা অনহলবাড়ে, চৌহানেরা আজমীরে, কচ্ছবাহগণ জয়পুরে, শিশোদীয়গণ উদয়পুরে, গহলোট বংশ মেবারে পূর্ণ প্রতাপে রাজ্য চালাতেন। কাংড়া রাজের এবং জম্বুরাজের অধীনে অপর দুই দল রাজপুত ইরাবতী ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশে বসবাস করতেন। শেষোক্ত রাজপুতগণ জম্বুবাল নামে খ্যাত।

রাজপুতানার রাণা সঙ্গা, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি শিশোদীয় বীরগণ মোগল সম্রাট বাবর, আকবর প্রভৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, ইতিহাসে তা একটি অধ্যায় সংযোজিত করেছে। মোগল রাজ-সরকারেও মানসিংহ, জয়সিংহ বীরত্বের এবং আনুগত্যের নজির সৃষ্টি করেন।

২.৫ রাজপুতানার সমাজ

বর্ণ ও জাতিবিভাগ ঃ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল রাজপুতদের সামাজিক ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। এই দীর্ঘ পাঁচ-ছয় শত বৎসরকালের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন জাতি এবং গোত্র সমূহের অধিকাংশই সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে, সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে নতুন নতুন জাতি বা গোত্রভুক্ত শ্রেণি, যাদের উদ্ভব

সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। বংশাবলী এবং গাথাশ্রিত বিবরণ থেকে এদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। আদি-মধ্য যুগের লিপিমালা এবং প্রশস্তিগুলিতে শুধুমাত্র দাতার গোত্র এবং জাতির উল্লেখ রয়েছে, যা থেকে শুধুমাত্র অনুমান করা যেতে পারে, ঐ যুগে সমাজে হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথার অন্তর্গত জাতি গোত্র ব্যবহৃত হত এবং কালক্রমে গোত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উক্ত লিপি ও প্রশস্তিসমূহ বিভিন্ন রাজপুত জাতির স্থানান্তরে গমন ও বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের প্রসঙ্গেও পরোক্ষভাবে আলোকপাত করে।

আলোচ্য জাতিগোষ্ঠীসমূহের উদ্ভব হয়েছিল বিভিন্নভাবে। অধিকাংশই গঠিত হয়েছিল দেশীয় জনগোষ্ঠীকে নিয়ে, কিছু জনগোষ্ঠী বিদেশী এবং অবশিষ্ট অংশ ছিল, প্রাচীন উপজাতীয় জনগণ। বিভিন্ন প্রকার অসবর্ণ বিবাহের ফলস্বরূপ অসংখ্য নতুন জাতি সৃষ্টি হয়েছিল বলেও কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা।

প্রাচীন ক্ষত্রিয় সম্ভূত রাজপুতগোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে সকল জাতি তারা হল সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী বা যদুবংশী। এদের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী নিজেদের পৌরাণিক বীরের বংশধর হিসাবে দাবী করেন। অগ্নিকুল রাজপুত গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় আবুপর্বতশিখরের হোমাগ্নি থেকে। ঋষি বশিষ্ঠ এই হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল প্রতীহার, চহমান, পরমার ও চালুক্যগণ। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক নাগাদ বিভিন্নভাবে রাজপুত জাতিগুলির উন্মেষ ঘটে, কারণ এই সময়কালের পূর্বে তাদের কোনো অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রতীহারদের অধিকৃত অঞ্চল ছিল মান্দোর, জালোর, ভিনমল এবং রাজোর। চহমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী শাকম্ভরী, নডোল, আজমীর, রণথম্ভোর এবং জালোর প্রভৃতি রাজস্থানের নানা অংশে রাজত্ব করত। পরমারদের ক্ষমতার মূল কেন্দ্র ছিল মালোয়া তবে এদের কতকগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠী চন্দ্রাবতী, বাঁশওয়ারা, জলোর ও কিরাড়ুতে রাজত্ব করে। চালুক্যগণ আবু জয় করেছিল বলে জানা যায়। খ্রিস্টীয় দশম শতকে রাষ্ট্রকূটদের একটি শাখার রাজধানী স্থাপিত হয় হাথুণ্ডিতে। গুহিলগণ চটসু, নগদা, অহর, চিতোর এবং কিষ্কিন্ধ্যায় (কল্যাণপুর) তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল বলে জানা যায়। কচ্ছবাহরা অম্বররাজ্য শাসন করত। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত শূরসেন বা যাদবগণ বায়ানা এবং কামান অঞ্চল নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হয়।

সম্ভবতঃ পরমারদের একটি শাখা ছিল লোড্রা রাজপুত গোষ্ঠী। খ্রিস্টীয় দশম শতকে লোডোরভা নামক স্থানটিতে তারা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে 'লোডরা' নামে চিহ্নিত হয়। এই শতকেই যে রাষ্ট্রকূট রাজপুত গোষ্ঠী হস্তীকুণ্ডী নামক অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে তাদের উত্তরপুরুষ ছিল হাথুণ্ডিয়া রাঠোরগণ। শেষোক্ত এই গোষ্ঠীর উল্লেখ এয়োদশ খ্রিস্টীয় শতকের লেখাগুলিতে পাওয়া যায়। শাকম্ভরী, নডোলীয়, সোনীগারা, সাঞ্চোরা প্রভৃতি সুপরিচিত চৌহান উপজাতিগুলি ছিল তাদের নামগুলি প্রাচীন সম্বর, নডোল, জালোর, সঞ্চোর প্রভৃতি স্থানের নামানুসারে প্রদত্ত হয়েছিল। উক্ত স্থানগুলি এদের দ্বারা শাসিত হত। 'অহর' নামটির উৎপত্তি গুহিলদের অন্যতম গোত্র 'আহাদিয়া' থেকে।

ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত কিছু জাতির যে উল্লেখ বিভিন্ন উপাদানে পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় এঁরা কোনো না কোনো নগরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। খ্রিস্টীয় ৯২৫ অব্দে পুষ্করে প্রাপ্ত একটি লিপিতে পুষ্করণ ব্রাহ্মণদের উল্লেখ পাওয়া যায়, খুব সম্ভবতঃ এই শ্রেণির ব্রাহ্মণগণের আদি বাসভূমি ছিল পুষ্কর নামক স্থানটি। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই পুষ্করণ ব্রাহ্মণগোষ্ঠী কিন্তু পুষ্করে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ পরাশর ব্রাহ্মণদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। সাঞ্চোরা ব্রাহ্মণগণের মূল আবাসস্থল রূপে সাঞ্চোর নগরটি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ প্রতাপসিংহের একটি লিপিতে আচার্য রামকে 'সত্যপুরজ্ঞাতি' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। উক্ত আখ্যাটি নিঃসন্দেহে সাঞ্চোরা ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি জাতিকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীমাল নামক স্থানটিতে বসবাসকারী ব্রাহ্মণগণ শ্রীমালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন, এঁদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্বান এবং পণ্ডিত হিসাবে। 'পালি' ভাষায় পারঙ্গম বা পারদর্শী হবার জন্য পল্লিবাল ব্রাহ্মণগণ সমাদর লাভ করেন। রাজোরের নামানুসারে সেখানকার ব্রাহ্মণরা রাজোরিয়া ব্রাহ্মণ রূপে পরিচিত হন। নীলকণ্ঠের মতে, আলোয়ারের নিকটে রাজোর অবস্থিত ছিল। ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লিপি থেকে জানা যায়, রাজোরিয়া পরিবারের জনৈক পুরোহিত প্রভুর বদান্যতায় তোডরাইসিং নামক স্থানে একটি জলকূপ খনন করা হয়েছিল। 'গৌড়তি' অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা 'গৌড়' ব্রাহ্মণ নামে চিহ্নিত হতেন। গৌড়তির অন্তর্গত ছিল আজমীর, মরোঠ, সম্ভর এবং মকরণ। বর্তমানেও এই সকল অঞ্চলে প্রচুর গৌড় ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব আছে।

বৈশ্য জাতির উদ্ভব এবং উৎপত্তিকাল সম্পর্কে আদি-মধ্য যুগীয় রাজস্থানের ইতিহাস বিশেষ আলোকপাত করে না। বহু কীর্তি-কাহিনী সম্বলিত লোকগাথা এবং উপকথাভিত্তিক বিবরণে অবশ্য

বৈশ্যজাতির মহান বংশগরিমা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের আগে পর্যন্ত বৈশ্যজাতি বা তাদের গোত্রের উল্লেখ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে আলোচনা করলে মনে হয়, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক ও খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে এই বৈশ্য বর্ণান্তর্গত জাতিগুলির উদ্ভব হয়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে জৈনধর্মগুরু রত্নপ্রভসূরি ওশিয়া, শ্রীমাল এবং পালি নামক অঞ্চল পরিদর্শনকালে উক্ত স্থান তিনটির অধিবাসীগণকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন বলে কথিত আছে। এই জনগণ ওস্বাল, শ্রীমালী এবং পল্লীবাল জাতিতে পরিণত হয়েছিল। জৈনধর্মে দীক্ষিত হবার পর ওস্বালগণ সংখ্যায় বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় বেশ কয়েকটি গোত্র। যতি শ্রীপাল একটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেছেন যেখানে বৈশ্য ওস্বাল জাতির ৬০৯টি গোত্রের বর্ণনা আছে। শ্রীমাল জাতির প্রাচীন বংশলতিকায় দেখা যায় ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীমাল জাতির জনৈক টোড়া নামক বণিক ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে এক জৈন সন্ন্যাসী কর্তৃক আহূত হয়েছিলেন। ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে পল্লীবাল জাতির দেদা নামক ব্যক্তি মল্লিনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রাচীন লিপিসমূহ ও পাণ্ডুলিপিতে পোরবাল জাতিকে 'প্রাগভাট' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাগ্‌ভাট মেবারের অপর নাম [মেদপাট]। সম্ভবতঃ প্রাগভাট রাজ্যের জনগণ কালক্রমে প্রাগভাট নামে বা 'পোরবাল' নামে পরিচিতি লাভ করে।

৭৬৭ বিক্রম অব্দে লিখিত ইন্দ্রগধা লিপিতে একটি দানপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে প্রাগভট জাতির অন্তর্গত এক কুমারের তিন কন্যা (যথা দেউল্লিকা, তক-সুল্লিকা এবং ভোগিনিকা) জনৈক গুহেশ্বর নামক ব্যক্তিকে কিছু দান-ধ্যান করেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় দশম-শতকের পূর্বেই খাণ্ডেলা এবং বাঘেরা—এই দুই স্থানের নামানুসারে খাণ্ডেলবাল এবং ভাঘেরবাল জাতি আত্মপ্রকাশ করে। ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে রাজস্থানের খাণ্ডেলবাল জাতির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত জৈন মূর্তিলিপিদ্বয়ে (১২১৬ এবং ১৩০৮ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ) খাণ্ডেলবালদের উল্লেখ আছে। ভাঘেরবাল জাতি সম্ভূত আশাধর খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষদিকে মুসলমানগণের ভয়ে মণ্ডলগড় ত্যাগ করে ধারানগরী চলে যেতে বাধ্য হন বলে জানা যায়। উজ্জয়িনীর আর একটি জৈন মূর্তিলিপিতে বাঘেরবাল বা ভাঘেরবাল শ্রাবকদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং দেখা যায়, খাণ্ডেলবাল বা বাঘেরবাল জাতি মূলতঃ রাজস্থানে উদ্ভূত হলেও কালক্রমে তারা বহুদূর এমন কি মধ্যপ্রদেশেও বিস্তারলাভ করে।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের পূর্বেই দিদ্ওয়ানা অঞ্চলে মাহেশ্বরীর বণিকগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান হয়। পূর্ববর্তী সময়ে এদের 'দিড়ু' নামে অভিহিত করা হত। 'সিংহাসনবত্রীসী'—গ্রন্থে মহাজন-জাতির যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে এই 'দিড়ু' নামটি আছে। ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দের একটি লিপিতে বলা হয়েছে, দিড়ু পরিবারের মহাজন রল্লা ঘঘসা অঞ্চলে একটি বাপি বা কূপ খনন করিয়েছিলেন। বর্তমানে মাহেশ্বরী গোষ্ঠীর একটি শাখা 'দিড়ু মাহেশ্বরী' নামে পরিচিত। 'দিড়ু' বা 'দিড়ু' শব্দটি থেকে পরিষ্কার যে এদের উৎপত্তিস্থল 'দিদওয়ানা' নামক অঞ্চল। এইভাবে দেখা যায়, মেরটবাল, হরসৌর, নরৈনবাল, সাম্ভারিয়া এবং আজমীরা প্রভৃতি নানা বণিকশ্রেণির যে তালিকা পাওয়া গেছে তাদের প্রত্যেকটিই উক্ত নামগুলির সঙ্গো সাদৃশ্যপূর্ণ অঞ্চলের প্রাচীন বা আদি অধিবাসী। জৈন ধর্মাবলম্বী জৈসবাল জাতির উন্মেষ ঘটেছিল অবশ্য খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ জয়সলমীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর।

রাজস্থানের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এখানে মূল ক্ষত্রিয়বর্ণসম্ভূত কিছু জনগোষ্ঠী ছিল যারা জৈন ধর্ম গ্রহণ করে বণিকশ্রেণিতে পরিণত হয়। সোনীগরা চৌহানগণ মূলতঃ সুবর্ণগিরি-র নামানুসারে পরিচিত ছিল কিন্তু সোনীদের সঙ্গো মিশ্রিত হয়ে যায়। সুবর্ণগিরি ছিল জলৌর দুর্গগিরি। হাথুন্ডিয়া রাঠোরগণ জৈন ধর্মগ্রহণ করে হাথুন্ডিয়া শ্রাবক নামে চিহ্নিত হন।

ধর্মীয় সাহিত্যের বিবরণ অনুযায়ী, অগ্রবাল জাতিগোষ্ঠীর আদিপুরুষ হলেন মহারাজ অগ্রসেন ; বহু প্রাচীন এই অগ্রবালগণ পাঞ্জাবের অগ্রোহা নামক স্থানে বসবাস করত, এই স্থানের নামেই তারা 'অগ্রবাল' নামে পরিচিত হয়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এই জাতির অস্তিত্ব ছিল এরূপ ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই। অষ্টম খ্রিস্টীয় শতকের পরবর্তী সময়ে অগ্রবাল গোষ্ঠী রাজস্থানে এসে বহু সংখ্যক দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকরণ অনুষ্ঠান করেন এবং বিভিন্ন সময়ে লেখা পান্ডুলিপিগুলির অনুকরণ পূর্বক সমাজে স্থান করে নেন।

'হুম্বার' নামক রাজপুত জাতিটির উদ্ভব সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। খুব সম্ভবতঃ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মতই কোনো বিশেষ অঞ্চল থেকে এদের অভ্যুত্থান হয়। রাজস্থানে এই হুম্বার জাতির জনগোষ্ঠীকে দেখা যায় দুঙ্গারপুর, বাঁশওয়াড়া এবং প্রতাপগড় অঞ্চলে যা প্রাচীন বাগড় প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এই জাতির লোকেরাও বহু বিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ১০৪৬ খ্রিস্টাব্দে ঝালরাপতন (Jhalrapatan) নামক স্থানে অবস্থিত বিখ্যাত শান্তিনাথ জৈনের মন্দিরটি এই জাতিভুক্ত শাহ পীপা নামক ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। রাজস্থানের

জাতিগোষ্ঠীর অন্যতম ধরকট্ জাতি মূলতঃ রাজস্থান-সঞ্জাত হলেও এদের অধিকাংশই বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে বসবাস করে। হরিষেণের বর্ণিত 'সিরিঞ্জপুরীয় থক্করকুল' কথাটি থেকে নাথুরাম প্রেমী অনুমান করেন যে, এরা সম্ভবতঃ টঙ্ক জেলার সিরোজ নামক স্থান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু অগর চাঁদ নাহাড়ার মতে, ধরকট্ গোষ্ঠীর উৎপত্তি ধকড়গড়হা নামক স্থানে, এই একই উৎস থেকে মাহেশ্বরী জাতির ধকড় শাখারও উদ্ভব হয়। দুটি প্রশস্তিতে বর্ণিত তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি উক্ত ধকড়গড়হা স্থানটির অবস্থান নির্দেশ করেছেন ভিন্‌মল এর নিকটে। 'ধম্মপরিক্‌খা' নামক গ্রন্থের লেখক হরিষেণ ধরকট্ জাতিভুক্ত ছিলেন, তাঁর সময়কাল খ্রিস্টীয় দশম শতক। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দেলবাড়া স্থানে প্রাপ্ত একটি লিপিতে এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন মোধেরা নগর-এর নামানুসারে শ্রীমোধ জাতির আত্মপরিচয় নির্দিষ্ট হয়। এই মোধেরার অবস্থান গুজরাটের অনাহিলবাড়ের দক্ষিণে। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং বণিক সম্প্রদায় এই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যকার হেমচন্দ্র সুরি শ্রীমোধ জাতির লোক ছিলেন। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে লিপিগুলিতেও এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রশাসনের উচ্চস্তরে বিভিন্ন শাখায় কায়স্থগণ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হতেন। রাজ্যের সাধারণ প্রশাসন থেকে শুরু করে বিচার-বিভাগীয়, আইন-সংক্রান্ত এমন কি রাজকোষ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের অবাধ বিচরণ ছিল। এই কায়স্থগণ, রাজস্থানের প্রশাসনিক-ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন—মাথুর কায়স্থগোষ্ঠী এবং নইগম-কায়স্থগোষ্ঠী। পরমার শাসক অর্থুনার বিজয়রাজের মন্ত্রী বামন-কায়স্থ গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে নহড়ে প্রাপ্ত একটি লিপিতে নৈগম কায়স্থ পরিবারজাত, তালহা নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা ঘটে চৌহান শাসক বিগ্রহরাজদেবের রাজত্বকালে।

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে রাজস্থানে যে বিরাট সংখ্যক জাতিগোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটেছিল, ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতীহার, চৌহান প্রভৃতি শাসক রাজপরিবারগুলি সুসংহত শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে প্রজাদের শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান : রাজস্থান বা প্রাচীন রাজপুতানার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমানকালে বিতর্কিত প্রথা হল সতী-প্রথা বা সতীদাহ প্রথা। মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতাগ্নিতে তার বিধবা স্ত্রীর আত্মাহুতি-র যে প্রথা রাজস্থানের সমাজে প্রচলিত ছিল তাকেই 'সতী'-প্রথা নামে আখ্যাত করা

হয়। রাজস্থানের বহু গ্রাম এবং অন্যান্য অঞ্চলে সতী বেদী এবং সতী-স্তম্ভের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলিতে লিপি উৎকীর্ণ করা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভিশপ্ত সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কে ঐতিহাসিক আলোচনা করার প্রয়োজনে উক্ত লিপিগুলিতে বর্ণিত তথ্যসমগ্রের কোনো ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা হয় নি।

১০৬ বিক্রমাব্দ বা ৪৯ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ পুষ্কর লিপিটি হল সর্বপ্রাচীন এবং সম্ভবতঃ একমাত্র লিপি যেখানে মৃত স্বামীর চিতায় এক সদ্যবিধবা ব্রাহ্মণ-রমণীর আত্মাহুতির তথ্য বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এই লিপিবর্ণিত তথ্য বিবরণের সত্যতা বা যাথার্থ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত নন, সেইজন্য উক্ত পুষ্কর লিপিতে উল্লিখিত সতী সংক্রান্ত তথ্য ঐতিহাসিক সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু এ ছাড়া খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অন্য কোন লিপিমালায় সতী প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে সপ্তম ও অষ্টম খ্রিস্টীয় শতক নাগাদ স্থাপিত যে সকল স্মারক বেদী নাগৌরের ছোটু-খন্টু নামক স্থানে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলিতে শুধুমাত্র কোনো মহিলার মৃত্যুসংবাদই উৎকীর্ণ করা হয়েছে, ব্রতী প্রথার কোনো ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ হয় নি। যাইহোক, রাজস্থানের বাইরে এরান এবং নেপালে অবস্থিত সতী বেদী বা সতীস্তম্ভে বহু যুগ আগেই সতীপ্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরানের সতী বেদিকাটি ৫১০-১১ খ্রিস্টাব্দে এবং নেপালের বেদিকাটি ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়।

রাজপুত জাতিগোষ্ঠীর অধিকাংশের মধ্যে সতী প্রথার প্রচলন সম্পর্কে খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সময়ে উৎকীর্ণ লিপিমালাগুলিতে প্রচুর তথ্য সংযোজিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজপুত বসতির 'দিবালী' গুলিতে প্রাপ্ত লিপিভিত্তিক তথ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সতীপ্রথা অব্যাহতভাবে রাজপুত সমাজে প্রচলিত ছিল ; বিশেষতঃ খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক নাগাদ এই প্রথা রাজপুতদের সমাজ সংস্কৃতিতে একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছিল। অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে সতী প্রথার চলন খুব একটা ছিল না বলেই মনে হয়, অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ এ ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে। রাজপুতদের 'দেবালী' বা 'দিবালীগুলি বিভিন্ন রাজপুত বসতিতে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ওসিয়া (যোধপুর, বিক্রম সম্বাদ ৮৯৫), ঘটিয়াল (যোধপুর, ৯৪৭ বিক্রম সম্বাদ), বেরাসর (বিকানীর, ১১৬১ বিক্রম সম্বাদ), বদলু (যোধপুর, ১০৬৮ বিক্রম সম্বাদ), চরলু (বিকানীর, ১২০০ বিক্রম সম্বাদ, ১২৪১ বিক্রম সম্বাদ, ১২৪৪ বিক্রম সম্বাদ), মান্দোর (যোধপুর ১২১৩ বিক্রম সম্বাদ), পল (যোধপুর, ১২২২ বিক্রম সম্বাদ), পলরি (মান্দোর, পাঁচটি স্মৃতিসৌধ পাওয়া যায় ১২৩২

থেকে ১৫৬৪ বিক্রম অব্দের মধ্যে), রম্মি (নাগৌর, ১২৩৫ বিক্রম সম্বাদ), লোহারি (উদয়পুর, ১২৩৬ বিক্রম সম্বাদ), উনসতর (যোধপুর ১২৩৭ বিক্রম সম্বাদ, ১২৪৮ বিক্রম সম্বাদ), রেওয়াসা (শেখাবতী, ১২৪৫ বিক্রমাব্দের তিনটি সতীসৌধ), কোলয়ৎ (বিকানীর, ১২৫৩ বিক্রম সম্বাদ) এবং বিভিন্ন অঞ্চল।

দেবালী বা সতী সৌধগুলির নিম্নভাগে খোদিত লিপিতে সাধারণতঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তাঁর নামের সঙ্গে উক্ত ব্যক্তির বিধবা পত্নী বা পত্নীগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হত। এই বিধবা পত্নীগণ, বলা বাহুল্য, 'সতী' রূপে স্বামীর চিতায় সহমরণপূর্বক লিপিতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। দেবালীর উর্ধ্বাংশে অশ্বারূঢ় একটি মানুষের আকৃতি বিদ্যমান যার উদ্যত হাতে উন্মুক্ত তরবারি এবং এই পুরুষকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে করজোড়ে এক বা একাধিক সতী রমণীর দণ্ডায়মানা। অপর এক প্রকার 'দেবালী' বা সতীসৌধ শুধুমাত্র মৃত এবং দাহকার্য নিষ্পন্ন হয়েছে এমন ব্যক্তির নামই শুধু মাত্র উল্লেখ করেছে, কিন্তু তাঁর চিতায় যে সকল রমণী আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে নীরব। তবে দেবালীগুলিতে খোদিত ভাস্কর্যে অবশ্য সতী প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সতী-সৌধ বা দেবালীর আর একটি ধরণ পরিলক্ষিত হয় উদয়পুরের লোহারি নামক স্থানে ১২৩৬ বিক্রম অব্দ বা ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত সতীস্তম্ভে। এই স্তম্ভের নিম্নাংশে প্রাপ্ত লিপিতে সাতজন সতী নারীর নাম পাওয়া যায় যাঁরা তাঁদের স্বামীর চিতায় সহমরণে গমন করেন। এই সতী-স্তম্ভের উপরাংশের চারটি ধার গোল আকৃতি বিশিষ্ট, একটি অংশে অশ্বারূঢ় এক মানবাকৃতি এবং সপ্তনারী তার নিকট দণ্ডায়মানা। চতুর্থ প্রকৃতির দেবালীটি ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দের, বিকানীরের কোলয়ত নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এখানে একজন মানুষ এবং এক সতীরমণী করজোড়ে দণ্ডায়মান।

সতীপ্রথার ব্যাপক প্রচলন এবং অনুশীলনের পশ্চাতে নানাবিধ যে সকল কারণ ছিল বলে অনুমান করা হয়, ১১০৪ খ্রিস্টাব্দে (বিক্রম সম্বাদ ১১৬১) উৎকীর্ণ বেরাসার গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপি তার একটির সন্ধান দিয়েছে। এই লিপি বর্ণিত বিবরণে দেখা যায়, একজন স্ত্রীলোক তার 'সুহাগ' রক্ষা করার নিমিত্ত 'সতী' হবার পথ বেছে নেয়। ধর্মবিশ্বাস মতে, এই সুহাগ রক্ষার মাধ্যমে ঐ সতী নারী শুধুমাত্র পার্থিব জগতেই নয়, পরলোকেও তার স্বামীর সহগামিনী হয়ে চিরন্তন অমরত্ব লাভ করবে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের কল্যাণপুর থেকে আবিষ্কৃত 'দেবালী'টিতেও অনুরূপ বর্ণনারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এখানে চন্দ্র ও সূর্যের পটভূমিতে নারী পুরুষের যুগল মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই স্বর্গীয় নারী-পুরুষ জগতের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন একত্রে সুখ ও আনন্দভোগ করবে, এইরূপই ধারণা করা হত। দেবালী-

উৎকীর্ণ লিপিগুলি পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, পুরোহিত শ্রেণি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রস্তরগাত্রে খোদিত লিপির মাধ্যমে স্বামীহারা নারীগণের সূক্ষ্ম ভাবাবেগ বা ধর্মীয় ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেবার প্ররোচনা দিতেন।

খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতক কাল পর্যন্ত সময়ে উৎকীর্ণ লিপিসমূহে ক্রমবর্ধমানভাবে 'সতী'র ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর প্রচলনের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে হিন্দু সমাজে নারীর স্থান অধিকারের কিভাবে ক্রমাবনতি ঘটেছিল তারই সূচক রূপে কাজ করে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের বিষ্ণুস্মৃতিতে, অষ্টম-শতকে রচিত কুবলয়মালা-য় এবং নবম শতকের মহাপুরাণে এর সমর্থিত তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, রাজপুতরমণীগণ তাঁদের স্বামী পরলোকগমন করলে অনন্যোপায় হয়েই আত্মাহুতির পথ বেছে নিতেন, কারণ স্বামীহারা রমণীদের সমাজে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করার কোনো উপায় ছিল না। কারণ অষ্টম শতকে লিখিত 'সমরাইচ্চকহা' এবং ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দের 'শ্রাবক-বসতদি-অতিচার' থেকে জানা যায়, এই নারীদের সম্পত্তির কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এই রচনা-দ্বয়ের বিবরণ অনুসারে, বিধবা নারীগণ শুধুমাত্র তাঁদের অলংকার এবং স্ত্রীধন-এর অধিকারী হতে পারতেন এবং পরিবারে স্বামীর পরবর্তী পুরুষ অথবা পুত্র অথবা খুল্লতাতের নিকট ভরণপোষণের দাবী জানাতে পারতেন। কিন্তু বাস্তব এতই কঠিন ছিল যে রাজপুত সমাজের পতিহীনা নারীগণ সেই বিড়ম্বিত জীবনের ভার হয়ে কালাতিপাত করার চেয়ে সতীর সহমরণকেই অনেক শ্রেয় বলে মনে করতেন। তবে যে রাজপুত বিধবা স্ত্রীলোকগণের নিরাপত্তা এবং সম্মানীয় জীবন যাপনের আশা এবং আশ্বাস ছিল, তাঁরা কিন্তু 'সতী'র পথে না গিয়ে পিতৃগ্রহে বা পুত্রের আশ্রয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করতেন।

অসংখ্য স্মৃতিসৌধ বা দেবালী, স্মৃতিস্তম্ভ বা বেদীর অবস্থান থেকে অবধারিতভাবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মূলতঃ রাজপুত অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে 'সতী'র প্রচলন ছিল। বস্তুতঃ খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে কিন্তু এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নি। প্রতিটি রাজপুত বিধবাই 'সতী' হতেন না বা সমগ্র রাজপুত জাতির প্রতিটি গোষ্ঠী বা উপজাতি এই প্রথাকে সমর্থন করতেন না। ১০৪২ খ্রিস্টাব্দের বসন্তগড় লিপিতে দেখা যায়, পরমার রাজপুতগণ সতীর অনুশীলন করতেন না; তাঁদের কোনো লিপিতে এমন কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না, যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, উক্ত রাজ্যে সতী প্রথার প্রচলন ছিল।

১১৮৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত অনভলদা স্মৃতিস্তম্ভটিকে (জাজপুর, ভিলওয়ারা জেলা) এইচ. সি. রায়, জি. এইচ. ওঝা প্রমুখ সতীস্তম্ভ বলে মনে করেন। কিন্তু জি. এস. ঘাই এই মতবাদ খণ্ডন করে

বলেছেন, এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে দোদ্য (পরমার রাজপুতদের একটি শাখা) প্রধান জেহদের মৃত্যুসংবাদ নয়, তিনি (জেহদ) একটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির (দেবকুলিক) স্থাপন করেছিলেন সেই তথ্যই লিপিবন্ধ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি লিপির উল্লেখ করা খুবই জরুরী। আলোচ্য যুগের এমন কয়েকটি লিপি পাওয়া গেছে যেখানে সতী প্রথার বিরুদ্ধে রাজপুত শাসকগোষ্ঠীর একাংশ এবং তাঁদের মহিষীগণের প্রতিবাদী মনোভাব সুপরিস্ফুট। পূর্বোক্ত বসন্তগড় লিপিতে দেখা যায়, রাজা পূর্ণপাল পরমার তাঁর ভগিনী রাণী লহিনীকে (তাঁর) স্বামী বিগ্রহরাজের মৃত্যুর পর 'সতী'-র অভিশাপ থেকে রক্ষা করে পরোক্ষভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, তৃতীয় পৃথ্বীরাজের মাতা কর্পূরদেবী 'সতী' থেকে বিরত হয়ে পুত্রের তত্ত্বাবধানে বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেন বলে জানা যায়। আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় আলোয়ার জেলার গড়হ্ নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি স্মৃতিপ্রস্তর লিপিতে (১১৮২ খ্রিস্টাব্দ)। এখানে বলা হয়েছে গুর্জর-প্রতীহার বংশীয় রাজা পৃথ্বীদের সবতের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা রাণী কৈলছদেবী সতী হবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েও তাঁর মন্ত্রীর উপদেশক্রমে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। লিপিমালার প্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয় সতীপ্রথা কোনো ধর্মীয় অনুশাসন প্রসূত আচার ছিল না। সেই কারণেই ভাগ্যবতী রাজপুত বিধবা নারীগণ সম্মানীয় জীবন যাপনের নিশ্চয়তা থাকলে সতী হবার আকাঙ্ক্ষাও করতেন না। লিপিভিত্তিক তথ্য থেকে আমরা আরও জানতে পারি খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে উদারমতাবলম্বী আলোকপ্রাপ্ত রাজপুতদের একাংশ সতী প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই প্রতিবাদ, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। এই সময়ে বাণভট্ট তাঁর 'কাদম্বরী' তে সতীদাহের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন এই প্রথার অনুশীলনে কোনো ধর্মীয় পুণ্যলাভ হয় না, এটি অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ সমাজের মানুষদের আচরিত একটি প্রথা। ঐতিহাসিক দশরথ শর্মার মতে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে জৈন ধর্মের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে সতীপ্রথা সমাজে তার নৈতিক সমর্থন হারায়। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিক এবং লিপিভিত্তিক তথ্যের পর্যালোচনা করলে এই মত মেনে নেওয়া শক্ত।

রাজস্থানের সামাজিক ব্যবস্থায় 'ভাই-বন্ত' নামে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। একে 'ভাইয়াচার'ও বলা হত। এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে একই পরিবারভুক্ত

সকল জ্ঞাতিকুটুম্বের অধিকারে থাকত। অর্থাৎ সেটির উপর কোনো একক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হত না, ঐ ভূসম্পদ ছিল পরিবার বা গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি। গ্রাম্য উপজাতিগুলি বংশপরম্পরায় যৌথ ভূ-সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারত।

রাজপুতজাতির সামাজিক ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এঁরা ধর্মনীতি, রাজনীতির সাথে সাথে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সমভাবে পালন ও রক্ষা করতে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং পর্বোৎসবে একত্র যোগদান দ্বারা পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন ও সহানুভূতি বৃদ্ধির প্রয়াস করতেন। রাজওয়াড়ার প্রধান প্রধান দেবালয়সমূহে রাণা প্রদত্ত ভূবৃত্তি ব্যতীত, ব্রাহ্মণগণ বণিক ও কৃষকদের নিকট থেকে কিছু কিছু দান পেয়ে থাকেন। একে 'মাপা' অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের নির্দিষ্টাংশ বলে। একলিঙ্গেশ্বর বা নাথজি বা নাথদ্বারমন্দির মেবারের প্রধান। বৈষ্ণবাচার্য বা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বল্লভাচার্য কর্তৃক সর্বপ্রথমে নাথদ্বারে নাথজি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে তিনি আরও ছয়টি বিগ্রহ এনে নাথদ্বারে স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর পৌত্র গিরিধারী ঐ সপ্তবিগ্রহ স্বীয় সপ্ততনয়কে দান করেন। তাঁদের উত্তরাধিকারীগণই এখন ঐ সকল মূর্তি পূজার অধিকারী। নাথদ্বারে নাথজি ব্যতীত অপরাপর মূর্তিগুলি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত হয়েছে—মথুরানাথ-কোটা, দ্বারকানাথ-কক্ষরৌলী, গোকুলনাথ বা চন্দ্র-জয়পুর, যদুনাথ-সুরাট, বিঠ্ঠলনাথ-কোটা ও মদনমোহন-জয়পুর। এই সপ্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতগণের মধ্যে কৃষ্ণার্চ্চনার বিস্তার ঘটে। বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় অবলম্বন করে রাজপুতগণ ক্রমে বল্লভাচার্য প্রবর্তিত অন্নকূট মহোৎসব প্রচলিত করেন।

প্রাচীন হিন্দু উপকথায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বর্ণগত দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিছু প্রভাবশালী ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণবর্গের অভিসন্ধি সম্পর্কে বিশেষ সন্দিহান ছিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র মূলতঃ ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন বলে কথিত আছে। ভক্তিমার্গের অর্থাৎ একেশ্বরবাদী ভাগবত ধর্ম উন্মেষের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, আচরিতব্য ক্রিয়াকলাপগুলি প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়েরই জন্য নির্দিষ্ট। অনুরূপভাবে, ব্রাহ্মণ বর্ণ গোষ্ঠীর একচ্ছত্র ধর্মাচরদের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে রাজপুতদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রবর্তন ও প্রসারণ হয়।

ব্রাহ্মণ্য বর্ণের প্রতি রাজপুত মনোভাব বিশেষ অনুকূল না থাকলেও যৌধ-সম্প্রদায় হিসেবে তাঁরা শক্তিপূজার প্রবল অনুরাগী ছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষের শক্তি আরাধনার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। রাজস্থানে বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন পন্থায় শক্তিপূজা অনুষ্ঠিত হত। শক্তিমাতৃকা

বা 'দেবী' রূপে কল্পিতা তাঁর নানারূপ কল্পনা করা হয়েছে, বিভিন্ন রূপ কল্পনায় শক্তির সাধনা করা হয়েছে রাজপুত অধ্যুষিত মরুদেশে। আমরা রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিপূজার যে তথ্য প্রমাণ পাই তা হল—কালী বা কালিকা (অচলপুর, আবু পর্বত শিখর, চিতোর, নাসিরাবাদ, আজমীর এবং অন্যান্য অঞ্চল), দুর্গা (বহু স্থানে পূজিত), চামুণ্ডা, (যোধপুর, যশবন্তপুর, ভিনমল, আজমীর এবং অন্যানা স্থানে পূজিতা), অষ্টভূজা (উদয়পুর জেলার একটি অঞ্চলে পূজিতা) এবং অম্বা ইত্যাদি। উপরিউক্ত পাঁচটি ভিন্ন রূপকল্পে দেবী শক্তির আরাধনা ছাড়াও কিছু স্থানীয় নামেও তিনি পরিচিতা এবং পূজিতা হতেন, যেমন—কালীমাতা, মোকালমাতা (বলি অঞ্চলে পূজিতা) পিপলাদমাতা (পিপারে পূজিতা), শচীয়ামাতা (ওসিয়ান ও কুকরিমাতা), শাকম্ভরী এবং আশাপুরীদেবী, কিনসরিয়া বা কৈরসমাতা (পর্বতসারে পূজিতা), খিমলমাতা (বসন্তগড়ে পূজিতা) কুইলাদেবী (করৌলির নিকট পূজিতা), সক্রাইমাতা (খাণ্ডেলার নিকট শেখাবতীতে পূজিতা), জিনমাতা (শিকারের নিকট রাইবাসাতে পূজিতা), সুমানমাতা (মোরখানায় পূজিতা), দধিমাতা (নগৌড় জেলার গোহমানগ্রোডে পূজিতা), শীলমাতা (অম্বর, জয়পুরে পূজিতা), চৌথমাতা (বারওয়ারা অঞ্চলে পূজিতা) প্রভৃতি। মাতৃকারূপে শক্তির পূজা যোধপুরের নিকট মান্দোর নামক স্থানে এবং অন্যান্য অঞ্চলে হত।

বস্তুতঃ রাজস্থানে শক্তিপূজার সূচনা হয় খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভিক পর্বে। জয়পুরের নিকট অবস্থিত প্রাচীন সাগর অঞ্চলে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের বেশ কতকগুলি পোড়ামাটির তৈরী মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। রাজস্থানের প্রায় সর্বত্র মহিষাসুরমর্দিনীর মর্মর মূর্তির অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজপুত শাসককুল থেকে সাধারণ মানুষ সর্বস্তরেই শক্তিপূজার প্রচলন ছিল। নালিয়াসার এবং রাইর-এ প্রাপ্ত পোড়ামাটির মাতৃমূর্তি এবং উৎসর্গীকৃত জলকূপ গুলিতে কুষাণ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত সময়কালের প্রচুর শক্তিমূর্তি এই দেবীর ব্যাপক আরাধনার ইঙ্গিত দেয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রাজস্থানে শক্তিপূজার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় গঙ্গানগর জেলার ভদ্রকালীতে প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনীর পোড়ামাটির মূর্তি থেকে। ৪২৩ খ্রিস্টাব্দের গঙ্গাধরলিপিতে তান্ত্রিক প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এই লিপি বর্ণিত তথ্য ইন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ করেছে যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে শক্তি উপাসনা ক্রমশঃ তান্ত্রিকতা বা তন্ত্র প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এইরূপে রাজস্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য লিপিতে শক্তি আরাধনার অজস্র উল্লেখ পাওয়া যায়, যা নিঃসন্দেহে এর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। প্রতাপগড়ের নিকট ঘোটারসিতে প্রাপ্ত বাটঅক্ষিণী মন্দিরলিপিতে উক্ত নামের এক দেবীর উল্লেখ রয়েছে। G. H. Ojha-র মতে, বাটঅক্ষিণী দেবী দুর্গারই নামান্তর।

রাজস্থানের চৌহান শাসকদের মধ্যে শক্তিপূজার চল ছিল ব্যাপকভাবে। এই বংশের শাসক দ্বিতীয় বিগ্রহরাজ খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষদিকে ব্রোচ (ভৃগুকচ্ছ)-এ আশাপুরীর মন্দির নির্মাণ করেন। রাজপুতানার প্রধান শৈব মন্দির হল একলিঙ্গজীর মন্দির। এই একলিঙ্গজী কৈলাসপুরী, কৈলাস পর্বত প্রভৃতি নামেও পরিচিত হতেন। এই মন্দির উদয়পুর থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন মেবারের রাণী, তিনি ছিলেন একাধারে যুবরাজ এবং পুরোহিত। একলিঙ্গজী 'দেওয়ান' রূপে তাঁরা পরিচিত হতেন। শিবের সঙ্গিনী দুর্গা 'মামা দেবী' বা দেবদেবীর মাতা নামেও পূজিতা হতেন।

রাজপুত বিশ্বাস অনুসারে, যাদব উপজাতির উপাস্য বীর হলেন কৃষ্ণ। তাঁর লীলাক্ষেত্র ছিল মথুরায়, মতান্তরে তাঁর বাসস্থান দ্বারকায়। উদয়পুরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে নাথদ্বারায় কৃষ্ণের বিগ্রহ-মন্দির দেখা যায়। কথিত আছে, আওরঙ্গজেবের হাত থেকে কৃষ্ণের বিগ্রহ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মথুরা থেকে সেটি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শিবের উপাসনার পাশাপাশি কৃষ্ণের সাধন-ভজনও রাজস্থানের সমাজে সমানভাবেই চলত। বলা বাহুল্য, সামগ্রিকভাবে কৃষ্ণ আরাধনার একটি শুভ প্রভাব রাজস্থানের সমাজে বিস্তৃত হয়।

রাজপুত সমাজে পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মানজ্ঞাপনের প্রথা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হত। শোকপালনের সময়ে মৃত পূর্বপুরুষগণের সমাধি পরিদর্শনপূর্বক তাঁদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎসর্গ করা রাজপুতদের প্রাথমিক সামাজিক কর্তব্যরূপে বিবেচিত হত। 'সতী'-বেদীতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাও সামাজিক আচারের অঙ্গ ছিল। এঁরা 'মহাসতী' নামে আখ্যাত হতেন।

রাজপুত জাতিগোষ্ঠীগুলির বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি গোষ্ঠীরই একজন রক্ষাকর্তা বা রক্ষক রূপে কল্পিত দেবতা ছিলেন—ইনি উক্ত গোষ্ঠীর উপাস্য দেবী বা দেবতা হিসাবে গোষ্ঠীভুক্ত সকল রাজপুত সদস্যের রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করেন এরূপ ধারণা করা হত। মেবারের শিশোদীয়গণের রক্ষাকর্তা (Tutelary deity) ছিলেন রাঠসেন বা রাষ্ট্রসেনা, সপ্তদেবতা নাগ্নেচ রাঠোরদের রক্ষা করতেন। বায়নমাতা ছিলেন চাবড়দের রক্ষাকর্ত্রী। কথিত আছে, ঘটনাচক্রে একবার জয়পুরের কচ্ছবাহদের হাতে রাঠোর দেবতা নিগৃহীত হন। ঐতিহাসিক টডের বর্ণনায় এই কাহিনীর সুন্দর ব্যঞ্জনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোটা রাজ্যের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের বা ব্রজনাথের অস্তিত্ব কল্পনা করা হত।

রাজপুতজাতির প্রধান পর্ব বা পার্বণ হল বসন্তপঞ্চমী। এই পঞ্চমী তিথি থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাজপুতজাতি একবারে উন্মাদমূর্তি ধারণ করে থাকেন। বসন্তপঞ্চমীর দুইদিন পরে ভানুসপ্তমী। এই দিন রাজপুতগণ সূর্যদেবের উপাসনা করেন। এরপর কালিসিদ্ধেশ্বরের শিবরাত্রি উৎসব। স্বয়ং রাণাকে দেবোদ্দেশে নিরম্বু উপবাসে থাকতে হয়। ফাল্গুনমাসে আহেরিয়া নামক বীরপর্বোৎসব। রাণা সামন্তবর্গে পরিবৃত ও বাসন্তী পরিচ্ছেদে ভূষিত হয়ে আনন্দিত হৃদয়ে মৃগয়ায় গমন করেন। এরপর আসে রাজপুতজাতির ফল্গু উৎসবের সমারোহ। এই সময়ে তারা পিতামাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, ভার্যা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন-পরিজন সকলকে উপেক্ষা করে, লজ্জা বিসর্জন দিয়ে পরস্পরে স্বেচ্ছামত আবীর দেয় এবং অসংবৃত আচার আচরণে মত্ত হয়ে ওঠে।

চৈত্রমাসের প্রতিপদ তিথিতে পিতৃলোকের পূজা, শুক্লা তৃতীয়ায় রাজনৈতিক উৎসব, অষ্টমী তিথিতে শীতলাদেবীর পর্বোৎসব, রাণার জন্মতিথি উৎসব, নব বর্ষারম্ভ, ফুলদোল বা পুষ্প উৎসব, অন্নপূর্ণা পূজা বা গান্ধোর, অশোকাষ্টমী, রামনবমী, মদন-মহোৎসব, সাবিত্রীব্রত, রম্ভার জন্মাহ, আরণ্য-ষষ্ঠী, গৌরীপূজা, নাগপঞ্চমী, রাখিপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, নবরাত্রি, খড়্গস্থাপন, দশেরা বা সমরোৎসব, জয়তোরণ, গণদেবতা পূজা, খান্ডাপূজা, গঙ্গার জন্ম, কার্তিকেয়ের জন্ম, চন্দ্রোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, দীপান্বিতা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও কার্তিকমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে উদয়পুরের জলযাত্রা পর্ব উল্লেখযোগ্য।

রাজপুতসমাজে প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদগুলিকে বিশেষ সম্মান জানানোর রীতি প্রচলিত ছিল। জলে নারিকেল বিসর্জন দিয়ে তার পূজা করা হত, কথিত আছে, বনাশ নদী হাত উত্তোলন করে সেই পূজা-উপচার গ্রহণ করত। এইরূপ আরও উপকথা রাজপুত ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। পুষ্কর হ্রদকে কেন্দ্র করে একটি রোমহর্ষক সর্প উপাখ্যান আছে। রাজপুত সমাজে 'নাগপঞ্চমী' উৎসব অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা হত। নাগবীরগণ যথা তিজাজি, গুগা এবং পীপার পূজা খুবই জনপ্রিয় ছিল।

পশুপক্ষী এবং বৃক্ষদেবতার উপাসনাও রাজপুতানায় প্রচলিত ছিল। গোসেবার পাশাপাশি বরাহ-কেও যথেষ্ট পবিত্র প্রাণী হিসাবে দেবতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ বরাহকে শস্যদায়িনী শক্তির আধার মনে করা হত। প্রেমের প্রতীক রূপে কল্পিত পারাবত বা পায়রাকে দানাশস্য ছড়িয়ে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রথা রাজপুতানায় ছিল। বুন্দীর রক্ষাকর্ত্রী দেবী আশাপূর্ণার প্রতিভূরূপে পিপ্পলগাছের কদর ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ভারতে যখন শক আধিপত্য বিস্তৃত হয়, তখন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শিব উপাসনা তখনও বিলুপ্ত হয় নি। ব্রাহ্মণদের প্রভাবে শকরা অধিকাংশই হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে শৈব হয়েছিলেন। পরে কণিষ্কের সময় থেকেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আস্থা বর্ধিত হয়। ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রিয় প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। সেই ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত করার জন্য নীতিকুশল ব্রাহ্মণগণ অভ্যাগত শকনৃপতিদের আশ্রয় বা শরণ নেন। শকরাজগণ ক্রমশঃ নিতান্তই গো-ব্রাহ্মণভক্ত হয়ে পড়েন, ব্রাহ্মণরা তাঁদের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। এই সকল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে।

২.৬ অনুশীলনী

১। রাজপুতানার ভৌগোলিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।

২। রাজপুত জাতির উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩। রাজপুত জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাম ও শাখাগুলির বর্ণনা দিন।

৪। রাজপুত সমাজে বর্ণ ও জাতিবিভাগ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৫। সতীপ্রথা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

৬। রাজপুতদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কি জানেন?

৭। রাজপুতদের ধর্মীয় দেবদেবী এবং ধর্মকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির বিবরণ দিন।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। The Indian Encyclopaedia—Vol. XIX.

২। James Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, Delhi, 1983.

৩। Shankar Goel (edited), Rajasthan From Pre-history to the Independence Era, Delhi, 2004.

একক ৩ ❑ বিজয়নগর—একটি বিভাজিত রাজ্য

গঠন

৩.০ প্রস্তাবনা

৩.১ রাজনৈতিক পরিচিতি

৩.২ রাজ্যবিস্তার

৩.৩ শাসনব্যবস্থা

৩.৪ আর্থ-সামাজিক ইতিহাস

৩.৫ সংস্কৃতি

৩.৬ সাম্রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা

৩.৭ বিজনগর ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ প্রস্তাবনা

একদিকে বাহ্মণি রাজ্য যখন প্রবল হয়ে উঠছিল তখন অপরদিকে রাজ্যটির দক্ষিণে বিশিষ্ট অবয়ব নিচ্ছিল অপর কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যও। এদের মধ্যে দুটি রাজ্যের নাম করতে হলে অবশ্যই মাদুরার সুলতানশাহী ও রেড়ি বংশীয় রাজ্যের কথা বলতে হয়। এর অল্পদিনের মধ্যে কাম্পিলী শাসনের জন্য মহম্মদ বিন্ তুঘলকের নিযুক্ত দুই শাসক-প্রতিনিধি ও সঙ্গাম রাজবংশের দুই ভাই হরিহর ও বুক্ক একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। তুঙ্গাভদ্রা নদীর তীরে তাঁরা শক্তিশালী বিজয়নগর দুর্গটি নির্মাণ করেন এবং কালক্রমে তাঁদের অধীনস্থ বিস্তৃত ভূখণ্ডটি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে পরিণত হয় (আনুমানিক ১৩৫০—১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ)।

৩.১ রাজনৈতিক পরিচিতি

দিল্লির সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে যখন সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ ও অরাজকতা চলছিল সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ উপকূলে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্ক মহীশূরের হোয়সল রাজ্যের বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন। বিজয়নগর রাজ্যে চারটি রাজবংশ রাজত্ব করে ঃ এরা হল যথাক্রমে সঙ্গাম বংশ, সালুব বংশ, তুলুব বংশ ও আরবিড়ু বংশ। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

৩.২ রাজ্যবিস্তার

সঙ্গাম বংশীয় বুক্কর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭—১৪০৪ খ্রিস্টাব্দ) সর্বপ্রথম রাজ্যসূচক উপাধি গ্রহণ করে। তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র মহীশূর, কানাড়া, ত্রিচিনাপল্লি ও কাঞ্চী বিজয়নগরের অন্তর্গত হয়। সঙ্গাম বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায় (১৪০৬—১৪২২ খ্রিস্টাব্দ)। যোদ্ধা ও শাসক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আমলে বিজয়নগর রাজ্য সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সালুব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন বীর নরসিংহ (১৫০৩—১৫০৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি বহমনীর সুলতান ও ওড়িশার রাজার যুগ্ম আক্রমণ প্রতিরোধ করে বিজয়নগরকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। নরসিংহ ছিলেন সুদক্ষ এবং প্রজাহিতৈষী শাসক। তুলুব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি ১৫০৯ থেকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন একাধারে সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করে তিনি পশ্চিমে কোঙ্কণ, পূর্বে বিশাখাপত্তনম এবং দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের সহিত সদ্ভাব বজায় রেখে চলেন এবং পর্তুগীজ গভর্নর আলবুকার্ককে ভাটখাল নামক স্থানে একটি নৌঘাটি নির্মাণের অনুমতি দেন। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সুদক্ষ শাসনের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনী রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর পাঁচটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের উৎপত্তি হয়। যথা—বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, বিদর, বেরার ও

আহম্মদনগর। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের এই পঞ্চরাজ্যের সহিত বিজয়নগরকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। তুলুব বংশীয় রাজা সদাশিব রায়ের আমলে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরের সঙ্গে সম্মিলিত দাক্ষিণাত্যের চারটি রাজ্যের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণা নদীর উত্তর তীরে তালিকোটা নামক স্থানে মুসলমান সৈন্য সমবেত হয় এবং এর ত্রিশ মাইল দূরে নদীর অপর পাড়ে বর্তমানকালের রাক্ষস ও তগদি গ্রামে এই যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে অবশ্য এই যুদ্ধ তালিকোটার যুদ্ধ নামেই পরিচিত। এই যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয় এবং বিজয়ী মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিজয়নগরে প্রবেশ করে প্রচুর ধনরত্নাদি লুণ্ঠন এবং রাজধানী বিজয়নগর ধ্বংস করে। তালিকোটার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুলুব বংশের পতন ঘটে এবং আরবিড়ু বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিরুমল। তিনি পেনুগোন্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং বিজয়নগরের বিনষ্ট গৌরব ও শক্তি কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। এই বংশের নরপতি তৃতীয় রঙ্গের রাজত্বকালে আভ্যন্তরীণ গোলোযোগ এবং বিজাপুর ও গোলকোন্ডার সুলতানদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বিজয়নগরের রাষ্ট্রীয় শক্তি ভেঙে পড়ে। এর ফলস্বরূপ শ্রীরঙ্গপত্তনম্, বিদনুর, মাদুরা ও তাঞ্জোরের শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইভাবে বিজয়নগর রাজ্যের পতন ঘটে।

৩.৩ শাসনব্যবস্থা

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত ও প্রজাকল্যাণমূলক। এই সাম্রাজ্যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার উন্মেষ এবং ক্রমবিকাশ দেখা যায়। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে, বিজয়নগরের শাসকগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এমনই এক সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন যার সাহায্যে যুদ্ধ চলাকালীন রাজ্যে যে বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা সম্ভব। শুধুমাত্র শৃংখলা ফিরিয়ে আনাই নয়, বিজয়নগরের বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ ও সৃষ্টিশীল কার্যকলাপকে অনুপ্রেরণা ও সহায়তাদান করাও এই শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল।

শাসনকার্যের সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা। স্বৈরাচারী হলেও বিজয়নগরের রাজারা ছিলেন প্রজাবৎসল। আইন, শাসন, সামরিক এবং বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও রাজা আপন রাজ্যের স্বার্থ বা প্রজাদের অধিকার ও স্বাধীন মতামতকে উপেক্ষা করে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়

দিতেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা সমাধানেও রাজাকে হস্তক্ষেপ করতে হত। বিজয়নগরের রাজারা জানতেন কীভাবে প্রজাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হয় এবং তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রাজকর্তব্য সম্বন্ধে রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁর তেলুগু ভাষায় রচিত 'আমুক্ত-মাল্যদা' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন যে 'ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্য শাসন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য। তিনি আরও বলেছেন 'রাজার উচিত রাজকার্যে পারদর্শী ব্যক্তিদের নিয়োগ করা যারা রাজ্যের মূল্যবান রত্ন-সমৃদ্ধ খনিগুলির অনুসন্ধান পূর্বক সেগুলি থেকে সম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হবে। প্রজাগণের নিকট থেকে ভদ্রভাবে রাজস্ব আদায়ে সমর্থ হবে, বলপূর্বক শত্রুকে বশীভূত করতে পারবে, প্রজাগণের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং তাদের বিপদের সময় রক্ষা করবে, প্রজাদের মধ্যে জাতিসংকর বন্ধন করতে সফল হবে, ব্রাহ্মণগণের গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করবে, রাজার দুর্গ রক্ষা ও শক্তিশালী করবে, অশুভ শক্তি যাতে বৃদ্ধি না পায় তার প্রতি দৃষ্টি দেবে, নগরগুলির পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান ও মনোযোগী হবে।

রাজাকে রাজকার্যে সাহায্য ও সহায়তা করার জন্য একটি মন্ত্রীসভা ছিল। রাজাই এই মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়োগ করতেন। প্রশাসনের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন ঠিকই তবে শুধু তাঁদের নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হত না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের যোগ্য ব্যক্তিরাও মন্ত্রীপদে আসীন হতেন। কখনো বংশানুক্রমিকভাবে আবার কখনো মনোনয়নের ভিত্তিতে মন্ত্রী নিয়োগ করা হত। আব্দুর রাজ্জাক এবং নিউনিজ (Nuniz) রাজ প্রশাসনের সাহায্যকারী একটি মন্ত্রকের উল্লেখ করেছেন। মন্ত্রীসভা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রধান কোষাধ্যক্ষ, রত্ন-সংরক্ষক, বাণিজ্য-বিষয়ক কর্মচারী, আরক্ষাধ্যক্ষ, অশ্ব-সংরক্ষক প্রমুখ আসীন ছিলেন। এ ছাড়া 'ভাট' নামক একশ্রেণির অধীনস্থ কর্মচারী (এদের কাজ ছিল রাজার গুণকীর্তন করা), তাম্বুল-সংবাহনকারী, বর্ষপঞ্জী প্রস্তুতকারক, লিপিকার এবং লিপিখোদাইকারী-র উল্লেখ সাহিত্যিক উপাদানগুলিতে পাওয়া যায়।

সুষ্ঠু প্রশাসন নির্বাহের উদ্দেশ্যে সমগ্র বিজয়নগর সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করা হয় (রাজ্য, মণ্ডল, চাবড়ি) ; এই প্রদেশগুলি আবার বেণ্থী ('নাড়ু'-র থেকে বৃহৎ), নাড়ু (গ্রামের থেকে বৃহৎ)। সীমা, গ্রাম এবং স্থল (কতকগুলি ক্ষেত্রের সমষ্টি) প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল কর্ণাটক প্রদেশে। কিন্তু তামিল অঞ্চলে কোট্টম (পাররু-র থেকে বৃহৎ)। পাররু (নাড়ু থেকে বৃহৎ), নাড়ু এবং গ্রাম প্রভৃতি বিভাগের অস্তিত্ব ছিল। এই সাম্রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে কতসংখ্যক প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল নিশ্চিতভাবে বলা

শক্ত। পায়েজ (Paes)-এর বিবরণ অনুসারে কিছু লেখক বলেছেন বিজয়নগর সাম্রাজ্য দুইশত প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এইচ. কৃষ্ণশাস্ত্রীর মতে, এই সাম্রাজ্য ছয়টি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি প্রদেশ 'নায়ক' বা 'নায়েক' নামক পদমর্যাদার জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক শাসিত হত। সম্ভবতঃ সম্রান্ত কোনো প্রাক্তন শাসক পরিবারের সন্তান অথবা রাজ পরিবারের সদস্য বা রাজ্যের কোনো প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণির অন্তর্গত ব্যক্তি এই 'নায়ক' পদে অধিষ্ঠিত হতেন। প্রতিটি শাসনকর্তা দেওয়ানি, সামরিক ও বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তবে প্রাদেশিক শাসক হিসাবে নিয়মিতভাবে তাঁকে উক্ত প্রদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাছে দাখিল করতে হত। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য করার জন্যও নায়ক প্রস্তুত থাকতেন। তদুপরি, কোনো নায়ক যদি প্রজাদের অত্যাচার করেছেন বা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে প্রমাণিত হত তবে রাজার তাঁকে কঠোর শাস্তি দেবার অধিকার ছিল। রাজার আদেশে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হত এমনকি তাঁর শাসিত প্রদেশটিকেও উক্ত শাসকের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হত। অর্থদণ্ডেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। নায়েকগণ প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করলেও কৃষিকার্যে অনুপ্রেরণা দান, নতুন নতুন গ্রাম স্থাপন, ধর্মরক্ষা, মন্দির এবং অন্যান্য সৌধ নির্মাণ প্রভৃতি গঠনমূলক ও কল্যাণকর কার্যে অগ্রণীর ভূমিকা নিতেন। তবে সপ্তদশ এবং অষ্টদশ শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দক্ষিণ ভারতে এই যুগে যে অরাজকতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য 'নায়ক' শ্রেণি-ই প্রধানত দায়ী ছিলেন। বস্তুত এই সময়েই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের চিরকালীন অবলুপ্তি ঘটে।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসকগণ বংশানুক্রমিকভাবে একটি শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। এই ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম এককটি ছিল গ্রাম। প্রতিটি গ্রাম স্বায়ত্বশাসিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভর ছিল। গ্রাম সভাগুলির কাজ ছিল উত্তর ভারতের 'পঞ্চায়েত' গুলির অনুরূপ। প্রতিটি গ্রামের 'গ্রাম সভা' শাসনতান্ত্রিক, বিচারবিভাগীয় এবং আরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে গ্রামের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করত। এই কাজে নিযুক্ত হতেন বংশানুক্রমিক কর্মচারীগণ যেমন, সেনাতিওভা (গ্রামের হিসাব-রক্ষক), তালারা (গ্রামরক্ষী), বেগারা (বাধ্যতামূলক শ্রমিক বা 'বেগার'দের ভারপ্রাপ্ত) প্রভৃতি। এই কর্মচারীগণের পারিশ্রমিক আসত ভূমিদান বাবদ অর্থ থেকে কিংবা কৃষিজ উৎপন্ন ফসলের অংশ থেকে। বাণিজ্যিক গোষ্ঠী বা সমবায় গুলির প্রধানগণ সম্ভবতঃ গ্রাম সভাগুলির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রাম-প্রশাসনের সঙ্গে রাজার যোগ ছিল 'মহানায়কাচার্য' পদমর্যাদার রাজকর্মচারীর মাধ্যমে।

বিজয়নগরের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব অথবা 'শিস্ত'। এই সাম্রাজ্যের একটি সুসংহত ভূমি রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত 'অধবনে' নামক বিভাগের তত্ত্বাবধানে। রাজস্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভূমিকে তিনটি পর্যায়ে বিভাজিত করা হত, এইগুলি হল—আর্দ্র ভূমি, শুষ্ক ভূমি এবং অরণ্য বা বনজঙ্গল। ভূমি ব্যবহারকারীর দেয় খাজনার পরিমাণও সুস্পষ্টভাবে বলা হত। বিজয়নগরের রাজারা রাজ্যের অতিরিক্ত আর্থিক চাপ এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় মেটাতে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ হিসাবে যে চিরাচরিত রাজস্বের পরিমাণ ধার্য ছিল তা কিয়ংদংশ বর্ধিত করতে বাধ্য হন। বিজনগরে শাসকগণ বিভিন্ন হারে কর ধার্য করার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ ভূমির উর্বরতা শক্তির উপর ভিত্তি করে কর ধার্য করা হত। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও রায়তদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করা হত। সাম্রাজ্যের অর্থাগম হত আরও অন্যান্য উৎস থেকে, যেমন আমদানী-রপ্তানি কর, পথ-কর, উদ্যান ও বৃক্ষরোপণ কর, অত্যাবশ্যকীয় বাণিজ্যিক পণ্যের সরবরাহকারীদের প্রতি ধার্য কর, প্রস্তুতকারক ও শিল্পীদের প্রতি ধার্য কর। কুম্ভকার, রজক, পাদুকাপ্রস্তুতকারী, ক্ষৌরকার, ভবঘুরে সন্ন্যাসী, মন্দির বারবণিতা শ্রেণি প্রভৃতি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ কর দিতে বাধ্য থাকত। নগদ অর্থে বা বস্তুসামগ্রীর মাধ্যমে রাজ্যের কোষাগারে কর সঞ্চিত হত। উপরিউক্ত বিবরণ থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, আলোচ্য সাম্রাজ্যের জনগণের প্রতি অত্যধিক করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসকগণ এবং রাজস্ব-বিষয়ক কর্মচারীরা প্রায়শই প্রজাদের পীড়ন করতেন। তবে একই সঙ্গে সরকারের কাছে প্রজাদের দাবী ও অনুরোধ জানাবার সুযোগও ছিল ; করের পরিমাণ হ্রাস বা কর মকুব করার জন্য প্রয়োজনবোধে প্রজাগণ সরাসরি রাজার নিকট দরবার করতে পারত। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিচার-সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষেত্রে রাজাই ছিলেন চূড়ান্ত বিচারক। কিন্তু বিচার বিভাগীয় কার্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কতকগুলি আদালত ছিল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করা হত বিচার-বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সংগঠনগুলির সহায়তায় রাজ্যের কর্মচারীগণ কোনো বিরোধের নিষ্পত্তি করে দিতে পারতেন। এই রাজ্যের প্রচলিত আইনগুলি চিরাচরিত প্রথা এবং সনাতন নিয়ম-কানুনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। অপরাধী ব্যক্তির প্রতি কঠোর সাজা বা দণ্ডদানেরও নির্দেশ দেওয়া হত। সাধারণভাবে চার প্রকার দণ্ড বা সাজা ধার্য করা হয়েছিল, যথা—জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি। গুরুতর অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হত। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলার উল্লেখও তৎকালীন

উপাদানে পাওয়া যায়। তবে বিচার-ব্যবস্থায় অনিয়ম বা পক্ষপাতের ঘটনা যে ঘটত না এমন কথা বলা যায় না।

হোয়েসল রাজাদের মতই বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সুশৃঙ্খল এবং সুসংঘবদ্ধ একটি সামরিক দপ্তর ছিল : দণ্ডনায়ক বা দন্নায়ব (সৈন্যাধ্যক্ষ বা সৈন্য-প্রধান) রাজ পদমর্যাদার কর্মচারীর অধীনস্থ এই বিভাগ 'কন্দাচার' নামে আখ্যাত হত। দণ্ডনায়ককে এই দপ্তর পরিচালনায় সহায়তা করতেন একদল অধীনস্থ কর্মচারী। সাম্রাজ্যটি একটি বিশাল ও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। রাজার নিজস্ব কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী ছাড়াও সামন্তরাজ ও অভিজাত সম্প্রদায় রাজ্যের প্রয়োজনে বাড়তি সেনাদল সরবরাহ করতেন। পদাতিক সৈন্য হিসাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হত। প্রয়োজনবোধে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত হত। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ এবং লিপিমালার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ; শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী গঠন করতে পোর্তুগীজ বণিকদের মাধ্যমে ওরমুজ থেকে স্বাস্থ্যবান অশ্ব আনয়ন করা হত। ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দের আগে হিন্দু রাজাগুলির সৈন্যবাহিনীতে হস্তী, উট প্রভৃতি পশুর ব্যবহার হত কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্যে উক্ত উপাদানের অপ্রতুলতার জন্য সম্ভবত অশ্ব আহরণের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিজয়নগর সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যগুলির সমতল ছিল না। অবশ্য সাহিত্যিক উপাদানে বিবৃত তথ্য অনুসারে বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যবাহিনীতে ৩৬০০ অশ্বারোহী, ৭ লক্ষ পদাতিক এবং ৬৩০টি হস্তী ছিল।

৩.৪ আর্থ-সামাজিক ইতিহাস

পায়েজ, নিকোলো কন্টি, বারবোসা, আব্দুর রাজ্জাক প্রভৃতি বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী, লিপিমালা এবং সমসাময়িক সাহিত্য থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমাজ-জীবন ও আর্থিক সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। সমাজে নারী ছিলেন সম্মানিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। শিল্প, শিক্ষা, সংগীত, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা বিষয়ে নারীগণ শিক্ষালাভের সুযোগ পেতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী বিচারকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ধনীদের মধ্যে বহুবিবাহ ও পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ সমাজে প্রশংসনীয় হত। সমাজে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, তাঁরা সাধারণত নিরামিষাশী ছিলেন। বিজয়নগরের নৃপতিগণ ধর্মপ্রবণ ও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, তবে অন্য

ধর্মের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীগণ নির্বিবাদে রাজ্যে বসবাস করতেন—রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। নিউনিজ্ তাঁর বিবরণে লিখেছেন—বিজয়নগরের রাজার সাম্রাজ্যে মল্লযুদ্ধে পারদর্শিনী নারী ছিলেন, ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ এবং কোমলভাষিণীগণ। রাজ্যে এমন রমণীগণ বাস করতেন যাঁরা প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে ব্যয়িত অর্থের হিসাব রাখতেন, রাজ্যের সকল কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করতে পারতেন এবং বহিরাগত লেখকদের রচিত গ্রন্থের সঙ্গে নিজেদের গ্রন্থের তুলনা করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের ছিল। এই রাজ্যের মহিলাগণ নিজেরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে সংগীত পরিবেশন করতে পারতেন এমন কি রাজমহিষীগণও সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন। উক্ত বিদেশি পর্যটকের বিবরণে আরও বলা হয়েছে, বিচারক এবং বিচারকর্মী হিসাবে নারীদের অস্তিত্ব বিজয়নগর রাজ্যে তো ছিলই, তদুপরি প্রতি রাত্রে নৈশপ্রহরীর ভূমিকায় রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত রাখার কাজেও নারীরা নিয়োজিত হতেন। সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল, বাল্যবিবাহ একটি প্রচলিত রীতি হিসাবেই সমাজে স্থান করে নেয়। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত জনগণের মধ্যেও পণপ্রথার মতো অনৈতিক একটি সামাজিক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাজশক্তি তার মীমাংসা করার জন্য মধ্যস্থতা করত। বিজয়নগরে সতীদাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল, ব্রাহ্মণগণ নিঃসংকোচে এই প্রথাকে সমর্থন ও উৎসাহ দিতেন। রাজশক্তির আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণগণ শুধুমাত্র সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ব্যাপারেও যথেষ্ট প্রভাব খাটাতেন এবং অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করতেন। নিউনিজ ব্রাহ্মণদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'তাঁরা সৎ, অত্যন্ত কৃতী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, হিসাবপত্রে নিখুঁত কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে বিমুখ'।

বিজয়নগরের জনসমাজে খাদ্যভ্যাসের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম বা বিধিনিষেধ ছিল না। ফলমূল, শাকসব্জি, তেল ছাড়াও ষাঁড় বা গোরু ছাড়া অন্য সকল প্রকার মাংস ভক্ষণীয় ছিল কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী হত্যা করে তাকে আহার হিসাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। নিউনিজের বর্ণনায় বিজয়নগরের রাজাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন বিসনগ নগরীর রাজগণ সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণ করতেন। তবে ষাঁড় বা গোমাংস খেতেন না, কারণ বৃষ বা গোমাতা তাঁদের পূজিত দেবতা, তাদের হত্যা করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা ছাগমাংস, শূকর, হরিণ, পায়রা, কোকিল সহ সকল রকম পক্ষী এমনকি ইঁদুর, বেড়াল, টিক্‌টিকি সব কিছুই ভক্ষণ করতেন। বিসনাগ (বিজয়নগরের রাজাদের আবাসস্থল) নগরীর রাজার থেকে এইগুলি ক্রয় করা হত। উক্ত জীবজন্তু,

পশুপক্ষীগুলি ক্রয়ের সময় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হত সেগুলি জীবন্ত আছে কি না। নদী থেকে টাটকা মাছ এনে বাজারে বিক্রয় করা হত।

যদি পায়েজ ও নিউনিজের উপরিউক্ত বর্ণনা সত্য হয় তবে Dr. Smith-এর ভাষায় বলা যায়, "a curious dietary for princes and people, who in the time of Krishnadeva Raya and Achyuta Raya were zealous Hindus with a special devotion to certain forms of Vishnu." খুব সম্ভবত ইঁদুর বিড়াল বা টিকটিকি সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের খাদ্য ছিল, যারা বিজয়নগরের অনার্য-জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে প্রচলিত 'নায়ক-ব্যবস্থা' 'চোল' রাজ্যের এই ব্যবস্থার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পরিমার্জিত ছিল। বস্তুত কর্ণাটকের হোয়সল রাজ্য ও অন্ধ্রের কাকতীয় রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামোয় পূর্ববর্তী যুগে এই নায়ক ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। বিজয়নগর রাজ্যে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের বিভাজিত সংগঠন যেখানে নায়ক পদমর্যাদার ব্যক্তি আরও স্বাধীনতা ভোগ করতেন। বিজয়নগরের লিপিগুলিতে 'অমরনায়ণকর' শব্দটির ব্যবহার প্রায়শই দেখা যায়, এর সঙ্গে 'অমরম' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। অমরনায়ণকর বলতে নায়কের দপ্তরের অধিকার ও কার্যকারিতাকে বোঝানো হয়েছে।

ফেরনাও নিউনিজের বক্তব্য অনুসারে সমগ্র বিজয়নগর রাজ্যে অন্ততঃ দুইশত নায়ক পদাধিকারী মানুষ ছিলেন। উক্ত পর্তুগীজ অশ্ব-বণিক ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর আসেন এবং কয়েক বৎসর সেখানে অতিবাহিত করেন। তাঁর রচনায় দেখা যায় রাজার নিকট থেকে প্রতি নায়কগণ ভূমির অধিকার লাভ করতেন, কারণ রাজাই ছিলেন সমগ্র ভূখণ্ডের অধিপতি। অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের মতো বিজয়নগর রাজ্য সামন্ত্রতন্ত্রের খুব নিকটে এসে পড়েছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অবশ্য বিজয়নগরকে 'সামন্ততান্ত্রিক' রাজ্য হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও, বিজয়নগর সম্পর্কে এই মত ঘোষণা করেন নি। তাঁর মতে এই রাজ্যে 'সামন্ততন্ত্র'র উপাদান ছিল।

খ্রিস্ত্রীয় ষোড়শ শতকে পোর্তুগীজ পরিব্রাজকদের বিবরণে কিন্তু শুধুমাত্র একটি ব্যবস্থা রূপেই নায়ক-প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় 'নায়ক' শব্দটি নেতা বিশেষত সামরিক নেতৃত্ব স্থানীয়কে চিহ্নিত করতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগে ভক্তিবাদের প্রভাবে 'নায়ক' শব্দটি প্রধানত দেবতা অর্থে প্রযুক্ত হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে গজপতি অভিলেখে রাজা

কপিলেশ্বরকে 'নায়ক' রূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক সরকারের মতে, 'নায়ক' বলতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সেই ব্যক্তিকেই চিহ্নিত করা হত যিনি সামরিক সহায়তা দানের শর্তে উক্ত রাজ্যের রাজার নিকট থেকে ভূমি লাভ করতেন। সাধারণভাবে একজন ক্ষমতাশালী বীর যোদ্ধাকে চিহ্নিত করতে নায়ক শব্দের প্রয়োগ হত।

দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের পথিকৃৎ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নায়কগণ সম্পূর্ণভাবে বিজয়নগরের রাজাদের মর্জির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন।

'নায়ক' প্রসঙ্গে দেশিয় উপাদানগুলি বর্ণিত তথ্য বৈদেশিক বিবরণ থেকে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তেলুগু কাব্য 'আমুক্ত মালদা' ব্রাহ্মণ থেকে আদিবাসী উপজাতীয় শ্রেণির মানুষ সর্বস্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। এখানে দুর্গ, ব্রাহ্মণ ও উপজাতীয় গোষ্ঠী এই তিনটি বিষয়ের প্রতি রাজ্যের সর্বাধিক মনোযোগ দানের উল্লেখ করা হয়েছে। যে সকল ঐতিহাসিক অন্ধ্র ও কর্ণাটকের ওপর ভিত্তি করে বিজয়নগরের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের মতে উক্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আঞ্চলিক সমাজ-জীবন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিজয়নগরের কোনোরকম পরিবর্তন হয় নি। ঐশ্লামিক আগ্রাসনের কবল থেকে হিন্দুত্ববাদকে রক্ষা করার তাগিদে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ জোরদার করা হয়েছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে কর্ণাটকের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বলে Burton Stein মনে করেন। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বুক্ক হোয়সল রাজ্য জয় করার পর কর্ণাটকের আঞ্চলিক একক বা প্রদেশ (territorial units)-গুলির উল্লেখ আর লিপিগুলিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত আয়গার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলস্বরূপ উক্ত রদবদল সম্ভব হয়েছিল।

এ. কৃষ্ণস্বামীর মতে, তামিল দেশে বহু পূর্ব থেকেই আয়গার ব্যবস্থা চলে আসছিল। সংক্ষেপে আয়গার ব্যবস্থা হল, গ্রামীণ কর্মচারীদের জন্য ভূমি বরাদ্দ করা। তামিল চোল লিপিগুলিতে ভূমি সংক্রান্ত বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় ; এখানে গ্রামপ্রধান, সেচ ব্যবস্থার কাজে জড়িত কর্মচারী প্রভৃতি গ্রামীণ ভূমিসংক্রান্ত কার্যে নিয়োজিত সকল প্রকার রাজভৃত্যের উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণস্বামী বলেছেন, বিজয়নগরের রাজনৈতিক কৌশলের ফলস্বরূপ আয়গার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

বিজয়নগর সম্পর্কিত ঐতিহাসিকগণের বিবৃতি অনুসারে, ভূমিসত্ত্বভোগীদের মূলত তিনটি স্তরবিন্যাস করা হত—অমর, ভণ্ডারবাড় এবং মান্য। ক্ষুদ্রতম শ্রেণিটি 'ভণ্ডারবাড়' অর্থাৎ রাজ্যের বিভিন্ন প্রয়োজনে এই গ্রামগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহৃত হত। মঠ বা মান্য (নিষ্কর) গ্রামসমূহ ব্রাহ্মণ, মন্দির,

মঠ প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করত। সর্ববৃহৎ অংশভাগটি অমর নামে আখ্যাত হত, যার ভোগদখলের অধিকার অমরনায়কদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বিশেষ একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করার প্রচলন ছিল (একভোগম)। ব্রাহ্মণগোষ্ঠীই শুধুমাত্র নয়, অব্রাহ্মণ শৈবসিদ্ধান্ত এবং বীরশৈব গুরুদের উদ্দেশ্যেও মঠ দান করা হত। এই যুগে 'দেবদান' নামক একপ্রকার ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়নগরের মন্দিরগুলি বৃহৎ ভূমিস্বত্বভোগীর স্থান নিয়েছিল কারণ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত শতাধিক গ্রাম মন্দিরগুলির ভোগদখল বা অধিকারে থাকত। কিন্তু মাত্র কয়েকটি মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি থেকে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে বিশেষত কৃষিসম্পদের উন্নয়নে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অমরনায়কগণের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কৃষিযোগ্য ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সেচ-প্রকল্প স্থাপন বা যে ভূমিতে সেচব্যবস্থা রয়েছে তাকে আরও উন্নত করা অমরনায়কদের কর্তব্য ছিল। অবশ্য কৃষ্ণা-কাবেরীর জলবিধৌত অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলি যথেষ্ট উর্বর ও শস্যশালী ছিল। কিছু বৃহৎ মন্দিরে সেচ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি দপ্তর ছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সকল দেবস্থান বা মন্দিরে অর্থসমাগম হত। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই অর্থ কল্যাণমূলক কাজে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হত।

পর্তুগীজ বণিক ফেরনাও নিউনিজ অশ্ব-বণিক হিসাবে দক্ষিণ ভারতে কিন্তু বিশেষ ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেন নি। তাঁর প্রায় সমসাময়িক পায়েজের বিবরণ থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। নিউনিজ-এর বিজয়নগর সাম্রাজ্যে অশ্ব-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণে দেখা যায়, রাজারা বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিলেন এবং তাঁদের সামরিক শক্তির উৎস ছিল অশ্বারোহী সৈন্যদল। উন্নতমানের অশ্ব এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সুদক্ষ পরিচালনায় বিজয়নগরের শাসকগণ তুঙ্গাভদ্রার উত্তরে মুসলমান শক্তিকে পরাজিত করেন, মূল ভূখণ্ডে হিন্দু শাসকগণও বশীভূত হন। তবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যেকে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধ রাজ্য (war state) হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়, দীর্ঘ দুই শতক ধরে অত্যন্ত সফল একটি সাম্রাজ্যরূপে এটি রাজত্ব করে। এই সফলতা, বলা বাহুল্য, অনেকাংশেই পর্তুগীজ ও মুসলমান বণিক এবং সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করে অর্জন করা হয়। আমুক্তমাল্যদার বিবরণে দেখা যায় 'একজন রাজা তাঁর রাজ্যের নদীমোহনাগুলি উন্নত করবেন যাতে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে ; অশ্ব, হস্তী, মূল্যবান রত্ন, চন্দনকাঠ, মণিমুক্তা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য অবাধে আমদানী করা সম্ভব হয়... তিনি (রাজা) বিদেশি নাবিকদের তাঁর রাজ্যে অতিবাহিত করার সুবন্দোবস্ত করবেন ..... তাঁদের নিজস্ব

আদব-কায়দা অনুয়ায়ী তত্ত্বাবধান করবেন। (রাজা) দূরবর্তী দেশ থেকে আগত হস্তী ও উন্নতমানের অশ্ব আমদানিকারী বণিকদের জন্য গ্রাম এবং নগরীতে সুসজ্জিত আবাসগৃহের ব্যবস্থা করবেন, দৈনন্দিন পরিষেবা, উপঢৌকনসহ ভালো মুনাফা লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। (রাজা) আপনার আমদানীকৃত পণ্য যেন শত্রুর হাতে না যায়। (আপনি) সর্বোত্তম অশ্ব ও হস্তীসমূহ কেবলমাত্র বিশ্বস্ত কর্মচারীদের দিন .... অশ্ব ও হস্তীদের আস্তাবল ও হস্তীশালার যত্ন নিন ..... অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি কখনও এ ব্যাপারে বিশ্বাস করবেন না। (A. Rangaswami Saraswati, 'Political Maxims of the Emperor Poet, Krishnadeva Raya' The Journal of Indian History, Vol. VI (1925) pp. 61-88).

অশ্ব-বাণিজ্য প্রসঙ্গে নিউনিজ লিখেছেন—রাজা প্রতি বছর তেরো হাজার ওরমুজের অশ্ব ক্রয় করেন, দেশিয় অশ্বগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ বাছাই করে নিজের আস্তাবলে স্থান দেন এবং অবশিষ্টগুলি সেনাপতিদের প্রদান করেন।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের অশ্ব-বাণিজ্যের বর্ণনা থেকে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত সমুদ্র-বাণিজ্যে ভারতবর্ষের অংশগ্রহণ নিতান্তই নগণ্য ছিল। আরবদেশ, সিরিয়া, তুর্কীস্তান থেকে সংগ্রহ করা অশ্ব মুসলমান বণিকদের দ্বারা কতিপয় পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরে নিয়ে আসা হত। পোর্তুগীজ আমলে গোয়া অশ্ব-বাণিজ্যের একটি বিশেষ বন্দর হিসাবে পরিচিত ছিল। এই বন্দর থেকে দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের এবং বিজয়নগরে অশ্ব সরবরাহ করা হত। মার্কোপোলোর সময় থেকে ইউরোপীয় এবং মুসলমান পর্যটকগণ ভারতবর্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও দেশীয় প্রজাতির অশ্ব এবং অশ্বের পরিচর্যার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন। সম্ভবত এই অভিমত সঠিক ছিল, সেই কারণেই রণ অশ্বগুলিকে নিয়মিতভাবেই ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আমদানী করা হত। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ উভয় প্রকার যোদ্ধার কাছেই এই অশ্বগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুলভা নরসিংহের রাজত্বকাল থেকে (খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক) বিজয়নগরের রাজারা এ কথা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, মূলত দুইটি উদ্দেশ্যে বিজয়নগরের রাজাগণ শক্তিশালী সমর উপকরণের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে চেয়েছিলেন। প্রথমত এই রাজ্যের শাসকশ্রেণির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত যোদ্ধাবৃন্দকে শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বাহিনী সরবরাহ। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর অধিপতি হিসাবে রাজা 'অশ্বপতি' খেতাব অর্জন করতেন। ওড়িষ্যার গঙ্গ রাজবংশের রাজারা ঠিক এইরূপই হস্তীবাহিনীর অধীশ্বর বা 'গজপতি' আখ্যায় ভূষিত হতেন।

১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিজয়নগরের রাজধানী শহরে কৃষ্ণদেব রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিঠলস্বামী মন্দিরে অশ্ব স্থাপত্যে 'হস্তীর' প্রতিকৃতি বহুলভাবে দেখা যায়। এখানে হোয়সল ও পাণ্ড্য রাজগণের মন্দিরে চিত্রায়িত হস্তীর চিরাচরিত যে 'প্যানেল' দেখা যায় তা ছাড়াও পোর্তুগীজ সৈনিকবৃন্দ এবং তাদের অশ্বগণের সমভিব্যাহারে একটি 'প্যানেল' ছিল। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণের সাহায্যে নিঃসন্দেহে বিজয়নগরের প্রতিরক্ষা বাহিনী অশ্ব চালনার কৌশল সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। অশ্ব-সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যে বিজয়নগরের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অপর সম্ভাব্য কারণ হল, মুসলমান এবং অন্যান্য শত্রুর বিরুধে যুধবিগ্রহ পরিচালনার জন্য রাজ্যের সম্রাটগণ যাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন সেই অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন সেনাপ্রধানদের শক্তিশালী করা। তুলনামূলকভাবে হীনবল বা কম পদমর্যাদার প্রধানগণ এই অশ্ব-সম্পদ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্থানীয় শক্তিবৃধি করতে পারতেন। বিজয়নগরের শাসকগণ অশ্ব বাণিজ্যের একচ্ছত্র অধিকার বজায় রাখার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যনীতির সার্থক রূপায়ণ করতে চেয়েছিলেন।

আগ্নেয়াস্ত্রের সফল ব্যবহার এই সাম্রাজ্যকে সাফল্যের চরম শীর্ষে উন্নীত করার বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বিদেশি মধ্যস্থতাকারী বা দালালদের সাহায্যে বাণিজ্যপথে অস্ত্রশস্ত্র বিজয়নগর সাম্রাজ্যে আসত। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রথম বুক্কের সঙ্গে বাহমনী সুলতান প্রথম মুহাম্মদ-এর যুদ্ধে সর্বপ্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যবহার হয়েছিল বলে জানা যায়। এই গোলন্দাজবাহিনী প্রথমদিকে সুশিক্ষিত বা সুদক্ষ না থাকলেও তাদের ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র এবং গাদা বন্দুক বিজয়নগরের সমরাস্ত্রের ভাণ্ডার সমৃধিশালী করে তোলে। বিজয়নগরের দুর্গসমূহের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্রগুলির বিশেষ কদর ছিল। রাজার সৈন্যবাহিনীতে বন্দুকধারী সৈনিকের সংখ্যা ক্রমশ বৃধি পাচ্ছিল। নিউনিজের সাক্ষ্যে দেখা যায়, ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে রাইচুরে বিজয়নগরের জয়লাভকালে কৃষ্ণদেব রায়ের অধীনে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে পোর্তুগীজ পারদর্শীগণ সমাদৃত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর তালিকোটার যুদ্ধে (রাক্ষস-তঙ্গাদি বা তগদি) দাক্ষিণাত্যের সুলতানী শক্তির কাছে বিজয়নগর পরাজিত হয়। শেষোক্ত রাজশক্তির কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর প্রাচুর্য যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। Domingos Paes-এর রচনায় কৃষ্ণদেব রায়ের রাজদরবারের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজার অশ্বারোহী সৈন্যদল এবং অশ্বগুলিকে মখমলের পোষাকে সজ্জিত করা হত। এই মখমল আসত মক্কা থেকে, সাটিন, রেশম বা সিল্ক, ব্রোকেড প্রভৃতি চিনদেশ থেকে। রাজার ব্যক্তিগত রক্ষীগণও অনুরূপ পোশাকে

সজ্জিত হতেন। উপরিউক্ত বিবরণ থেকে সংশয়াতীত সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পেনিনসুলার উভয় উপকূল থেকেই বিজয়নগরের অন্তর্বর্তী নগারে এবং রাজদরবারে পণ্য সামগ্রী আমদানি করা হত।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আমদানিকৃত পণ্য সম্ভারের পরিমাণ, বিলাসমূল্য এবং গুরুত্ব খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হয়েছিল কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের চরিত্র বিশেষ কিছুই বদলায়নি। সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বিজয়নগরে বিশাল সাম্রাজ্যে আশীটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ নগরী মন্দির সমন্বিত ব্যবস্থাস্থল ছিল এবং অবশিষ্ট বাণিজ্য-নগরীগুলি ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কাজকর্মসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব (দুর্গ-তত্ত্বাবধান) পালন করত। এই নগরীগুলিতে একাধিক বাজার স্থাপিত হয়েছিল, সম্ভবত বহু বণিক তাঁদের বসতিস্থল থেকেই ব্যবসা পরিচালনা করতেন বলে বাজারগুলি বসত। এই বিপণি স্থানসমূহ বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠী এবং কারিগরী বণিকদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট করা হত। এই বণিকেরা একই ধরনের পণ্যসামগ্রীর ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। অর্থাৎ প্রতিটি বণিকগোষ্ঠী ও সমপেশার শিল্প এবং কারিগর বণিকদের জন্য পৃথক পৃথক বাজার স্থাপিত হয়েছিল। নগরীগুলির বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্য মন্দিরসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

আলোচ্য যুগে অন্ধ্রপ্রদেশের নগরগুলিসহ অন্যত্র বিপণি এবং বাড়িভাড়া ও অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হত তা বিভিন্নভাবে ব্যয় করা হত। এর একাংশ খরচ হত শহরের মন্দিরগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে। কোণ্ডাইভিডু মন্দিরলিপি (খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে উৎকীর্ণ) থেকে জানা যায়, শহরে ষাট রকমের পণ্য যথা শস্য, শাকসবজি, লবণ, ফলমূল, তৈলবীজ, সূতিবস্ত্র, সুতো, বস্ত্র ধাতব যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রবেশমূল্য (toll) ছাড়াই শহরে প্রবেশ করতে পারত। সাধারণভাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মন্দির-লিপিগুলি বণিকগোষ্ঠী ও কারিগরী বৃত্তি অবলম্বনকারী শ্রেণির ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও সম্মানজনক সামাজিক অবস্থানের নিখুঁত বিবরণ দিয়েছে। দেবালয় বা দেবমন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানে তাদের নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা মূলত ভূম্যধিকারী জনগোষ্ঠীর (যাঁরা প্রতিবেশী গ্রামাঞ্চলে বাস করতেন) আনুকূল্য ও সহায়তায় সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যের অন্যান্য বিপর্যয়ে শহরবাসীরা মন্দিরগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব নিতেন।

বিদেশি বণিকগণ বিজয়নগরের উন্নত পথঘাট, পথে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা, ভ্রাম্যমান পথিকদের জন্য পথপার্শ্বস্থ সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত ব্যবস্থা, এবং শহর ও ক্রয়বিক্রয়ের স্থানে (fair) যাতায়াতের সুগম পথের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সাধারণত বাণিজ্যিক পণ্যাদির পরিবহন হত দুটি বলদ বাহিত গাড়ির সাহায্যে। গোরুর গাড়ির উল্লেখ বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে বিশেষ দেখা যায় না। পশ্চিম উপকূলে নদীপথে বাণিজ্যতরীর ব্যবহার হত। দীর্ঘপথে পণ্য পরিবহণে প্রথমোক্ত শকট যানের ব্যবহার হত সর্বাধিক।

সুতরাং, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং সুদূরবর্তী বাণিজ্য উভয়ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন হয়েছিল একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। এই বাণিজ্যিক উৎকর্ষের মূলে ছিল বিজয়নগরের শাসকদের ঐকান্তিক প্রয়াস এবং স্থানীয় অভিজাত শ্রেণির আনুকূল্য। শেষোক্ত শ্রেণির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া নগরকেন্দ্রিক বাণিজ্য এরূপ সফল হতে পারত না। বিজয়নগরের লিপিগুলিতে এ তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক এবং পাক্ষিক হাটবাজার বসত প্রধান সড়কে। কোনো উৎসব বা পালা-পার্বণে বড়ো বড়ো মন্দির-চত্বরেও এই ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রিক জমায়েত হত। গুন্টুরে অবস্থিত ওঙ্গাল তালুকের শিঙ্গাররায়কোন্ডা নামক গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে তিরুপতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় যাকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা (Fair) বসত। সংশ্লিষ্ট শহরাঞ্চলের বাণিজ্য সমিতিগুলির উদ্যোগে তাদের নেতৃস্থানীয়দের পরিচালনায় নিয়মিতভাবে বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হত। এই নেতৃবৃন্দ 'পত্তনস্বামী' নামে পরিচিত ছিলেন। বিবরণ থেকে জানা যায়, স্থানীয় বাণিজ্যকর্তাদের আদেশে এই মেলাগুলি সংঘটিত হত। এই কর্তারা 'নাড়ু' বা একটি অঞ্চলের প্রধান হিসাবে 'গোল্ড' বা 'মহামণ্ডলেশ্বর' অভিধায় ভূষিত হতেন।

খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতক নাগাদ দক্ষিণ ভারতের নগরগুলির অভূতপূর্ব ঐক্য সামাজিক জীবনকে নতুন পথে পরিচালিত করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্গরক্ষিত নগরকেন্দ্রিক প্রশাসনে একজন নগণ্য আঞ্চলিক নেতার পদ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিও 'নায়ক' পদে উন্নীত হয়ে যথেষ্ট সম্মানীয় অবস্থানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষিজীবি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা বিজয়নগরের সাম্রাজ্যে ক্রমে ক্রমে বিলীনয়মান হয়ে যায়। এই যুগে সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল দেবালয়সমূহ—বিদ্যাচর্চা, শিল্পকলা এবং ধর্মীয় আচার—সর্বক্ষেত্রে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

বৈদেশিক বিবরণ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে পরিষ্কার যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সম্পদ ও বৈভবে অনন্য সাধারণ একটি স্থান দখল করেছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিকাজ এবং সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন হয়। এখানকার প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছিল বয়নশিল্প, খনিজ ও আকরিক এবং ধাতুশিল্প ; সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ক্ষুদ্র শিল্প ছিল সুগন্ধী প্রস্তুতকারী শিল্প। রাজ্যের অর্থনীতিতে বণিক এবং কারিগরদের 'গিল্ড'গুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন ঃ প্রতিটি স্বতন্ত্র 'গিল্ড' বা শিল্পের ব্যবসায়ীগণের বিপণিগুলি একে অন্যের নিকটে অবস্থিত ছিল। পায়েজের বিবরণে দেখা যায়, প্রতিটি সড়কেই একটি মন্দির ছিল যেগুলি বণিক ও শিল্পীদের যোগাযোগ রক্ষা করত। উপকূলীয় বাণিজ্য ছাড়াও সমুদ্র বাণিজ্য এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এই বিজয়নগরের উল্লেখযোগ্য সফলতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মালাবার উপকূলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল কালিকট ; আব্দুর রাজ্জাকের মতে এই সাম্রাজ্যে তিনশত সংখ্যক সমুদ্র-বন্দর ছিল। ভারতমহাসাগরের দ্বীপগুলির সাথেই শুধু নয়, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মালয় উপদ্বীপ, বর্মা, চিন, আরবদেশ, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া এবং পর্তুগালের সঙ্গে। রপ্তানিযোগ্য পণ্যসামগ্রির মধ্যে ছিল বস্ত্র, তণ্ডুল, লৌহ, লবণ, শর্করা, মশলাপাতি ; অশ্ব এবং হস্তী ছাড়াও বিদেশ থেকে আমদানি করা হত মুক্তা, তাম্র, প্রবাল, পারদ, চিনা রেশম এবং মখমল। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য পরিবহনে কাবদি, ঝাঁকামুটিয়া, অশ্ব-শকট, বলদে টানা গাড়ি, গো-শকট এবং অশ্বেতর প্রাণীর ব্যবহার ছিল। উপকূলীয় এবং সমুদ্র বাণিজ্যে বিভিন্ন ধরনের নৌ-যান ব্যবহৃত হত। বারবোসার বিবৃতি অনুসারে, মালদ্বীপ থেকে প্রস্তুত নৌ-যানগুলি দক্ষিণ ভারতে ব্যবহার করা হত। লিপিভিত্তিক তথ্য থেকে জানা যায় বিজয়নগরের রাজাদের নিজস্ব নৌ-বহর ছিল এবং পোর্তুগীজদের ভারতবর্ষে আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এখানকার জনগণ নৌকা তৈরির কৌশল জানত। তবে বিজয়নগর রাজ্যের সমুদ্রবাণিজ্যের পরিবহণ ব্যাপারে খুঁটিনাটি জ্ঞান কতটুকু ছিল তা বলা শক্ত।

বিজয়নগরে বহু ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাসমূহ স্বর্ণ এবং তাম্রনির্মিত হত ; রৌপ্যমুদ্রারও একটি নজির পাওয়া যায়। শাসকগণের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মুদ্রাগুলির ওপর বিভিন্ন দেবদেবী ও জীবজন্তুর চিত্র মুদ্রিত হত। জিনিসপত্রের দর সাধারণত কম ছিল।

বিদেশ পর্যটকগণ বিজয়নগরে সমাজে উচ্চশ্রেণির জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু লিপিগুলি থেকে আমরা জানতে পারি সাধারণ মানুষ করভারে পীড়িত হত। স্থানীয় শাসনকর্তাগণের দুর্ব্যবহারে তাদের নাভিশ্বাস উঠত, কখনও কখনও প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তার হস্তক্ষেপে এই অত্যাচার বন্ধ করতে হত।

বিদেশি বিবরণীতে বলা হয়েছে বিজয়নগর আয়তনে ছিল সুবৃহৎ, সুউচ্চ প্রাকার বেষ্টিত নগরীটি শক্তিশালী দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইতালিয় পর্যটক নিকোলো কন্টি ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে এই সাম্রাজ্যে পরিদর্শনকালে লিখেছেন, বিজয়নগরীর পরিধি ষাট মাইল, এর প্রাচীর পার্বত্য উপত্যকা থেকে উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত, এই নগরে নব্বই হাজার মানুষ অস্ত্র বহনে সমর্থ ছিল... রাজা অন্য যে-কোনো ভারতীয় রাজ্যের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। ১৪৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে আগত পারসিক পর্যটক আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন ; এই রাজ্য (বিজয়নগর) এতই জনসমৃদ্ধ যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাজার রাজকোষ সোনার সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের মানুষ রত্নাভরণ ব্যবহার করত, অঙ্গুরীয় থেকে কর্ণাভরণ, কণ্ঠহার, বাজুবন্ধ, বলয় প্রভৃতি সকল প্রকার গহনা তাদের অঙ্গে শোভা পেত। ডমিনিগোস পায়েজ, যে পোর্তুগিজ পর্যটক বিজয়নগরের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর বিবরণে বলা হয়েছে, এই রাজ্যের রাজার প্রচুর সম্পদ, অগাধ প্রাচুর্য, অগণ্য হস্তীযূথ এবং সৈন্যদল ছিল ..... (বিজয়নগরে) বহু জাতির জনগোষ্ঠী ব্যবসায়িক কারণে একত্র বসবাস করত, বহু মূল্যবান রত্ন রাজধানী শহরে ছিল, বিশেষত হীরে পাওয়া যেত প্রচুর .... পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর হল বিজয়নগর। এখানে ধান, গম, দানাশস্য এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কড়াই, মুগ, মুসুর ও অশ্ব-খাদ্যের মজুত থাকত এবং খুবই সুলভ ছিল। এডোয়ার্ডো বারবোসা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন এই রাজ্য সুবিশাল ও সুবিন্যস্ত, জনসমাকীর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র সমন্বিত। বিজয়নগরের বাণিজ্যকেন্দ্রে হীরা (দেশজ), পেগু থেকে আমদানিকৃত রুবি (চুনী), চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার রেশম এবং কর্পূর, কস্তুরী (musk) গোলমরিচ, ছোটো এলাচ, চন্দন কাঠ ও চন্দন প্রভৃতি মালাবার উপকূল থেকে আগত পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বিদেশি লেখকগণ অবশ্য বিভিন্ন রকম জীবজন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদানের প্রথারও উল্লেখ করেছেন। এই হত্যালীলায় বিজয়নগর রক্তস্নাত হয়ে উঠত। পায়েজের বক্তব্য অনুসারে রাজা চব্বিশটি মোষ এবং দেড়শত মেষ বলি প্রত্যক্ষ করতেন—এক কোপে এগুলির মুণ্ডচ্ছেদ করা হত। জনপ্রিয় নয়দিন ব্যাপী উৎসবের শেষ দিনে আড়াইশত মোষ এবং চার হাজার পাঁচ শত মেষ বলি দেবার রেওয়াজ বিজয়নগরে ছিল।

৩.৫ সংস্কৃতি

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে উন্নতমানের সাংস্কৃতিক এবং শিল্পকলার ব্যাপক অনুশীলন হত। সম্রাটগণ সংস্কৃত, তেলুগু, তামিল এবং কন্নড় ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় অতুলনীয় সুন্দর সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যের সুপরিচিত টীকাকার সায়ন এবং তাঁর ভ্রাতা মাধব বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সূচনাপর্বে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা এই রাজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিজয়নগরের সাফল্য চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল বিশেষত কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে। দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য জগতে এই সময় একটি নবযুগের বার্তা বয়ে আনে। রাজা নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত, কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি দার্শনিক, কবি, এবং ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সমাবেশ বিশেষ পছন্দ করতেন। এঁদের সাম্মানিক হিসাবে কৃষ্ণদেবরায় আকর্ষণীয় উপহার রূপে ভূমি ও অর্থ প্রদান করতেন। এই রাজা তেলুগু ভাষায় 'আমুক্ত মাল্যদা' রচনা করেন। এই গ্রন্থের সূচনায় তিনি পাঁচটি সংস্কৃত পুস্তকের উল্লেখ করেছেন যেগুলি তাঁরই সৃষ্টি। শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে নয়, আমুক্তমাল্যদা কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করার সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য উপাদান। তাঁর রাজসভায় 'অষ্টদিগ্‌গজ' (আটটি হস্তী) অর্থাৎ আটজন সুপ্রসিদ্ধ কবির আগমন ঘটত, যাঁরা সাহিত্য জগতের (তেলুগু) স্তম্ভস্বরূপ। তাঁর সভাকবি পেড্ডন তেলুগু ভাষায় কাব্য রচনা করে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আরবিড়ু বংশীয় শাসকগণও কবি এবং ধর্মীয় পণ্ডিতদের অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করতেন। স্থানীয় শাসক এবং সম্রাটদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও বহু লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়। সংগীত, নৃত্য, নাটক, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক রচনা রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা এবং প্রশংসা পেত। সংক্ষেপে বিজয়নগর সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ঐক্যবদ্ধ রূপকে বাস্তবায়িত করতে সফল হয়েছিল।

সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও স্থাপত্যে বিজয়নগর উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষতা লাভ করে। এই সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসকীর্তি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে, এর অনুপম গঠন-বৈচিত্র্য পৃথিবীর যে-কোনো পুরাকীর্তিকে ম্লান করে দিতে পারে। অনন্য স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন যেগুলি বিজয়নগরের রাজধানীর রাজসৌধকে কালজয়ী করে রেখেছে তা সবই দেশিয় শিল্পীদের হাতে সৃষ্টি। কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালে নির্মিত হাজারা মন্দির প্রসঙ্গে লংহার্স্ট (Longhurst) মন্তব্য করেছেন, "যে সকল নিখুঁত স্থাপত্য শিল্পবিশিষ্ট হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব আছে, হাজারা তাদের অন্যতম", বিজয়নগর

স্থাপত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল বিঠ্ঠলস্বামী মন্দির। ফার্গুসনের (Fergusson) মতে, এই মন্দির একটি অনন্য স্থাপত্যকীর্তি যা অলঙ্করণ শিল্পস্থাপত্য কতটা উন্নত ও নয়নশোভন হতে পারে তার সাক্ষ্য বহন করছে। এই যুগে অঙ্কনশিল্পও চরম উৎকর্ষতালাভ করেছিল ; সংগীত সাধনার প্রসার হয়েছিল দ্রুতগতিতে। সংগীতবিদ্যা-বিষয়ক কয়েকটি রচনা কৃষ্ণদেবরায়ের সময়ে প্রকাশিত হয়। বিজয়নগর রাজ্যের জনগণ নাটক নাট্যাভিনয় দেখতে ভালবাসত ; নাট্যরসে আনন্দলাভ করত।

লিপিভিত্তিক এবং সাহিত্যিক উপাদানে বিবৃত তথ্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে বিজয়নগরের কর্ণধারগণ সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ; ধর্মানুশীলনে তাঁদের কোনো আলস্য ছিল না। কিন্তু এই রাজাদের মধ্যে উগ্র ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামি ছিল বলে জানা যায় না। কারণ, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এবং জৈন—এই চারটি সম্প্রদায় ছাড়াও অ-হিন্দু বিদেশি জাতিগোষ্ঠী (যথা খ্রিস্টান, ইহুদি প্রভৃতি) সমাজে নিরুপদ্রবে বসবাস করত। তাদের প্রতি সম্রাটগণের ব্যবহার ছিল উদার ও নিরপেক্ষ। বারবোসা লিখেছেন—"(রাজা) হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী, মূর নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে উপদ্রবহীন, চিন্তামুক্ত শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যেখানে গমনাগমন, স্বচ্ছন্দ আচার-আচরণে কোনো বাধা ছিল না।"

৩.৬ সাম্রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা

বিজয়নগর সম্পর্কে বিভিন্ন উপাদানে প্রচুর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার সারাংসার আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচুর্য ও উৎকর্ষতার পাশাপাশি কতকগুলি ত্রুটি বা দুর্বলতা এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে শিথিল করে দেয়। প্রথমত, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করার ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ ক্ষমতাহীন হতে থাকে। এই দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন আনে। দ্বিতীয়ত, বহুরকমের সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সত্ত্বেও আলোচ্য সাম্রাজ্যে কোনো সুদূরপ্রসারী বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে শাসকগণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। ড. আয়েঙ্গারের মতে, এই ব্যর্থতাই একটি স্থায়ী হিন্দু সাম্রাজ্য সৃষ্টিকে অসম্ভব করে তোলে। তৃতীয়ত, বিজয়নগরের নৃপতিগণ সাময়িক লাভের হাতছানিতে পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগীজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন কিন্তু এই লাভের নীতি অনুসরণ করে তাঁরা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের কথা মাথায় রাখেননি। পোর্তুগীজদের স্থায়ী বসবাস বিজয়নগরের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিল।

৩.৭ বিজয়নগর : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

তুঙ্গভদ্রার তীরে সঙ্গমবংশীয় দুই ভ্রাতা হরিহর ও বুক্ক শক্তিশালী বিজয়নগর দুর্গটি নির্মাণ করলেন এবং ক্রমে ক্রমে মন দিলেন তাঁদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের বিস্তারসাধনে। ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে হোয়েসল রাজ্য এবং তাঁর পরবর্তী বছর হস্তগত হল বনবাসীর কদম্বশাসিত রাজ্যটিও। ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিজয়নগরের অধীন হল. উত্তর তামিলনাড়ুর শম্বুভার্য রাজ্যটি এবং পরবর্তী সত্তরের দশকে মাদুরার সুলতানশাহীও। রেড্ডি বংশীয় রাজারা তাঁদের ভূখণ্ডের একাংশ বিজয়নগরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন এবং তার পর ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেল ওই রাজ্যটি। এইভাবে ১৩৭০-এর দশক নাগাদ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত বিজয়নগরের অন্তর্গত হল। পরে অবশ্য বিজয়নগরকে বাহমনি-সুলতান শাহীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল এবং ওই সুলতান শাহীর অবক্ষয় ও পতনের পর যুদ্ধ করে যেতে হয়েছিল দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজার সঙ্গেও। তবে প্রায় দুই শত বছর ধরে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা কিন্তু আগে যেখানে ছিল কার্যত সেখানেই থেকে গিয়েছিল।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে সামন্ত-ভূস্বামীদের বিদ্রোহ এবং বিজয়নগরের ভূখণ্ডে বাহ্‌মণি রাজ্যের ও উড়িষ্যার শাসকের সৈন্যদলের বিজয় অভিযানের অব্যবহিত পরেই বিজয়নগরের এক সেনাপতি সঙ্গাম রাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। রাজ্যাভিষেক কালে নরসিংহ সলুভা উপাধি নিয়ে অতঃপর এই সেনাপতি সিংহাসনে বসলেন। বিজয়নগরের হস্তচ্যুত ভূভাগের সিংহভাগ অঞ্চলই পুনর্দখল করে নিতে সক্ষম হন সলুভা। তবে নরসিংহ সলুভার রাজত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি ; ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি বীর নরসিংহ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হন এবং তুলুভ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

বীর নরসিংহের ভাই কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৫০৯ থেকে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ) রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে ব্যাপক রদবদল ঘটিয়ে তার উন্নতিবিধান করা হয় এবং উন্নতি ঘটে অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রশাসন পরিচালনার। রাজকার্যের পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত জমির রাজস্ব-নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজা কৃষ্ণদেব ধার্য করেন নতুন উচ্চতর করের হার। পোর্তুগীজদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের পর কৃষ্ণদেব তাঁদের সাহায্যে পারস্য ও আরব থেকে অশ্ব আমদানী করতে শুরু করেন, অপরদিকে পোর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ দাক্ষিণাত্যের সুলতানশাহী গুলিতে এই ঘোড়া আমদানির ব্যাপারে আরোপ করেন নানা বিধিনিষেধ। এর ফলে বিজয়নগর একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করতে থাকে। এই সাফল্যে

অশ্বারোহী বাহিনীগুলি সৈন্যদলের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। ইতিপূর্বে ভারতের মুসলমান রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী অন্যান্য মিত্র রাজ্য—যেমন আরব ও পারস্য থেকে অশ্ব আমদানীর পথে কোনো অসুবিধা হয় নি। কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্যকালে ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরে পোর্তুগীজ নৌ-শক্তির আবির্ভাবের ফলে বদলে গিয়েছিল সবকিছু। অতঃপর পোর্তুগীজদের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করেছিল ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যগুলিকে সমুদ্রপার থেকে অশ্ব আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।

বেশ কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও বিজয়নগর সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের পূর্ববর্তী রাজ্যগুলির চেয়ে ছিল অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন। সাম্রাজ্যের অধিপতি 'মহারাজা' হিসাবে আখ্যাত হলেও প্রায়শই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত রাজ্যের মন্ত্রী বা 'মহাপ্রধানে'র হাতে। 'মহারাজা'র অধীনে থাকত প্রকাণ্ড এক রাষ্ট্র-পরিষদ, তাতে সভাসদরা ছাড়াও সদস্য হিসাবে থাকতেন প্রধান-প্রধান সামন্ত ভূস্বামী ও বণিক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সরাসরি দায়ী থাকতেন 'মহাপ্রধান'-এর কাছে। এই শাসনকর্তাদের সাধারণত দুই বা তিন বছর অন্তর বদলানো হত, সম্ভবত রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ যাতে দানা বাঁধতে না পারে সেইজন্যই এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই শাসনকর্তাদের কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় তালুকগুলি থেকে খাজনা আদায় করে তা রাজকোষে জমা দেওয়া এবং সামন্ততান্ত্রিক 'অমরনায়ক' ভূস্বামী ও সামন্ত রাজন্যবর্গের কাছ থেকে রাজকর আদায় করা। আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্বের অল্প একটু অংশ তাঁদেরও প্রাপ্য হত। রাজ্যের প্রদেশগুলি তখন ভাগ করা হয়েছিল একেকজন রাজকর্মচারীর শাসনাধীনে কয়েকটি করে জেলায়।

কিছু কিছু শর্তাধীনে রাষ্ট্রীয় জমি দান করা হত যোদ্ধাদের, তাঁদের রাজসেবার বিনিময়ে পুরস্কারস্বরূপ। 'অমরনায়ক'দের সঙ্গে 'ইকতাদার'দের প্রভেদ ছিল এইখানেই যে, 'অমরনায়ক'রা নিজেরাই কৃষকদের ওপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতে পারতেন, এছাড়া ভূমি হস্তান্তরকরণেরও অধিকার ছিল তাঁদের। 'অমরনায়ক'রা নিজেরা যে-রাজকর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন তার সঙ্গে কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের রাজকরের পরিমাণ নির্ভর করত রাজসভায় তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাবের ওপর। সচরাচর 'অমরনায়ক'রা তাঁদের তালুক থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ রাজকোষে জমা দিতেন, সৈন্যবাহিনী পোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার তা থেকে বাদ যেত। তবে অমরনায়করা এ-বাবদেও খরচ কমাতেন এবং ক্রমশ তাঁরা অনেক কম সংখ্যায় পদাতিক ও অশ্বারোহী

সৈন্য নিযুক্ত করতে শুরু করেন। নীতিগতভাবে অমরনায়করা তাঁদের ভূসম্পত্তি বংশ-পরম্পরায় ভোগদখলের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিজয়নগরের গোটা ইতিহাস জুড়ে এই সমস্ত সম্পত্তি প্রায়শই এককেটি ভূস্বামী পরিবারের দখলে আগাগোড়া থেকে যেতে দেখা গিয়েছিল। অমরনায়কদের কাছ থেকে কিংবা খোদ রাজার কাছ থেকে দান হিসাবে ভূমি পেতেন অমরনায়কদের সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ছোটো ছোটো সৈন্যদলের অধিনায়করাও। এই সমস্ত জমি সর্বদাই পিতার কাছ থেকে পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতেন। প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিকদের মধ্যে ওই সময়ে মন্দিরগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণত সেগুলি হয়ে দাঁড়াত আশপাশের বিশাল এককেটি এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আনুষ্ঠানিক পূজাপার্বন উপলক্ষ্যে তীর্থযাত্রীরা ভিড় করে আসতেন মন্দিরগুলিতে, তখন মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলে মেলাও বসত। কারুশিল্পী ও বণিকার মন্দিরের কাছাকাছি বাস করতেন এবং মন্দিরগুলিও কখনও কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ও মহাজনী কারবারে নেমে পড়ত। কিছু কিছু কারুশিল্পী সরাসরি মন্দির সংক্রান্ত নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রীতে বেতন পেতেন তাঁরা, উপরন্তু মন্দিরের দেবত্র ভূমিরও অংশবিশেষ লভ্য হত তাঁদের। কার্যক্ষেত্রে এইসব ভূমি বংশানুক্রমে ভোগদখল করা চলত। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে সেবার কাজটিও হত বংশানুক্রমিক। মন্দিরগুলি ছিল শাসকশ্রেণির ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের একটি অংশ। সেগুলি ঊর্ধ্বতন সামন্ত-ভূস্বামীকে কর দিতে হত, আবার সেগুলিরও ছিল নিজ নিজ অনুগত ভূস্বামী—যাঁরা বাধ্য থাকতেন বিদেশি সেনাবাহিনী ও দস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লোকবল যোগাড় করে মন্দির রক্ষা করতে।

গ্রামগুলির একটা প্রধান অংশই ছিল ব্রাহ্মণ 'সভা' গুলির কর্তৃত্বাধীন। এই ব্রাহ্মণরা সাধারণত কর্তৃত্ব করতেন খুবই ছোটো ছোটো ভূমির ওপর, কেন না এককেটি গ্রাম এমন কি একশত জন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারত। তা সত্ত্বেও এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, কারণ এঁদের ভূমি চাষ করে দিতেন ভাড়াটিয়া প্রজা কিংবা অস্পৃশ্য জাতির লোকজন। এই খেতমজুরদের ব্রাহ্মণগণ 'ভূমিদাস' হিসাবেই দেখতেন।

পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক বড়ো বড়ো গ্রামীণ সমাজ ইতিমধ্যেই ভেঙে টুকরো হয়েছিল। সাধারণভাবে এগুলি এক-একটি গ্রামের ভূমিখণ্ডের ভিত্তিতেই গঠিত ছিল। আবাদীভূমিগুলি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। পতিত ভূমিগুলি ছিল কেবল গ্রামীণ সমাজের যৌথ সম্পত্তি এবং নিষ্কর।

তামিলনাড়ুতে জলসেচের ব্যবস্থাযুক্ত প্রচুর ভূমি ছিল, সেগুলিকেই প্রায়শই বণ্টন করা হত 'সুরতি' বা লটারির সাহায্যে,.কারণ অপেক্ষাকৃত খরার বছরে উঁচু ডাঙ্গা জমিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জল পেত না।

'অমরনায়ক'রা তাঁদের আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেন। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে প্রদেয় সকল আদায় দিতে হবে মুদ্রায়। এর ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপিগুলি থেকে মন হয় কিছু কিছু গ্রামীণ সমাজ তখন গ্রামের ভূমির একাংশ বিক্রি করে দিতে কিংবা বাস উঠিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের ক্ষমতা নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, নগরগুলিতেও। কিন্তু কৃষ্ণদেবরায়ের মৃত্যুর পর ফের একবার সামন্ত-ভূস্বামীদের মধ্যে বিরোধ বেঁধে ওঠে। কৃষ্ণদেব রায়ের ভ্রাতা অচ্যুত (১৫৩০-৪২ খ্রিঃ) এবং মন্ত্রী রাম রায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা ক্রমে দুটি সামন্ত গোষ্ঠীর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয়ে ওঠে।

তালিকোটার যুদ্ধের পর বিজয়নগর রাজ্যের পতন শুরু হল দ্রুতগতিতে। সপ্তদশ শতকের সূচনায় এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিণত হয় ছোটো একটি রাজ্যে, যার রাজধানী ছিল পেনুকোন্ডায়। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রাক্তন সামন্ত-রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সময় নতুন একটি রাজ্যও গড়ে ওঠে, তার নাম মহীশূর।

রাম রায়ের ভাই তিরুমল বিজয়নগরের শেষ রাজবংশ অরবিড়ু বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশের সবচেয়ে উল্লেখ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ভেঙ্কট (১৫৮৬-১৬১৪ খ্রিস্টাব্দ)। রাজা দ্বিতীয় শ্রীরঙ্গামের রাজত্বকালে (১৬৪২-১৬৭০ খ্রিস্টাব্দ) বিশাল বিজয়নগর সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায় বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্যে।

ভারতের ইতিহাসে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যেতে পারে। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে এই সাম্রাজ্য প্রথমে মুসলমান রাজ্য বাহমনি এবং পরে দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিহত করে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছিল। দক্ষিণ ভারতে হিন্দু শিল্প-স্থাপত্যের উন্নয়ন এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সঙ্গে বিজয়নগরের নৃপতিগণের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

৩.৮ অনুশীলনী

১। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কারা? এই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লিখুন।

২। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

৩। বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৪। বিজয়নগরের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি তথ্যমূলক রচনা লিখুন।

৫। বিজয়নগরের সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যকলা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন।

৬। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের মূলে কী কী কারণ ছিল বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা সহ লিখুন।

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। Burton Stein— Vijayanagara, C. 1350—1564, Tapan Roychaudhuri & Irfan Habib (edited) *Cambridge Economic History of India*, I, 2004.

২। Robert Sewell—*A Forgotten Empire ; Vijayanagara* (reprint) Delhi, 1962.

৩। K. A. Nilkantha Sastri—*A History of South India*, Madras, 1958.

৪। K.A.N. Sastri & N. Venkataramanayya—*Further Sources of Vijayanagara History*, 3 vols. Madras, 1946.

একক ৪ ❑ বাংলা

গঠন

৪.০ প্রস্তাবনা

৪.১ বঙ্গ থেকে বাংলা

৪.২ প্রাদেশিক বিভাজন

৪.৩ বাংলার বিভাগ-সমূহের বিবরণ

৪.৪ সামাজিক ইতিহাস—গুপ্তোত্তর যুগ

৪.৫ গ্রামীণ বসতি—গুপ্তোত্তর যুগ

৪.৬ সামাজিক ইতিহাস—পাল, সেন ও সময়ামযিক রাজাদের যুগ

৪.৭ অনুশীলনী

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ প্রস্তাবনা

আধুনিক ভারত উপমহাদেশের মানচিত্রে 'বাংলা' বা 'বেঙ্গল' নামে কোনো পৃথক রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ভূভাগের অস্তিত্ব নেই। ব্রিটিশ আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হবার আগে কিন্তু 'বেঙ্গাল' বা 'বাংলা' বা 'বঙ্গ' শব্দটি ভারতের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি প্রদেশকে চিহ্নিত করত, তবে দেশ-বিভাজনের ফলস্বরূপ সেই 'বাংলা' নামের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডটি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান এই দুটি প্রদেশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' রূপে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও আধুনিক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে চলতি কথায় বেঙ্গাল বা বঙ্গ বা বঙ্গাল শব্দটির ব্যবহার এখনও চলে আসছে। এই দুই বাংলার জনসমাজের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যই

মূলত উপরিউক্ত শব্দ সমূহ ব্যবহারকে অব্যাহত রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে নিয়ে গঠিত অঞ্চলগুলি বাংলা বা 'বঙ্গ' নামের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। বস্তুতঃ, বঙ্গ, বঙ্গদেশ বা বাংলা সম্পর্কিত আলোচনায় বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অখণ্ড বাংলাদেশের চেতনাকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ঘটনাচক্রে আজ মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে ভূমিখণ্ডের নিশানা নির্দেশিত হলেও বাংলাদেশ কিন্তু আজকের সৃষ্টি নয়।

৪.১ বঙ্গ থেকে বাংলা

প্রাচীন এবং আদি-মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে 'বাংলা' নামে কোনো পৃথক রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে স্বতন্ত্র কয়েকটি ভূখণ্ডের (যেগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল) একত্র সহাবস্থানকে সামগ্রিকভাবে বাংলা বা বাংলাদেশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ভূভাগগুলির অন্যতম হল 'বঙ্গ' বা বঙ্গদেশ ; সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে, উক্ত 'বঙ্গ' শব্দটি থেকেই 'বাংলা' নামের উৎপত্তি।

ভারতবর্ষের প্রবহমান সংস্কৃতির স্মৃতিপটে 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' দেশটি যথেষ্ট প্রাচীনতার দাবী করতে পারে। 'বঙ্গ' নামটির সুপ্রাচীনতার প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে ঐতরেয় আরণ্যক নামক প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যটির কথা, যেখানে একটি সুক্তে (ঐতরেয় আরণ্যক ২/১/১) বঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখটি রয়েছে—'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ'। তবে এই উল্লেখটুকু ছাড়া বঙ্গ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আলোকপাত করেনি এই গ্রন্থ। মহাভারতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকের বক্তব্য পকৃতপক্ষে এখনও বিতর্কের বিষয়, অর্থাৎ বঙ্গ সম্পর্কে তৎকালীন ধারণা কি ছিল সে প্রসঙ্গে শুধুমাত্র একটি সুক্তে লিখিত সংক্ষিপ্ততম তথ্য থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি।

যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে proto-historic যুগের জনবসতির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় উত্তর-ভারতে 'তথাকথিত' বৈদিক আর্যদের আগমনের আগেই অন্ততঃ বাংলার পশ্চিমস্থ অঞ্চলে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) অনার্য জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল।

বহু প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে বাংলায় মনুষ্যের বসতি ছিল প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র হতে তা জানা যায়। সম্ভবত কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষেরাই ছিল বাংলার অধিবাসী। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, এদের সাধারণ সংজ্ঞা—নিষাদ জাতি। এরা প্রধানত কৃষিকাজ দ্বারা জীবনধারণ করত। উক্ত ঐতিহাসিক বলেছেন, দ্রাবিড় ও ব্রহ্মতিব্বতীয় ভাষাভাষী আরও কয়েকটি জাতি বঙ্গদেশে বাস করত। এর পরে অপেক্ষাকৃত উন্নততর সভ্যতার অধিকারী এক শ্রেণির লোক বাংলাদেশে বসবাস শুরু করে। এদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আর্যদের মিশ্রণের ফলেই বর্তমান বাঙালি জাতি সৃষ্টি হয়েছে, এটিই প্রচলিত মত। মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী অনুসারে বিচার করে দেখা গেছে যে বাংলার সকল শ্রেণির হিন্দুরাই প্রশস্ত শির (Brachycephalic) কিন্তু আর্যাবর্তের অন্যান্য হিন্দুগণ দীর্ঘ-শিরস্ক (Dolechocephalic)। বৈদিক সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ওই যুগে আর্যরা বাংলার অধিবাসীদের খুব অবমাননার দৃষ্টিতে দেখতেন, এই যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে উক্ত ধারণার সমর্থন মেলে। এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। দেশিয় জনগোষ্ঠীর প্রতি আর্যদের এই উন্নাসিক মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বাংলার আদিম অধিবাসীগণ ঠিক আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আর্যগণ বঙ্গদেশে বসতি স্থাপনের পূর্বেও বাংলার জনগোষ্ঠী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে খুব পশ্চাৎপদ ছিল না। বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে অনেক স্থানে ভূগর্ভ থেকে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার যে সমুদয় নির্দশন পাওয়া গেছে তা প্রাক্-বৈদিক যুগের। কেউ কেউ অনুমান করেন যে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি খ্রিস্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

মহাভারতের মতে, পূর্বাঞ্চলের অধিপতি পৌরাণিক দৈত্যরাজ বলির অবতার রাজা বলির পত্নী সুদেষ্মার গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়, এদের নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম। এই পঞ্চপুত্রের অন্যতম বঙ্গের অধিকৃত রাজ্যই বঙ্গদেশ। পৃথকভাবে বঙ্গের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোকপাত করা যাবে। এখন শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, বঙ্গের উল্লেখ শুধুমাত্র বেদ বা মহাকাব্যের মত মূলত ধর্মনির্ভর, দেশীয় সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না, সম্ভবত তার পরিচিতি ছিল আরও সুদূর প্রসারী। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক বীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত বিজয়ের বাসনায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন তখন সম্ভবত বীরগাথা লিপিবদ্ধ করার

জন্য তাঁর সঙ্গো এসেছিলেন কিছু ঐতিহাসিক। তাঁদের সাক্ষ্য বিবরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কিছু গ্রিক ও লাতিন ইতিহাসকার (যেমন ডায়োডোরাস সেলুকাস, কুইন্টাস কার্টিয়াস রাফাস, প্লুটার্ক, জাস্টিন প্রভৃতি) 'গঙ্গারিডাই' নামে একটি দেশের বা জাতির উল্লেখ করেছেন। জাস্টিনের মতে, 'গঙ্গারিডাই' (Gangaridai) দেশটির অবস্থান সাগরের উপকূলে, যেখানে গঙ্গানদীর অজস্র স্রোতধারা এসে মিশেছে। নিঃসন্দেহে এখানে বঙ্গোপসাগরের কথাই বলা হয়েছে। গঙ্গার যে-কোনো একটি প্রধান উপধারার পূর্বদিকে অন্তত এই দেশটি ছিল বলে মনে হয়। এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে নিম্নবঙ্গের একটি অংশ তৎকালীন 'গঙ্গারিডাই' দেশের অন্তর্গত ছিল।

খ্রিস্ট্রীয় প্রথম শতকে এক অজ্ঞাতনামা নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লুস অফ্ দি এরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থে 'গঙ্গা' নামক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই নামে একটি বন্দরেরও উল্লেখ এখানে আছে। প্লিনী এবং ক্লডিয়াস টলেমির (খ্রিঃ ২য় শতক) রচনায় বর্ণিত 'গঙ্গারিডাই' বা 'গঙ্গারিডে' দেশের সঙ্গো গঙ্গানদীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ইঙ্গিত স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এখানে একটি কাব্যিক উপমার অবতারণা করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্য মনে করেন 'গঙ্গারিডাই' শব্দটিকে যদি 'গঙ্গাহৃদ' (অর্থাৎ 'গঙ্গা (নদী) যার হৃদয় রূপে বিরাজিত' কথাটির অপভ্রংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে সংশয়াতীতভাবে বলা যায়, গঙ্গারিডাই এবং বঙ্গ—এই দুটি নামই উপকূলবর্তী একটি অভিন্ন দেশকে নির্দেশ করছে।

শুধুমাত্র গ্রিক-লাতিন বিবরণই নয়, চৈনিক কিছু সাহিত্যিক উপাদান থেকেও বঙ্গের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। চীন দেশিয় 'ছিয়েন-হান-সু' গ্রন্থে 'হুয়াং-চি' নামে একটি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে 'হুয়াং-চি'-কে উপকূলস্থিত একটি প্রদেশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার সঙ্গো খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে চীনের নৌ-বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই হুয়াং-চি-র (যার অর্থ গঙ্গা নামক দেশ) অবস্থান সমুদ্রের উপকূলে। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই চৈনিক বিবরণীতে উল্লিখিত 'হুয়াং-চি'-ই হল পেরিপ্লুস বর্ণিত 'গঙ্গা' বা 'গঙ্গ' নামক উপকূলবর্তী রাজ্য। পরবর্তীকালে, আনুমানিক খ্রিস্ট্রীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ নাগাদ সংকলিত চৈনিক আকর-গ্রন্থ 'উই-লু' আলোচ্য দেশটি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। এই বিবরণীতে 'প্যান-ইউচ' (যার উৎপত্তি 'বঙ্গ' শব্দ থেকে) নামে একটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। একে 'হ্যান-ইউচ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। কুরাকিচি শিরাতোরির মতে, শেষোক্ত শব্দটি 'গঙ্গা'-কে বোঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে। অধ্যাপক

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই দুটি নামই এক এবং অভিন্ন বঙ্গদেশকেই চিহ্নিত করেছে। যদি এই ধারণাকে সঠিক বলে গণ্য করা হয় তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে আনুমানিক খ্রিস্ট্রিয় তৃতীয় শতক বা তার বহু পূর্ব থেকেই গঙ্গা বা গঙ্গা নামক দেশটির অস্তিত্ব ছিল এবং তা 'বঙ্গ' নামেও পরিচিত ছিল। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশে' (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক) 'গঙ্গা স্রোতান্তরেষু' অর্থাৎ গঙ্গাস্রোতের অন্তরবর্তী একটি ভূখণ্ডরূপে বঙ্গাদেশকে চিহ্নিত করেছেন। এই সকল তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত 'বঙ্গ' এবং বৈদেশিক গ্রিক-লাতিন বিবরণে প্রাপ্ত 'গ্যাঙ্গারিডাই' মূলত একটি দেশকেই চিহ্নিত করেছে। চৈনিক-সূত্রেও তার সমর্থনযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। আলোচ্য দেশটি নিঃসন্দেহে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভিক চতুর্থ বা পঞ্চম শতক পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ এবং বাংলাদেশকে নিয়ে গঠিত এই বঙ্গ প্রদেশের পরিব্যাপ্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল, অধুনা চব্বিশ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ) হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমানের কিয়দংশ, বাঁকুড়া বীরভূম (?) এবং খুব সম্ভবত নদীয়ার অঞ্চলগুলিও তৎকালীন বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। তাঁর মতে পেরিপ্লুসে বর্ণিত 'গঙ্গা' দেশ যদি উত্তর চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা যায়, তবে উপরিউক্ত ধারণাকে সঠিক মনে করা যেতে পারে। গুপ্ত রাজাদের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ সার্বভৌম গুপ্ত সাম্রাজ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গের পরিসর এই পর্যন্তই ছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগোত্তর কালে বঙ্গের এই সম্ভাব্য মানচিত্রটির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। গুপ্ত রাজাদের আমলে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের যে ভূভাগ 'বঙ্গ' নামে পরিচিত হত, গুপ্তোত্তর যুগে সেই অঞ্চল তার 'বঙ্গ' নামক পূর্ব-পরিচিতি হারিয়ে ফেলে। সম্ভবতঃ 'রাঢ়' এবং 'গৌড়' এই নাম দুটি আলোচ্য ভূখণ্ডটিকে বোঝাতে অধিক ব্যবহৃত হওয়ায় 'বঙ্গ' নামটি তাদের আড়ালে চলে যায়। পাল-সেন যুগে বঙ্গের অবস্থানের উৎস সন্ধান করলে দেখা যায়, পূর্বদিকে ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ (বা বরিশাল), ঢাকা এবং কখনও কখনও কুমিল্লা, নোয়াখালি অঞ্চল এমন কি পশ্চিমে অবস্থিত যশোর, খুলনা জেলাও বঙ্গের অন্তর্গত হয়। বস্তুত গুপ্তযুগ পর্যন্ত মূল 'বঙ্গ' দেশের যে পরিচিতি পাল-সেন যুগের (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত) বঙ্গ তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ভূখণ্ড। বঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিত উপকূলীয় অঞ্চলটি হল 'বঙ্গাল'। কিছু কিছু উপাদানে এই বঙ্গাল দেশটির পৃথক পরিচিতি দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে 'বঙ্গাল' বঙ্গেরই অংশবিশেষ। বঙ্গ এবং বঙ্গালের উল্লেখ প্রাচীন

ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদানে প্রায়শই পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষের প্রবহমান ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বঙ্গ বা বঙ্গাল যথেষ্ট প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারলেও 'বাঙ্গালা' শব্দটি আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে প্রথম দেখা যায়। রাজা টোডরমল ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবরের নির্দেশে 'আসলি তুমার জমা' নামে রাজস্ব সম্পর্কিত যে সমীক্ষা প্রস্তুত করেন তাতেই সর্বপ্রথম রাঢ়, 'বাঙ্গালা' বরেন্দ্র ও বঙ্গাদেশ 'সুবে বাঙ্গালা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

আদি—ইউরোপীয় লেখকগণ 'বেঙ্গালা' বা 'বেঙ্গোলা' নামে নগর ও রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ খ্রিস্টীয় শতকে 'বাংলা'র সঠিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা বেশ কঠিন। কারণ আকবরের রাজত্বের পরবর্তী সময়কার ইউরোপীয় পর্যটকরা প্রায়শই চেরমণ্ডল বা করমণ্ডলকেও বাংলার অন্তর্গত করেছেন। যাইহোক, আকবর-এর যুগের 'সুবে বাঙ্গালা' মোটামুটিভাবে অবিভক্ত বাংলাকেই চিহ্নিত করেছে। বৈদেশিক পর্যটকদের উল্লিখিত 'বেঙ্গালা' বা 'বেঙ্গালা' নামটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রক্রিয়াকরণে এবং উচ্চারণের তারতম্যে ধীরে ধীরে 'বাংলা' (বেঙ্গালা > বঙ্গালা > বাংলা) নামে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম থেকে তিলাইগরহি গিরিপথ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডটি সুবা বাঙ্গালা নামে পরিচিত হত।

৪.২ প্রাদেশিক বিভাজন

ঐতিহাসিক যুগে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গা নদীর স্রোত রাজমহলের পাহাড় পার হবার পর বর্তমান মালদহের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ গৌড় নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় তার উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হত। গৌড়রে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী এখন দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে—ভাগীরথী ও পদ্মা। পদ্মা নদী অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে প্রবল স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়। এর পূর্বে গঙ্গা নদী, ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা এই তিনভাগে বিভক্ত হয়ে সাগরে প্রবেশ করত। এককালে এদের মধ্যে সরস্বতী নদীই ছিল বড়ো এবং তা রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতির সহিত মিলিত হয়ে বিশাল নদীতে পরিণত হয়েছিল। এই নদী ক্ষীণ হয়ে যাবার ফলে এর তীরস্থিত

প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তি (তমলুক) ও পরবর্তীকালে সপ্তগ্রাম বিনষ্ট হয় ও ভাগীরথীর কলেবর বৃদ্ধি হয়ে প্রথমে হুগলি ও পরে কলকাতা প্রাধান্য লাভ করে। ভাগীরথী নদীও পূর্বে কলকাতা ছাড়িয়ে পশ্চিম শিবপুর অভিমুখে না গিয়ে সোজা দক্ষিণে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। কালীঘাট ও আলিপুরের মধ্যবর্তী শীর্ণকায়া আদিগঙ্গা নদীটি এখনও ভাগীরথীর পূর্বখাতের নাম ও চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। মেঘনা নদী অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সৃষ্টি। স্থলভাগে দক্ষিণবঙ্গের পরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্যনীয়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া বিল অঞ্চলে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদী উচ্চতর প্রদেশ থেকে মাটি বহন করে যে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বিস্তৃতি সাধন করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন নদীমাতৃক বাংলার (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) সুবিশাল ভূভাগটিতে নদীর স্রোতধারার দিক্ পরিবর্তনের সাথে সাথে বারংবার ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক সীমানারও অদল-বদল ঘটেছে। তথাপি, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে কতিপয় নদীপথের (গঙ্গার নিম্নধারা সমেত) দিকভ্রষ্টতা সত্তেও, বাংলার ঐতিহাসিক ভূখণ্ডটি চারটি সুস্পষ্ট প্রদেশে বিভক্ত ছিল—

(ক) রাঢ়, সুহ্ম এবং গৌড়—ভাগীরথীর (গঙ্গার একটি শাখা) পশ্চিম দিকে অবস্থিত অঞ্চল।

(খ) পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র—পদ্মার (গঙ্গা নদীর অপর শাখা) উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল।

(গ) বঙ্গ এবং বঙ্গাল—ভাগীরথী ও পদ্মার (যার সাথে যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার মিলিত স্রোতধারা মিলিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর উৎপত্তি) মধ্যবর্তী ভূভাগ।

(ঘ) সমতট, পট্টিকেড় এবং হরিকেল—মেঘনার পূর্বে অবস্থিত অঞ্চল।

৪.৩ বাংলার বিভাগ সমূহের বিবরণ

(ক) রাঢ়-সুহ্ম-গৌড় ঃ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি-র 'মহাভাষ্যে' বঙ্গ ও পুন্ড্রের সঙ্গে সুহ্ম দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রচিত একটি জৈন সূত্র যা 'আচারাঙ্গ সূত্রে' সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, মহাবীর তীর্থঙ্কর বজ্জ (বজ্র) ভূমি এবং সুভ (সুহ্ম) ভূমিতে দুর্গম পথহীন লাঢ় (রাঢ়) দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। জৈন আচারাঙ্গা সূত্রের মতে তীর্থঙ্কর মহাবীর

বর্ধমান ঊষর রাঢ়ভূমিতে এসেছিলেন, তবে সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট তাকে অত্যন্ত বিরূপ অভ্যর্থনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মহাকাব্য এবং পুরাণেও সুহ্ম দেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাভারতের দিগ্বীজয়-পর্বে বলা হয়েছে, ভীম তাঁর পূর্বাভিমুখী অভিযানকালে বঙ্গাদের পরাজিত করেন এবং তারপর তাম্রলিপ্ত কর্বট, সুহ্ম সহ উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে বশীভূত করেন। এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, সুহ্ম প্রদেশের সীমা সমুদ্রতীর পর্যন্ত অথবা তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। কালিদাসের সময় সুহ্মদেশের দক্ষিণতম প্রান্তসীমাটি সমুদ্রের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। দণ্ডী-বিরচিত 'দশকুমার চরিতে' দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রয়েছে সুহ্মদেশের একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে। হেমচন্দ্রের রচনায় তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্তের সমার্থক হিসাবে 'দামলিপ্ত' নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভিক কয়েকটি শতকে তাম্রলিপ্তকে কখনো একটি পৃথক রাজনৈতিক ভূখণ্ড, হিসাবে আবার কখনো সুহ্মদেশের অন্তর্গত অঞ্চলরূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়। মহাভারতের দিগ্বীজয় পর্বে তাম্রলিপ্ত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একক একটি অঞ্চল, যা সুহ্ম, কর্বট ও অন্যান্য উপকূলীয় রাজ্য থেকে পৃথক। আবার পুরাণে এটিকে এমন একটি প্রদেশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে গঙ্গা প্রবহমানা। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সান-মো-ত-তো (সমতট) থেকে তো-মো-লি-চি (তাম্রলিপ্তি) এসেছিলেন নয়শত লী পথ অতিক্রম করে। তাঁর বর্ণনা অনুসারে শেষোক্ত তাম্রলিপ্তির পরিসীমা ছিল চৌদ্দশত লী। জৈন প্রজ্ঞাপনার বিবৃতি থেকেই একমাত্র জানা যায় সুহ্ম দেশ বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল।

বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' এবং রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা'য় পূর্বদেশের একটি প্রদেশ রূপে সুহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ধোয়ী রচিত 'পবনদূত'-এ (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক) ভাগীরথীর উপত্যকা অঞ্চলে সুহ্মদেশের অবস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের তেত্রিশতম পঙক্তিতে উল্লিখিত 'ব্রহ্ম' শব্দটিকে যদি 'সুহ্ম' হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে অনুমান করা যেতে পারে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে যমুনা এবং সরস্বতী যেখানে ভাগীরথী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, হুগলি জেলার সেই ত্রিবেণী অঞ্চল সুহ্ম নামক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। পবনদূতের সাতাশতম পঙক্তিতে সুহ্মের অবস্থান সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে।

রাঢ় ঃ একটি ভৌগোলিক প্রতিশব্দ হিসাবে 'রাঢ়' শব্দটি সুহ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারত তথা বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মধ্যযুগে 'সুহ্ম' নামটির ব্যবহার বিরল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র রাঢ় অঞ্চলকে চিহ্নিত করতে সুহ্ম-এর উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের রচনায় সুহ্ম এবং রাঢ় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জৈন ধর্মসাহিত্যে রাঢ় শব্দের পরিবর্তে 'লাঢ়' ব্যবহার করা হয়েছে। সিংহলীয় উপকথা 'দীপবংস' এবং 'মহাবংস' নামক পালি সাহিত্যে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনকারী বিজয়সিংহের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি 'লাল' অঞ্চলের সিংহপুর থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এই 'লাল' প্রদেশটিই 'রাঢ়' অঞ্চল বলে সনাক্ত করা যেতে পারে। ধঙ্গ নামক শাসকের উৎকীর্ণ খাজুরাহো লিপি থেকে জানা যায়, কাঞ্চী, অন্ধ্র, রাঢ় এবং অঙ্গের রাজমহিষীগণ এই চন্দেল্লরাজ কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রফলক থেকে সেনবংশের আদি পুরুষগণ রাঢ়তে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়।

খুব সম্ভবত রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলটি সুহ্ম নামে পরিচিত হত। পরবর্তী যুগে এই নামের ব্যবহার কমে আসে, সেই স্থলে 'দক্ষিণ-রাঢ়' নামে উক্ত অঞ্চলটি পরিচিত হতে থাকে। আমরা সাহিত্যিক এবং শিলা বা তম্রলেখতে 'দক্ষিণ রাঢ়' শব্দটির ব্যবহার প্রায়ই দেখতে পাই।

ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে রাঢ় প্রদেশকে একটি জলহীন, শুষ্ক, উষর ভূমি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এই বর্ণনা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলের রুক্ষ প্রান্তরে আজও তার সত্যতা বহন করে চলেছে। 'দিগ্বীজয়-প্রকাশ' গ্রন্থে দামোদর নদের উত্তরস্থ এবং গৌড়ের পশ্চিমদিকে অবস্থিত প্রদেশ হিসাবে রাঢ় উল্লিখিত হয়েছে। তবকৎ-ই-নাসিরী 'রাল' বা রাঢ় দেশের বর্ণনা দিয়েছে যা গাং নদীর পশ্চিমে অবস্থিত হয়ে লখনৌতির বামপার্শ্বস্থ একটি শাখা প্রদেশ রূপে পরিগণিত হত।

বস্তুতপক্ষে, আদি-মধ্যযুগীয় বাংলায় রাঢ় অঞ্চলটি বর্ধমান সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত ছিল বলে মনে হয়। উক্ত অঞ্চলটি বাংলার অন্যান্য প্রদেশ থেকে ভাগীরথী নদীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে পড়ে। জাও-ডা-ব্যারোস সম্পাদিত মানচিত্রে রার (Rara) অঞ্চলটিকে গঙ্গার পশ্চিমতীরে গৌড়-এর বিপরীত পার্শ্বস্থ একটি অঞ্চল হিসাবে প্রদর্শিত করা হয়েছে। পরবর্তী মানচিত্রগুলিতে এই অঞ্চলটির নাম আর দেখা যায় না।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও লিপিমালার সাক্ষ্যে উত্তর-রাঢ় এবং দক্ষিণ-রাঢ়—এই দুই উপবিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। বাকপতি মুঞ্জের গাওনরি লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলই লিপিতে উত্তিল-লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন-লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলদ্বয় দণ্ডভুক্তি এবং বঙ্গালদেশের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্র হুগলি জেলার দামোদর তীরে অবস্থিত আধুনিক ভুরসুট নামক স্থানটির উল্লেখ করেছিলেন ভুরিশ্রেষ্ঠিক নামে, যা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল।

উত্তির বা উত্তির লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়)-এর উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় নবম শতকে উৎকীর্ণ গঙ্গা-রাজ দেবেন্দ্র বর্ম্মণের ভারতীয় জাদুঘর ফলকে। ভোজবর্ম্মণের বেলাভ তাম্রফলকে উত্তর রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত সিদ্ধলের উল্লেখ দেখা যায়। এই সিদ্ধল গ্রামটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত সিদ্ধনগ্রাম। নৈহাটী তাম্রফলকের বিবরণ অনুসারে বল্লহিট্ঠ বা বল্লহিট্টা নামক স্থানটি রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল যা বর্তমানে বর্ধমান জেলার উত্তরস্থিত বালুতিতি অঞ্চল। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তি-র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দানফলকে যে সকল গ্রাম দানের উল্লেখ রয়েছে সেগুলি মোরা নামক নদীর সন্নিহিত ছিল, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে উত্তর-রাঢ় অঞ্চল সেন রাজাদের আমলে ময়ূরাক্ষী উপত্যকার একাংশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ময়ূরাক্ষীর গতিপথ ছিল বর্তমান বীরভূমের মধ্য দিয়ে। সম্ভবত অজয় নদ বর্ধমান জেলার উত্তরপ্রান্ত সীমায় প্রবাহিত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে বিভাজিকা হিসারে কাজ করেছে সেই মধ্যযুগীয় বাংলায়। অপরদিকে পূর্বে উত্তর-রাঢ় ভাগীরথীর জলবেষ্টনীতে বর্তমান মুর্শিদাবাদের বিশাল ভূভাগ জুড়ে বৃহৎ আয়তনের একটি উপবিভাগ রূপে বিরাজিত ছিল।

গৌড় ঃ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে গৌড়পুর নামক প্রদেশটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার অবস্থান নির্দেশ করা হয় নি। যদি পাণিনি বর্ণিত উক্ত অঞ্চলটি গৌড় নগরটি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে অনুমান করা যেতে পারে এটি গৌড় জনপদের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গ এবং পুণ্ড্রের সঙ্গে গৌড়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গৌড় জনগণের সংযোগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের বরাহমিহিরের রচনায় ছয়টি জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়, এগুলি হল—গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান এবং তাম্রলিপ্তক।

ঈশানবর্ম্মণের হরাহ লিপিতে (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়, এখানে বলা হয়েছে 'গৌড়ান সমুদ্রাশ্রয়ান' যার অর্থ গৌড়গণ সমুদ্রতীরে বসবাস করে। এই লিপিটিতে যে গৌড়দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের কথা ইতিপূর্বে কেনো ঐতিহাসিক দলিল, অনুশাসন, মুদ্রা বা অন্য উপাদানে এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ হয় নি। এই লিপি থেকে উপলধি করা যায় যে গৌড়গণের আবাসভূমি সমুদ্রের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের গুর্গি লিপিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে গৌড়রাজকে সমুদ্রস্থিত জলবেষ্টিত দুর্গের বাসিন্দারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের মেদিনীপুর তাম্রশাসনদ্বয়ে বিবরণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ সুদূর সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শশাঙ্কের আধিপত্য মেদিনীপুরের দণ্ডভুক্তি এবং ওড়িশা বা উৎকল প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে আমরা দেখি, এই বৌদ্ধ পরিব্রাজক তান-মো-লি-তি (তাম্রলিপ্তি) থেকে যাত্রা শুরু করে কি-লো-না-সু-ফ-ল-ন (কর্ণসুবর্ণ) পরিভ্রমণ করেন যার রাজধানীর খুব নিকটেই অবস্থিত ছিল লো-টো-মো-চি মহাবিহার। তাম্রলিপ্তি অঞ্চলটি নিশ্চিতভাবেই বর্তমান তমলুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং লো-টো-মো-চি বা রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার চিরোটির নিকট স্থাপন করা হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই রাজা শশাঙ্কই বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' গৌড়াধিপতিরূপে বর্ণিত। দুবী তাম্রফলকে গৌড় রাজের সঙ্গে একাধিক বর্ম্মণ রাজার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান খুব সম্ভবত উত্তর বঙ্গ—বর্ম্মা অঞ্চল। গৌড়রাজ শশাঙ্ক ছিলেন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের সমসাময়িক, তাই সঙ্গত কারণে অনুমান করা যেতে পারে ভাস্করবর্ম্মণের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ দুবি ফলকে যে গৌড় রাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি শশাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনো রাজা নন। এই ধারণা যদি সঠিক হয় তবে ধরা যেতে পারে উত্তরদিকে পুণ্ড্র অঞ্চলেও গৌড় আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। সুতরাং সাময়িকভাবে হলেও গৌড়রাজ্য উত্তরে পরিব্যাপ্ত হয়।

বাকপতিরাজ-বিরচিত গৌড়বহ অনুসারে কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মণের রাজত্বকালে একজন গৌড়রাজ মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। অনুমান করা যেতে পারে 'গৌড়' শব্দটি দ্বারা মূলত পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ একটি ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করা হলেও পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলাকেই 'গৌড়' নামটি ব্যবহার করা

হত। সম্ভবত শশাঙ্কের সময় থেকেই গৌড়—প্রদেশের সংজ্ঞাটি পরিবর্তিত এবং প্রসারিত হয় তার সীমানার প্রসারণে। পরবর্তী যুগে পাল এবং সেন রাজারা 'গৌড়েন্দ্র', 'গৌড়েশ্বর' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিহার মিহিরভোজের গোয়ালিয়র প্রস্তরলিপি ধর্মপালকে 'বঙ্গাধিরাজ' আখ্যায় বর্ণনা করেছে—এবং তাঁর প্রজারা হল 'বৃহৎবঙ্গান'। রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘবর্ষের (৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) নীলগুন্দ লিপিতে 'বঙ্গ-জনপদ'-এর উল্লেখ আছে। আবার ওই একই রাজার কানহেরী লিপি 'গৌড় বিষয়'-এর বর্ণনা করেছে। কর্করাজের (৮১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ) বরোদা তাম্র ফলকে বঙ্গ এবং গৌড়ের সহাবস্থান দেখা যায়, অপরপক্ষে ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর লিপিতে কিন্তু বঙ্গ এবং গৌড় স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র নামক আকর-গ্রন্থে বঙ্গ এবং ভুবনেশ (ভুবনেশ্বর/উড়িষ্যা)—এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তীরূপে গৌড়ের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। বাৎসায়নের কামসূত্রের টীকাকার যশোধর অবশ্য দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত গৌড়ের বিস্তৃতি ছিল বলে মনে করেন। তবে গৌড়ের সীমারেখার প্রসারণ ঘটলেও তার মূল ভূখণ্ডটি কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত 'অনর্ঘরাঘব' নাটকে গৌড়রের রাজধানী চম্পার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে আইন-ই-আকবরীতে এই স্থানটি চম্পানগর (মান্দারণ) নামে বর্ণিত হয়েছে। ভবিষ্যপুরাণের সাক্ষ্য অনুসারে গৌড় দেশের উত্তরে পদ্মা প্রবাহিত হত এবং দক্ষিণে ছিল বর্ধমান প্রদেশ। গৌড়ের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষে বা সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) তীর পর্যন্ত অঞ্চলে গৌড় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, যদিও গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের যুগে এর রাজনৈতিক সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শশাঙ্কের লিপি অনুসারে, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গঞ্জাম (উড়িষ্যা) জেলা পর্যন্ত গৌড় রাজ্য পরিব্যাপ্ত ছিল।

গৌড়ের বৃহত্তম সংজ্ঞা দেখা যায় কল্‌হন্‌ রচিত রাজতরঙ্গিনীতে (খ্রিস্ট্রীয় একাদশ শতক)। এখানে গৌড়ের পাঁচটি বিভাগকে একত্রে চিহ্নিত করতে 'পঞ্চগৌড়' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, এগুলি হল গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং উৎকল। অনুমান করা হয় ধর্মপালের রাজ্যসীমা বোঝাতে 'পঞ্চগৌড়' শব্দটি ব্যবহৃত হত। ধর্মপালের মুঙ্গের লিপি এবং খালিমপুর লিপি বর্ণিত তথ্য পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'উদয়সুন্দরীকথা' ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামিন্' আখ্যায় ভূষিত করেছে।

আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিতে'র বক্তব্য অনুযায়ী উত্তর ভারতের সিংহভাগ যথা পাঞ্জাব (সারস্বত) কনৌজ (কান্যকুব্জ), বাংলা (গৌড়), দারভাঙ্গা (মিথিলা), এবং উড়িষ্যা (উৎকল) গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই অঞ্চলগুলিই রাজতরঙ্গিনীতে পঞ্চগৌড় নামে চিহ্নিত হয়েছে।

(খ) **পুণ্ড্রবর্ধন—বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী :** পুণ্ড, গৌড় এবং পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন এবং পৌণ্ড্রবর্ধন নামে পদ্মার উত্তর দিকে অবস্থিত যে অঞ্চলকে প্রাচীন বাংলায় চিহ্নিত করা হত তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী নামটিও। গঙ্গার অপর শাখা পদ্মানদীর উপরিভাগে অবস্থিত এই অঞ্চলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ঋগ্বেদে পুণ্ড্রের উল্লেখ না থাকলেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিবা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পুণ্ড্রের উল্লেখ পাই। পরবর্তীযুগে সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র, মহাভারত, হরিবংশ, জৈন কল্পসূত্র এবং রামায়ণে পুণ্ড্র জনগণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

তবে উপরিউক্ত সাহিত্যিকে উপাদান সমূহের একটিতেও পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের ভৌগোলিক কোনো সংজ্ঞা বা বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয় নি। মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্বে মহাকাব্যের বীরনায়ক ভীমের ভারত অভিযানের বর্ণনায় পুণ্ড্র দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে ভীম মোদাগিরির (মুঙ্গের) রাজাকে বধ করেন এবং তারপর পুণ্ড্র ও কৌশিকী কচ্ছ জয় করে বঙ্গ অভিযানে অগ্রসর হন।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, কোশী বা কুসি নদী (সংস্কৃত—কৌশিকী) একসময় উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। ডঃ বুকানন এবং হ্যামিলটন প্রাচীন সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করে এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। অনুমান করা যায়, এই কৌশিকী কচ্ছ নামে উল্লিখিত জনগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেছিল এবং পদ্মানদী বঙ্গ ও কৌশিকী কচ্ছের রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবহমানা ছিল। যদি তাই হয়, তবে মহাভারতে বর্ণিত পুণ্ড্র রাজ্য শুধুমাত্র উত্তর বাংলার উত্তর অংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমগ্র উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রদের আধিপত্য ছিল না—এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক নয়।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙের পর্যটন বিবরণী সি-ইউ-কি-র বর্ণনা অনুসারে জানা যায় এই চৈনিক পরিব্রাজক কা-চু-উ-খি-লো (কজঙ্গল) থেকে যাত্রা শুরু করেন পূর্বদিকে, তিনি গঙ্গানদী পার হয়ে প্রায় ছয়শত লী পথ পাড়ি দিয়ে পুন-না-ফ-তন-না (পুণ্ড্রবর্ধন) দেশে এসে পৌছান এবং এই পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পূর্বে আরও নয়শত লী পথ পার হয়ে একটি বিশাল নদী অতিক্রম করে হিউয়েন

সাঙ পদার্পণ করেন কা-মো-লু-পো অর্থাৎ কামরূপ দেশে। কানিংহাম কা-চু-উ-খি-লো দেশটিকে রাজমহলের আঠারো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কাঁকজোল বা কজঙ্গাল বলে মনে করেন। পুন-না-ফা-তন্-না নিঃসন্দেহে পুণ্ড্রবর্ধন এবং যে বিশাল নদীটি পার হয়ে এই পরিব্রাজক কামরূপে পৌছান তাকে করতোয়া নদী হিসাবে সনাক্ত করা যেতে পারে।

সুতরাং, ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করতে গেলে বলা যায়, পুণ্ড্রবর্ধনের পশ্চিমে ছিল গঙ্গা এবং পূর্বে করতোয়া। সম্ভবত দক্ষিণে পদ্মার স্রোতধারা পুণ্ড্রকে কর্ণসুবর্ণ থেকে পৃথক করে রেখেছিল। বস্তুত সি-ইউ-কির বিবরণ আমাদের পুণ্ড্রের ভৌগোলিক সীমা সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেছে।

সার্বভৌম গুপ্ত যুগ থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন কালে পুণ্ড্রবর্ধন একটি ভুকতি বা প্রদেশ হিসাবে বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। কালক্রমে একমাত্র ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বাংলা পুণ্ড্রবর্ধনের রাজনৈতিক মানচিত্রে স্থান করে নেয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রাচীন লিপিটি কিন্তু উদ্ধার করা হয়েছে এই পুন্ড্রনগর অঞ্চলের মহাস্থান থেকে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ অর্থাৎ সুদূর মৌর্যযুগে ব্রাহ্মী হরফে এবং প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এই লিপিটিতে 'পুদনগল' অর্থাৎ পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি সেই যুগের একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য যেখানে বাংলার কোনো প্রদেশের সন্ধান লিপিবদ্ধ রয়েছে। মহাস্থানগড় বা মহাস্থান বর্তমান বগুড়া জেলায় (বাংলাদেশ) অবস্থিত ছিল।

বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী ঃ উত্তর দিকে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলটি স্ব-নামেই খ্যাত বা পরিচিত ছিল অপরিবর্তিতভাবে, তবে পাল রাজগণের সময় থেকে লক্ষ্য করা যায় এই রাজ্যটি প্রায়ই বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র নামে অভিহিত হতে থাকে। এই নামটি দ্বারা উত্তরবঙ্গের একটি বিশাল ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করা হত। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক লোক কথায় পুণ্ড্রবর্ধনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বরেন্দ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কয়েকটি লিপিতেও এর সমর্থক তথ্য পাওয়া যায়। কামরূপের শাসক জয়পালের সময়ে উৎকীর্ণ সিলিমপুর লিপিতে পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলরূপে বরেন্দ্রীর উল্লেখ রয়েছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে বরেন্দ্রীর একটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে ভূমিদানের ঘটনা লিপিবদ্ধ। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রফলকেও পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত স্থান হল বরেন্দ্রী। আরও কতকগুলি লিপিতে একটি ভৌগোলিক একক হিসাবে বরেন্দ্রী উল্লিখিত।

মাধাইনগর লেখাতে পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত অঞ্চল হিসাবে বরেন্দ্রীর নাম পাওয়া যায় যার অন্তর্ভুক্ত ছিল কাঁটাপুর নামক স্থান। অপর একটি তাম্রফলকে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত নাটরি গ্রামের নাম রয়েছে। মাধাইনগর লিপি বর্ণিত কাঁটাপুরকে বর্তমান দিনাজপুর জেলার কাঁটানগরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয় এবং রাজশাহী জেলার নাটোর-ই-হল প্রাচীন নাটরি গ্রাম। সুতরাং দিনাজপুর এবং রাজশাহীর মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভুমিখণ্ডটি অন্তত বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রচিত রামচরিতে বরেন্দ্রীর ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাব্যিক বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা জানতে পারি দক্ষিণে গঙ্গা এবং পূর্বে করতোয়া বেষ্টিত বরেন্দ্রী অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল ছিল। অবশ্য এখানে গঙ্গা নদী বলতে পদ্মাকেই বোঝানো হয়েছে যা অতিক্রম করে রামপাল বরেন্দ্রীতে প্রবেশ করেছিলেন। বল্লাল চরিত্রের ভাষ্য অনুযায়ী বল্লালসেনের সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল বরেন্দ্রী। তবকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে বারিন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় যা গঙ্গার পূর্ব পার্শ্বে লখ্‌নাবতীর প্রান্তসীমায় অবস্থিত ছিল।

(গ) বঙ্গ এবং বঙ্গাল ঃ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য, ঐতরেয় আরণ্যকে উল্লিখিত 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' সম্ভবত বঙ্গ সম্পর্কিত সর্বপ্রাচীন অভিব্যক্তি। তবে বৌধায়নের ধর্মসূত্রে বঙ্গদের সম্পর্কে যে বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে তারা একটি অনার্য জনগোষ্ঠীরূপে আর্য সংস্কৃতিমণ্ডলের বাইরে বন্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল বলেই ধারণা করা যেতে পারে। বৌধায়ন অন্যান্য দেশের সঙ্গে পুণ্ড্র এবং বঙ্গের উল্লেখ করেছেন, যেখানে কেউ পরিভ্রমণ করলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অঙ্গ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ এবং সুহ্মদের সঙ্গে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণের মতে অযোধ্যার শাসককুলের সঙ্গে বঙ্গদের রাজনৈতিক মৈত্রী ছিল।

একটি প্রদেশ হিসাবে বঙ্গের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। এখানে প্রস্তুত সূতীবস্ত্র কৌটিল্যের মতে সর্বোত্তম ছিল। মহাভারতের দিগ্বীজয় পর্বে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি এবং পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম, কর্বট রাজ্য থেকে বঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে পৃথকরূপে গণ্য করা হয়েছে। অনুমান করা যায় লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) বঙ্গের পূর্বতম সীমানায় প্রবাহিত ছিল। মহাভারতে ভীমের অভিযানের বর্ণনা থেকে মনে হয় পৌন্ড্রক ও তাম্রলিপ্তকদের রাজ্য দিয়ে বঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভবপর হত।

মহাভারতের মতে, পূর্বাঞ্চলের অধিপতি পৌরাণিক দৈত্যরাজ বলির অবতার রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়, এরা হল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। বলিরাজ তাঁর বিস্তৃত রাজ্য এই পঞ্চপুত্রের হাতে বন্টন করে দিলে প্রত্যেকের অঞ্চল সেই সেই পুত্রের নামে আখ্যাত হতে থাকে। মহাভারতের সভাপর্বে ভীষ্মের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে পুণ্ড্র, বঙ্গ ও সুহ্ম দেশের ও সেই দেশগুলির রাজন্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অন্যান্যদের মধ্যে বঙ্গাগণেরও উল্লেখ আছে হস্তী ও সৈন্যদলসহ কৌরবপক্ষে যোগদানকারী হিসাবে। এই সব তথ্য বঙ্গগণ যে ভারতের প্রাচীন জাতি এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী—তারই ইঙ্গিত বহন করে।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। কালিদাসের এই রচনায় দেখা যায় কোশলরাজ রঘু সমুদ্র সমীপে সুহ্মদের রাজ্য জয় করে দ্বীপময় বঙ্গাদের রাজ্যে এসে উপস্থিত হন। গঙ্গার বহুমুখী স্রোতধারায় এই অঞ্চলে অসংখ্য দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছিল এবং বঙ্গের অধিবাসীগণ নৌ-চালনায় এতই পারদর্শী ছিল যে নৌ-বহর থেকেই রাজা রঘুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল যদিও শেষরক্ষা করতে পারে নি। সুতরাং, অনুমান করা যায়, বঙ্গের অবস্থান ছিল ভাগীরথীর হুগলি শাখার পূর্বদিকে, পক্ষান্তরে সুহ্মদের রাজ্য ছিল উক্ত নদীর অপর তীরে বা পশ্চিম দিকে।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে নাগার্জুনিকোন্ডা লিপিতে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি সর্বপ্রাচীন লিপি যেখানে প্রথম বঙ্গ দেশের নাম রয়েছে। মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) বঙ্গের উল্লেখ করেছে, যারা রাজা চন্দ্রের দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় বঙ্গের অস্তিত্ব আছে তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দেশগুলির তালিকায় উপ-বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্য যুগের শেষভাগে রচিত দিগ্বিজয় প্রকাশে যশোর এবং তৎসংলগ্ন অটবী প্রদেশকে উপবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, সম্ভবত শেষোক্ত অরণ্য অঞ্চল বর্তমান সুন্দরবনের অংশবিশেষ ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পের সাক্ষ্য অনুসারে গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেল স্বতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং উক্ত সকল অঞ্চলে অসুর ভাষা ব্যবহৃত হত। মূলত বঙ্গাদেশ ভাগীরথীর পূর্ব তীর এবং সমতল অঞ্চলের পশ্চিম সীমানার মধ্যবর্তী ভূভাগে অবস্থিত হলেও উপাদানগত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, কয়েক শতক ধরে বিভিন্ন সময় এই দেশের সীমানার পরিবর্তন হয়েছে।

বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক) দক্ষিণ বঙ্গ বা অনুত্তর বঙ্গের উল্লেখ করেছে, যেখানে অহরহ নৌ-চলাচলের ধ্বনি শোনা যেত। এই বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশের দুটি ভিন্নধর্মী ধারা—উত্তরে উচ্চ ভূমি এবং নিম্নে অর্থাৎ দক্ষিণে আর্দ্র, সিক্ত, নদীবিধৌত সমতল। সম্ভবত উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যপথ বরাবর গঙ্গা প্রবাহিত হত। বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া এবং ইদিলপুর তাম্র ফলকে বিক্রমপুর বিভাগের বর্ণনা পাওয়া যায় যা পদ্মার উত্তরে ঢাকার নিকট অবস্থিত ছিল এবং বঙ্গের অংশ হিসাবে গণ্য হত।

বিক্রমপুর বিভাগের অন্তর্গত শঙ্করপাস গ্রামটি বঙ্গের অংশ ছিল একথা ইদিলপুর ফলকে উল্লিখিত আছে। এই শঙ্করপাস গ্রামটি কয়েক শতক ধরে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে এবং এখনও বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টা জেলায় এই গ্রামটি স্বনামেই অবস্থিত। এই তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় বঙ্গের উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব সীমানায় ঢাকা (বাংলাদেশ) জেলার কিছু অংশ এবং শ্রীহট্ট অবস্থিত ছিল। সম্ভবত এই কারণেই বাৎসায়নের কামসূত্রের টিকাকার যশোধর বলেছেন 'বঙ্গার লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ' অর্থাৎ বঙ্গদেশ লৌহিত্যের পূর্বে অবস্থিত।

যশোধরের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মদনপাড়া লিপিতে বঙ্গের অন্তর্গত পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামটি দান করার দলিলপত্র নথিভুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে উক্ত গ্রামটি পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তির অন্তঃপাতী। এই পিঞ্জোকাষ্ঠি হল বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার মদনপাড়ার নিকটস্থ পিঞ্জরী নামক গ্রাম। উপরিউক্ত তাম্রফলক বা অনুশাসনগুলি নিশ্চিতভাবে ইঙ্গিত করে যে, অন্ততপক্ষে সেন রাজবংশের শাসনকালে বিক্রমপুর বিভাগ ফরিদপুর জেলা বা ফরিদপুর জেলার কিয়দংশকে তার অন্তর্গত করেছিল। বলা বাহুল্য ফরিদপুর বঙ্গেরই অংশবিশেষ।

অভিধান চিন্তামণির রচয়িতা হেমচন্দ্র বলেছেন 'বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়ঃ' অর্থাৎ বঙ্গ এবং হরিকেল এখানে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে বলা যায়, বঙ্গ ও হরিকেল একই অঞ্চলকে চিহ্নিত করত। এই হরিকেলকে চৈনিক পরিব্রাজক হৎ-সিং পূর্ব ভারতের পূর্ব-সীমারূপে বর্ণনা করেছেন; হরিকেল আধুনিক শ্রীহট্টের প্রাচীন পরিচিতি। সুতরাং, সুবিস্তৃত একটি ভূখণ্ড যার ব্যাপ্তি লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে তা এক সময় বঙ্গের ভৌগোলিক সীমান্তর্গত হয়েছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রেও সমুদ্র থেকে ব্রহ্মপুত্র সমগ্র ভূভাগটি বঙ্গ নামে আখ্যাত হয়েছে।

বঙ্গাল ঃ বঙ্গাল দেশের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। লামা তারনাথের রচনায় এই স্থানকে 'ভঙ্গাল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তারনাথের (খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক) বহুপূর্বে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের (৮০৫ খ্রিস্টাব্দ) নেসারিকা বা নেসারি দানফলকে তাঁরই সমসাময়িক পাল রাজ ধর্মপালের উল্লেখ দেখা যায় বঙ্গালের রাজা হিসেবে। অষ্টম-নবম শতক থেকে সাহিত্যিক এবং লিপিমালার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় বঙ্গাল নামটি সেই সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা এবং পরিচিতি লাভ করেছিল। বঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বঙ্গালের উল্লেখ পাওয়া যায় দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকে উপাদানসমূহে। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলই লিপি (১০১২-১০৪৪ খ্রিঃ রাজত্বকাল) কলচুরীরাজ কর্ণের (আনুমানিক ১০৩৪-১০৭৩ খ্রিস্টাব্দ) গোহারবা লিপি, বিপুলশ্রীমিশ্রের (একাদশ—দ্বাদশ শতক) নালন্দা লিপি, কলচুরী বংশীয় বিজ্জলের আবলুর লিপি এবং দ্বাদশ শতকের মহীশূর লিপি সহ কিছু দক্ষিণ ভারতীয় লিপিতে 'বঙ্গাল' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক উপাদানের অবতারণা করা যেতে পারে। এগুলি হল সোমদেবের যশস্তিলক (৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ), দ্বাদশ শতকের দাকার্ণব, সদুক্তি কর্ণামৃত (শ্রীধর দাসের সংকলিত—১২০৬ খ্রিস্টাব্দ), নয়চন্দ্রসূরির হাম্মীর কাব্য (চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতক)। উক্ত রচনাগুলির প্রত্যেটিতেই একটি দেশ হিসাবে 'বঙ্গাল' উল্লিখিত হয়েছে।

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলই লিপি-বিবৃত তথ্য বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। দক্ষিণ ভারতের এই চোল নৃপতির লিপিতে গোবিন্দচন্দ্র নামক জনৈক রাজার রাজ্য রূপে বঙ্গালদেশকে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ব ভারতে রাজেন্দ্র চোলের বিজয়াভিযান প্রসঙ্গে তিরুমলই লিপি থেকে জানা যায় তিনি তণ্ডভুক্তির (দণ্ডভুক্তি—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার দাঁতন) রাজা ধর্মপাল ; তক্কণ লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়)-এর রাজা রণসুর, মহীপাল (পাল বংশীয় নৃপতি) যিনি উত্তিল রাঢ়ম্ (উত্তর রাঢ়)-এ রাজত্ব করতেন, এবং বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁর সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় পরাজিত করেছিলেন। শেষোক্ত গোবিন্দচন্দ্র নামক রাজাকে সংশয়াতীতভাবে পূর্ববঙ্গের চন্দ্র বংশীয় শাসক গোবিন্দচন্দ্র বলে গণ্য করা যেতে পারে। আলোচ্য লিপিতে বঙ্গালদেশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটি 'অবিরাম বর্ষণমুখর দেশ' হিসাবে। বঙ্গালদেশ, তিরুমলই লিপির ভাষ্য অনুসারে দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় এবং উত্তর রাঢ় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, চন্দ্ররাজগণ কোথাও নিজেদের চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি

আবার কোথাও বঙ্গালাদেশের অধীশ্বর রূপে আখ্যাত করেছেন যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে বঙ্গালদেশটি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই ধারণার সপক্ষে অধ্যাপক সরকার বঙ্গাদেশের নাব্য অঞ্চলে অবস্থিত রামসিদ্ধি-পাটকের অন্তঃপাতী বঙ্গাল-বড়াভু অঞ্চলটিকে বাখেরগঞ্জ (বাংলাদেশ) জেলার গৌর নদী অঞ্চলে অবস্থিত বানথোরা নামক স্থান বলে সনাক্ত করেছেন। একই সঙ্গে বঙ্গ এবং বঙ্গাল শব্দের ব্যবহার অন্ততঃ খ্রিস্টীয় দশম শতক পর্যন্ত চলে এসেছে। ওই সময়ের পশ্চিমভাগ বা পশ্চিমবাগ তাম্রফলকে 'বঙ্গাল-মঠ' নামক একটি মন্দির বা বিহারের বর্ণনা আছে যেখানে বঙ্গালের অধিবাসীগণের যাওয়া আসা চলত। সদুক্তিকর্ণামৃতে 'বঙ্গাল-বাণী' শব্দটি পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বঙ্গালদেশের প্রচলিত ভাষাকে চিহ্নিত করতে উক্ত শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ঘ) সমতট, হরিকেল এবং পট্টিকেড় ঃ সমুদ্রগুপ্তের এলাহবাদ স্তম্ভলিপিতে সর্বপ্রথম সমতটের উল্লেখ দেখা যায় (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক)। এখানে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অধিকৃত প্রত্যন্ত রাজ্যরূপে সমতটের নাম রয়েছে দাভাক, কামরূপ, নেপাল এবং কর্তৃপুরের সঙ্গে। বিভিন্ন সময়ে সমতটের ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন হবার কারণে এই রাজ্যের প্রকৃত সীমারেখা কতদূর ছিল তা নির্ধারণ করা কঠিন। এলাহবাদ স্তম্ভলিপির পরবর্তী সময়ে ওই একই সম্রাটের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ মেহেরৌলি লিপিতে একটি সুপরিকল্পিত রাজ্য হিসাবে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে—এই দেশটি সমতট রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল এ কথা আপাতগ্রাহ্য। সাধারণভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় প্রাচীন বাংলার দক্ষিণস্থ ব-দ্বীপ অঞ্চল বঙ্গ নামে চিহ্নিত হত। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা (খ্রিঃ ষষ্ঠ শতক) বঙ্গ ও সমতটকে পৃথক রূপে প্রদেশ হিসাবে বর্ণনা করেছে। সমতটের পরবর্তী উল্লেখ লিপিবদ্ধ হয়েছে বৈদেশিক বিবরণীসমূহে।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে হিউয়েন সাঙ 'সান-মো-ত-ত' বা সমতটের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই রাজ্য সমুদ্রতীরে অবস্থিত এবং রাজ্য হিসাবে এই অঞ্চল (সমতট) পুন্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ—পদ্মার উত্তরে এবং করতোয়ার পশ্চিমে অবস্থিত), কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রভাগ—মুর্শিদাবাদ জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চল) এবং তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ—পশ্চিম বাংলা), থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে আরও জানা যায়, সমতট রাজ্য কামরূপ দেশের বারোশত লী দক্ষিণে

(অর্থাৎ দুইশত মাইল) এবং তাম্রলিপ্তের নয় শত লী-র (প্রায় দেড়শত মাইল) বেশি পূর্বে অবস্থিত ছিল। সমুদ্র-উপকূলবর্তী আর্দ্র এই সমতট রাজ্যের পরিধি ছিল তিনশত লী-র ও-বেশি। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে ধারণা করা যেতে পারে, তাম্রলিপ্তের পূর্বে, কামরূপের দক্ষিণে, পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণ সীমার বাইরে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বসীমা ও মালদহের দক্ষিণ সীমার বাইরে সমতট রাজ্যের অবস্থান ছিল।

হিউয়েন সাঙের পরবর্তীকালে ভারতে আসেন ইৎ-সিং (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ভাগ)। তাঁর বিবরণীতে ছাপান্ন জন চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাহিনি পাওয়া যায়, যাঁরা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসেন। এঁদের অন্যতম বৌদ্ধ উপাসক শেং-চি-সমতট পরিভ্রমণকালে সমতটের শাসক রাজভটকে সিংহাসনে দেখেছিলেন। এই রাজভটকে অবিসংবাদিতভাবে পূর্ববঙ্গের খড়্গ রাজবংশীয় রাজরাজভট বলে সনাক্ত করা হয়। আসরফপুর তাম্রফলকদ্বয়ে এই শাসকের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত লিপিটি কর্মান্ত-বসাক নামক স্থানের রাজকীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। কর্মান্ত-বসাকের অবস্থান ছিল বর্তমান ত্রিপুরা জেলার বাড়কামতায়। প্রাচীন বাংলার দক্ষিণ-পূর্বভাগে সমতটের অবস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ মেলে শ্রীধরণরাতের কৈলান তাম্রফলক (আনুমানিক সপ্তম খ্রিস্টীয় শতক), ভবদেবের কুমিল্লা তাম্রফলক (আনুমানিক অষ্টম খ্রিস্টীয় শতক) এবং আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকে উৎকীর্ণ শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমবাগ তাম্রানুশাসন থেকে। শ্রীধরনরাতের তাম্রলিপিটির প্রাপ্তিস্থান কৈলান নামক গ্রামটি বর্তমান কুমিল্লা (বাংলাদেশ)-র দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং লালমাই রেলস্টেশনের তের মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। কৈলান লিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় এটি সমতটের অন্যতম প্রশাসনিক কেন্দ্র দেবপর্বত থেকে উৎকীর্ণ হয়। এখানে শ্রীধরনরাতকে 'সমতটেশ্বর' বা সমতটের অধিপতি রূপে আখ্যাত করা হয়েছে। লিপিটিতে বর্ণিত আছে যে, ক্ষীরোদা নদী চক্রাকারে বেষ্টন করেছিল দেবপর্বতকে। এই ক্ষীরোদার স্রোতধারায় শত শত হস্তীযূথ আনন্দে জলক্রীড়া করত এবং এই নদীর উভয়পার্শ্বে সুসজ্জিত নৌকার সারি শোভাবর্ধন করত। পশ্চিমবাগ তাম্রলিপিতেও দেবপর্বত ও তাকে বেষ্টনকারিণী ক্ষীরোদার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দেবপর্বতকে 'ক্ষীরোদা-মণি' (অর্থাৎ 'ক্ষীরোদার মুকুটের রত্ন) আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। দেবপর্বতকে নিঃসন্দেহে ময়নামতী—লালমাই-পর্বতমালা হিসাবে সনাক্ত করা যেতে পারে। এটি কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এবং ক্ষীরোদা নদী হল বর্তমান ক্ষীরনাই বা ক্ষীরাই যা অধুনা শুষ্কধারা হলেও

তার ক্ষীণ অস্তিত্বের চিহ্নটুকু আজও বিদ্যমান। উপরিউক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা নোয়াখালি এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত ত্রিপুরা প্রদেশের অন্তর্গত কিছু অঞ্চল নিয়ে সমতল রাজ্য গঠিত ছিল। পালরাজ প্রথম মহীপালের বাঘোরা ও নারায়নপুর মূর্তি লিপিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। মেহার নামক অঞ্চলে প্রাপ্ত দামোদরদেবের তাম্রপটে সমতট-মণ্ডলের উল্লেখ আছে, যা নিশ্চিতভাবে ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী অঞ্চলকে সমতটের অন্তর্গত প্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত করে। সম্ভবত এই মেহার লিপিই প্রাপ্ত শেষ তাম্রফলক যেখানে প্রদেশ বা রাজ্য হিসাবে সমতটের উল্লেখ রয়েছে। ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন অবশ্য হিউয়েন সাঙের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চব্বিশ পরগনা, খুলনা, বাখেরগঞ্জ প্রভৃতি সমুদ্রসমীপস্থ জেলাগুলি সমতটের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করেন।

হরিকেল এবং পট্টিকেড় ঃ ইৎ-সিং বা ইচিং-এর বর্ণনায় (৬৭৩-৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ) একটি প্রদেশ হিসাবে সর্বপ্রথম হরিকেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং অপর এক বৌদ্ধ পর্যটক উ-হিং এর বিবরণ উদ্ধৃত করে বলেছেন, শেষোক্ত পরিব্রাজক সিংহল থেকে উত্তর-পূর্বে যাত্রা শুরু করে পূর্ব ভারত এবং জম্বুদ্বীপের পূর্ব সীমায় অবস্থিত হরিকেল প্রদেশে এসে পৌঁছান। এই পূর্বতম ভারতীয় দেশটি নৌপথে যাতায়াতে সুগম ছিল। সুতরাং ইৎ-সিং বর্ণিত দেশটি বহু বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কুমিল্লা এবং নোয়াখালি জেলার পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্বে হরিকেল নামে পরিচিত ছিল এ কথা বলা যেতে পারে। চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী অঞ্চল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ভাগে হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধ সাহিত্য আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক) হরিকেল, খাড়ি, রাঢ় এবং বঙ্গের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে যারা পরস্পর প্রতিবেশি রাজ্য হিসেবে অবস্থিত থাকলেও স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখেছিল। এই রাজ্যগুলি 'আযুব' ভাষা ব্যবহার করত এ কথা আগেও বলা হয়েছে। হুই-লুনের রচনায় (৮১৭ খ্রিস্টাব্দ) সমতট, হো-লাই-কাই-লো (হরিকেল) এবং তাম্রলিপ্তকে কামরূপের নিকট স্থান দেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতক নাগাদ লেখা রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী, চম্পা, রাঢ়, কামরূপ প্রভৃতির সঙ্গে হরিকেলের উল্লেখ করেছে পূর্ব ভারতের রাজ্য হিসাবে। আবার হরিকলে রাজ্যের নারীকুলের প্রশংসা করা হয়েছে এই সাহিত্যে ; এই নারীদের যেখানে ভারতবর্ষের 'প্রাচ্যদেশের' নারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম শতকে উৎকীর্ণ চট্টগ্রাম তাম্রফলকে কান্তিদেবকে হরিকেল-

মণ্ডলের শাসকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে হরিকেল মণ্ডলের রাজধানী শহর বর্ধমানপুরে নির্দেশিত হয়েছে। কান্তিদেবের আলোচ্য তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান থেকে সহজেই অনুমান করা যায় চট্টগ্রাম হরিকেলের অন্তর্গত ছিল। শ্রীচন্দ্রের রামপাল ফলকে হরিকেলের ভাগ্যবিধাতারূপে চন্দ্রদ্বীপের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উল্লেখ আছে।

হরিকেলের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আর্য-মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে খাড়ি, রাঢ় প্রভৃতির সঙ্গে হরিকেলের যে উল্লেখ আছে পরবর্তীকালে যাদবপ্রকাশের রচিত বৈজয়ন্তী (খ্রিস্টীয় একাদশ শতক) এবং হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণি (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক)-তে তার সমর্থন মেলে না। শেষোক্ত দুটি রচনায় বঙ্গ এবং হরিকেলকে সমার্থক রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ উক্ত রাজ্যদ্বয় অভিন্ন ছিল। এর সম্ভাব্য কারণ হল, চন্দ্রবংশীয় রাজত্ব প্রাথমিকভাবে চন্দ্রদ্বীপ এবং হরিকেলে স্থাপিত হলেও খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষ নাগাদ চন্দ্ররাজগণ সমগ্র পূর্ব বাংলায় তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল পূর্বেই চন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। বঙ্গ রাজ্যের বিস্তারলাভের কারণে একটি সুবৃহৎ ভূভাগ নাম অপরিবর্তিত রেখে ওই বঙ্গ নামেই আখ্যাত হতে থাকে ; এই রাজ্যের সংজ্ঞা প্রসারিত হবার ফলে ক্ষুদ্র হরিকেল তার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় নি। হরিকেল বৃহৎ বঙ্গের আড়ালে তার নাম ও পরিচিতি হারিয়ে ফেলে। হরিকেল প্রসঙ্গে আলোচনায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কিছু রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে যার সম্মুখদিকে 'হরিকেল' বা 'হরিকল' উপকথাটি খোদিত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে এই মুদ্রাগুলি সপ্তম খ্রিস্টীয় শতকের।

১১৪১ শকাব্দে (১২১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের ময়নামতী তাম্রফলকে 'পট্টিকেড়' নগরে স্থাপিত একটি বৌদ্ধবিহারে দানকার্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। একাদশ শতকে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ 'অষ্টসহস্রিক প্রজ্ঞা পারমিতা'র পাণ্ডুলিপিতে (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত) ষোড়শ বাহুবিশিষ্ট দেবীমূর্তি চিত্রিত হয়েছে ; যাঁকে 'পট্টিকেড়ে চুণ্ডাবরভবনে চুণ্ডা' এই উপকথায় ভূষিত করা হয়েছিল। বর্মী জনশ্রুতি পট্টিকেড়কে 'পট্টিকর' বা 'পাইটকর' রূপে উল্লেখ করেছে। পট্টিকেড় অঞ্চলের উল্লেখ কিছু মুদ্রায় পাওয়া যায় যা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে ওই নামে একটি রাজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের সুনিশ্চিত করে।

৪.৪ সামাজিক ইতিহাস—গুপ্তোত্তর যুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গৌড় এবং বঙ্গ সহ অন্যান্য যে সকল প্রদেশ গুপ্ত রাজশক্তির অধীনস্থ ছিল, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তারা ক্রমশ স্বাধীন রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন বাংলার অন্যতম রাজশক্তি গৌড় উত্তর ভারতের রাজনীতিতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেই একটি গুরুত্বহীন স্থান অধিকার করেছিল। গুপ্তোত্তর যুগ সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে, এই যুগটির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই স্বাতন্ত্র চিরাচরিত রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। শুধুমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজবংশের উত্থান পতনই নয়, আলোচ্য যুগে আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। আধুনিক ইতিহাসবিদ্গণ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের সময়কালকে 'আদি-মধ্য যুগ' নামে অভিহিত করেছেন।

গুপ্তোত্তর যুগের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করার প্রাক্কালে গুপ্ত রাজবংশের আমলের বাংলার সমাজ প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। সাধারণভাবে লিপিমালার সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় গুপ্ত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল একথা বলা যেতে পারে। তৎকালীন বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় বাংলার সমাজ ভারতীয় আর্য প্রধান ব্রাহ্মণ জাতিপ্রথার অনুবর্তী হয়ে পড়ে। গুপ্ত যুগের বাংলাকে জানবার প্রধান উপাদান লিপি। গুপ্ত রাজত্বকালের লিপিসমূহে অগণ্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে 'কায়স্থ' জাতির উল্লেখ রয়েছে একজন 'রাজকর্মচারী' এবং 'হিসাব-রক্ষক' বা 'করণিক' রূপে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের গুপ্ত অনুশাসনে 'কায়স্থ'-র উল্লেখ দেখা যায় পদবী হিসাবে, অর্থাৎ যে পদবীগুলি (যেমন চন্দ্র, দত্ত, দাস, দেব, ঘোষ প্রভৃতি) কায়স্থগণ অদ্যাপি তাঁদের নামের শেষে ব্যবহার করেন, সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে। রাজকীয় পদমর্যাদা বোঝাতে 'প্রথম-কায়স্থ' বা 'জ্যেষ্ঠ কায়স্থ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে ফরিদপুর লিপিতে। এমন কি তখন ব্রাহ্মণ বর্ণভুক্ত মানুষজনও যে সকল পদবী ব্যবহার করতেন তা বর্তমান বাঙালী সমাজে কায়স্থগণই ব্যবহার করেন। এই তথ্য থেকে ধারণা করা যেতে পারে গুপ্তযুগে 'কায়স্থ' শব্দটি বংশানুক্রমিক জাতি অর্থে প্রযোজ্য হয় নি।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বাঙালী রমনীগণের রূপ এবং গুণের বিশেষ প্রশংসা করা হলেও, গৌড় ও বঙ্গের ললনাদের ব্যভিচারের প্রতিও কটাক্ষ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার বাইরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এই প্রদেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। গুপ্ত যুগের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান তারই পরিচয় বহন করে।

গুপ্তোত্তর যুগের বাংলার সমাজের সুপরিস্ফুট চিত্র অঙ্কন করতে হলে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ প্রয়োজন, বলা বাহুল্য তা এই মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। সুপরিচিত চিনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনকালে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিতে সেখানকার জনগণের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সাধারণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় সমতটের অধিবাসীগণ কঠোর প্রকৃতির মানুষ এবং তাম্রলিপ্তির লোকজন শুধু শক্তসমর্থ নয়, সেই সঙ্গে প্রকৃতিগতভাবে সাহসীও ছিল। কর্ণসুবর্ণের জনগণের ব্যবহার ছিল ভদ্র এবং সৎভাবে জীবনযাপন করত কিন্তু তাম্রলিপ্তির জনগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং হঠকারী রূপে চৈনিক বিবরণীতে স্থান পেয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণের জনগোষ্ঠীর শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ এবং তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের তীব্র আকাঙ্খা ছিল বলে হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার প্রতি গভীর প্রীতি বাংলার মানুষকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এমন কি সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত পরিভ্রমণে প্রেরণা বা উৎসাহ যোগাত।

বিজয়সেনের মল্লসারুল লিপি (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) এবং জয়নাগের বপ্পঘোষবাট লিপি (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক) থেকে বঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। শেষোক্ত অনুশাসনে মহাপ্রতিহার সূর্যসেন বপ্পঘোষবাট নামক একটি গ্রাম ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন বলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কুটকুট্ গ্রামের ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে কিছু তথ্যও এখানে উল্লিখিত আছে। গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজ্যকালীন মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রাপ্ত দুইটি লিপিতেও ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই লিপিদ্বয়ে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং জাতিপ্রথা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তিপ্পেরা তাম্রশাসনে (লোকনাথ উৎকীর্ণ) একই রূপ তথ্যের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। লোকনাথের এই দানশাসন থেকে জানা যায় মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মণ নামক এক ব্রাহ্মণকে অরণ্য প্রদেশে ভূমি দান করা হয়েছিল। গহন অরণ্যে পরিবৃত, শ্বাপদ শংকুল এই ভূমি উক্ত ব্রাহ্মণকে দান হিসাবে দেওয়া হয়েছিল যেখানে অনন্তনারায়ণের

মন্দির নির্মাণকল্পে এবং সেইসঙ্গে দুইশত এগারো জন বৈদিক ব্রাহ্মণকে নিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করার অভিপ্রায়ে। ভাস্করবর্ম্মণের নিধনপুর তাম্রফলকে বাংলার পূর্বতম সীমায় ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত বসতি স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণগণের নামের শেষাংশ বাংলার কায়স্থ-জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত পদবীসমূহের অনুরূপ।

যাই-হোক, বাংলার অংশবিশেষে যদি ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে ওই প্রদেশের অপরাপর অংশে যে আরও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত বসতি স্থাপিত হবে সে কথা স্বতঃসিদ্ধ। লোকনাথের তিপ্পারা লিপির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, যেখানে সুভঙ্গ জেলার অটবী প্রদেশে শতাধিক ব্রাহ্মণকে নিয়ে উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এখানেও নিধনপুর লিপি বর্ণিত বর্ণনার অনুরূপ ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতাগণের নামের অন্তর্ভাগে কায়স্থ পদবী ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ভূতি, চন্দ্র, দাম, দাস, দত্ত, দেব, ঘোষ মিত্র, নন্দী, শর্ম্মণ এবং সোম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিধনপুর তাম্রফলকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠীর যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তিপ্পারা লিপিতে সেই একই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। উড়িষ্যার কটক জেলার নেউলপুরে জনৈক রাজা শুভাকরের একটি তাম্রানুশাসনে ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণের নামের শেষার্ধে কায়স্থ পদবী সন্নিবেশিত হতে দেখা যায়। সুতরাং সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শ্রীহট্টের নিকট অবস্থিত পঞ্চখণ্ড থেকে এই ব্রাহ্মণগোষ্ঠী দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হয়ে প্রথমে তিপ্পেরা জেলা এবং পরে উড়িষ্যায় প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেছিল। লোকনাথের তিপ্পারা বা তিপ্পেরা লিপি থেকে জানা যায়, উক্ত রাজা ছিলেন একজন 'করণ', তাঁর মাতামহ ছিলেন পারসব কেশব, কিন্তু পিতামহকে 'দ্বিজবর' বা 'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন 'দ্বিজসত্তম' অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলের সর্বোত্তম এবং তাঁর পূর্বপুরুষ সম্ভবত ভরদ্বাজমুনির বংশধর। লিপি বর্ণিত পারসব কেশব কথাটি গভীর ইঙ্গিতবাহী। পারসব জাতি মূলত ব্রাহ্মণ শ্রেণিভুক্ত এবং শূদ্রের সমপর্যায়ের। বস্তুত, কেশবের ব্রাহ্মণ পিতা এক শূদ্রা রমণীকে বিবাহ করেছিলেন। তিপ্পেরা লিপি উক্ত বংশপরিচয় বর্ণনার মাধ্যমে এইভাবেই একটি অসবর্ণ বিবাহের পরোক্ষ উল্লেখ করেছে। সুতরাং এটুকু ধারণা করা যেতে পারে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রা অনুলোম বিবাহ সম্ভবত সামাজিক নিষেধাজ্ঞার বাইরে ছিল। এই লিপির সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা হয় 'করণ' এবং 'কায়স্থ' শব্দদ্বয় সাধারণভাবে বৃত্তি (profession) বোঝাতে ব্যবহার হয়েছে, পূর্ববর্তীকালে এই দুই শব্দ সমার্থকরূপেই ব্যবহৃত হত।

হিউয়েন সাঙ সমতট পরিভ্রমণ করেন ৬৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু তাঁর বিবরণে এখানকার রাজার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু নালন্দায় তাঁর গুরু বা আচার্য বৌদ্ধ পন্ডিত শীলভদ্র সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ বলেছেন সমতটের একটি ব্রাহ্মণ রাজপরিবারে শীলভদ্রের জন্ম। সমতটের রাজার প্রসঙ্গে হিউয়েন সাঙের নীরবতা থেকে মনে হয় সমতটে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাঁর রচনায় সমতটে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজার পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গেও কোনো কথা বলা হয় নি। এ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় হিউয়েন সাঙের পরিদর্শনকালে সমতটের ব্রাহ্মণ শাসকগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। এই সময় সমতটে রাত বংশীয় রাজবংশ শাসন করতেন। সমসাময়িক খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গ (দেবখড়্গ) অবশ্য নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বৌদ্ধ ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিপ্পেরা অঞ্চলে রাজ্যস্থাপনকারী এই খড়্গরাজাদের সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। খুব সম্ভবত ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত রাত রাজপরিবারের সন্তান ছিলেন সুপরিচিত বৌদ্ধ পন্ডিত শীলভদ্র। 'ভদ্র' পদবীযুক্ত এই শীলভদ্র নামটি থেকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সমতটে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভদ্র-রাজবংশের শাসনের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছেন না। কিন্তু তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, শীলভদ্র একটি আদ্যপ্রান্ত বৌদ্ধ-প্রভাবিত নাম। উক্ত নামধারী বৌদ্ধ শিক্ষক জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হবার পর শীলভদ্র নামটি গ্রহণ করেছিলেন।

সপ্তম শতকের শেষভাগে চিন থেকে আগত অপর বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইৎ-সিং বা ই-চিং-এর ভারত সম্পর্কিত বিবরণে সমতটের রাজা খড়্গবংশীয় রাজভটের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী শেষোক্ত রাজা বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল অনুরাগী হিসাবে তার পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। সমতটের রাজধানীতে চারহাজারেরও বেশি সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করত। তারা রাজ আনুকূল্য লাভ করত। অবশ্য ই-চিং এবং শেং-চির আগমনের মাত্র কয়েক দশক আগে হিউয়েন সাঙের পরিবদর্শনকালে সমতটে মাত্র দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। অনুমান করা যেতে পারে সপ্তম শতকের শেষদিকে বৌদ্ধ খড়্গ রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমতট রাজ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

তিপ্পারা লিপি বর্ণিত তথ্য অনুসারে এই লিপির উৎসগাতা লোকনাথ ছিলেন সমতটের শাসক। সম্ভবত এই শাসক শিবের উপাসক ছিলেন, তিনি ছিলেন করণ এবং ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কৈলান তাম্রশাসনে শ্রীধরণরাতকে 'পরমবৈষ্ণব' এবং ভগবান পুরুষোত্তম (বিষ্ণু)-র একনিষ্ঠ

পূজারীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগে গুপ্তরাজগণকে তাঁদের লিপিতে সাধারণত 'পরম ভাগবত' উপাধিতে আখ্যাত করা হয়েছে। তাঁরাও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

কৈলান ফলকের বর্ণনায় দেখা যায়, মহাসন্ধিবিগ্রহিক (যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) জয়নাথের অনুরোধে রাজা শ্রীধরনরাত একখণ্ড ভূমি দান করতে সম্মত হন। এই ভূমি ভগবত তথাগতরত্ন (বুদ্ধ) বা রত্নাত্রয়-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করা হয়েছিল। 'রত্নাত্রয়' বলতে বোঝায় বৌদ্ধ ত্রিনীতি (বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ) যা বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতীকায়িত ভিত্তিস্বরূপ। এই প্রতিষ্ঠানে বুদ্ধের উপাসনা, বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থাদির পঠন-পাঠন এবং আহারাদির ব্যবস্থা ছিল ; সেই সঙ্গে 'আর্য সঙ্ঘ' বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় বসন ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণও সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল। শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিক্ষুরাই নন, কিছু সংখ্যক বিদ্বান ব্রাহ্মণের 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' (পাঁচটি প্রাত্যহিক যজ্ঞ, যা ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত, এগুলি হল অধ্যাপন, তর্পণ, হোম, বলি এবং অতিথি-পূজন)—সম্পাদন করার জন্যও এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। বস্তুতঃ, কৈলান লিপি-বর্ণিত এই তথ্য খ্রিস্টীয় সপ্ত শতকের বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক উদারতার পরিচয় বহন করে। আমরা দেখি জয়নাথ নামক উচ্চপদস্থ জনৈক রাজকর্মচারী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয়ধর্মের প্রতিই সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই যুগের বিদগ্ধ শাস্ত্রকার বা দার্শনিকরা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের সারগর্ভ আলোচনা ও বাদানুবাদে যতই নিজেদের ব্যাপৃত রাখুন না কেন, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কোনো ঘাটতি ছিল না অথবা বলা যেতে পারে বৌদ্ধ ধর্মমতাবলম্বী সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ্য সমাজের দ্বারা আকর্ষিত বা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সামন্ত মরুণ্ডনাথের কালাপুর তাম্র অনুশাসনে সম্ভবত জয়স্বামীর অনুরোধে একটি ভূমিদান করার উল্লেখ রয়েছে। উক্ত জয়স্বামী ইতিপূর্বে দান হিসাবে প্রাপ্ত এক পাঠক (পাঁচ কুল্যবাপ বা চল্লিশ দ্রোণবাপ পরিমাণ) ভূমিতে একটি মঠ (মন্দির বা বিহার) নির্মাণ করে সেখানে ভাগবত অনন্তনারায়ণের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আলোচ্য কালাপুর তাম্রশাসনটি উক্ত ভগবত অনন্তনারায়ণের মন্দিরের বলি, চরু ও সত্র পরিচালনার জন্য এবং বিশিষ্ট ত্রৈবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীগৃত ভূমিখণ্ড দান করার কথা লিপিবদ্ধ করেছে। এই ভূমিটি নিষ্কর অগ্রহার রূপে ঘোষিত হয়েছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, লিপিটির উৎকীর্ণকারী আপাতদৃষ্টিতে শৈব ধর্মানুরাগী কারণ তাঁর অনুশাসনে 'বৃষ' বা ষাঁড়ের চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু ভগবান

অনন্তনারায়ণের উদ্দেশ্যে 'অগ্রহার' হিসাবে ভূমিদান করতে তিনি একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বলা বাহুল্য, ভগবান অনন্তনারায়ণ নিঃসন্দেহে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুরই একটি রূপ মাত্র। কালাপুর তাম্রফলকটি থেকে জানা যায়, সামন্ত মরুণ্ডনাথ উক্ত দেবতার দৈনন্দিন উপাসনার জন্য আবশ্যিক সকল রকম উপচার সরবরাহের ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্য এবং ওই স্থানে চতুর্বেদ-সম্পর্কে পারদর্শী শতাধিক ব্রাহ্মণকে উপনিবেশিত করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। আলোচ্য অনুশাসনের দ্বারা ব্রাহ্মণদের কোথাও গোষ্ঠীগতভাবে আবার কোথাও ব্যক্তিবিশেষকে ভূমিদান করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ভোগী (গ্রাম-প্রধান), পাচক (রাঁধুনি) এবং ভৃচক (ভাষ্যকার) প্রভৃতি সামিল হয়।

উক্ত তথ্য প্রমাণ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি সামন্ত লোকনাথের প্রদত্ত আরণ্যক ভূমিতে ভগবত অনন্তনারায়ণের মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও সেখানে বসতিস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ওই সামন্ত পরিবারেরই মরুণ্ডনাথ আরণ্যক অঞ্চলে একই উদ্দেশ্যে এক পাটক দুই দ্রোণ পরিমাণ ভূমি দান করেন।

খুব সম্ভবত তিপ্পারা তাম্রশাসন (লোকনাথ কর্তৃক উৎকীর্ণ) এবং নিধনপুর তাম্রলিপি (ভাস্করবর্মণ কর্তৃক উৎকীর্ণ)-তে উল্লিখিত 'স্বামী' পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ যাঁরা দানগ্রহীতা হিসাবে ভূমি লাভ করেন, তাঁরা মন্দিরের বলি-চরু ও সত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁদের সামাজিক অবস্থান ছিল বর্তমান কালের সেবায়েত বা মোহন্তদের সম-পর্যায়ের। এঁরা স্থায়ীভাবেই উক্ত অঞ্চলে বসবাস করতেন।

'মরুণ্ডনাথ' নামটি ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত 'মুরুণ্ড'দের কথা মনে করিয়ে দেয়। গুপ্ত রাজবংশের উত্থানের অব্যবহিত পূর্বে (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের আগে) ভারতীয় সাহিত্যে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে পাটলিপুত্রে মরুণ্ডগণ শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। টলেমির 'Geographike Huphegesis' (আনুমানিক ১৪৫ খ্রিস্টাব্দ)-এ উল্লিখিত 'মারোনডাই' বা 'মরোনডাই' (যাকে মুরুণ্ড বলে সনাক্ত করা যেতে পারে)-দের আবাসস্থল উক্ত অঞ্চলেই ছিল।

পূর্বভারতে মুরুণ্ডদের (শক-মুরুণ্ড-সমুদ্রগুপ্তের এলাহবাদ স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত) অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে ওই অঞ্চলে কুষাণ রাজশক্তির প্রসারণের ইঙ্গিত বহন করে। এই প্রসঙ্গে কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা এবং তাদের অনুকরণে পূর্বভারতে তৈরি মুদ্রার ব্যবহার উক্ত ইঙ্গিতকে আরও সতর্ক রূপ দেয়। বিহার, বাংলা এবং উড়িষ্যায় কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সম্ভাবনা আর একটি সম্ভাব্য অনুমানের জন্ম দেয়—তা

হল পূর্ব ভারতে কুষাণ আধিপত্য হয়তো বা মুরুণ্ডদের দ্বারাই পরিচালিত হত। যদি তাই হয় তবে বলা যেতে পারে, উক্ত শাসক রাজবংশ, জন্মসূত্রে অ-ভারতীয় হলেও হিন্দু ধর্মকে আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়েছিল (দীনেশচন্দ্র সরকার, এপিগ্রাফিক ডিসকভারিজ ইন্ ইস্ট পাকিস্তান, ১৬-১৭ পাতা)।

৪.৫ বাংলার গ্রামীণ বসতি—গুপ্তোত্তর যুগ

গুপ্ত রাজত্বকালে অধিকাংশ গ্রামীণ বসতিস্থাপনের নজির পাওয়া যায় উত্তর বাংলার অঞ্চলগুলিতে। কিন্তু পরবর্তী যুগে পূর্বাভিমুখে বসতিস্থাপনের একটা প্রবণতা লক্ষিত হয় যেখানে গ্রামগুলি বিচ্ছিন্নভাবে না থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে উঠেছিল। ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে উৎকীর্ণ জয়নাগের বপ্পঘোষবট লিপিটির প্রাপ্তিস্থান রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ-নদিয়া জেলার সীমানায় অবস্থিত বপ্পঘোষবট গ্রামটি উত্তর ও পূর্বে গঙ্গিনিকা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই গঙ্গিনিকা সম্ভবত বর্তমান জলঙ্গী বা কোনো ছোটো নদীও হতে পারে। উক্ত গ্রামটির পশ্চিমের অঞ্চল কুটকুট্ গ্রামের ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত এবং পূর্বের সীমা আপাতভাবে দক্ষিণ মুখে প্রসারিত ছিল। আলোচ্য লিপিটিতে পদত্ত গ্রামটির বিস্তারিত সীমানা-নির্ধারক বিবরণ থেকে সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে, সুপরিচিত প্রাকৃতিক সীমানাগুলি (যেমন—নদী, কৃষিজমি এবং যে গ্রামটি দান করা হয়েছে তার সংলগ্ন গ্রামসমূহ প্রভৃতি) দ্বারা কোনো ভূমিখণ্ডের প্রকৃত অবস্থান এবং সীমা নির্ধারণ করা হত।

তবে গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগে সমগ্র বাংলায় গ্রামীণ বসতিগুলি একই নিয়মে বা একই ধাঁচে স্থাপিত হয় নি। সম্ভবত জমির তারতম্য অথবা ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বসতি স্থাপনের সুযোগ-সুবিধার তারতম্যে গ্রামীণ সমাজের বসবাসের এলাকারও তারতম্য ঘটেছিল।

লিপিমালার সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায়, আলোচ্য গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে মোটামুটিভাবে দুই ধরনের গ্রামীণ বসতির অস্তিত্ব ছিল—(১) কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বসতিপূর্ণ অঞ্চল, যা বাস্তু ও ক্ষেত্রকে একত্রিত করে একটি সম্মিলিত জনবসতির রূপ নেয়। (২) নতুন বসতির সৃষ্টি; সুবিস্তৃত ভূভাগ জুড়ে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যগণের প্রত্যেকের জন্য পৃথক বসতির ব্যবস্থা এই নবস্থাপিত উপনিবেশে করা হয়েছিল। কুমিল্লা অঞ্চলে প্রাপ্ত লোকনাথের লিপিতে আরণ্যক প্রদেশে (অটবী-ভূখণ্ড) জনমানবহীন শ্বাপদ-সংকুল স্থানে ব্রাহ্মণ্য বসতি স্থাপনের নজির রয়েছে সে কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি।

বিজয়সেনের মল্লসারুল লিপিতে অব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের একাংশের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদেরও 'অগ্রহার' ভূমিতে বসবাসকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শশাঙ্কের মেদিনীপুর তাম্রফলক ও এগরা তাম্রশাসন থেকে গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণির অন্তর্গত হিসাবে মহামহত্তর, প্রধান, মহাপ্রধান প্রভৃতি নতুন কয়েকটি রাজপদমর্যাদাভুক্ত নাম পাওয়া যায়, যাঁরা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের ভূমিদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

৪.৬ সামাজিক ইতিহাস—পাল, সেন ও সমসাময়িক রাজাদের যুগ

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় খ্রিস্টীয় সপ্ত শতকের মধ্যভাগ থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য বা অরাজক অবস্থা নিঃসন্দেহে আলোচ্য রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাবে বিস্তার করেছিল। আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায়, গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে পূর্বাঞ্চলে (গৌড়, মগধ ?) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সমাজে তার কতটা প্রভাব পড়েছিল তা সঠিক বলা যায় না। শশাঙ্কের পরবর্তী সময়ে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে যে উত্থান-পতন ঘটে তার বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে এই ভাঙাগড়ার খেলায় তখনকার আর্থ-সামাজিক জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রফলকে অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে বাংলায় 'ম্যাৎস্যন্যায়' কিরূপে সমাপ্ত হল এবং 'প্রকৃতি' গণের দ্বারা গোপাল কীভাবে রাজা নির্বাচিত হলেন তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। বস্তুত পাল বংশের প্রতিষ্ঠা গোপালের সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে বাংলার রাজনীতিই শুধু নয় সমাজ-সংস্কৃতিও নতুন আলোর সন্ধান পায়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী নাগাদ বিভিন্ন গোত্র ও প্রবর ভুক্ত, শ্রৌত আচার পালনকারী, বৈদিক অনুশাসনের একাধিক শাখার ব্রাহ্মণগণ বিপুল সংখ্যায় সমগ্র বাংলায় বসতি বিস্তার করেন। ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্ত থেকে ক্রমাগত ব্রাহ্মণগণের আগমনে তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে—সমসাময়িক লিপিগুলি তারই প্রমাণ। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের প্রচুর লেখমালাতে লাট (গুজরাট), মধ্যদেশ ছাড়াও ক্রোড়ঞ্চী বা ক্রোড়ঞ্চ (কোলঞ্চ), তরকারি (শ্রবস্তীতে অবস্থিত),

মুক্তাবাস্তু, হস্তীপাদ, মাৎস্যাবাস, কুন্তীর এবং চন্দ্রাবার নামক স্থান থেকে বাংলায় এসে বসতি স্থাপনকারী ব্রাহ্মণদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুগে ব্রাহ্মণদের শ্রেণিবিন্যাস করা হত তাদের 'গামী' অনুসারে। 'গামী' শব্দটি 'গ্রাম' শব্দ থেকে আগত। রাজা বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দান করা গ্রামের নামানুসারে ওই দানগ্রহীতা পরিবারটির 'গামী' স্থির করা হত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খ্রিস্টীয় শতকের সাহিত্য ও লিপিতে এই সকল 'গামী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবিশাল কুলুজি সাহিত্যে ব্রাহ্মণধর্মাবলম্বী বিভিন্ন শাখাগোষ্ঠীর জন্মবৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কথিত আছে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ বেদশাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন, সেই কারণে গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কনৌজ থেকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানান। এই রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশেই বসবাস শুরু করেন। তাঁদের ভরণ-পোষণের জন্য গ্রামসমূহ দান করা হয়। গ্রামের নাম অনুসারে তাঁদের পদবী বা 'গামী' নির্দিষ্ট হয়েছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মতো কিছু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছাড়া আধুনিক বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় এই ব্রাহ্মণদেরই উত্তরসূরি বলে অনুমান করা যেতে পারে।

সেনরাজ বল্লালসেনের আমলে ব্রাহ্মণগোষ্ঠী 'রাঢ়ীয়' এবং 'বারেন্দ্র'—এই দুই নামে পরিচিত হতে থাকেন ; বস্তুত যে অঞ্চলে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল। তাঁদের ব্যক্তিগত গুণাবলি ও উৎকর্ষতার যাচাই করে তবেই 'কুলীন' পর্যায়ভুক্ত করা হত। আলোচ্য যুগের লেখমালাসমূহের তথ্য থেকে কিন্তু আদিশূরের সময়ে বাংলাদেশে বেদশাস্ত্র-পারঙ্গম ব্রাহ্মণের অভাব ছিল—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। আদিশূরের রাজত্বকাল আনুমানিক ৬৫৪ শকাব্দ ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ। এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয় যে, আদিশূরের রাজত্বের আগে মাত্র সাতশত ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ছিল, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ বাংলা থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, কারণ, মাত্র পাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততির একহাজার বা বারোশত বছরের মধ্যে সংখ্যায় কয়েক লক্ষ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। অষ্টম খ্রিস্টীয় শতকের পরবর্তী সময়ের অসংখ্য লিপি কিন্তু কনৌজী ব্রাহ্মণ বা কুলীন সম্পর্কিত কাহিনিটির সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নীরব লেখমালাগুলির এই নীরবতা আমাদের উপরিউক্ত সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় একটি প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে, স্থান থেকে স্থানান্তরে ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপন অত্যন্ত সাধারণ একটি রীতি হয়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে

উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণদের অভাব বা তাঁদের জ্ঞান ও সামাজিক অবস্থানের ঘাটতি থাকার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

কুলজি-সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে, গৌড়ের শ্যামলবর্মণ ১০০১ শক অব্দে কান্যকুব্জ (বা বারাণসী) থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলার ব্রাহ্মণরা যজ্ঞাগ্নি নির্বাহ করতে জানত না এবং বেদ জ্ঞানও ছিল না, সেই কারণে এঁদের আনতে হয়েছিল। অপর একটি ভাষ্যে দেখা যায়, সরস্বতী নদীর তীরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল ; তাঁদের কয়েকজন বাংলায় এসে রাজা হরিবর্ম্মণের আনুকূল্যে কোটালিপাড়া (ফরিদপুর) অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। সম্ভবত বর্মণ বংশীয় রাজত্বকালে বেদজ্ঞ কিছু ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসেছিলেন।

বল্লাল সেনের 'দান-সাগর' সারস্বত নামে একশ্রেণির ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছে। বিহারের গয়া জেলায় প্রাপ্ত ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ একই লিপিতে অপর এক শ্রেণির ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এঁরা হলেন 'শাকদ্বীপী' ব্রাহ্মণ। কুলজি-র বিবরণ অনুযায়ী, সারস্বত ব্রাহ্মণগণ অন্ধ্ররাজ শূদ্রকের আমন্ত্রণে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী প্রদেশ থেকে আসেন এবং তাঁদের পূর্বপুরুষগণ, যাঁরা 'গ্রহ-বিপ্র' নামে পরিচিত, তাঁরা গৌড়রাজ শশাঙ্কের অনুরোধে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

ব্রাহ্মণদের স্মৃতিশাস্ত্র-নির্দেশিত কর্তব্যকর্মগুলির যে বিবরণ পাওয়া যায় তা হল যজন-যাজন-অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান ও গ্রহণ। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে বেদশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ও দুর্লভ রত্নসম্ভারের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য ছাড়াও পালরাজগণের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করতেন। নারায়ণ পালের বদল স্তম্ভলিপি এবং শামল বর্মণের বজ্রযোগিনী তাম্রফলকে দুইটি ব্রাহ্মণ পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা বেদ-বিহিত কর্মে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও পাল ও বর্ম্মণ রাজাদের অধীনে মন্ত্রণাদাতা ও সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ করতেন। ব্রাহ্মণদের আচরিত অন্যান্য বৃত্তিগুলির মধ্যে কৃষিকার্যকে স্মৃতি ও নিবন্ধকারগণ অনুমোদন করেছেন।

খালিমপুরে (মালদা জেলা) প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রানুশাসনে পাল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত প্রধান নারায়ণ বর্ম্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, এই নারায়ণ বর্ম্মণ, নন্য-নারায়ণের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যিনি মূলত লাট ব্রাহ্মণ (দ্বিজ)-দের আরাধ্য দেবতা। পাল সম্রাট ধর্মপাল উক্ত দেবতার সেবা

এবং পুরোহিতদের ভরণ-পোষণের জন্য চারটি গ্রাম দান করেছিলেন। ডি. আর. ভাণ্ডারকারের মতে, উক্ত দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণ নিঃসন্দেহে গুজরাটের আনন্দপুর বা বাড়নগর থেকে আগত নাগর-ব্রাহ্মণ। তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণগোষ্ঠীই নয়, পাল-রাজবংশ কর্তৃক উৎকীর্ণ সব লিপি (ধর্মপাল ব্যতীত) কর্ণাট এবং লাট দেশ থেকে বাংলায় এসে বসতি স্থাপনকারী চাট, ভাট ইত্যাদির উল্লেখ করেছে যা থেকে বোঝা যায় অন্যান্য জাতির মানুষও ভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে পাকাপাকিভাবে চলে আসে। ভান্ডারকার চারটি আঞ্চলিক জাতির উল্লেখ করেছেন (এরা হল গৌড়, মালব, খস এবং হূণ) যারা কুলিক বা কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে পাল যুগে বাংলার জনসমাজের একটি বহুজাতিক চরিত্র ছিল।

ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে আলোচনার পর কায়স্থদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তিব্বতীয় সাহিত্য পাগ-সাম-জোন-ঝাং ধর্মপালের অধীনস্থ রাজকর্মচারী দঙ্গাদাসকে 'কায়স্থ' (লেখক বা কর্মচারী) রূপে বর্ণনা করেছে। অনুমান করা যেতে পারে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের পরবর্তী সময়ে বাংলায় জাতি হিসাবে 'কায়স্থ' গণ স্বীকৃতি লাভ করে। খ্রিস্টীয় দশম শতক নাগাদ কায়স্থগণ একটি স্বীকৃতি জাতি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল (গৌড়-কায়স্থ-বংশ) শ্রীধরের 'ন্যায়কন্ডলী' নামক ভাষ্যে কায়স্থ কুলপ্রধান পান্ডুদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় (৯৯১ খ্রিস্টাব্দ)। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অবশ্য এই ধারণার বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। তিনি পান্ডুদাসকে বাংলাদেশের বাসিন্দা এবং 'ন্যায়কন্ডলী' বাংলাদেশে রচিত হয়েছিল একথা মানতে দ্বিধা করেছেন। বস্তুত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাণ্ডারকারের মতবাদের সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন নি। তাঁর মতে, নাগর ব্রাহ্মণদের ব্যাপকভাবে বাংলায় আসার যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বর্ণিত বঙ্গদেশের 'নাগর' ব্রাহ্মণগণ ছিলেন নগর বা শহরে আবাসিত ব্রাহ্মণ। ভাণ্ডারকারের মতে, এই নাগর ব্রাহ্মণগণ বাংলায় এসে কায়স্থ পদবীগুলি ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং তাঁরা কায়স্থ জাতির পরিচিতি পান। কিন্তু এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

কায়স্থদের মূল বৃত্তি জীবিকা প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঈশ্বর ঘোষের রামগঞ্জ তাম্রফলকে রাজকর্মচারীগণের তালিকায় 'মহাকায়স্থ'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলা থেকে প্রাপ্ত এই লিপি অন্ততঃ এটুকু জানতে সাহায্য করে যে, দ্বাদশ শতক নাগাদ কায়স্থদের ভূমিকা করণিকের থেকে আলাদা ছিল। সম্ভবত তারা লেখক বা হিসাব-রক্ষকের কাজ করত। খালিমপুর

তাম্রফলকে ধর্মপালের রাজকর্মচারীদের তালিকায় 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ'-র উল্লেখ রয়েছে। অনুমান করা যায়, পালযুগে মূলত রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত জেলান্তরের কর্মচারিগণ মূলত কায়স্থ-পদমর্যাদা শব্দ-প্রদীপ-নামে একটি চিকিৎসাশাস্ত্রের টীকাকার নিজেকে 'করণ' পরিবারজাত (করণ-অন্বয়) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন রাজবৈদ্য এবং তাঁর পিতা ও পিতামহ ওই একই পদমর্যাদায় রাজা রামপাল এবং গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় উপস্থিত থাকতেন। রামচরিতের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর পিতাকে 'করণানাং-অগ্রণী এবং যুদ্ধ ও শান্তিস্থাপনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরূপে বর্ণনা করেছেন। বৈজয়ন্তীর লেখক খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে করণ ও কায়স্থকে সমার্থক বলে মনে করেছেন যা 'লিপিকার' অর্থে ব্যবহৃত হত। কায়স্থদের অনুসৃত বৃত্তি গ্রহণকারী করণগণ বাংলার সমাজে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মতো বাংলাদেশেও কায়স্থদের সঙ্গে তাদের একত্রীকরণ ঘটে।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের আগে জাতি হিসাবে বৈদ্যদের অস্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশানদেবের ভাতেরা তাম্রফলকে তাঁর মন্ত্রী বনমালী করকে বৈদ্য-বংশ-প্রদীপ' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে কৈবর্ত প্রধান দিব্য-র নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা নিঃসন্দেহে কৈবর্ত জাতির সামাজিক গুরুত্বের পরিচায়ক। ভবদেব ভট্ট অবশ্য কৈবর্তজাতিকে সাতটি অন্ত্যজ জাতির অন্যতম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্য মাতার অনুলোম বিবাহজাত সন্তানকে 'কৈবর্ত' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিগুলি কৈবর্ত জাতির সমগোত্রীয় মাহিষ্যদের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যনারীর সন্তানরূপে বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মনুসংহিতা এবং জাতকের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় কৈবর্তগণ কৃষিজীবি এবং মৎস্য-সংগ্রাহক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বল্লাল চরিত্রের বর্ণনায় দেখা যায়, বল্লালসেন কৈবর্তদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই জাতিকে 'অব্রাহ্মণ্য' বলা হয়েছে। মূলত একটি আদিম উপজাতি হলেও কৈবর্তগণ আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মিশ্র জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং 'মাহিষ্য'রূপে পরিচিত হয়।

বৃহদ্ ধর্ম ও ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে আর্য সংস্কৃতির অন্তর্গত নয় এমন বহু জাতি ও উপজাতির নাম পাওয়া যায়। ভবদেবের বর্ণনায় এদের কয়েকটি 'অন্ত্যজ' হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রফলকে বাংলার সীমান্তে অরণ্য অঞ্চলে বসবাসকারী 'পুলিন্দ' জাতির উল্লেখ আছে, এই জাতির নারীকুলের গুঞ্জার মালার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

বৃহদ-ধর্ম-পুরাণে শূদ্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুরাণের মতে সকল মিশ্র জাতি অর্থাৎ কার্যত সকল বাংলাদেশে বসবাসকারী অব্রাহ্মণ জনগোষ্ঠী শূদ্রশ্রেণির অন্তর্গত। এই তাত্ত্বিক নির্দেশ বাংলার সামাজিক জীবনে পালন করা হত কিনা সঠিকভাবে বলা কঠিন।

'পবনদূত' কাব্যে ধোয়ীর বর্ণনা থেকে জানা যায় লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুরা-র রমনীগণ যথেষ্ট মুক্ত জীবনযাপন করতেন ; পর্দা-প্রথার কঠোর প্রচলন ছিল না। কিন্তু পবনদূতের রচয়িতা ধোয়ীর পূর্ববর্তী সময়ে লেখা বাৎসায়নের কামসূত্রে বঙ্গের রাজার হারেমে পর্দা প্রথার অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পবনদূতের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় সেযুগের নারীগণ শিক্ষিতা এবং অনেকেই বিদূষী ছিলেন। জীমূতবাহন অপুত্রক বিধবার তার মৃত স্বামীর সকল সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করেছেন, তবে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক রাখা বা দান করার কোনো অধিকার উক্ত বিধবা নারীকে দেওয়া হয় নি। জীমূত বাহনের বিবৃতি অনুসারে, মৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত হয়ে পবিত্র দেহ-মনে একনিষ্ঠ বিধবার জীবনযাপন করার শর্তেই কোনো নারী উক্ত সম্পত্তির অধিকার অর্জন করতে পারবে।

পতির বহুবিবাহ নিঃসন্দেহে নারী জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। তবে নারীর দৈহিক পবিত্রতার প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হলেও তা সম্ভবত শাস্ত্রকারদের রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ সমসাময়িক তথ্যবিবরণ থেকে সমাজে যথেষ্ট শৈথিল্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'পবনদূত'-কাব্যে সামাজিক জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা রক্ষণশীলতার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সমাজজীবনের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই তাকে গ্রহণ করা হত। শুধুমাত্র পবনদূত বা রামচরিত-এর বিবরণ নয়, সেনরাজাদের রাজকীয় নথিপত্রের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায়, বারবণিতাগণ সমাজে যথেষ্ট সমাদৃতা ছিলেন। জীমূতবাহনের রচনায় ক্রীতদাসী রাখার প্রথা উল্লিখিত হয়েছে ; তাঁর টীকাকার অবশ্য এই নারীদের 'রক্ষিতা' হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। মন্দিরগুলিতে দেবদাসী-প্রথারও প্রচলন ছিল। সমসাময়িক উপাদানগুলিতে বিজয় সেন এবং ভবদেব ভট্টের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরসমূহে আত্মনিবেদিত শতাধিক রমণীর দেহমাধুর্য ও আকর্ষণী ক্ষমতার বর্ণনা পাওয়া যায়। ধোয়ীর কাব্যেও সুহ্মদেশের সেন রাজ (সম্ভবত লক্ষ্মণসেন) কর্তৃক স্থাপিত মন্দিরের জনৈকা দেবদাসীর উল্লেখ আছে। এই প্রথা পাল-সেন যুগের আগে

থেকেই সম্ভবত সমাজে প্রচলিত ছিল, কল্‌হন-রচিত রাজতরঙ্গিণীতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে পুণ্ড্রবর্ধনের একটি মন্দিরের নর্তকী কমলার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত সে একজন পুরনারী ছিল। আলোচ্য রমনীগণ নৃত্য-গীত এবং অন্যান্য কলায় পারদর্শিনী ছিলেন। মন্দিরের সেবাকার্যে নিয়োজিত হলেও এঁরা প্রায়শই সাধারণ বারাঙ্গণার অধিক গুণসম্পন্না ছিলেন না।

পাহাড়পুর অঞ্চলে (প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত—বর্তমান বাংলাদেশ) প্রাপ্ত ভাস্কর্য থেকে আলোচ্য যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আভরণ সম্পর্কে প্রচুর সম্যক ধারণা করা যেতে পারে। সাধারণত পুরুষদের পরিধেয় ছিল ধুতি, যা প্রায়শই হাঁটুর নীচে নামত না। নারীগণ পরিধান করতেন শাড়ি, তা পায়ের পাতা স্পর্শ করত। পালযুগে পোশাক পরিধানের ধরণ এমনটাই ছিল। এই সময়ের পূর্ববর্তী যে সকল ভাস্কর্য পাহাড়পুরে দেখা যায়, তাদের চরিত্র ভিন্ন। বালক কৃষ্ণের বেশ-ভূষা বা অলংকার সম্ভবত তৎকালীন শিশুদের পোশাককে উপস্থাপিত করেছে। নারী বা পুরুষ উভয়েই কেশবিন্যাস করতেন সুচারুভাবে, তবে মস্তক আচ্ছাদন ব্যবহারের রীতি কারুর মধ্যেই দেখা যায় না। এই যুগের নারী-পুরুষের ব্যবহৃত অলঙ্কারের ধরণ মোটামুটিভাবে অভিন্ন ছিল। তারা কর্ণাভরণ, দ্বিলহরী কণ্ঠহার, বাজুবন্ধ, চূড়, বলয় ইত্যাদি ব্যবহার করতেন।

সাহিত্যিক উপাদানগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণের খাদ্যাভাস চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করেই অপরিবর্তিত থেকেছে। তণ্ডুল, মৎস্য, মাংস, ফলমূল, শাকসব্জি এবং দুগ্ধ বাঙালির খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পেত। বাংলার ব্রাহ্মণগণ মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করতেন বলে জানা যায়, যা বাংলার বাইরে সাধারণত ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। বৃহদ্-ধর্ম-পুরাণে ব্রাহ্মণদের গ্রহণযোগ্য একটি মৎস্য-তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে।

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং সপ্তম শতকের শেষার্ধে যখন তাম্রলিপ্তে অবস্থান করেছিলেন তখন তাঁর বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হয়। কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তিনি আহারে আমন্ত্রণ করায় তাঁকে বলা হয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ বেহিসাবী আহারের আয়োজন করাই বাংলার জনগণের প্রাচীন রীতি, শুধুমাত্র উদরপূর্তির পক্ষে যথেষ্ট আহারের উপকরণ থাকলে অতিথির নিকট ওই বৌদ্ধ পরিব্রাজক হাস্যাস্পদ হবেন। এই তথ্য কতদূর সত্য সে বিচারে না গিয়ে অনুমান করা যেতে পারে, অপরিমিতভাবে দ্রব্যের ব্যবহার করার অভ্যাস বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত ছিল।

রামচরিতে বরেন্দ্রীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার 'মুরজ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের নাট্যশাস্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ—নির্দেশিত বিধিনিয়ম মেনে দেবদাসী, বারবণিতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়েই নৃত্য ও গীতের সাধনা করত। সাহিত্য এবং লেখমালায় গীতবাদ্য ও নৃত্যের পর্যাপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। পাহাড়পুরে ভাস্কর্যে নৃত্যরত ভঙ্গীতে কতিপয় যুগলমূর্তি এবং ঢাক-ঢোল, বাঁশি, মৃৎপাত্র প্রভৃতি বাদনরত সহযোগী বাদ্যকরদের সন্ধান মেলে। মহিলাদের অবসর-বিনোদন ছিল উদ্যান রচনা এবং জলক্রীড়া। পুরুষগণ কুস্তি ও শরীরী কসরৎ-এর অবসর যাপন করত।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প আসুর ভাষা ব্যবহারকারী বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রদের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত গৌড় ও পুণ্ড্রে আসুর ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।

৪.৭ অনুশীলনী

১। প্রাচীন বাংলাদেশ কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল? তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২। বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩। বৈদেশিক বিবরণে উল্লিখিত 'গঙ্গারিডাই' কোথায় অবস্থিত ছিল? কী কারণে একে বঙ্গদেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়?

৪। গুপ্তোত্তর যুগে বাংলার সামাজিক অবস্থা কীরূপ ছিল?

৫। গুপ্তোত্তর যুগের গ্রামীণ বসতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৬। পাল-সেন ও তার সমসাময়িক যুগে বাংলার সমাজ-জীবনের একটি সামগ্রিক আলোচনা করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar — *History of Ancient Bengal*, Calcutta, 1971

২। নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব, কলকাতা, ১৯৬০

৩। F.J. Monahan — *The Early History of Bengal*, Oxford, 1925

৪। A. Bhattacharya — *Historical Geography of Ancient and Early Medieval Bengal,* Calcutta, 1977.

৫। M. Banerjee (edited) — *Essays on Early Bengal, Epigraphy*, Jadavpur University, 2005.

৬। R.D. Banerjee — "The Palas of Bengal", *Memoirs of the Asiatic Soceity of Bengal*, V, Calcutta, 1915.

৭। B.N. Mukherjee — "The Territory of the Gangaridai"—*Journal of Indian Landscape Systems and Ecological Studies,* X, Calcutta, 1987.

৮। D.R. Bhandarkar — The Nagar Brahmanas and the Bengal Kayasthas"—*Indian Antiquary,* LXI, 1932.

সপ্তম (খ) পত্র
পর্যায়—৩

একক ১ ❑ আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ

গঠন

০.১ প্রস্তাবনা
১.১ প্রাক্কথন
১.২ ভাষার ইতিবৃত্ত
১.২.১ আঞ্চলিক ভাষা ও লিপির উদ্ভব
১.৩ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
২.০ প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যের ভাষা ও ক্রমবিকাশ
৩.০ দক্ষিণ-ভারত : আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য : তামিল
৩.১.১ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ
৪.০ আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও সাহিত্যের বিকাশ : পূর্বভারত
৫.০ পশ্চিম ভারত : গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ
৬.০ উত্তর ভারত : আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ
৭.০ কথান্ত
৮.০ অনুশীলনী
৯.০ গ্রন্থপঞ্জী

০.১ প্রস্তাবনা

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কলসীমাটিকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে আদি মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের পাঠ্যনির্দিষ্ট সময়কালটি হল খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত, যাকে মোটামুটিভাবে আদি-মধ্যযুগের অন্তর্গত কাল রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

আদি মধ্য যুগটি বিভিন্ন কারণে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য কালপর্বটির ব্যাখ্যা নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে মতদ্বৈততা আছে। এই এককটিতে আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল এবং তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.১ প্রাক্‌-কথন

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে বিশেষত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক স্থানীয় শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এই প্রবণতা তুর্কী আক্রমণের সময় পর্যন্ত বিশেষ সক্রিয় ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই খন্ডীকরণ স্বভাবতই আঞ্চলিকতার বাতাবরণ তৈরী করে। ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতি তার ব্যতিক্রম নয়। এই উপমহাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্যায় অনিবার্যভাবে তাই আঞ্চলিকতার প্রভাব এবং তার ক্রমবিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতাটি ছিল মৌর্য রাজবংশের প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। গুপ্ত রাজত্বকালে ভারতবর্ষে একটি খন্ডীকৃত রাজনৈতিক কাঠামো ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হয়। এই সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। থানেশ্বর ও কনৌজকে কেন্দ্র করে হর্ষবর্ধন গড়ে তোলেন এক বিশাল সাম্রাজ্য যা তাঁকে 'উত্তরাপথনাথ' অভিধায় ভূষিত করে। কিন্তু হর্ষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়—সারা উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করে অগণ্য আঞ্চলিক শক্তি। অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারতের একাংশ নিয়ে গড়ে ওঠে গুর্জর—প্রতিহার সাম্রাজ্য। পূর্বভারত ও উত্তর ভারতের অবশিষ্টাংশ নিয়ে গড়ে ওঠে পাল সাম্রাজ্য। একই সময়ে রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্য তথা সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এইভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বিভাজন আঞ্চলিক শক্তির প্রভাববৃদ্ধির সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, আলোচ্য কালসীমায় ব্যাপকহারে ভূম্যধিকারের হস্তান্তর এবং একটি ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উত্থান লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভূমিদান বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কিন্তু গুপ্তোত্তর যুগে ব্যাপকভাবে ভূমি হস্তান্তরের প্রথার অনুশীলন শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ কালক্রমে একটি সম্পন্ন ও শক্তিশালী ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আলোচ্য কালপর্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল জাতির বিস্তার। জাতিবিস্তারের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকেই। বৈদিক শিক্ষারীতির পাশাপাশি গোত্র, প্রবর, গ্রাম পরিচিতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মণ্য সমাজে অসংখ্য জাতি, উপজাতির সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক সাহিত্যে নিশ্চিতভাবে তার প্রভাব পড়ে। ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত রাজপুত জাতি এই সময় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রচিত হয় রাজপুতজাতি কেন্দ্রিক সাহিত্য। তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে শূদ্রদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। আর্যীকরণের ফলে বহু উপজাতিয় জনগোষ্ঠী শূদ্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রবেশ করে। বহু পেশাদার কারিগর গোষ্ঠী জাতিতে রূপান্তরিত হয়—সমাজ বহুধাবিভক্ত জাতিব্যবস্থার অনুসারী হয়ে ওঠে।

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি এ সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে। ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশৈলীতে আঞ্চলিকতার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। অধ্যাপক

রামশরণ শর্মার মতে সমগ্র ভারতবর্ষ যে অসংখ্য রাজনৈতিক এককে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে; সেগুলি ছিল একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতকের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন কমে আসার ফলে আঞ্চলিকতার ধারণা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে।

১.২ ভাষার ইতিবৃত্ত

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনার আগে ভারতবর্ষে ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন প্রসঙ্গে একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভাষা হল এমন এক বাঙ্ময় স্বনির্ভর সংকেতধর্মী প্রকাশ যার রীতিসিদ্ধ প্রচলিতি গড়ে ওঠে সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। কতকগুলি ধ্বনি বা অক্ষর সমবায়েই ভাষা রচিত হয় না। সেগুলি যদি কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর নিকট বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে, তখনই তাকে বলা যায় 'ভাষা'। এই জন্যই ভাষা 'রীতিসিদ্ধ'। ভাষা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের নিরবয়ব ধারণার প্রতীক। ভাষার আর একটি লক্ষণ হল যে এটি বাঙ্ময়। ভাষার অর্থবহ প্রকাশ নানাভাবেই ঘটতে পারে যেমন অঙ্গভঙ্গি বা ইঙ্গিত দ্বারা, লিখিত রচনার মাধ্যমে অথবা কোনো বিশেষ চিহ্নের দ্বারা। 'ভাষা' অর্থে কিন্তু প্রধানত বাঙ্ময় প্রকাশকেই বুঝতে হবে। কারণ, শ্রোতা ও বক্তার ব্যক্তিমানস, জীবনবোধ, মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষেপ অথবা চিন্তানির্ভর দ্বান্দ্বিক প্রত্যয় ইত্যাদি কেবল বাঙ্ময় প্রকাশেই উন্মীলিত হয়। ভাষার আশ্রয় হল সমাজ। সমাজভুক্ত ভাষাভাষীর সহযোগ, মনোভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়া হল ভাষার দৃঢ়মূল ভিত্তি। অপরদিকে জনজীবনের ইতিহাস, চরিত্র, মানসিকতা অথবা সমাজসত্ত্বার অভিজ্ঞতা অন্তঃপুরেই সঞ্চিত হতে থাকে। তাই ভাষা যেন এক 'সামাজিক চুক্তিবিশেষ'।

১.২.১ আঞ্চলিক ভাষা ও লিপির উদ্ভব

আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের যে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে মৈথিলী, গুজরাটি, রাজস্থানী, বাংলা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষা সেই সময়েই তার প্রাথমিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে যেমন আদি অসমীয়া, আদি বাংলা, আদি ওড়িয়া বা আদি মৈথিলী ভাষার ক্রমবিবর্তনটি লক্ষ্য করা যায় তেমনই পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের বিবরণ পরিস্ফুট হয় বৌদ্ধ বজ্রযান সাহিত্যে। জৈন প্রাকৃত সাহিত্য থেকে পশ্চিম ভারতের সংস্কৃতিগত বিবর্তনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে, অগ্রহার প্রথার ব্যাপক প্রচলনে খৃষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতক থেকে যে সব ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতা উত্তর ভারত থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রহ্মদেয় বা ঐ জাতীয় নিষ্করভূমিতে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরাই আদি প্রাগার্য উপভাষা এবং প্রচলিত আর্যভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ ঘটান, যা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে।

শুধুমাত্র উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, দাক্ষিণাত্যে আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যও কম ছিল না। সংস্কৃত অভিজাত শ্রেণীর ভাষা হিসাবে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত হলেও সাধারণ জনসমাজে কানাড়া ভাষা বহুল ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের একটি চালুক্য লেখতে

তার সমর্থন আছে। প্রাকৃতের পরিবর্তে তামিল ভাষাকে দৈনন্দিন কথোপকথনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের জৈন ধর্মগোষ্ঠী।

এবার লিপির প্রসঙ্গে আসা যাক। সংস্কৃত লিপ্ ধাতু থেকে 'লিপি' শব্দটির উৎপত্তি। লিপ্ ধাতুর অর্থ লেপন করা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ভূর্জপত্রে ও তালপত্রে ধাতুনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র কলমদ্বারা দাগ কেটে তার ওপর কালি মাখিয়ে দেওয়া হত। এই রঞ্জক পদার্থ লেপন করা থেকে 'লিপি'র উৎপত্তি।

অশোকের গিরি অনুশাসনে ব্রাহ্মী হরফে লিপি শব্দটি অন্তত ছয়বার উৎকীর্ণ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'লিপি'-র স্থলে 'দিপি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের উৎকীর্ণ গিরি অনুশাসনে ভারতীয় লিপির দুইটি ধারা দেখা যায়—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খরোষ্ঠী এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপি। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর খরোষ্ঠী লিপির সন্ধান পাওয়া যায় না, ব্রাহ্মী সর্বভারতীয় লিপি হয়। ব্রাহ্মী বাম থেকে দক্ষিণে লিখিত।

উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মীলিপির স্বতন্ত্র ধারার বিবর্তন ঘটেছে। উত্তরভারতে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে কুষাণ রাজত্বকালে ও চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মীলিপির পরিবর্তন ঘটে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ও পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মীলিপি অঞ্চলভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে, এগুলি হল ১. 'শারদা' লিপি (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাব অঞ্চলে), ২. 'নাগর' লিপি (দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট রাজপুতনা মালবে এবং মধ্যদেশে), ৩. 'কুটিল' লিপি (পূর্বভারতে)। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উত্তরভারতে, নাগরী লিপির প্রসার ঘটেছিল। 'নাগর' থেকে পরবর্তীকালে দেবনাগরী, গুজরাটী, কায়থী লিপির উৎপত্তি; শারদা লিপি থেকে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে গুরুমুখী এবং কুটিল লিপি থেকে বাংলা, মৈথিল, অসমীয়া, ওড়িয়া ও নেপালী লিপির উদ্ভব। প্রায় সহস্রাব্দ পূর্বে বাংলা ও দেবনাগরী লিপি নিজস্বরূপ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মীলিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন লিপির মধ্য দিয়ে কালক্রমে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হয়েছে।

১.৩ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মের বাহন হল সংস্কৃত ভাষা। কাল ও ভাব অনুযায়ী এই ভাষার দুটি স্তর—একটি বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, অপরটি বৈদিকোত্তর সাহিত্যের ভাষা। সাধারণভাবে দ্বিতীয় স্তরটির ভাষাই সংস্কৃত বা Classical sanskrit নামে পরিচিত। সংস্কৃত ভাষার মূল হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং সেই সূত্রে ইউরোপের গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগ নিবিড়। ইরাণের প্রাচীন আবেস্তীয় ভাষা ও প্রাচীন পারসিকের সঙ্গেও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্ক যুক্ত।

সমগ্র সংস্কৃত রচনাবলী মোটামুটিভাবে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত, যেমন, সাহিত্য, দর্শন, তন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যকে যুগপর্যায় অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—বৈদিক যুগ, মহাকাব্য এবং পুরাণের যুগ, ক্লাসিকাল বা পাণিনির পরবর্তী যুগ।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের রচনা বা সংকলনকাল ধরা হয় আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। বৈদিক সাহিত্য চারটি পর্যায়ে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। বেদ চারটি—ঋক্, সাম ও যজুঃ এবং অথর্ব। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে বিবিধ যজ্ঞকার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা, কিছু কিছু প্রাচীন উপাখ্যানের সন্নিবেশ। ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট উপনিষদ। আরণ্যকগুলিতে কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা আছে। ঋগ্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত ছান্দোগ্যপনিষদ সামবেদের অন্তর্গত। শুক্লযজুর্বেদের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হল শতপথ ব্রাহ্মণ।

শব্দজ্ঞানের জন্য রচিত হয় ব্যকরণ, ব্যকরণসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হল পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক), কাত্যায়ন (সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) অষ্টাধ্যায়ীতে 'বার্তিক' নামক কয়েকটি সূত্র সংযোজিত করেন। পতঞ্জলি (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) সমগ্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন 'মহাভাষ্য' নামক গ্রন্থে। পরবর্তীকালে যে সমস্ত ব্যকরণ লেখা হয় তার মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রচিত বোপদেবের মুগ্ধবোধ উল্লেখযোগ্য। আলংকারিকদের মধ্যে দণ্ডী (আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক), ভামহ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), আনন্দবর্ধন, মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, খৃষ্টীয় দশম শতকে রচিত ধনঞ্জয়ের দশরূপ প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। যজ্ঞকাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য। এই মহাকাব্যদ্বয় কোনো নির্দিষ্ট একটি যুগে বা একই ব্যক্তির দ্বারা রচিত নয়। উভয় গ্রন্থেই পরবর্তীকালের সংযোজন আছে। ভারতবর্ষের এই আদিকাব্য দুটি ঠিক কোন সময়ে তাদের প্রাথমিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা বলা কঠিন। তবে অনুমান করা যেতে পারে মহাভারতের বর্তমান রূপটি সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক বা তার নিকটবর্তী কোনো সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ হয় মহাভারতের এক বা দুই শতক পূর্বে। রামায়ণের প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের সম্পূর্ণ এবং ষষ্ঠ কাণ্ডের কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন বহু পণ্ডিত। রামায়ণের কবি বাল্মীকি এবং মহাভারতের কবি বেদব্যাস বলে প্রসিদ্ধি আছে। 'ভগবদ্গীতা' মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এবং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের নির্দেশক হিসাবে যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যরূপে পরিগণিত। পুরাণ গ্রন্থগুলির সংখ্যা প্রচুর। দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই পুরাণের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অনেক কাব্য নাটকের উপজীব্য।

পাণিনির কালকে (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক) ক্ল্যাসিকাল যুগের প্রারম্ভ বলে ধরা হয়। এই যুগের কাব্যগ্রন্থগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। রূপক ও উপরূপক শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থাবলী দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ—পদ্য, গদ্য এবং চম্পু। দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বহু বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

কালিদাস-পূর্ব যুগের প্রসিদ্ধ কবি বা নাট্যকার অশ্বঘোষ ও ভাস। অশ্বঘোষ (আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক) দুইখানি কাব্য রচনা করেন। এগুলি হল 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ'। তিনি একখানি বড় নাটকও (প্রকরণ) লিখেছিলেন, যার নাম 'শারিপুত্র'। ভাসের কাল অজ্ঞাত, তবে তাঁর নামে অনেক

গ্রন্থ প্রচলিত আছে, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। কালিদাস আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' প্রভৃতি নাটক রচনা করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার হিসাবে বিবেচিত হন। কালিদাস উত্তর যুগের সুপ্রসিদ্ধ কবি বা নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'কীরাতার্জুনীয়ম'-এর কবি ভারবি (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক), 'শিশুপাল বধ'-এর রচয়িতা কবি মাঘ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'মৃচ্ছকটিকম'-এর লেখক শূদ্রক, 'উত্তররামরচিত' প্রভৃতি নাটক প্রণেতা ভবভূতি (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক), 'মুদ্রারাক্ষস'-এর নাট্যকার বিশাখদত্ত (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক), 'রত্নাবলী' প্রভৃতির কবি রাজা হর্ষ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'রাবণবধ' বা ভট্টিকাব্য'-এর কবি ভট্টি (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'জানকীহরণ' -এর কবি কুমারদাস (আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'নৈষধচরিতের'র কবি শ্রীহর্ষ (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক) প্রভৃতি। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে কহ্লন, বিহ্লন, জয়দেব, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'দশকুমারচরিত'-এর লেখক দণ্ডী, 'বাসবদত্তা'র লেখক সুবন্ধু (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) এবং 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'-এর লেখক বাণভট্ট বিখ্যাত গদ্যকাব্য রচয়িতা। গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ত্রিবিক্রমভট্টের (আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতক) 'নলচম্পূ' বা 'দময়ন্তীকথা' ও 'মদালসাচম্পূ'। ভোজের নামে প্রচলিত 'রামায়ণচম্পূ' সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্বীয় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে জৈনগণ কিছু চম্পূকাব্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান সাহিত্য সে যুগে রচিত হয়েছিল।

২.০ প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

আর্য-সংস্কৃতির ক্রমবিস্তারের পূর্বে প্রাচীন বঙ্গভূমিতে সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার কোনো অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করার সপক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে এটুকু ধারণা করা যেতে পারে, প্রাচীন বাংলার বিস্তীর্ণ স্থলভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আর্য বসতি গড়ে উঠেছিল যার প্রভাবে বাংলাদেশের উচ্চবর্ণজ কিছু সামাজিক জনগোষ্ঠীর সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে আর্যভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন আরম্ভ হয়।

প্রাচীন বাংলায় আর্যভাষার ব্যবহারের প্রথম এবং অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় একটি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদন থেকে। এটি হল বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলেখ, যা আনুমানিক তৃতীয় খৃষ্টপূর্ব শতকে ব্রাহ্মলিপি এবং প্রাকৃতভাষায় লিখিত হয়। আমরা আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ সময়কালে উৎকীর্ণ আর একটি লিপির সন্ধান পাই বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে। এটি সংক্ষিপ্ত লিপি, সংস্কৃত ভাষায় রচিত। উপরিউক্ত লিপিদ্বয় প্রাচীন বাংলায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই অন্ততপক্ষে একটি সীমায়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ব্যবহার বা প্রচলন হয়েছিল এই ধারণার ইঙ্গিত বহন করে ঠিকই তবে এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ওই অঞ্চলে সংস্কৃত বা প্রাকৃতভাষার ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন বাংলার পুন্ড্রবর্ধন অঞ্চলে (উত্তরাংশ) বহু সংখ্যক ভূমিদান লেখ উৎকীর্ণ হয়; এই লেখমালা সংস্কৃতে রচিত, গদ্যাকারে লিখিত এই সকল দানপত্রে সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষতা নজরে পড়ে তবে তাদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই। তবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমদিক থেকে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল, তাদের কয়েকটিতে উচ্চমানের সংস্কৃত কাব্য রীতির উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা যায়। অনুমান করা যেতে পারে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে এই সাহিত্যকে উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণে সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য কালপর্বে প্রাচীন বাংলা যে সংস্কৃত ও সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে বৈদেশিক বিবরণীগুলিতে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক) বৌদ্ধ পুঁথিপত্র অধ্যয়ন এবং অনুলিপির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে দীর্ঘ দুই বৎসর তাম্রলিপ্তি (অধুনা মেদিনীপুর জেলার তমলুক) প্রদেশে অতিবাহিত করেন। অপর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) জ্ঞানচর্চার বহু কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন যা তৎকালীন বাংলাদেশে অবস্থিত ছিল, তিনি বিদ্যোৎসাহী বাংলাদেশের অধিবাসীদের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন তাঁর ভারত ভ্রমণ বিবরণীতে। পরবর্তীকালে ই-চিং, চীনদেশ থেকে তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলেন সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণের মহান ব্রত নিয়ে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতচর্চার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই ক্রমঃবিকশিত হয়েছিল এ কথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ইতিহাসে রয়েছে।

হর্ষচরিতের লেখক বাণভট্ট (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) প্রাচীন বাংলার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন তাঁর রচনায়। তথাপি এই প্রদেশের কবিগণের শব্দবৈচিত্র্যের অসামান্য নৈপুণ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, কবি ভামহের গৌড়ীয় কাব্য-রীতি এবং দণ্ডীর কাব্যে অনুসৃত বিদর্ভ কাব্য-রীতি সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। এই দুই কাব্য-রীতির মধ্যে কোনটি অধিকতর রসগ্রাহী সে প্রসঙ্গে উভয় কবির মধ্যে মতভেদ থাকলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার একটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করতে থাকে, যা সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জনসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। খৃষ্টীয় নবম শতকের টীকাকার বামনের মতে, বৈদর্ভী বা গৌড়ী কাব্য-রীতির নামকরণ হয় যে অঞ্চলে এই রীতিগুলি প্রচলিত ছিল তদনুসারে। পরবর্তীকালে তা ওই আঞ্চলিক নামের তকমা নিয়েই একটি নির্দিষ্ট রীতিকে চিহ্নিত করতে সমগ্র ভারতবর্ষেই ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন গৌড়ী রীতির জন্ম হয় 'গৌড়' থেকে যা বাংলাদেশে অবস্থিত একটি অঞ্চল বলেই পরিচিত। এ থেকে নিঃসন্দেহে ধারণা করা যেতে পারে, প্রাচীন বাংলাদেশ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল।

অপরপক্ষে, বাঙালী কবি বা সাহিত্যিকদের যে সকল সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে কিন্তু অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক। লিপিমালার সাক্ষ্যপ্রমাণ অবশ্য সংস্কৃতের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের রচনার সপ্রশংস উল্লেখ করেছে, বেদ, বেদান্ত, প্রমাণ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, মীমাংসা, তর্ক এবং ব্যাকরণের একাধিক শাখায় তাদের সাবলীল বিচরণের কথাও এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাজা হরিবর্মনের মন্ত্রী ভট্ট

ভবদেবের পাণ্ডিত্যের কথাও তাঁর লিপি থেকে জানা যায়। এই লিপিতে আরও বলা হয়েছে, রাটীয় ব্রাহ্মণ ভট্ট ভবদেব দর্শনের ব্রহ্মাদ্বৈত শাখায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং কুমারিল ভট্টের রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র এবং গণিতে, জ্যোতিববিজ্ঞান (ফলসংহিতা) প্রভৃতিতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

৩.০ দক্ষিণ ভারত ঃ আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য ঃ তামিল

দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হল তামিল। যে চারটি দ্রাবিড় ভাষায় উন্নত শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তামিলে। এই নিদর্শনসমূহের প্রাচীনতম হল 'তোলকাপ্পিয়াম্' নামক একখানি বিশিষ্ট ব্যকরণ গ্রন্থ, এই গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক।

দীর্ঘকালব্যাপী তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যেই নয়, ভারতবর্ষে অন্যান্য ভাষাসমূহের মধ্যেও তামিল প্রাচীনতম বলে বিবেচিত। তবে বিভিন্ন যুগে এই ভাষার রূপগত বিবর্তন ঘটেছে—আদি তামিল, পুরাতন তামিল, প্রাচীন তামিল, মধ্যযুগীয় তামিল, আধুনিক তামিল প্রভৃতি প্রয়োগ থেকেই এই ভাষাটির ব্যকরণগত বিভিন্নতা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য আর্যেতর ভারতীয় ভাষার মত তামিলেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। তবে মালয়লম, কন্নড় যা তেলুগুর মত সমৃদ্ধ দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে যে পরিমাণ সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছে, সে তুলনায় তামিলের উপর সংস্কৃতের প্রভাব সামান্যই বলা যায়। বর্তমান কালের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রতিনিধিমূলক ভাষা হল তামিল। মূল দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত আছে তামিলে।

আনুমানিক দুই হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ তামিল ভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি থেকে এবং সংস্কৃত তথা ভারতীয় আর্যভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ ও রীতি গ্রহণ করেও তামিল সাহিত্য একটি দক্ষিণ দ্রাবিড়ীয় ধারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) আদি তামিল (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক) (২) প্রাচীন তামিল বা ক্লাসিক তামিল (পড়ন-তমিড়, চেন-তমিড়)—খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পল্লব, চালুক্য ও চোড় সাম্রাজ্যের সময়কালে রচিত। এছাড়া পরবর্তী যুগে আরও কতকগুলি স্তরবিন্যাস করা হয়েছে।

আদি তামিল সাহিত্যকে 'সংগম' সাহিত্য ও বলা হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তামিল ভাষায় সাহিত্য চর্চার ও কবি সম্বর্ধনার জন্য সাহিত্যসভা বা সঙ্গম আহ্বান করার রীতি প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টজন্মের অব্যবহিত আগে বা পরেই সঙ্গম কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন কিন্তু তাদের রচনা পাওয়া গেছে প্রাচীন তামিলে। সর্বপ্রাচীন তামিল পুস্তকের কাল সম্ভবত খৃষ্টীয় ১ম শতক। সংগম যুগের তামিল সাহিত্যের নিদর্শন বেশীর ভাগই সংকলন—গ্রন্থকারে পাওয়া গেছে—দুটি প্রধান সংকলনের মধ্যে প্রথমটি

হল পত্তুপপাট্টু বা গীতিকাব্য দশক। এই কবিতাগুলি আটজন কবির দ্বারা রচিত। এগুলি প্রথম খৃষ্টীয় শতকের দ্বিতীয় ভাগের বিভিন্ন রাজগণকে উৎসর্গীকৃত।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পর রচিত হয় আঠারোটি নীতিগর্ভ কবিতার সংকলন 'পতিতেন কীড় ক্-কণক্কু'। এই সংকলনের কবিতাগুলি ক্ষুদ্র এবং দ্বিপদী। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল তিরু-ভাল্লুবার এর রচিত 'কুরল'। এই কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

গুপ্তযুগের ও পল্লব সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের উদ্দীপনা তামিল সাহিত্যে গৌরব এনে দিয়েছিল। শৈব সন্তদের দ্বারা রচিত শৈব স্তোত্র ও কবিতাগুলিকে খৃষ্টীয় একাদশ শতকে নম্পিয়ন্টার নম্পি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এই সংকলনগুলিকে বলা হয় 'তিরুমুরৈ'। অঞ্চম 'তিরুমুরৈ'-তে যে ভক্তিস্তোত্র আছে তার রচয়িতা মাণিক্ক বাচকর নামক একজন শৈব সন্ত। সঙ্গমযুগের দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল—'চিলপ্-পতিকরম' এবং 'মণি-মেকলৈ'।

তামিল দেশের আঠারোজন বৈষ্ণব সন্ত কর্তৃক রচিত ৪০০০ স্তোত্রের সংকলন করেন শ্রীনাথমুণি (খৃষ্টীয় একাদশ শতক)। তামিল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আন্ডাল, আন্টাল বা গোদা নামক একজন মহিলা কবিও আছেন যাঁর তিরিশটি কবিতা 'তিরুপপাবৈ গ্রন্থে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের কালপর্বে কয়েকজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব হয়েছিল।

৩.১.১ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির দিক থেকে দ্রাবিড় ভাষাসমূহের মধ্যে তামিলের পরেই তেলুগুর স্থান। ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে তেলুগু ভাষার প্রচলন তা 'আন্ধ্র' নামে পরিচিত। 'আন্ধ্র' শব্দটি মূলত জাতিবাচক হলেও প্রাচীনকালে এটি একটি ভাষাকেও বোঝাত। পরবর্তীকালে আন্ধ্র অঞ্চল ও তার ভাষা 'তেলেঙ্গ' নামে পরিচিত হয়, 'তেলেঙ্গ' থেকেই 'তেলুগু'-র উৎপত্তি। মার্জিত চারটি দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে মূল দ্রাবিড় থেকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তেলেগু। এই কারণে তামিল ও মালয়লম্ ভাষীদের কাছে তেলেগু অনেকটা দুর্বোধ্য।

একাদশ শতকের মধ্যভাগে নন্নয় ও নারায়ণ ভট্টের রচিত চম্পূকাব্য 'মহাভারত' সম্ভবত অন্ধ্র সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন ফসল। নন্নয় মাত্র আড়াই পর্বে এই কাব্য অসমাপ্ত রাখেন। পরবর্তী দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর তিকন বিরাটপর্ব থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব রচনা করেন। আরও ৭৫ বৎসর পর এররাপ্রগড নামে এক কবি অরণ্যপর্ব এবং হরিবংশও সম্পূর্ণ করেন। তিনি নিজে একটি রামায়ণও রচনা করেন। তেলুগু সাহিত্যে এঁরা 'কবিত্রয়' নামে সুপরিচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পালকুরিকি সোমনাথের নেতৃত্বে বীরশৈব কবিরা সংস্কৃতভাষার প্রভাব মুক্তির আন্দোলন করেন। তাঁর অনেক গ্রন্থের মধ্যে 'পণ্ডিতারাধ্যচরিত্রম' ও বাসবপুরাণ' উল্লেখযোগ্য।

'কন্নড়' বা কানাড়া দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত চারটি দ্রাবিড়ভাষার অন্যতম। কালো মাটির দেশ বলে 'কর্' (কালো) নাড়ু (দেশ) এই দুটি শব্দ থেকে এই দেশবাচক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক

থেকে কন্নড় ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেলেও কন্নড় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল খৃষ্টীয় নবম শতকে রচিত কবি শ্রীবিজয়-এর অলংকার গ্রন্থ 'কবিরাজমার্গ', ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে কানাড়ী সাহিত্য চারটি পর্বে বিভক্ত, যার প্রথমটি হল আদি যুগ (খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত) এবং দ্বিতীয়টি হল আদি মধ্য যুগ (৮০০-১১৫০ খৃষ্টাব্দ)। তৃতীয় পর্বের নাম মধ্যযুগ যার ব্যাপ্তি ১১৫০-১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত চতুর্থ এবং শেষ ভাষা হল মালয়লম্। এটি সম্ভবত নবম শতক থেকে প্রাচীন তামিল ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেইজন্যই তামিল ও মালয়লম ভাষার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। ভারতের অন্যতম স্বীকৃত জাতিয় ভাষা হিসাবে কেরল বা প্রাচীন চের প্রদেশ জুড়ে এই ভাষা ব্যবহৃত। প্রাচীন স্তরে তামিল ও মালয়লম্ সাহিত্যিক ঐতিহ্য অভিন্ন। মালয়লম্ ভাষায় চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতকের আগে কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রকৃত সাহিত্য রচনার শুরু চতুর্দশ শতক থেকে, এই সময় থেকে সংস্কৃতাদর্শ অনুকরণে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পূকাব্যও গড়ে উঠেছিল।

৪.০ আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও সাহিত্যের বিকাশ ঃ পূর্বভারত

পূর্বভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হয় সম্ভবত মগধে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা থেকে যার আনুমানিক সময়কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, ভোজপুরী বা মৈথিলী ভাষা প্রাকৃতভাষার বিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাভাষাসহ অন্যান্য পূর্বভারতীয় ভাষা আর্য ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। এই ভাষা সমূহের উৎপত্তি সূত্রটি এইরূপ ঃ

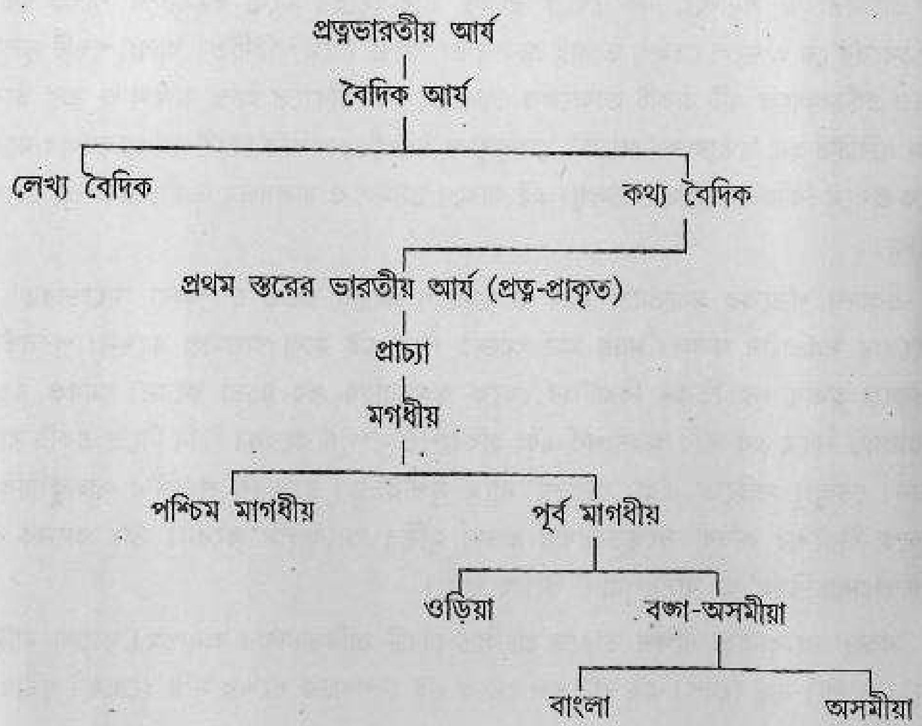

বাংলাভাষার উৎপত্তিকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। এই ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষিত হয়, আদি, মধ্য ও নব্য বা আধুনিক। আদি স্তরের বাংলাকেই প্রাচীন বাংলাভাষা বলা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল ৯৫০ খৃষ্টাব্দ—১৩৫০ খৃষ্টাব্দ। প্রাচীন বাংলাভাষার প্রধান নিদর্শন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুঁথিতে সংকলিত গীতগুলি। সম্ভবত খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত এই চর্যাগীতি সম্বলিত গ্রন্থ বা পুঁথি আচার্য শাস্ত্রীমহাশয় নেপাল থেকে উদ্ধার করে আনেন। এই প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহতে বিধৃত চর্যাগীতির ভাষাতেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীনতম বাংলাভাষার লক্ষণগুলি খুঁজে পান।

বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি ব্রাহ্মীলিপি থেকে। সপ্তম শতকে ব্রাহ্মীলিপি তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। (১) 'শারদা', 'নাগর' ও 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মীলিপির 'কুটিল' রূপভেদ থেকে বাংলা অক্ষরের জন্ম।

৫.০ পশ্চিম ভারত ঃ গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ

গুজরাটী ভাষা একটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা যা গুজরাট-কাথিয়াবাড় অঞ্চলে ব্যবহৃত। রাজস্থান বিশেষত মাড়বাড়ী ভাষার সঙ্গে এর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরী থেকে কিছুটা পৃথক এর নিজস্ব লিপি আছে। অপভ্রংশ থেকে উদ্ভুত এই ভাষা চালুক্য রাজগণের সময় থেকেই সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে এবং এর বিস্তারের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই গুর্জর অপভ্রংশ আধুনিক গুজরাটী রূপ লাভ করে এবং মারোয়াড়ী নামে এর একটি অপ্রচলিত শাখার উৎপত্তিও এই সময়ে। গুজরাটী সাহিত্য বিশিষ্ট রূপ লাভ করার সাথে সাথে ব্রজের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এটি স্বীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা করে। এই পরিবর্তন চরম রূপ লাভ করে ১২৫০ থেকে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

আচার্য হেমচন্দ্র (১০৮৯—১১৭৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁর প্রাকৃত ব্যকরণে বিশদ উদাহরণসহ অপভ্রংশের ব্যকরণও আলোচনা করেছেন। হেমচন্দ্রের পর থেকে গুজরাটী সাহিত্যের উপর সংস্কৃত এবং প্রাকৃত গাথার বিশেষ প্রভাব দেখা যায় সর্বোপরি এই সাহিত্যে জৈনধর্মের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই যুগে রামচন্দ্র, সোমেশ্বর বস্তুপাল এবং তেজপাল প্রমুখ সংস্কৃত পন্ডিতের আবির্ভাব হয়। এই কালপর্বে এমন লেখকেরও সন্ধান মেলে যাঁরা সমসাময়িক চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। 'স্থূলিভদ্র ফাগু' (১৩৩৪ খৃষ্টাব্দ) এবং 'বসন্তবিলাস' (আনুমানিক ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ) ইত্যাদি ফাগুজাতীয় কাব্য এই সময়ে রচিত হয়। 'নেমিনাথ চতুষ্পাদিকা' (১২৬৯ খৃষ্টাব্দ) নামক ক্ষুদ্র কবিতা বা 'eclogue' এবং 'রেবন্তগিরিরাস' (১২৩১ খৃষ্টাব্দ) নামক রাসকাব্য এই যুগের সৃষ্টি। রাসের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মনাভের 'কাহ্নড়দে প্রবন্ধ' (১৪৫৬ খৃষ্টাব্দ)। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পরবর্তী যুগে গুজরাটী সাহিত্য জৈন প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয় মূলত হিন্দু-প্রাধান্যের ফলে।

৬.০ উত্তর ভারত ঃ আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাগুলির সাধারণ নাম হিন্দী। হিন্দীভাষাগুচ্ছ দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ পশ্চিমা হিন্দী, তার অন্তর্গত ভাষা হল ব্রজভাষা, কনৌজী বঙ্গারু বা হরিয়ানী এবং আম্বালা থেকে রামপুর পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দুস্থানী। অপর ভাগ পূর্বী হিন্দী, তার মধ্যে পড়ে অবধী বা কোশলী বা বইসওয়াড়ী, বখেলি এবং ছত্তিশগঢ়ী।

ফারসী হরফে লেখা উর্দু এবং দেবনাগরী হরফে লেখা এখনকার হিন্দী ভাষা হিন্দুস্তানী থেকে উদ্ভূত। 'হিন্দী' শব্দটির প্রাচীন রূপ হিন্দ্বী। এই শব্দটি এসেছে 'হিন্দবী' থেকে এবং সেই শব্দটির মূল হল মধ্যপারসিক (পহ্লবী) 'হিন্দুগী' অর্থাৎ সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা।

হিন্দী সাহিত্যের ত্রিকাল হল প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কাল। অপভ্রংশের পর প্রাচীন হিন্দীকাব্যের কালকে 'বীরগাথাকাল' নামে অভিহিত করা হয় যার কালপর্ব খৃষ্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতক। এই বীরগাথাগুলির মধ্যে কবি চন্দ বরদাঙ্গা বিরচিত 'পৃথ্বীরাজ রসো' (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। প্রাচীন যুগের হিন্দী কবিগণের মধ্যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের কবি আমীর খসরুর রচনার বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্যপ্ত মধ্যযুগ হিন্দী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ রূপে বিরাজমান।

৭.০ কথান্ত

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কালপর্বে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আভিজাত্যের নিরিখে অনন্য স্তরে আরোহণ করেছিল; রাজকীয় ভাষা রূপে, রাজণ্যবর্গের ভাষা রূপে দরবারে সংস্কৃতের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রবণতা দেখা যায়, প্রথমদিকে সেগুলি উৎকর্ষতার মাপকাঠিতে নগণ্য হলেও কালক্রমে দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত, পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে স্থানীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে উত্তরণ ঘটে, যার বর্ণনা উপরিউক্ত এককটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৮.০ অনুশীলনী

১। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আঞ্চলিকতার বোধটি কখন জন্ম নেয় এবং কেন।

২। খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩। আঞ্চলিক ভাষার ও লিপির উদ্ভব সম্পর্কে কি জানেন?

৪। সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটে?

৫। প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৬। দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন!

৭। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরভাগে আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কি জানেন?

৯.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ ল্যাঙ্গুয়েজেস্ এন্ড লিটারেচারস্ অফ্ মডার্ন ইন্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯৬৩।

২। এল. এইচ. গ্যারি ঃ ফাউন্ডেশন অফ্ ল্যাঙ্গুয়েজ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৮

৩। পরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, ২২৫ পাতা, ৩৩৪ পাতা

৪। সুকুমার সেন ঃ ঐ, ৫২৯—৫৩০ পাতা।

৫। সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ঃ ঐ, ৫৩০—৫৩১ পাতা।

৬। আর. কল্ডওয়েল ঃ এ কম্পারেটিভ গ্রামার অফ্ দ্য দ্রাবিড়িয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস্, ম্যাড্রাস, ১৯৬১।

৭। সাহিত্য একাডেমী (প্রকাশিত) ঃ কনটেম্পরারী ইন্ডিয়ান লিটারেচার ঃ এ সিম্পোজিয়াম্, নিউ দিল্লী, ১৯৫৭।

৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ হিস্ট্রী অফ্ এনশেন্ট বেঙ্গল, ১৯৭৪, কলিকাতা।

৯। রামশরণ শর্মা ঃ আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়ান সোসাইটি।

একক ২ ❑ উদারনৈতিক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Liberal Arts, Science and Technology)

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ সৃজনধর্মী কাব্য
১.২ ঐতিহাসিক কাব্য
১.৩ খণ্ডকাব্য
১.৪ দূতকাব্য
১.৫ শতককাব্য
১.৬ স্তোত্রকাব্য
১.৭ গদ্যকাব্য
১.৮ চম্পূকাব্য
২.০ নাটক ও নাট্যসাহিত্য
৩.০ আখ্যান-সাহিত্য
৪.০ দর্শনচর্চা ঃ বিভিন্ন দার্শনিক ধারা
৪.১ সাংখ্য-দর্শন
৪.২ যোগ বা পাতঞ্জল দর্শন
৪.৩ ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন
৪.৪ মীমাংসা দর্শন
৪.৫ বেদান্ত দর্শন
৫.০ বিজ্ঞান-চর্চা
৫.১ আয়ুর্বেদ
৫.২ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত
৫.৩ পরমাণুতত্ত্ব
৫.৪ রসায়ন চর্চা
৫.৫ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার
৬.০ অনুশীলনী
৭.০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ প্রস্তাবনা

সাহিত্যের বাহন ভাষা। এই ভাষা দুইভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমত তথ্য পরিবেশনের জন্য এবং দ্বিতীয়ত হৃদয়বৃত্তি থেকে উদ্ভূত নানা অনুভূতি প্রকাশের জন্য। উভয়কে অবলম্বন করে সাহিত্য গড়ে ওঠে। যে রূপে তা তথ্য পরিবেশন করে সে রূপকে তথ্যসাহিত্য বলতে পারা যায়। যেমন—বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, প্রযুক্তি; আবার যখন তা অনুভূতিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে তখন সৃষ্টি হয় রসসাহিত্য, যেমন—কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি। শেষোক্ত শ্রেণীর সাহিত্য সৃজনধর্মী সাহিত্য রূপেও আখ্যাত হয়। আলোচ্য এককটিতে এরূপ স্বাধীন উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত রচনা, তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যা খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়সীমায় ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১.১ সৃজনধর্মী কাব্য

অলংকার শাস্ত্রে 'কাব্য' শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য কাব্যের যথার্থ লক্ষণ কি সে বিষয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ভীমহ বলেছেন, শব্দ ও অর্থের সাহিত্যই কাব্য, দণ্ডীর মতে—ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন' পদাবলী হল কাব্য, আবার রুদ্রটের মতে কবিকর্মই কাব্য। তবে শব্দ ও অর্থ এই দুইটি উপাদান নিয়েই যে কাব্যের সৃষ্টি হয় এ বিষয়ে কারোর মতদ্বৈত নেই।

আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে কাব্যের যে সকল প্রভেদ নির্দেশ করেছেন তা থেকে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বৈচিত্র্য বিষয়ে কিছুটা ধারণা জন্মায়। তিনি পদ্য, গদ্য ও মিশ্র এই ত্রিবিধি ভেদ নির্দেশ করেছেন। কাব্যের একাধিক শ্রেণী বিভাগে দণ্ডী একটি বৃহত্তর অংশকেই শ্রব্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণ 'মহাকাব্য' কেই শ্রেষ্ঠ শ্রব্যকাব্য রূপে স্বীকার করে থাকেন। মহাকাব্য রচনার উপযোগী কবিপ্রতিভা অত্যন্ত দুর্লভ। শুধু পরিধির বিশালতার জন্যই নয়। বিষয়বস্তুর অনন্ত বৈচিত্র্য, শব্দার্থহরণ কৌশল এবং অলংকার প্রয়োগ বিষয়ে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য, বিচিত্র ছন্দের সন্নিবেশ বিষয়ে দৃঢ় সংস্কার ও অবিচলিত দৃষ্টি, নানাবিধ শাস্ত্র ও কলাবিদ্যায় গভীর বৈদগ্ধ্য এতগুলি শক্তির একত্র সমাবেশ ভিন্ন মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয়।

খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে যে সকল মহাকাব্য রচিত হয় তার মধ্যে প্রাচীনতম হল কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষের লেখা 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ'। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অশ্বঘোষ বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ তাঁর আবির্ভাবকাল।

সংস্কৃতভাষায় বর্তমানে যে বুদ্ধচরিত পাওয়া যায় তা সতেরোটি সর্গে সমাপ্ত। চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে বুদ্ধচরিত আঠাশটি সর্গে সমাপ্ত। গৌতমের প্রথম জীবন থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের আরম্ভ পর্যন্ত কাহিনী এই কাব্যে বিধৃত। অপর কাব্য সৌন্দরানন্দেও বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যদ্বয় সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের পরই সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের স্থান। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বর্তমানে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত। একটি বিক্রমাদিত্যের সহিত জড়িত খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক এবং অপরটি গুপ্তযুগে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে। শেযোক্ত সময়কালটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কালিদাসের অপূর্ব কবিত্বশক্তি, ভাষার অপূর্ব সুষমা ও মাধুর্য, উপমা প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে অনন্যসাধারণ দক্ষতার সাক্ষ্য মেলে মেঘদূতম্ কাব্যে। এই কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তী কালে অনেক কবি মেঘদূতমের অনুকরণে বহু কাব্য রচনা করেন। ছয় সর্গে বিভক্ত ঋতুসংহার খণ্ডকাব্যে অনুরাগীজনের দৃষ্টিতে ছয় ঋতুর বৈশিষ্ট্য সাবলীলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কালিদাসোত্তর যুগে ভারবি, ভট্টি, মাঘ এবং কুমারদাস মহাকাব্য রচনা করে শাশ্বত কীর্তি অর্জন করেছিলেন। ভারবির (আনুমানিক সময়কাল, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হতে সপ্তম্ শতাব্দীর মধ্যভাগ) 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত পাণ্ডবদের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। টীকাকার মল্লিনাথ ভারবির রচনাকে নারিকেল ফল সদৃশ রূপে বর্ণনা করেছেন।

ভট্টিকাব্য নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ভট্টি বা ভর্তৃহরি রচিত 'রাবণবধ' কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। একে যথার্থ কাব্য না বলে 'শাস্ত্রকাব্য' বলাই সমীচীন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে কবি কুমারদাস রচিত 'জানকীহরণ' রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত, কালিদাসের মহাকাব্যদ্বয়ের প্রভাব এর প্রতিটি শ্লোকে বিদ্যমান।

আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষার্ধে রচিত মহাকবি মাঘের রচিত 'শিশুপালবধ' কাব্যখানি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে বিশেষভাবে আদৃত। এই কাব্যে ভারবির প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারবি ও মাঘের আবির্ভাবের পর মহাকাব্যরচনায় ক্রমশঃই কৃত্রিমতার সংক্রমণ বাড়তে থাকে। এই যুগে বহু কাব্য রচিত হয়েছে ঠিকই তবে কবিত্বের দিক থেকে সেগুলি পূর্বের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। খৃষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে শ্রীহর্ষ প্রণীত 'নৈষধচরিত' অনন্যসাধারণ সৃষ্টিরূপে পরিগণিত।

১.২ ঐতিহাসিক কাব্য

সংস্কৃতে ঐতিহাসিক কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাকবি কহ্লন কর্তৃক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী'। এই কাব্য আটটি তরঙ্গে বিভক্ত। পরবর্তীকালে জোনরাজ শ্রীধর এবং প্রাজ্যভট্ট রাজতরঙ্গিনীর তিনটি পরিশিষ্ট সংযোজন করেন। তদ্ভিন্ন ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'নৃপাবলী' ছবিল্লাকর প্রণীত গ্রন্থ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কাব্য বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১০০5 অব্দে পদ্মগুপ্ত কর্তৃক রচিত 'নবমাহসাঙ্কচরিত' ধারাধিপতি সিন্ধুরাজের রাজত্ববিষয়ক ঐতিহাসিক কাব্য (১৮ সর্গে বিভক্ত)। বিহ্লন রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' কাব্যখানি (১৮ স্বর্গে রচিত) চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্ল ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কীর্তিগাথা অবলম্বনে রচিত।

কবি সন্ধ্যাকরনন্দী শ্লোকের সাহায্যে পালবংশীয় গৌড় নরপতি রামপালদেবের রাজত্বকাহিনী এবং অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জীবনকথা 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে নিবদ্ধ করেন। তিনি নিজেকে 'কলিকালবাল্মীকি' নামে অভিহিত করেছেন। এছাড়া, জোনরাজ-কৃত 'পৃথ্বীরাজবিজয়', জৈন আচার্য হেমচন্দ্রসূরি রচিত 'কুমারপালচরিত', পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কৃত 'প্রাণাভরণ', 'জগদাভরণ', প্রভৃতি বহু রচনায় ঐতিহাসিক উপাদান নিবদ্ধ আছে। তবে এগুলির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

১.৩ খণ্ডকাব্য

খণ্ডকাব্য নামে অভিহিত রচনাগুলি সংস্কৃত সাহিত্যে অনন্যস্থান অধিকার করলেও, মহাকাব্যের তুলনায় অপরিসর, বর্ণনীয় বিষয়েরও বৈচিত্র্য নেই। এগুলি লিরিক বা গীতিকবিতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যপূর্ণ। কালিদাসের ঋতুসংহার এই জাতীয় কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

১.৪ দূতকাব্য

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতম্' সংস্কৃত গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলেও এতে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন সূচিত হয় যার ফলে পরবর্তী বহু কবি তাঁর অনুকরণে দূতের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ ছলে খণ্ডকাব্য রচনায় ব্রতী হন। এই জাতীয় কাব্যগুলি 'দূতকাব্য' নামে পরিচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে 'মেঘদূতে'র অনুকরণে রচিত শতাধিক দূতকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ধোয়ী রচিত 'পবনদূত', বিষ্ণুদাস রচিত 'মনোদূত', রূপগোস্বামী রচিত 'উদ্ধবসন্দেশ' ও 'হংসদূত', কৃষ্ণসার্বভৌম রচিত 'পদাঙ্কদূত' প্রভৃতি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১.৫ শতক কাব্য

আলোচ্য সময়কালে বহু কবি তাঁদের রচিত শ্লোকরাজি শতশ্লোকের সংগ্রহ বা শতকের আকারে সংক্ষিপ্ত কাব্যরূপে সংকলন করে যশস্বী হয়েছেন। তন্মধ্যে অমরুকবি রচিত শৃঙ্গারাত্মক 'অমরুশতক' সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবি ভর্তৃহরি রচিত 'শতকত্রয়' সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নস্বরূপ। শিহ্লন কবি রচিত 'শান্তিশতক', সোমনাথ রচিত 'অন্যোক্তিশতক' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১.৬ স্তোত্রকাব্য

বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তের আন্তরিক আবেগ নিবেদন প্রসঙ্গে রচিত বহু স্তোত্র সংস্কৃতি সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। বাল্মীকি প্রণীত 'গঙ্গাস্তোত্র', পুষ্পদন্ত বিরচিত 'মহিম্নঃস্তোত্র', লীলাশুক রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১.৭ গদ্যকাব্য

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যের প্রচলন কম। বাণভট্টের (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এ বিষয়ে অনন্য নিদর্শন।

১.৮ চম্পূকাব্য

সংস্কৃত সাহিত্যে চম্পূকাব্য অর্থাৎ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত কাব্য বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল, দণ্ডীর কাব্যাদর্শেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের কাহিনীসমূহ অবলম্বনে একাধিক চম্পূকাব্য রচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভোজ-রচিত 'রামায়ণচম্পূ', এছাড়া অনন্তভট্ট-কৃত 'ভরতচম্পূ', ত্রিবিক্রম কবি প্রণীত 'নলচম্পূ' জৈনাচার্য সোমদেবসূরি-কৃত 'যশস্তিলকচম্পূ' প্রভৃতি কাব্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু লেখক চম্পূকাব্য লিখে যশস্বী হন। এঁদের মধ্যে জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ', কবিকর্ণপুর রচিত 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' প্রভৃতি চম্পূকাব্য অসামান্য সাহিত্যশৈলীর সাক্ষ্য বহন করে।

২.০ নাটক ও নাট্যসাহিত্য

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অবস্থাবিশেষের অনুকরণকে বলা হয় 'নাট্য'। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ হল ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র। এতে নাটকের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রকার আলোচিত হয়েছে। পদ্যকাব্যের মত দৃশ্যকাব্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হলেন কবি কালিদাস। তাঁকে কেন্দ্রস্বরূপ রেখে দৃশ্যকাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত যুগবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) কালিদাসপূর্ব যুগ (২) কালিদাস যুগ এবং (৩) কালিদাস-উত্তর যুগ। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক গল 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'। তাঁর পূর্ববর্তী খ্যাতনামা নাট্যকার অশ্বঘোষ 'শারিপুত্রপ্রকরণ' বা 'শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ' নামে সুন্দর ও সাবলীল একটি নাটক রচনা করেছিলেন।

কালিদাস ভাসের উল্লেখ করেছেন কিন্তু ভাস তাঁর কতকাল পূর্বের লেখক এ নির্ণীত হয় নি। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে খৃষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত নানা কালই ভাসের কাল রূপে বিভিন্ন পণ্ডিত নির্দেশ করেছেন। ভাসের রচিত প্রতিমা নাটক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কালিদাস রচিত নাটক তিনটি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম এবং বিক্রমোর্বশীয়ম্। এগুলির মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নাটক। কালিদাসের সময়কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক। তাঁর চরিত্রচিত্রণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, কাহিনীর অভিনবত্ব ও নাটকীয়তা সর্বজন প্রশংসিত।

কালিদাসোত্তর যুগের অন্যতম নাট্যকার শূদ্রক। আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে তাঁর সময়কাল ধরা হয়। শূদ্রক রচিত বিখ্যাত নাটকটি হল 'মৃচ্ছকটিকম্'। এই যুগের 'উভয়াভিসারিকা', 'পদ্মপ্রাভৃতক', 'ধূর্তবিটসংবাদ', 'পাদতাড়িতক' যথাক্রমে বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত ও শ্যামলিক রচিত ভাণ।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষের রচিত 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী' নাটক যথেষ্ট পারদর্শিতার নজির। তিনি 'নাগানন্দ' নাটিকাটিও রচনা করেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্ববর্তী সময়ের নাট্যকার বিশাখদত্তের অনন্য সৃষ্টি 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক। মূলত রাজনীতি ভিত্তিক এই নাটক নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান

অধিকার করেছে, এতে নারীচরিত্র নেই বললেই চলে। ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহার' নাটকটিও খৃষ্টীয় নবম শতকে সৃষ্টি হয়েছিল। ভবভূতির (আনুমানিক খৃষ্টীয় ৭ম—৮ম শতক) 'মহাবীরচরিত' এবং 'উত্তররামচরিত' রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়। তাঁর অপর রচনা 'মালতীমাধব' নামক প্রকরণ।

খৃষ্টীয় নবম শতকের পরবর্তী সময়কালে নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক প্রকার ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা যায়। এই যুগে রচিত গ্রন্থগুলি নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে নিগড়িত, নাটক হিসাবে নগণ্য এবং অনেকক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের অনুকরণমাত্র। এই যুগের প্রধান কয়েকজন নাট্যকার হলেন কৃষ্ণমিশ্র, ক্ষেমীশ্বর, মুরারি ও রাজশেখর। এঁদের উল্লেখযোগ্য নাটক যথাক্রমে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' (রূপক-নাট্য), 'চণ্ডকৌশিক' (রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত), অনর্ঘরাঘব (রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত), বালরামায়ণ (রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত), বালভারত (মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত), বিদ্ধশালভঞ্জিকা (নাটিকা) প্রভৃতি।

৩.০ আখ্যান সাহিত্য

মহাকবি দণ্ডীর রচিত 'দশকুমার চরিত' একটি অভিনব আখ্যান শৈলীর পরিচয় বহন করে। গুপ্ত-পরবর্তী যুগে উপদেশমূলক আখ্যানের যুগান্তকারী সাক্ষ্য হল পঞ্চতন্ত্র। একাদশ খৃষ্টীয় শতকে সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গুণাঢ্যের বৃহৎকথা-র উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। প্রাকৃত রচনার পুরোনো আদলকে আমরা শেষ দেখতে পাই বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহ', রাজশেখরের 'কাব্যমঞ্জরী' প্রভৃতিতে। তবে সর্বশেষে দ্বাদশ শতকে রচিত কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর উল্লেখ না করলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটিকে গীতিকবিতাধর্মী আখ্যান বলে চিহ্নিত করলেও অত্যুক্তি হবে না।

৪.০ দর্শনচর্চা ঃ বিভিন্ন দার্শনিক ধারা

প্রাচীন ভারতে দার্শনিক জ্ঞান অর্জনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হত। কৌটিল্য দর্শনশাস্ত্রকে বলেছেন সকল জ্ঞানের দীপবর্তিকা, সকল বিধিবিধানের স্তম্ভস্বরূপ। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত দর্শনশাস্ত্রকে কাল-প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে ভাগ করা হয় ছয়টি দর্শনে বা দার্শনিক ধারায়। এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে যোগসূত্র হল এগুলির মধ্যেকার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা দ্বারা হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদের সংযুক্তিও নিরূপণ করা যায়।

৪.১ সাংখ্য-দর্শন

সাংখ্য-দর্শনের উৎপত্তি ও তার প্রকৃতি-নিরূপণ এক জটিল ব্যাপার। অত্যন্ত প্রাচীন যুগে সাংখ্যের উদ্ভব ঘটে। কেউ কেউ বলছেন সাংখ্য হচ্ছে এক ধর্মীয়, অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন, আবার কারোর মতে এটি বস্তুবাদী দর্শন। লোকশ্রুতি অনুসারে সাংখ্য-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয় ঋষি কপিলকে। ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের একটি পুঁথিতে সাংখ্য-দর্শনের আদি রূপের পুনর্নির্মাণ সাধিত হয়েছে।

সাংখ্য দর্শনকে বদরায়ন বেদান্তের প্রধান প্রতিপক্ষ রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই দর্শনের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে, ব্রহ্মসূত্রে, মহাকাব্যে, চরক রচিত চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং মানব ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

৪.২ যোগ বা পাতঞ্জল দর্শন

দর্শনসমূহের মধ্যে যোগ পতঞ্জলিকৃত দর্শনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। ধ্রুপদী যোগ-দর্শনের সূত্রপাত বলে ধরা হয় ঋষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' নামক পুঁথিটিকে। এই পুঁথিতে যোগ-দর্শনের সবকটি মূল প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে। পরবর্তী কালে এই তত্ত্বগুলিকে আরও বিকশিত করা হয় ব্যাসভাষ্য (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক) ও বাচস্পতির তত্ত্ববৈশারদী (খৃষ্টীয় ৯ম শতক) গ্রন্থে। পতঞ্জলি ও তাঁর অনুসারীদের কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল যোগের তথাকথিত অষ্ট মার্গ শিক্ষা দেওয়া। যোগের দার্শনিক মতাদর্শের পরিণতি ঘটেছে জগতের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী 'পরম সত্ত্বা' বা ঈশ্বরের বর্ণনায়।

৪.৩ ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন

উপরিউক্ত দুটি দার্শনিক ধারার উদ্ভব ঘটে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এবং গুপ্তযুগ নাগাদ এই দুটি সুস্পষ্টরূপ লাভ করে। এরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বৈশেষিক দর্শনের প্রবক্তা ঋষি কণাদ, তাঁর মতবাদের অন্যতম প্রধান একটি তত্ত্ব হল বস্তুপদার্থ সম্পর্কিত। ন্যায় দর্শনের পুরোধা ঋষি গৌতম। এখানে কেন্দ্রিয় চিন্তাটি প্রকাশ পেয়েছে 'স্বচ্ছ চিন্তা'র নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে।

৪.৪ মীমাংসা-দর্শন

ভারতীয় ষড়দর্শনের ঐতিহ্যবদ্ধ তালিকার শেষে সর্বদাই স্থান পেয়ে এসেছে 'মীমাংসা' ও 'বেদান্ত' নামক দর্শন দুটি। মীমাংসা দর্শন আগাগোড়া বেদসমূহকে প্রামাণ্য হিসাবে উল্লেখ করেছে। এই দার্শনিক ধারার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়টি হল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির রীতিনীতি ও ধরণধারণ এবং পূজার্চনার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কিত।

৪.৫ বেদান্ত-দর্শন

ঋষি বদরায়নের রচিত প্রথম বিশুদ্ধ বেদান্ত-গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের রচনা বলে অনুমান। শঙ্কর (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) ও রামানুজের (দ্বাদশ শতাব্দী) বহুসংখ্যক দার্শনিক রচনা অদ্যাপি বিদ্যমান। শঙ্করের মত অনুসারে পরব্রহ্ম থেকে জাত এই বিশ্বসংসার মায়া বা ইন্দ্রজালমাত্র, বস্তুভিত্তিক প্রকৃতি প্রয়োগিক 'অহম' এর মতই অবাস্তব।

তবে দ্বাদশ শতকে শঙ্করাচার্যের এই দার্শনিক অবস্থানকে সরাসরি আক্রমণ করে রামানুজের পরিশীলিত ভক্তিবাদী মতবাদ। প্রকৃতপক্ষে, রামানুজ উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভক্তিবাদী আদর্শ ও ব্রাহ্মণ আদর্শের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করেন। পরবর্তীযুগে তাঁর অনুগামী হন মাধব।

৫.০ বিজ্ঞানচর্চা

প্রাচীন ভারতবর্ষে আদি মধ্যযুগে পরম্পরাগতভাবে শুধুমাত্র কাব্য-নাটক-দর্শন চর্চা নয়, এর পাশাপাশি চলত আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্র/বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পরমাণু-তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা, রসায়ন সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি বহু বাস্তবমুখী শাস্ত্রের অনুশীলন ও শিক্ষা।

৫.১ আয়ুর্বেদ

আয়ুর্বেদ হল প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান। আয়ুসম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায়, তাই আয়ুর্বেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে যে আয়ুর্বেদই হল চারটি বেদের সার এবং কশ্যপমুনির মতে প্রখ্যাত বেদ চতুষ্টয়ের পরবর্তী বেদ হল আয়ুর্বেদ। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজসভায় মহর্ষি চরক রাজবৈদ্য ছিলেন বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা। কয়েক শতাব্দী পর সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্যতম ছিলেন ধন্বন্তরি, তাঁর লিখিত একটি ভেষজবিদ্যা পাওয়া যায়। নবরত্নের অন্যতম অমরসিংহ লিখিত অমরকোষ গ্রন্থে বহু ঔষধের বিকল্প নামের উল্লেখ আছে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ইসলামীধর্মী দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগসূত্র স্থাপিত হবার পর আয়ুর্বেদ-চর্চার ক্ষেত্রটি অনেক প্রসারিত হয়। কথিত আছে, বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রশীদ (৭৬৩—৮০৯ খৃষ্টাব্দ) আয়ুর্বেদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি আরবি ভাষায় চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বিখ্যাত পর্যটক অল-বিরুণীর বিবরণীতে (১০১৭—১০৩০ খৃষ্টাব্দ) ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ চর্চার প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। সুশ্রুতসংহিতায় অস্ত্রোপচারকল্পে শতাধিক যথাযোগ্য অস্ত্র এবং চতুর্দশ প্রকারের পট্টবিবরণীর বিশেষ বিবরণ আছে। ব্রহ্মসংহিতার মতে বৈদ্যক বা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই আটটি চিকিৎসা বিভাগ ছাড়াও পশুরোগ চিকিৎসারও বিবরণ পাওয়া যায়। শুধুমাত্র মানব বা পশু চিকিৎসাই নয়, সেকালে বৃক্ষাদিরও এক ধরণের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তার নিদর্শন মেলে বৃক্ষায়ুর্বেদে।

৫.২.০ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত

জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিবিজ্ঞান বলতে বোঝায় গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-সম্পর্কিত বিদ্যা। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হয়। খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্য ভূমিতে গ্রহগতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল এবং যেহেতু এই সময় থেকেই ঐ সকল দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ স্থাপিত হয় সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে এদেশের গ্রহ-গণিতের যে উন্নতি ঘটেছে তার মূল উপাদান এশিয়ার পশ্চিমাংশ থেকে এসেছিল। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থকে সিদ্ধান্তগ্রন্থ বলে। আর্যভট্ট বা আর্যভট (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ?) কৃত আর্যভটীয়, বরাহমিহিরের (খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক) সংকলিত

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ব্রহ্মগুপ্ত (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) কৃত ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ভাস্করাচার্য কৃত গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ সকল গ্রন্থ অপেক্ষাও প্রাঞ্জল ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হল অজ্ঞাতনামা জ্যোতির্বিদ (বা ময়দানব) কর্তৃক রচিত সূর্যসিদ্ধান্ত।

'গণ' ধাতুর সহিত 'ত' প্রত্যয়যোগে গণিত শব্দটির উৎপত্তি। সুতরাং গণিতের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা গণনা বা হিসাব করে পাওয়া যায়। গণিতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এটি মূলত দুইটি ধারায় প্রবাহিত, প্রথমটি সংখ্যা বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি আকৃতি-বিষয়ক—যার প্রচলিত নাম জ্যামিতি। গণিতের ইতিহাসকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। প্রাচীনযুগের সীমারেখা সপ্তম খৃষ্টীয় শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। অষ্টম শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগ।

মধ্যযুগে গণিতশাস্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বীজগণিতের উৎকর্ষ ও প্রসার। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্করাচার্যের (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক) নাম চিরস্মরণীয়। ভাস্করাচার্য এবং অন্যান্য গণিতবিদগণের প্রচেষ্টায় গতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। পরবর্তী জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আর্যভট্টের শিষ্য লাতদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে প্রথম ভাস্কর, দশম শতকে দ্বিতীয় আর্যভট্ট এবং মঞ্জুল ও দ্বাদশ শতকে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থের লেখক দ্বিতীয় ভাস্করের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে জ্যোতির্বিদ্যাচর্চায় আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের তত্ত্বগুলিকে পরবর্তী জ্যোতির্বিদরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন মল্লিকার্জুনসূরী দ্বাদশ শতকেও সূর্যসিদ্ধান্তের টীকা রচনা করেন তেলেগু এবং সংস্কৃত ভাষায়। নবম শতকে সূর্যসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লেখা সুমতির 'সুমতিতন্ত্র' গ্রন্থ পরবর্তীকালে নেপালী দিনগণনার পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়।

ফিরে আসি গণিতচর্চায়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই শাস্ত্র কিছু প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে ভিত্তি করে অবরোহী বিশ্লেষণ প্রণালীর পরিবর্তে প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে আরোহ প্রণালীকে আশ্রয় করে। ভারতীয় বীজগণিত ছিল গ্রীক বীজগণিতের মতোই প্রাচীন। বীজগণিতের ক্ষেত্রেও আর্যভট্টের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর 'আর্যভটিয়ম্' গ্রন্থে বীজগণিত সংক্রান্ত কিছু শ্লোক পাওয়া যায়, ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' রেখার জ্যামিতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে আরবদের সঙ্গে ভারতের যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটে তাতে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এরপর পাশ্চাত্যের সঙ্গে আরবদের সংযোগ ঘটলে ভারতীয় সংখ্যাসূচক চিহ্ন, দশমিক পদ্ধতি এবং ত্রিকোণমিতির কিছু তত্ত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য গাণিতিক গ্রন্থগুলির মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে শ্রীধরের 'গণিতসার', ভগ্নাংশ, শূন্যের মান, ঘনক্ষেত্র বা বর্গফল বার করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। দ্বাদশ শতকে দ্বিতীয় 'ভাস্করের লীলাবতী' বা 'বীজগণিত' গ্রন্থও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৫.৩ পরমাণুতত্ত্ব

ভারতবর্ষে দ্বিতীয়দফার নগরায়ণ ঘটে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, এর পরবর্তী যুগ থেকে সম্ভবত দার্শনিক মতবাদগুলির চর্চার সাথে সাথে পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের বিবর্তন ও উদ্ভবের মূলসূত্র অন্বেষণের প্রয়াসে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন তাত্ত্বিক মতবাদ। এই তত্ত্বসমূহ ইহবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যার ফলস্বরূপ জন্ম নেয় প্রাচীন পরমাণুতত্ত্ব।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদ গৃহীত হয়েছে। এই মতবাদকে আরম্ভবাদ এবং অসৎকার্যবাদও বলা হয়। উদয়নাচার্য বলেছেন যে, এই পরমাণুবাদের মূল রয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, তাতে যে 'পতত্র' শব্দটি রয়েছে তাই হল পরমাণু। মহর্ষি কণাদ পরমাণুবাদের আবিষ্কর্তা ও সমর্থক। খৃষ্টীয় প্রথম শতকেই কণাদের পরমাণুতত্ত্বের মাধ্যমে বস্তুর ক্ষুদ্রতর অবিভাজ্য অংশ বা পরমাণুর ধারণা পাওয়া যায়। ন্যায় বৈশেষিক মতে আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা সর্বব্যাপী ও নিত্য দ্রব্য। মন নিত্য হলেও অণুপরিমাণবিশিষ্ট। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু নিত্য। পরমাণু অতিশয় সূক্ষ্ম এবং সর্বপ্রকার উৎপত্তিশীল দ্রব্যের উপাদান কারণ। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে প্রশস্তপদের 'পদার্থধর্ম সংগ্রহ' গ্রন্থে পরমাণু দ্বারা বস্তুজগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

গৌতমের 'ন্যায়সূত্রে' পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। পরে ন্যায়সূত্রের টীকা ন্যায়ভাষ্যে বাৎসায়ন এবং উদ্যতকর ও বাচস্পতি পরমাণুতত্ত্বের আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

আজীবিকদের স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ সংরক্ষিত হয় নি, তবে অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশামের মতে, আদিকাল থেকেই ছয়টি মৌলের ধারণা আজীবিকদের মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণী সাহিত্য 'মণিমেকলাই' ও 'শিলপ্পদিকরম্' থেকে জানা যায়, ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু এবং তার মহাসম্মিলনে বৃহৎ বস্তুজগতের সৃষ্টির তত্ত্ব আজীবিকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

বৌদ্ধ দার্শনিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকদের গ্রন্থে পরমাণুতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বসুবন্ধুর 'অভিধম্মকোষ' এবং বিভিন্ন সময়ে রচিত তার উপর নানা ভাষ্য বা টীকা, শুভগুপ্তের খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে লিখিত 'বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা' থেকে এই তত্ত্বের নানা মৌলিক বক্তব্য পাওয়া যায়। এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হল পরমাণুকে এখানে ক্ষুদ্রতম অংশ রূপে স্বীকার করলেও তার অবিনশ্বরতা স্বীকার করা হয় নি।

৫.৪ রসায়ন-চর্চা

প্রাচীন ভারতে রস বলতে বোঝানো হত গাছ-গাছড়া, লতাপাতা পেষণ করে প্রাপ্ত রস অথবা জ্বাল দিয়ে প্রাপ্ত ক্বাথ। চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতায় প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক যোগ ও তার প্রস্তুত প্রণালী,

পতঞ্জলির ধাতুবিদ্যায় ধাতুজাতীয় লবণ, সংকর ধাতু, পারদ সংকর ও বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাষণ, শোধন এবং বিশুদ্ধতা পরীক্ষার উল্লেখ ও আলোচনা রয়েছে। ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে 'বৃহৎসংহিতা'য় সিমেন্ট তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে বরাহমিহির আলোচনা করেন। সেখানে সিমেন্টকে 'বজ্রলেপ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধযুগের বিভিন্ন মন্দিরে এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। সপ্তম-অষ্টম শতকে রসায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র। বানভট্টের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা' সম্ভবত অষ্টম শতকে লেখা, এই গ্রন্থে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নানা খনিজ এবং প্রাকৃতিক লবণের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও একদা অ্যালকেমি বা কিমিয়াবিদ্যা বিশেষ প্রসার লাভ করে। সিন্দুর দহন করে তরল পারদ ধাতু নিষ্কাশন করার কৌশল ভারতবর্ষের আয়ত্ত ছিল। সেযুগে একদিকে যেমন সোনা তৈরীর প্রচেষ্টায় পারদ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে, তেমনই চলে ঔষধে গাছ-গাছড়ার সঙ্গে পারদ-ঘটিত পদার্থের ব্যবহার। তখন রস বলতে প্রধানত পারদকেই বোঝানো হত। তান্ত্রিক নিগূঢ়তত্ত্বে অ্যালকেমি বা নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার শাস্ত্র ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অ্যালকেমিষ্ট বা কিমিয়াবিদ ছিলেন নাগার্জুন। তিনিই সর্বপ্রথম পারদ-গন্ধক ঘটিত পদার্থ কজ্জলী ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে পৃথক প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর বা মকরধ্বজ। প্রস্তুতিগত পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও এদের উপাদানগত পার্থক্য সেই, আধুনিক রসায়নশাস্ত্রে এসবই মারকিউরিক স্যালফাইড নামে পরিচিত। যাইহোক, ঔষধে পারদ এবং অন্যান্য ধাতু প্রয়োগ করার নাম দেওয়া হয় রসায়ন। নাগার্জুনের 'রসরত্নাকর' এবং শৈবতান্ত্রিক গ্রন্থ 'রসার্নব' এই অমৃততত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত। পরবর্তী যুগে 'রসরত্নসমুচ্চয়' এবং অন্যান্য গ্রন্থে পারদের গুণাগুণ সম্পর্কে অনেক বেশী বাস্তবসম্মত আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক চরিত্র নিয়েও বিশদ ব্যাখ্যা হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতীয় অ্যালকেমি তিব্বতেও প্রভাব বিস্তার করে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সাহিত্যিক সূত্রে ভারতবর্ষে ঘুমের ঔষধে পারদে ব্যবহার দেখা যায়। আনুমানিক ৯৫০ খৃষ্টাব্দে চক্রপাণি সমপরিমাণের পারদ ও গন্ধক মিশিয়ে গন্ধক মিশ্র পারদ তৈরী করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রসার্নব সর্বপ্রথম অগ্নিপ্রয়োগে তামার শিখা নীল, টিনের শিখা পারদ রঙের, সীসার শিখা ম্লান, লোহার শিখা তামাটে এবং তুঁতের শিখা লাল হয় সে কথা অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন।

৫.৫ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল ধাতুবিদ্যার প্রসার। উন্নত ধাতুপ্রযুক্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে দিল্লীর অদূরে অবস্থিত মেহরৌলি লৌহস্তম্ভ যা অনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া সম্পূর্ণ তাম্রনির্মিত সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি এবং সমকালীন ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিসমূহ নিঃসন্দেহে ভারতীয় কারিগরীবিদ্যার উৎকর্ষতার পরিচায়ক। ইস্পাত

তৈরীর কৌশল আয়ত্ত হবার ফলে ভারতবর্ষের রণনীতিতে পরিবর্তন আসে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে সকল ভারতীয় পণ্যের কদর ছিল তার মধ্যে উন্নত মানের ধাতুনির্মিত দ্রব্য ছিল অন্যতম। উন্নত ধরণের ধাতুবিদ্যার জন্য বিশেষভাবে উত্তপ্ত করা ইস্পাতের বিশেষ মূল্য ছিল। শেষোক্ত উপায়ে তৈরী স্টিল থেকে বিশ্ববিখ্যাত 'দামাস্কাস' তরবারী তৈরী হত। ভারতীয় ইস্পাত নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র বর্হিবাণিজ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বাইরের বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে।

বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের প্রযুক্তিতে প্রস্তুত অন্যান্য যে সকল পণ্যের চাহিদা বহির্বিশ্বে ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বোনা কাপড়ের জন্য ফিট্‌কিরি ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সংযোগে তৈরী রং মাখানো দ্রব্য এবং তুঁত গাছ থেকে তৈরী 'ইন্ডিগোটিন' বা নীলরঙ। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষত রঞ্জক পদার্থের ব্যবহারে অভূতপূর্ব নৈপুণ্য এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শৈল্পিক পরিবেশনের ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল রঙ-এর ব্যবহার এই নবলব্ধ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার দৃষ্টান্ত। অজন্তা গুহাচিত্রের মৌলিক রঙের বৈচিত্র্য যা আজও আমাদের বিস্মিত করে তা আহরণ করা হয়েছিল বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য থেকে। উজ্জ্বল নীল রঙের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল নীলকান্তমণি।

সাধারণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে প্রযুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা উদ্ভাবনগুলি তখনও যুক্ত হয়নি। গিল্ড বা কারিগর সংগঠন বা 'শ্রেণী'-র সীমিত গন্ডিতে এই প্রযুক্তিচর্চা চলত এবং বংশ পরম্পরায় এই চর্চার অনুশীলন চলত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে যেমন রসায়ন ও গণিতের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পারিস্পারিকভাবে আদান-প্রদান করা হত।

এই সময়ের সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে তাত্ত্বিক আলোচনার সাথে প্রায়োগিক কলাকৌশলের প্রতিও আলোকপাতের প্রবণতা দেখা যায়, তবে এই জাতীয় সাহিত্য সংখ্যায় খুবই কম। বরাহমিহিরের রচনায় কৃষিবিদ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে 'মানসার' ও 'কৃষিপ্রসার' গ্রন্থেও এরূপ আলোচনা দেখা যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কীত বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে শিল্পশাস্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কীত এই গ্রন্থগুলি ধর্মীয় এবং ধর্ম বহির্ভূত স্থাপত্যের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সরবরাহ করে।

৬.০ অনুশীলনী

১। প্রাচীন ভারতবর্ষের সৃজনশীল কাব্য সম্পর্কে যা জানেন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন।

২। আলোচ্য যুগে দর্শন-চর্চার বিভিন্ন ধারা প্রসঙ্গে কি জানেন?

৩। নাটক ও নাট্য সাহিত্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ কতটা সমৃদ্ধ ছিল তা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৪। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আদি-মধ্য যুগে ভারতবর্ষে কি কি গ্রন্থ রচিত হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কিভাবে উদ্ভব ও প্রসার ঘটে?

৭.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। এ. বি. কীথ ঃ এ হিস্ট্রী অফ্ স্যান্স্ক্রিট লিটারেচার, লন্ডন, ১৯৬১।

২। এস. এন. দাশগুপ্ত এবং এস্. কে. দে ঃ এ হিস্ট্রী অফ্ স্যান্সক্রিট লিটারেচার—প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২।

৩। এ. এফ্. আর. হর্নলে ঃ স্টাডিজ ইন মেডিসিন ইনএনশেন্ট ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড, ১৯০৭।

৪। গণনাথ সেন ঃ আয়ুর্বেদ-পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৫। সমরেন্দ্রনাথ সেন ঃ বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৫, ১৯৫৮।

৬। সুকুমারী ভট্টাচার্য ঃ ক্লাসিকাল স্যান্স্ক্রিট লিটারেচার।

৭। ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় ঃ এ পপুলার ইন্ট্রোডাকশন্ টু ইন্ডিয়ান ফিলসফি।

৮। ঐ ঃ সায়েন্স এন্ড সোসাইটি ইন্ এনশেন্ট ইন্ডিয়া।

একক ৩ □ জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ও রসায়ন (Astronomy, Ayurveda and Rasayana)

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ পূর্বাবলোকন

১.২ জ্যোতির্বিদ্যা—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১.২.১ জ্যোতির্বিদ পরিচয়

১.৩ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ

১.৪ বৈদেশিক প্রভাব

২.০ আয়ুর্বেদ ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

২.১ আয়ুর্বেদাচার্য (বৈদ্যক) ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৩.০ রসায়ন

৩.১ চরক ও সুশ্রুতের রসায়ন

৩.২ বাগভট্ট, বৃন্দ ও চক্রপাণিদত্তের রসায়ন

৩.৩ কিমিয়া বা তান্ত্রিক রসায়ন

৩.৩.১ রসরত্নাকর

৩.৩.২ রসার্ণব

৪.০ কথান্ত

৫.০ অনুশীলনী

৬.০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককটিতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কালসীমায় জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রসার ও প্রগতি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য এককটি এই বিষয়গুলি আরও বিস্তৃত বা বিশদভাবে আলোচনার জন্য সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন ও আয়ুর্বেদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বহু প্রাচীন।

১.১.০ পূর্বাবলোকন

ভারতীয় সভ্যতা, বলা বাহুল্য, বহু প্রাচীন। বহুকাল থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখানে বিজ্ঞানেরও উন্নতি ঘটে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায় মৌর্যযুগে অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টীয় পূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। এই সময়ে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতের বিভিন্ন শাখা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যকরণধর্মী বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচিত হয়, তবে সেগুলি পুঁথিপত্রের আকারে লিপিবদ্ধ হয় পরবর্তী যুগগুলিতে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতেক মগধের অভ্যুত্থান হয়েছিল ঠিকই, তবে মৌর্য আমল থেকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সূচিত হয়। এই ধারা পরবর্তী যুগে কুষাণ এবং গুপ্ত রাজাদের সময়েও অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের, বিশেষত, বেদবিহিত ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের যাথার্থ ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের বৃহত্তর অব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী সন্দিহান হয়ে ওঠে। বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততার বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। শুরু হয় ধর্মীয় আন্দোলন। এই আন্দোলনের জোয়ার মানুষের স্বাধীন, উন্মুক্ত, উদার চিন্তার পথ প্রশস্ত করে যার ফলশ্রুতি হিসাবে কালক্রমে জন্ম নেয় বিভিন্ন স্বাধীন উদারনৈতিক তত্ত্বকথা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিভিন্ন উদ্ভাবন।

শুধুমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, এই আমলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে যে লক্ষণগুলির প্রকাশ ঘটে, তার পূর্ণরূপ প্রতিভাত হয় পরবর্তী প্রায় তিন শতক ধরে। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ অন্তত ষোলটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তির তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে। এগুলি একত্রে 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে পরিচিত। উত্তর ভারতের প্রধান শক্তি থেকে এক সর্বভারতীয় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিল মগধ, মৌর্যসম্রাটগণের অবিংসবাদী কৃতিত্বে মগধের এই উত্তরণ ঘটে। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন প্রশ্নাতীত। এই সময়ের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল প্রধান। মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে নগরায়ণের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তী তিন-চার শতক ধরে নগরায়নের পাশাপাশি বাণিজ্যের ব্যাপক অগ্রগতি ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে শুধুমাত্র আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যই নয়, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষদিক থেকে ভারতবর্ষ নিয়মিত দুরপাল্লার বৈদেশিক তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে ভারত মহাসাগরে মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি বণিক ও নাবিকদের কাছে পরিচিত হয়ে যায়, শুরু হয় পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যের প্রসার। চীন ও সুদুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের স্থল ও নৌবাণিজ্যের ইতিহাস আরও প্রাচীন। এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের সূত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ-সূত্র স্থাপিত হবার ফলে উভয়ের সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চা, চিকিৎসাশাস্ত্র পরস্পরকে প্রভাবিত করে, শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্য নয়, দেওয়া-নেওয়া শুরু হয় বহু চিন্তাভাবনার, বহু উদ্ভাবনী তত্ত্বের।

১.২.০ জ্যোতির্বিদ্যা—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

জ্যোতির্বিদ্যা বা জ্যোতির্বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় তা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী এককে আলোচনা করা হয়েছে। সভ্যতার প্রথম বিকাশকাল থেকেই সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি পরম কৌতুহলের বিষয় ছিল। বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিষ্কগণের বিশেষ করে সূর্য ও চন্দ্রের আবর্তন ও চলাচলের নিয়মকানুন আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং কালগণনার প্রয়োজনে তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গণনা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

প্রথমদিকে সূর্য, চন্দ্র, দৃশ্যমান গ্রহপঞ্চক (বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি), চন্দ্রপাত বা রাহু এবং তারকারাজির গমনাগমনের নিয়ম আবিষ্কার, তাদের ভবিষ্যত অবস্থান নির্ণয় এবং গ্রহণাদির (সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ) গণনাই জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী যুগে ক্রমে ক্রমে গ্রহাদির অবস্থান ও চলাচলের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও দেশগত ভাগ্যের সম্পর্ক আছে বলে অনেকে কল্পনা করতে থাকেন, তার ফলে ফলিত জ্যোতিষের উদ্ভব হয়। প্রথমদিকে গণিত জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ উভয়েই জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে অবশ্য ভাগ্যগণনাশাস্ত্রকে জ্যোতির্বিদ্যার সীমানার বাইরে রাখা হয়েছে। অপরপক্ষে গ্রহ ও তারকাদির দূরত্ব, ওজনবিন্যাস, বস্তুবিন্যাস, গঠনপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা এই শাস্ত্রের অন্তর্গত হয়েছে। ফলে অধুনা পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুত, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য তারকা ও নীহারিকাপুঞ্জের আকৃতি, প্রকৃতি ও গতিনির্ণয় ও তৎসহ বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা।

ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শুরু হয়। তখন মাত্র সূর্য ও চন্দ্রের গতিই পর্যবেক্ষণ করা হত। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বিভাগের দ্বারা ঋতুকাল নিরূপণ করা হত এবং বৎসরও গণনা করা হত। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দ্বারা বৎসরকে মাসে ভাগ করা হত। বৈদিক ঋষিগণ সূর্যগ্রহণও লিপিবদ্ধ করেছেন; তাঁরা চন্দ্রপথকে ২৭ বা ২৮টি নক্ষত্র বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন। ১৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের সন্নিহিত সময়ে সূর্য ও চন্দ্রের গতিকে ভিত্তি করে বর্ষপঞ্জী রচনার পদ্ধতিও প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তখন গ্রহগতি নির্ণয়ের প্রচেষ্টার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টজন্মের পরে অবশ্য এই প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যভূমিতে গ্রহগতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কিছু উন্নতি হয়েছিল এবং যেহেতু পরবর্তীযুগে ঐ সকল দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ নিয়মিতভাবে স্থাপিত হয়, সেহেতু মনে করা যেতে পারে, এদেশে গ্রহগণিতের যে উন্নতি ঘটেছে তার মূল উপাদান এশিয়ার পশ্চিমাংশ থেকে এসেছিল। অবশ্য এ দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান পাশ্চাত্যদেশের জ্ঞান অপেক্ষা কিছুটা পৃথক এবং উন্নত।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থকে সিদ্ধান্তগ্রন্থ বলা হয়। আর্যভট্ট কৃত আর্যভট্টীয়, বরাহমিহিরের সংকলিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচার্যের গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায়

সিদ্ধান্তগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ সকল অপেক্ষাও সাবলীলভাবে লিখিত হয়েছে এক অজ্ঞাতনামা জ্যোতির্বিদের রচনা করা সূর্যসিদ্ধান্ত। অবশ্য সূর্যই যে সৌরজগতের কেন্দ্র এ কথা তাঁরা নির্ণয় করতে পারেন নি। পাশ্চাত্যদেশে ক্লডিয়াস টলেমি (আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) কর্তৃক প্রচারিত ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ এবং তাঁর রচিত 'জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস্' গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে সম্ভবত সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি রচিত হয়।

১.২.১ জ্যোতির্বিদ—পরিচয়

আমরা ভারতবর্ষের প্রখ্যাত কয়েকজন জ্যোতির্বিদের জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে এখন আলোকপাতের প্রচেষ্টা করব।

আর্যভট্ট

আনুমানিক ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের জন্ম হয়, তাঁর বাসস্থান ছিল কুসুমপুর (পাটনা)। আর্যভট বা আর্যভট্টের গ্রন্থ 'আর্যভট্টীয়' (বা ভটীয়) মাত্র ১২১ শ্লোকে সম্পূর্ণ এবং চারটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত (১) গীতিকাপাদ (১৩টি শ্লোক) (২) গণিতপাদ (৩৩টি শ্লোক) (৩) কালক্রিয়া (২৫টি শ্লোক) এবং (৪) গোলপাদ (৫০টি শ্লোক)।

পরবর্তীকালে (৮৭৫ শকাব্দ বা ৯৫৩ খৃষ্টাব্দ) আর্যভট্ট নামধারী অপরএক জ্যোতির্বিদ 'আর্যসিদ্ধান্ত' নামে একটি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন, এঁকে দ্বিতীয় আর্যভট্ট নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ ভারতে এখনও তাঁর আর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থানুসারে পঞ্জিকা গণনা করা হয়।

প্রথম আর্যভট্ট ভারতীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের বা সায়েন্টিফিক অ্যাষ্ট্রনমির প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীকদের নিকট ইনি অন্দুবেরিয়াস্ বা অর্দুবেরিয়স্ এবং আরবীয়গণের নিকট অর্জভর নামে পরিচিত। অল্-বিরুণী তাঁকে বারবার কুসুমপুরের আর্যভট্ট বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দু জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আর্যভট্টই প্রথম দিন রাত্রিভেদের কারণস্বরূপ পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা (ভূ-ভ্রমণবাদ) প্রচার করেন। পৃথিবী কতবার আবর্তিত হয় তা তিনিই প্রথম নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর প্রায় হাজার বছর পর কোপার্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ) কর্তৃক এই তত্ত্ব পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত হয়েছিল। আর্যভট্ট প্রস্তাবিত পৃথিবীর আহ্নিক গতি বিষয়ক মতবাদ পরবর্তীকালে হিন্দু জ্যোতির্বিদগণের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের আহ্নিক গতির তত্ত্ব গ্রহণ করেন নি।

হিন্দু জ্যোতিষে আর্যভট্টের আর একটি অবদান হল পরিবৃত্ত ও উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে গ্রহগতির ব্যাখ্যা প্রদান।

আর্যভট্টের কয়েকজন শিষ্য টীকাকার হিসাবে হিন্দুজ্যোতিষে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে লাটদেব, প্রথম ভাস্কর ও লল্ল-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাটদেব আর্যভট্টের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করেন।

বরাহমিহির

আনুমানিক ৫০৫ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের জন্ম। কিংবদন্তী এই যে, বরাহমিহির ছিলেন অবন্তীনগরবাসী এবং বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন। এই বিক্রমাদিত্য কারোর মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য, আবার কেউ কেউ বলেন গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। যাইহোক, বরাহমিহিরের লোকান্তর ঘটে ৫৭৮ বা ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে, এ ক্ষেত্রেও সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব হয় নি। তবে তিনি যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের ব্যক্তি ছিলেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অপর একটি কিংবদন্তী আছে যে, বরাহ পিতার এবং মিহির তৎপুত্রের নাম।

বরাহমিহির একাধারে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতে পারদর্শী ছিলেন। 'বৃহৎসংহিতা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি সূর্য-চন্দ্রাদির গতি ও প্রভাব, আবহবিদ্যা, স্থাপত্য এবং পূর্ত কর্মাদির প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা, শাকুনবিদ্যা, বিবাহ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন। বরাহমিহিরের অন্যান্য গ্রন্থ হল— (১) বৃহদ্বিবাহপটল ও (২) পল্লববিবাহপটল—এই গ্রন্থদ্বয়ে জ্যোতির্বিদ্যাসম্মত বিবাহের কালাকালাদির আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া যোগযাত্রা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ।

ব্রহ্মগুপ্ত

ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ও বীজগণিতাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম আনুমানিক ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে। অল-বিরুনীর মতে তাঁর নিবাস ছিল মুলতান প্রদেশের সন্নিকটে; বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয়ের মতে তিনি উত্তর গুর্জর প্রদেশের রাজধানী ভিল্লমল নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। নিজ গ্রন্থ ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তের রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি (জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্ত) ৫৫০ শকাব্দ গত হলে ত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীব্যাঘ্রমুখ নামক রাজার রাজত্বকালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই তথ্য থেকে অনুমিত হয় তাঁর জন্মকাল ৫৯৮ খৃষ্টাব্দ। ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত আরবদেশে 'সিন্দহিন্দ' নামে পরিচিত ছিল। তাঁর রচিত করণ-গ্রন্থ 'খণ্ডখাদক' ও আরবদের নিকট পরিচিতি ছিল 'অলর্কন্দ' নামে। আর্যভট্টের পর প্রাচীনভারতে গণিত ও জ্যোতিষে স্বতন্ত্রতার পরিচয় দেন ব্রহ্মগুপ্ত। তবে আর্যভট্টের আহ্নিক গতির মতবাদকে তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন।

ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত গ্রন্থটি ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গণিত ও গোলজ্যোতিষ ব্যতীত পাটীগণিত ও বীজগণিতও ব্রহ্মগুপ্তের রচনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর গতিশীলতা ও অয়ন-চলন সম্বন্ধে ব্রহ্মগুপ্ত নীরব ছিলেন। ইউরোপীয় বীজগণিতের মূলে আরবী গ্রন্থ ঃ আরবী গ্রন্থের মূলে ব্রহ্মগুপ্তের রচনা। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মগুপ্তকে 'গণচক্রচূড়ামণি' আখ্যায় অভিহিত করেছেন।

মুঞ্জাল

মুঞ্জাল খৃষ্টীয় নবম শতকের একজন প্রথিতযশা জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। তবে তাঁর সঠিক জন্মসাল বা জন্মস্থান অজ্ঞাত। মুঞ্জাল তাঁর কর্মস্থল উজ্জয়িনীতে আনুমানিক ৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 'লঘুমানস' নামে একটি

জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে অয়ন-চলন বা পৃথিবী পরিক্রমা সম্পর্কে প্রথম যে জ্যোতির্বিদ সবিস্তারে আলোচনা করেন, তিনি হলেন মুঞ্জাল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাস্কর অয়নগতির আলোচনা প্রসঙ্গে মুঞ্জালের উল্লেখ করেছেন।

ভাস্করাচার্য

আনুমানিক ১১১৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের বীজ্জলবীড় গ্রামে ভাস্করাচার্যের জন্ম, ইনি ১১৫০ খৃষ্টাব্দে 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থটি রচনা করেন। পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। 'সিদ্ধান্তে শিরোমণি' গ্রন্থটি চারভাগে বিভক্ত ঃ (১) লীলাবতী (২) বীজগণিত (৩) গ্রন্থগণিতাধ্যায় এবং (৪) গোলাধ্যায়। লীলাবতী অধ্যায়টি পাটীগণিত সংক্রান্ত; গোলাধ্যায়ে ভাস্করাচার্য পৃথিবীর গোলত্ব ও তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ব্যাস-গণিতের সাহায্যে 'তৎকালিক গতি'র মূল তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্থূলগতির পরিবর্তে সূক্ষ্মগতি নির্ণয়।

১.৩ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ

আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের রচনাকাল। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ রচনায় একদল বহিরাগত জ্যোতির্বিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা মূলত শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ।

'সিদ্ধান্ত' বলতে হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ যে কোন জ্যোতিষকেন্দ্রিক গ্রন্থকেই বুঝিয়েছেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ ও টীকাকারদের রচনা থেকে মূলত আঠারো ধরণের সিদ্ধান্তের হদিশ পাওয়া যায়। বরাহমিহির ছাড়াও টীকাকার ভট্টোৎপল পৌলিশ সিদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মধ্যে সর্বোত্তম হল সূর্যসিদ্ধান্ত। শেষোক্ত সূর্যসিদ্ধান্তটি বহু পূর্বে রচিত সমনামী গ্রন্থটির থেকে বহুক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য পূর্ণ। বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্তটি বহু জ্যোতির্বিদ ও টীকাকারদের দ্বারা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। এই পরিবর্তনটি মূলত প্রাক্ পঞ্চম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে সাধিত হয়। বর্তমান সূর্য সিদ্ধান্তটি ১৪টি পরিচ্ছেদে রচিত, যথা—(১) গ্রহদের মধ্যে গতি (২) গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান (৩) দিক (৪) দেশ (৫) কাল (৬) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ (৭) গ্রহদের সংযোগ (৮) ও (৯) নক্ষত্র (১০) চাঁদের উদয়াস্তের উচ্চতা (১১) সূর্য ও চন্দ্রের কয়েকটি দোষ (১২) ব্রহ্মলোক, ভূগোল সৃষ্টির ব্যাপ্তি (১৩) আর্মিলারী গোলক ও কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি (১৪) কালনির্ণয়ের বিভিন্ন উপায়।

১.৪ বৈদেশিক প্রভাব

চীনদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারারও আদান-প্রদান শুরু হয়। ট্যাংদের রাজত্বকালে চীনে কয়েকজন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ পদার্পণ করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চ্যাংনানে গৌতম, কাশ্যপ ও কুমার নামে তিনজন জ্যোতিষী তিনটি

ভারতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে চর্চা করেন বলে জানা যায়। ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী উ-র নির্দেশে গৌতম সিদ্ধান্তে পারদর্শী জনৈক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ একটি পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। ৭১৮ খৃষ্টাব্দে রচিত এই পঞ্জিকার নাম 'কিউ-চি-লি' বা নবগ্রহ সিদ্ধান্ত। পঞ্চম শতাব্দীর আর্যভট্টের জ্যামিতির সঙ্গে তৃতীয় শতকের চৈনিক গণিতজ্ঞ লিউ হুই এর রচনার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

আরব্য বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা মূলত গ্রীস ও ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল। পারসিক ও সিরিয় পন্ডিতগণ বরাবরই ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সেভেরাস্ সেবখ্‌ত্ নামে এক সিরিয় খৃষ্টান ধর্মযাজক হিন্দু অঙ্ক পাতন পদ্ধতির ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। খলিফা-আল্-মনসুরের সময় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতীয় পন্ডিতদের সঙ্গে আরবীয় পন্ডিতগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দু'দেশের বিজ্ঞানচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। ইব্রাহিম-আল-ফাজারি ও ইয়াকুব-ইব্‌ন্-তারিখ নামে দুই আরবীয় গণিতজ্ঞ হিন্দু পন্ডিতদের সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্তের দুটি রচনার আরবী অনুবাদ করেন। অল্‌বিরুনী ভারতবর্ষে এসে মূল সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করে তা লিপিবদ্ধ করেন।

২.০ আয়ুর্বেদ ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

পূর্ববর্তী এককে আয়ুর্বেদ বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণার অবতারণা করা হয়েছে, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হতে উদ্ভুত এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। ব্রহ্মা তাঁর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেন প্রজাপতিকে, প্রজাপতি দেন অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে। এই দুই দেব চিকিৎসকের নিকট হতে দেবরাজ ইন্দ্র এই বিদ্যা অর্জন করে ঋষি ভরদ্বাজ প্রভৃতিকে তা দান করেন। ভরদ্বাজ থেকে আত্রেয়, আত্রেয় থেকে অগ্নিবেশ ও অন্যান্য শিষ্যগণ এবং তাঁর পরে চরক চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেন। আবার ধন্বন্তরি, সুশ্রুত ও তার সহাধ্যায়ীগণ আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং তৎপরবর্তীকালে সেই সূত্র থেকে নাগার্জুন প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। প্রথম অবস্থায় শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর শিক্ষাদাতা ঋষি হতে শিক্ষার্থী ছাত্র শুধু মুখে মুখে শুনে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে পরবর্তীকালে একইভাবে নিজ নিজ ছাত্রগণের নিকট সেই জ্ঞান হস্তান্তর করতেন। আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ প্রথমে সেই জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে সংহিতার আকারে প্রকাশ করেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে মহর্ষি আত্রেয়ের অন্যান্য শিষ্যগণ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি প্রভৃতিও অনুরূপভাবে নিজেদের আহরিত জ্ঞান সংহিতা আকারে প্রকাশ করেন।

২.১ আয়ুর্বেদাচার্য (বৈদ্যক) ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিত

প্রাচীন ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাবিজ্ঞান উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণ করে। আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ আয়ুর্বিজ্ঞানী সম্পর্কে সামগ্রিক আলোকপাত করার প্রয়াসী।

চরক

অনন্তজ্ঞানের অধিকারী চরক সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লিখিত কপিলবলের চরক উপাধি দেখে কোনো কোনো পণ্ডিত তাঁকে চরকসংহিতার রচয়িতা বলে মনে করেন, ইনি সম্রাট কণিষ্কের সভাপণ্ডিত ছিলেন। আলোচ্য 'চরকসংহিতা'টি 'অগ্নিবেশ-সংহিতা'র সংস্কৃত রূপ। বর্তমানে উপলব্ধ 'চরকসংহিতা' আচার্য দৃঢ়বল চরকের পুনঃসংস্কৃত। এই গ্রন্থের সিদ্ধিস্থানের সপ্তদশ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশটি তাঁরই রচিত।

চরকসংহিতাকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান। সমগ্র গ্রন্থের রচনাশৈলীতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের ভট্টার হরিচন্দ্র রচিত 'চরকটীকা', নবম শতাব্দীর আষাঢ়বর্মা রচিত 'পরিহার বার্তিকা' ও দশম শতকের জেজট-নির্মিত 'নিরন্তরপদ ব্যাখ্যা' প্রাচীন টীকাগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে 'কার্তিককুণ্ড' ও 'গয়দত্ত'-এর চরকটীকাও নির্মিত হয়। একাদশ খৃষ্টীয় শতকে বাংলার প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্তের রচিত চরকটীকা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সাবলীল।

সুশ্রুত

আয়ুর্বেদের ইতিহাসে চরকের মত সুশ্রুতের গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর খ্যাতি খৃষ্টীয় ৯ম—১০ম শতকের মধ্যেই পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। চক্রপাণিদত্তের (খৃষ্টায় একাদশ শতক) টীকা রচিত হবার পূর্বে সুশ্রুতের গ্রন্থের অর্থাৎ সুশ্রুত-সংহিতার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। চক্রপাণিদত্তের ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসাবে রচিত হয়েছিল ডল্লনের (ত্রয়োদশ শতক) ব্যাখ্যা।

সুশ্রুত সংহিতা ছয় খণ্ডে রচিত, এগুলি হল সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও উত্তরতন্ত্র। সুশ্রুতসংহিতার শল্যচিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারবিদ্যা খ্যাতি অর্জন করেছে।

বাগভট বা বাগভট্ট

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বাগ্ভট নামধারী একাধিক লেখকের মধ্যে প্রাচীন হলেন বৃদ্ধবাগভট। ইনি সিংহগুপ্তের পুত্র, বৌদ্ধ অবলোকিতের শিষ্য এবং গদ্যপদ্যময় 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' বা 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহের স্রষ্টা। চৈনিক পরিব্রাজক খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের ইৎ-সিং সম্ভবত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের লেখক হিসাবে এই বাগভট্টেরই উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণীতে অষ্টাঙ্গ সংগ্রহেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ হোয়েনলে এবং ডঃ সার্টন তাঁকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের লোক বলেই মনে করেন। অষ্টাঙ্গহৃদয়ে অস্ত্রোপচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। পদ্যে রচিত 'অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা'-র রচয়িতা অপর বাগভট্ট সম্ভবত বৃদ্ধবাগভট্ট-র রচনা দ্বারা প্রভাবিত হন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, ইনিই সিন্ধু অধিবাসী সিংহগুপ্তের পুত্র। জনপ্রিয়তার দিক থেকে আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতকের দ্বিতীয় বাগভট্টের অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা, প্রথম বা বৃদ্ধ বাগভট্টের রচনাকেও

পিছিয়ে দেয়। দুই বাগভট্টের রচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চরক ও সুশ্রুতের যুগে শারীরবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসার যে প্রসার ও উন্নতি ঘটে, খৃষ্টীয় ৭ম—নবম শতক নাগাদ তার অবনতি ঘটেছিল।

মাধবকর ও বৃন্দ

ইন্দুকরের পুত্র মাধবকরের সময়কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতক। তিনি 'বুগ্বিনিশ্চয় মাধবনিদান' রচনা করেন। গণ্ডালের ঠাকুরসাহেব প্রমাণ সহযোগে বলেছেন যে, এই মাধবকর হলেন বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্যের ভাই মাধবাচার্য। এ তথ্য স্বতঃসিদ্ধ নয়। তবে মাধবকর খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক অপর এক চিকিৎসাবিদ ও রসায়নজ্ঞ হলেন বৃন্দ, যিনি 'সিদ্ধযোগ' নামে একটি চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপাণিদত্ত

চক্রপাণিদত্ত একাদশ খৃষ্টীয় শতকের শেষার্ধে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে লোধ্রবলী বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। চক্রপাণির পিতা নারায়ণদত্ত গৌড়াধিপতি মহারাজ নয়পালদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে চক্রপাণি 'চিকিৎসা সংগ্রহ', 'দ্রব্যগুণ', 'সর্বসারসংগ্রহ' নামে তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই চিকিৎসা সংগ্রহ নামক পুস্তকটি চক্রদত্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই বৃন্দ-বিরচিত 'সিদ্ধ যোগে'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। এই গ্রন্থে 'নাবনীতক সংহিতা', 'চরকন্যাস', 'বৃদ্ধবিদেহ', 'বৃদ্ধসুশ্রুত', 'বৃদ্ধবাগ্ভট' প্রভৃতি বর্তমানে লুপ্ত প্রায় বহু গ্রন্থ থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। চক্রপাণিদত্ত 'চরকসংহিতা'র উপর 'চরকতত্ত্বপ্রদীপিকা' নামে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা ও সুশ্রুতের উপর 'ভানুমতী' টীকা রচনা করে 'চরকচতুরায়ন' ও সুশ্রুত সহস্রনয়ন' উপাধি লাভ করেন। মাধব নিদানের উপরও চক্রপাণির একটি টীকা পাওয়া যায়। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও 'ব্যকরণতত্ত্বচন্দ্রিকা' এবং 'শব্দচন্দ্রিকা' নামে ব্যকরণ ও কোষগ্রন্থের তিনি রচয়িতা। চক্রদত্তের 'মুক্তাবলী' ঔষধসম্পর্কীত একটি বহু প্রচলিত গ্রন্থ। শুধু চিকিৎসাবিদ নয়, রসায়নেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল বলে জানা যায়। পারদ-গন্ধক ঘটিত লবণ বা মার্কারি সালফাইড' কজ্জলী বা রসকর্পটি সম্ভবত তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

নাগার্জুন

প্রাচীন ভারতবর্ষে তিনজন নাগার্জুন ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন, প্রথম নাগার্জুন হলেন সুত্রবৃত্তির রচয়িতা শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জুন। সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ইনি জন্মলাভ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতকে আর এক নাগার্জুনের উল্লেখ পাওয়া যায় বৃন্দ উল্লিখিত সিদ্ধযোগে। পণ্ডিতদের মতে এই নাগার্জুন হলেন সুশ্রুত-সংহিতার রচয়িতা। তিনিই মূল গ্রন্থের কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেন। সুশ্রুত চন্দ্রিকা ও ন্যায়চন্দ্রিকা নামে প্রচলিত গয়দাসের পঞ্জিকাতে নাগার্জুন পাঠ নামে উল্লিখিত পাঠটি সুশ্রুতসংহিতারই পাঠ।

ডহ্লন

ডহ্লন সুশ্রুতসংহিতার উপর একটি টীকা রচনা করেন যা 'নিবন্ধসংগ্রহ' নামে পরিচিত। চক্রপাণিদত্তের পর তিনিই সুশ্রুতের অন্যতম প্রাচীন টীকাকার। এই গ্রন্থের বিবৃতি অনুসারে বৃদ্ধ সুশ্রুত রচিত সুশ্রুত সংহিতা নাগার্জুনের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে বর্তমান সুশ্রুত সংহিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। ডহ্লনের সময়কাল খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক।

শার্ঙ্গধর

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একজন চিকিৎসাবিদ ও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ হলেন শার্ঙ্গধর। 'শার্ঙ্গধর সংহিতা' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ভারতীয় ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থা, ঔষধের গুণাগুণ, রোগ-নির্ণয়, রোগের প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিন্যাস, রোগের উপর ঋতুগত প্রভাব, অ্যানাটমি বা শারীরবৃত্তি-সম্পর্কিত নানা আলোচনা সন্নিবেশিত; দ্বিতীয় খণ্ডে কষায়, নিষেক, বড়ি, চূর্ণ প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী, স্বর্ণভস্ম, ধাতবভস্ম, পারদ ঘটিত যৌগিক প্রস্তুত প্রণালী আলোচিত এবং তৃতীয় খণ্ডে সাধারণ চিকিৎসার নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে নাড়ী পরীক্ষার পদ্ধতির বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে। শার্ঙ্গধর রচনায় রোগের পুংখানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। অহিফেনের উল্লেখ এবং ব্যবহার সর্বপ্রথম করেন শার্ঙ্গধর। অকরাক্তভ নামক লালার উৎপত্তি ও উত্তেজক ভেষজের গুণাগুণ শাঙ্গাদেব সংহিতায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে বোপদেব শাঙ্গাধরের সংহিতার ওপর একটি টীকা রচনা করেন।

উপরিউক্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞগণ ছাড়াও নরহরি নামে এক সুচিকিৎসক 'রাজনিঘণ্টু' বা 'অভিধান চূড়ামণি' (১২৩৫—৫০ খৃষ্টাব্দ) নামে ভেষজ চিকিৎসার একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

৩.০ রসায়ন

প্রাচীন ভারতবর্ষে রসায়নের আদি ইতিহাস সম্পর্কে পূর্বেই একটি প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা বহু প্রাচীন। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সূত্র থেকে প্রাচীন ভারতে রসায়নের উদ্ভব হয়, যথা—(১) মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পসংক্রান্ত কারিগরী বিদ্যা এবং (২) চিকিৎসা বিদ্যা। এই দুটি শাস্ত্র-ই ভারতবর্ষে প্রাচীন, যা রসায়নের সফল প্রয়োগে সার্থক হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় সভ্যতার ঊষালগ্নে রসায়নের প্রয়োগ—কৌশল মানবসমাজ আয়ত্ত করে, পরবর্তী সময়ে যুগে যুগে এই বিদ্যা অনেক সুশৃঙ্খল হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে রসায়নশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে বস্তুর উপাদান, ধর্ম এবং সম্বন্ধ বিষয়ক বিদ্যাকে রসায়ন বলা হয়। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন করে হিন্দুদের রসায়নজ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে।

৩.১ চরক ও সুশ্রুতের রসায়ন

চরক ও সুশ্রুত উভয়েই সোনা, রুপা, তামা, সিসা, টিন, লোহা এই ষড়ধাতুর সাহায্যে কয়েকপ্রকার ক্ষার, লবণ ও পানীয় ও কয়েকটি রাসায়নিক তৈরী করেন। তাঁদের মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা ছিল।

চরক পাঁচ প্রকার লবণের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—সৌর্বলে বা সোরা, সৈন্ধব বা খনিজ লবণ, বিট বা কৃষ্ম লবণ, সামুদ্র বা সমুদ্রজাত লবণ এবং উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ লবণ। তুঁতে, মোমছাল, হরিতাল, গন্ধক প্রভৃতিতেও খনিজ লবণ আছে। চর্মরোগের প্রতিকারে ভেষজের সাথে খনিজ লবণ মিশ্রিত করে ব্যবহারের কথা চরকসংহিতায় লিপিবন্ধ হয়েছে।

লবণ বলতে আমরা যা বুঝি তা একশ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ। রসায়নশাস্ত্রে খাদ্য লবণ বা সাধারণ লবণকে 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' বলা হয়। অম্লের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু বা ধাতুকল্প দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ গঠন করে। অম্লের সহিত অন্য লবণ উত্তপ্ত করে এবং ক্ষার বা ক্ষারক ও অম্লের প্রশমন ঘটিয়েও লবণ প্রস্তুত করা যায়। এইভাবে শমিত লবণ, আম্লিক লবণ, ক্ষারকীয় লবণ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সমুদ্রজল উত্তপ্ত করে খাদ্যলবণ পাওয়া যায়। খণিতেও নানাপ্রকার লবণ থাকে, যা খনিজ লবণ নামে পরিচিত। মাটীতে অবস্থিত লবণ প্রধানত গাছের খাদ্য।

ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'অ্যালকেলি' তা আমাদের ভাষায় ক্ষার বলে পরিচিত। অ্যালকেলি শব্দটি আরবী অল্-কালি বা ভস্ম থেকে উদ্ভূত। প্রাচীন ভারতে তেঁতুল, তিসি, কলা, আদা, পলাশ, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের অংশ রৌদ্রে শুকিয়ে ও দগ্ধ করে তার ভস্ম দিয়ে ক্ষার প্রস্তুত হত। চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় ক্ষার তৈরীর পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। চরক সংহিকায় বলা হয়েছে, পলাশের নতুন অংশটিকে প্রথমে টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে ভস্মে রুপান্তরিত করতে হবে। ঐ ভস্মকে চার-ছয় গুণ অনুপাতে জলে ভালোভাবে দ্রবীভূত করে কাপড়ের ছাঁকনিতে একুশবার ছেঁকে নিলে ক্ষার প্রস্তুত হবে। এ বিষয়ে সুশ্রুতের বর্ণনা আরো পরিব্যপ্ত।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্ষারকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, এই তিন শ্রেণীর ক্ষারের প্রস্তুত প্রণালীও বর্ণিত হয়েছে। সুশ্রুত পটাশিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ সবক্ষার ও সোডিয়াম কার্বনেট বা সার্জিকাক্ষারের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সোহাগাও ক্ষারের পর্যায়ভুক্ত।

সেকালের তীক্ষ্ণ ক্ষার বর্তমানের পরিভাষায় সোডিয়াম হাইড্রসাইড বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড। যবক্ষার হল আধুনিক পটাসিয়াম কার্বনেট। যবক্ষার ও চুন একত্রে মিশ্রিত করে তাপ দিলে তৈরী হত পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড। তেমনই সর্জিকাক্ষার (সাজিমাটী বা সোডিয়াম কার্বনেট) থেকে চুন সহযোগে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন হয়। যবক্ষার বা সর্জিকাক্ষার-এর দ্রবণ ও চুণের মিশ্রণকে সেকালে বলা হত মধ্যম ক্ষার এবং যবক্ষারের লঘু দ্রবণকে বলা হত মৃদু ক্ষার।

৩.২ বাগভট্ট বৃন্দ ও চক্রপাণিদত্তের রসায়ন

আলোচ্য শারীররসায়নবিদগণ চরক ও সুশ্রুতের পথানুসারী। বাগভট্ট ক্ষার প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনায় সুশ্রুতেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বাগভট্টের সময় থেকে ঔষধ হিসাবে ধাতব ও খনিজের মিশ্রণ শুরু হয় যা আয়ুর্বেদের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এ বিষয়ে বৃন্দ ও চক্রপাণিদত্তের রসায়ন বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। 'সিদ্ধযোগ' গ্রন্থে বৃন্দ পর্পটি তামা, রসামৃত চূর্ণ প্রভৃতি পারদ দ্বারা নির্মিত কয়েকটি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতের নির্দেশ আছে। গন্ধক, তামা ও তাম্রমাক্ষিক উত্তমরূপে গুঁড়ো করে পারদের সাথে মিশিয়ে একটি বন্ধ মুষার মধ্যে তাকে জারিত করলে পর্পটি তামা উৎপন্ন হবে। রসামৃত, চূর্ণ, গন্ধক ও পারদ মিশিয়ে মার্কারি সালফাইড তৈরী হত। গন্ধকের সাথে অর্ধেক পরিমাপ ওজনের পারদ মিশ্রণে সৃষ্টি হত রসামৃত। আমলকি ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের রসে লোহাকে ভিজিয়ে গরম করে কিভাবে এই ধাতুকে মারা যায় তার প্রক্রিয়াও গ্রন্থে বর্ণিত। চক্রপাণিদত্ত তাঁর গ্রন্থে তামা, লোহা, রূপা, পারদ প্রভৃতি দ্রব্যের যৌগিক প্রস্তুতি প্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন।

৩.৩ কিমিয়া বা তান্ত্রিক রসায়ন

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে অমূল্য কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। বৃন্দ, বাগভট্ট, চক্রপাণিদত্ত প্রমুখের নিরলস চিকিৎসা ও রসায়নচর্চা বিভিন্ন যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত ও চিকিৎসায় সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে তোলে। এই সময়কালেই একটি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী তান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায় শারীরবিদ্যা সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হন। ভারতীয় কিমিয়া মূলত তাঁদেরই সৃষ্টি। কিমিয়াবিদগণ বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি বস্তুতেই আছে একটি মূল উপাদান, তবে তার সঙ্গে সবসময়েই কোনো অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে, যার শোধন প্রয়োজন। অগ্নির দ্বারা শোধন করতে করতে একসময় সেই মূল উপাদানটি বেরিয়ে আসবে। কিমিয়াবিদ্রা মনে করতেন শরীর হল জাগতিক সকল সুখের আধার। তাকে সুস্থ ও নীরোগ রাখা জন্য কি করা উচিত সে ব্যাপারে তাঁরা নিরন্তর গবেষণা করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধানে জানা যায়, পারদ হল সেই বস্তু যা সতেজ, সবল, সুস্থ ও তপস্যাক্ষম শরীর নির্মাণ ও অটুট রাখতে পারে। ফলে পারদকে কেন্দ্রবিন্দু করে তাঁদের গবেষণা চলতে থাকে। তান্ত্রিক কিমিয়ায় 'রস' শব্দের অর্থ পারদ এবং 'রসায়ন' বলতে পারদ বিজ্ঞানকে বোঝানো হয়। তান্ত্রিক কিমিয়ায় সর্বাধিক যাঁর নামোল্লেখ করা যায় তিনি লোহাশাস্ত্র, রসরত্নাকর কক্ষপুটতন্ত্র ও আরোগ্য মঞ্জরীর রচয়িতা নাগার্জুন। এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করে যে দুটি লিখিত উপাদান, সেগুলি হল 'কাঞ্জুর' ও তাঞ্জুর' নামক বিশ্বকোষদ্বয়। এই তান্ত্রিক কিমিয়া গ্রন্থসমূহে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

৩.৩.১ রসরত্নাকর

নাগার্জুনের এই গ্রন্থে প্রথমেই কৃত্রিম উপায়ে নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার কয়েকটি অসম্পূর্ণ প্রণালী বিবৃত হয়েছে। রসক বা দস্তার খনিজ, হিঙ্গুল প্রভৃতি আরও কিছু দ্রব্যকে সোনায় পরিণত করার কিছু বিধান রসরত্নাকরে পাওয়া যায়। তবে দস্তার সঙ্গে তামা মিশিয়ে যে সোনার রঙের সামগ্রী প্রস্তুত হয় তা পিতল ছাড়া অন্য কিছু নয়। পিতল প্রস্তুত প্রণালী ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই জানা ছিল। নাগার্জুনের মতে, পারদের তরলতা, দ্যুতি ও গতিশীলতা না থাকলে বুঝতে হবে পারদটি অকার্যকরী হয়ে গেছে। সঠিক গুণাগুণ যাচাই করার জন্য চাই সঠিক পর্যবেক্ষণ, এ ক্ষেত্রে পারদটির রঙ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যদি সেটি উদীয়মান সূর্যের রঙ ও আভা ছড়ায় এবং অগ্নির উত্তাপ সহ্য করতে পারে তবেই সেই পারদ ব্যবহারযোগ্য।

দস্তা বা জসদ আবিষ্কার ঃ

রসরত্নাকরে দস্তা বা জসদ নিষ্কাশনের পদ্ধতিতে বলা হয়েছে, রসক বা দস্তাটিকে ক্ষার, লাক্ষা, সোহাগা, সন্ধিত ধ্যান্যাবল, স্নেহপদার্থ, ভুসা প্রভৃতির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে বন্ধ পাত্রে আগুনে জারিত করলে টিনের মত পদার্থের উদ্ভব হয়। তাই রসকের সারবস্তু। দস্তা নিষ্কাশনের এটিই সাবেক প্রণালী। তবে নাগার্জুনের সময়ে রসক থেকে দস্তা নিষ্কাশনের পদ্ধতির আবিষ্কার হলেও দস্তাকে তখনও ধাতু হিসাবে গণ্য করা হত না। রসরত্নাকরে যাদুমন্ত্রের উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে বিভিন্ন যন্ত্রের যেমন, পেষন যন্ত্র, বংশযন্ত্র, নালিকা যন্ত্র, গজদন্ত যন্ত্র, দোলাযন্ত্র, অধপাতন যন্ত্র, পাতন, তুলা, বালুকা, মুষা প্রভৃতি।

৩.৩.২ রসার্নব

এই গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধাতু ও খনিজ নিষ্কাষণ পদ্ধতি, ধাতু মারা পদ্ধতি, বিশুদ্ধ ধাতু চেনার উপায়, ধাতুর স্পর্শে অগ্নির বর্নান্তর, পারদ ও পারদ-ঘটিত যৌগিক, ক্ষার এবং রাসায়নিক পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

রসানর্বে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন ও সীসা—এই ছয়টি ধাতুর বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে তাম্র নিষ্কাশন পদ্ধতির সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যায়। ধাতুমারা পদ্ধতিটিও রসানবে বর্ণিত। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম 'বিদ'। গন্ধক, হরিতাল, সামুদ্র, নিশাদল, সোহাগা ও উদ্ভিদভস্মকে মিশিয়ে এক ধরণের বিদ্ তৈরী করা হত।

রসার্নবে বর্ণিত রাসায়নিক যন্ত্রপাতিগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল দোলা যন্ত্র, মুষাযন্ত্র, কোষ্ঠীযন্ত্র, গর্ভযন্ত্র ও হংসপক্ষ যন্ত্র।

বাগভট্ট, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্তের সময় থেকেই ওষুধ তৈরীতে রসায়নকে ব্যবহার করা শুরু হয়। তান্ত্রিক কিমিয়াবিদ্যা সর্বক্ষেত্রে তেমন প্রসারলাভ করে নি, তবে এই সময়ে পারদ ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞানের প্রসার ঘটে এবং নানা যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত বিদ্যা পরিব্যপ্ত হয়।

৪.০ কথান্ত

প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ এবং রসায়নের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল স্মরণাতীত যুগ থেকে। জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও রসায়ন তিনটি পৃথক অনুশীলনের ক্ষেত্র হলেও এই বিদ্যাত্রয় একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আদান-প্রদান ঘটেছে বিভিন্ন দেশের। আজকের ভারতবর্ষের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার মূল নিহিত রয়েছে প্রাচীন যুগের উন্নততর বিজ্ঞান ভাবনার মধ্যে।

৫.০ অনুশীলনী

১। জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদের উদ্ভবকাল ও আয়ুর্বেদচর্চার ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

৪। রসায়নশাস্ত্রের আদি ইতিহাস সম্পর্কে কি জানেন?

৫। কিমিয়া ও তান্ত্রিক রসায়ন বলতে কি বোঝায়? এ বিষয়ে নাগার্জুনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৬.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। এ. বি. কীথ ঃ এ হিস্ট্রী অফ্ স্যান্‌স্‌ক্রিট লিটারেচার—লন্ডন, ১৯৬১

২।এস. এন. দাশগুপ্ত এবং এস্. কে. দে ঃ এ হিস্ট্রী অফ্ স্যান্‌স্‌ক্রিট লিটারেচার, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২

৩। গণনাথ সেন ঃ আয়ুর্বেদ-পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৪। ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় ঃ সায়েন্স এন্ড সোসাইটি ইন্ এনশেন্ট ইন্ডিয়া।

৫। সমরেন্দ্রনাথ সেন ঃ বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৫, ১৯৫৮।

একক ৪ ❑ প্রগতির নবদিগন্ত (পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক) (New Developments)

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ ভারতীয় সমাজ ঃ সামাজিক স্তরবিবর্তন
১.২ জাতির প্রসার ও ক্রমবিবর্তন
২.০ নারী ঃ সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা
২.১ শিক্ষাদীক্ষা
২.২ নারীর বিবাহ
২.৩ সতীপ্রথা
২.৩.১ সম্পত্তির অধিকার
২.৪ গণিকাবৃত্তি
২.৫ পারিবারিক জীবন
৩.০ বিবাহপ্রথা
৪.০ সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন
৫.০ ধর্ম ঃ রূপান্তর ও ক্রমবিবর্তন
৬.০ আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন
৭.০ স্থাপত্য ও চিত্রকলা
৮.০ অনুশীলনী
৯.০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ প্রস্তাবনা

খৃষ্টীয় ৬৫০—১২০৬ অব্দের কালপর্বটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদি মধ্যযুগ নামে অভিহিত। আমাদের আলোচ্য এককটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়িত (খৃষ্টীয় পঞ্চম—ত্রয়োদশ শতক) হলেও ইতিহাসের নিরন্তর গতিময়তার চলমান স্রোতে মাত্র দেড়শতকের প্রসারণ বাড়তি কোনো বৈশিষ্ট্য দাবী করে না, বরং বলা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে ওঠে তার সূচনা হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকেরও আগে। বস্তুতপক্ষে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়কালে যে লক্ষণটি এই কালপর্বটিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছে তা হল অগ্রহার

ব্যবস্থা অর্থাৎ ধর্মস্থান বা পুরোহিত সম্প্রদায়কে নিষ্কর ভূসম্পদ দান। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটার ফলে সমাজ ও অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে যে প্রবণতা জন্ম দেয় তার পরিণত রূপ খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের সময়সীমায় লক্ষ্য করা যায়। তবে আলোচ্য এককটির মূল উদ্দেশ্য হল পূর্বোক্ত সময়কালে (৫ম—১৩শ শতক) প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও তার বিবর্তন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা। এই কালপর্বে ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে কিছু বস্তুগত পরিবর্তন চোখে পড়ে, ভারতীয় সমাজ যে কতটা গতিময় এবং পরিবর্তনশীল ছিল তা প্রাক-আদি মধ্য যুগ এবং আদি মধ্যযুগের সামাজিক বিবর্তনের স্রোতটি অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায়।

১.১ ভারতীয় সমাজ ঃ সামাজিক স্তরবিবর্তন

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারা ও তার বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় সমকালীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলি থেকে। এই সময়ে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। বৈদিক ঐতিহ্যবাহী পরম্পরাগত চতুবর্ণভিত্তিক সমাজের ধারণা আদি-মধ্যযুগ এসে অনেকটাই বিবর্তিত হয়, তার প্রধান কারণ, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের, আর্থিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন। অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসার, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি, অব-নগরায়ন এবং নগরাশ্রিত অর্থনীতির ক্রমাবনতি, কৃষির ব্যাপক প্রসার প্রভৃতি অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, শুধু তা-ই নয়, সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা ও মর্যাদাতেও তা যথেষ্ট ছাপ ফেলে।

খৃষ্টীয় শতকের গোড়ার দিক থেকে রচিত ধর্মশাস্ত্রসমূহে ব্রাহ্মণবর্ণকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু আলোচ্যযুগে তত্ত্বগতভাবে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা স্বীকৃত হলেও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। সম্ভবত ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী ক্রমশ তার পূর্বের একচ্ছত্র প্রাধান্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের আধিপত্য সীমিত হয়ে পড়ে। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, সেইসঙ্গে মনু একথাও বলেছেন যে, শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৃত্তি ও বর্ণাদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে ব্রাহ্মণগণ বর্ণচ্যুত হতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণদের অবশ্যই বেদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক, নতুবা তাদের পক্ষে অভিপ্রেত নয় এমন অযোগ্য বৃত্তিকে অবলম্বন করে যদি ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ করে তবে তাকে শূদ্র হিসাবেই বিবেচনা করা হবে। এই যুগে লক্ষণীয়ভাবে দেখা যায়, বহু ব্রাহ্মণই অনন্যোপায় হয়ে অধঃস্তন বর্ণগুলির জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হত। বিশেষ করে আলোচ্য যুগপর্বে কৃষি অর্থনীতির প্রসারণ ও ভূসম্পদ দান গ্রহণের ব্যাপক প্রচলনে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কৃষি কাজকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ধর্মশাস্ত্রকারগণ কৃষিকাজকে ব্রাহ্মণদের বৃত্তিরূপে অনুমোদন করলেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন না। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে সে যুগে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ছাড়া অন্য বৃত্তিগ্রহণের প্রবণতা এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে শাস্ত্রকাররাও তা স্বীকার করে নেন। তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের সংজ্ঞা আরও ব্যাপকভাবে নির্ধারণ করেন। ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৃত্তিবদলের ঘটনা শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যেই নয়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবেই দেখা যায়। ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নেওয়া এবং বৈশ্যদের বৃত্তি

ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু সামাজিক অবস্থার বিবর্তনে এই দুই বর্ণও অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। তবে ব্রাহ্মণদের মত ক্ষত্রিয়দেরও অন্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হবার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বাধা ছিল না। আলোচ্যপর্বে সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় বৈশ্যবর্ণগোষ্ঠী। কৃষির ব্যাপক প্রচলনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বৈশ্য সম্প্রদায় ক্রমে কৃষিকেই জীবিকারূপে বেছে নেয়, ফলত বৈশ্যদের সঙ্গে শূদ্রদের পৃথকীকরণ করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণে আদি-মধ্যযুগে বাংলাদেশে মাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতির উল্লেখ দেখা যায়। শূদ্রদের সৎ শূদ্র ও অসৎ শূদ্র—এই দুইভাগে আবার কোথাও উত্তম সংকর ও অধম সংকর এই দুই স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পর্বে বৈশ্যরা শূদ্রদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। কৃষি অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়েছিল। গুপ্তোত্তর যুগে শূদ্ররা মূলত দাস, কারিগর বা কৃষি-শ্রমিক ছিল না। তারা কৃষক হিসাবে বৈশ্যদের স্থলাভিষিক্ত হয়। হিউয়েন সাঙ শূদ্রদের কৃষিজীবি বলেই বর্ণনা করেছেন।

অল্-বিরুণীর মতে, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না। এই সামাজিক বিবর্তনের সাক্ষ্য দেয় তৎকালীন পুঁথিগুলি। সেখানে শূদ্রদের চাষী ও কৃষিজীবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে শূদ্রদের শস্যদানকারী এবং গৃহপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত 'গহপতি' গণ উক্ত গৃহপতির অভিন্নরূপ বলে অবশ্য মনে হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত শূদ্রদের একটি বিস্তারিত তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে।

তবে এই কালসীমার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অস্পৃশ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি। অশুদ্ধ শূদ্র ও অস্পৃশ্যরা একটি নতুন সামাজিক বর্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন ভারতবর্ষে কিছু জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য হিসাবে মেরুকরণের প্রবণতা বহু সনাতন প্রথার অন্যতম। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে, বৌদ্ধ সাহিত্যে, পাণিনির রচনায় অস্পৃশ্যদের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীযুগে অল-বিরুণীর রচনায় ভধাতু, চণ্ডাল, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি অস্পৃশ্যজাতির উল্লেখ আছে।

প্রাচীন ভারতে অস্পৃশ্য জাতিগুলি ছিল মূলতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া উপজাতিয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী তাদের হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়াস এই সময়ে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য পুঁথি ও সাহিত্য এবং বৌদ্ধ চর্যাপদ প্রভৃতি সূত্র সাহিত্যে এ বিষয়ে কিছু তথ্য মেলে। অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত শবর, ডোম, নিষাদ, চন্ডাল প্রভৃতি জাতির স্থান হয় লোকালয়ের বাইরে, গ্রামের প্রান্তসীমায়। আর্যীকরণের প্রক্রিয়ায় যে সব উপজাতি হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি তারা অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য হত, এরা ছিল মূলত অরণ্যচারী, অরণ্যবাসী, যাদের মুখ্য উপজীবিকা শিকার সংগ্রহ। এ ছাড়াও সমাজে তথাকথিত নিম্ন ও ঘৃণ্য জীবিকাধারী কিছু জনগোষ্ঠী অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত হয়।

১.২ জাতির প্রসার ও ক্রমবিবর্তন

আলোচ্য কালপর্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জাতির বিস্তার। জাতিবিস্তারের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকেই। বৈদিক শিক্ষারীতির পাশাপাশি গোত্র, প্রবর, গ্রাম

পরিচিতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মণরা বহু সংখ্যক জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে রাজপুত নামক জাতির উত্থানের ফলে জাতির বিস্তার ঘটে। এই যুগের স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, শূদ্রদের সংখ্যা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়, কারণ আর্যীকরণের ফলে বহু উপজাতি শূদ্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্য-সমাজে প্রবেশ করে। বহু পেশাদার গোষ্ঠী, কারিগর শ্রেণীগোষ্ঠী জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, আদি মধ্যযুগ ছিল জাতিবিস্তারের যুগ। প্রচলিত বর্ণগুলির বাইরে বহুসংখ্যক জাতির সৃষ্টি হয়। স্মৃতিগ্রন্থগুলি বর্ণসংকরের মধ্য দিয়ে জাতিবিস্তারের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। ব্রাহ্মণদের পরিচয়ে আঞ্চলিকীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজপুত জাতির উত্থানের ফলে জাতির বিস্তার হয়েছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মধ্য এশিয়া থেকে আগত গুর্জর প্রভৃতি জাতি রাজপুত হিসাবে গণ্য হতে থাকে, ফলে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় বহুগুণে। সমসাময়িক স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে রাজপুতদের 'পতিত ক্ষত্রিয়' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত সোলাঙ্কি, পরমার, চাহমান, তোমার, গহড়বাল প্রভৃতি রাজপুত clan গুলি মধ্য এশিয়ারই মূল বাসিন্দা ছিল।

আলোচ্য পর্বে শূদ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিকের সংহিতাগুলিতে মাত্র দশ থেকে পনেরটি মিশ্রজাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু পরবর্তীকালে মনুসংহিতায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় একষট্টিতে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে জাতির যে অতিরিক্ত তালিকা আছে তাকে ধরলে জাতির সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় শতাধিক। শূদ্র জাতির বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় যাদব প্রকাশের 'বৈজয়ন্তী' এবং হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি' গ্রন্থে। আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে লিখিত বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে বলা হয়েছে বৈশ্য স্ত্রী এবং নিম্নজাত পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উৎপন্ন হয়েছে হাজার হাজার মিশ্রজাতি, যদিও নির্দিষ্টভাবে এদের সনাক্তকরণ করা হয় নি। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য প্রসারের প্রক্রিয়ায় বিজিত উপজাতিসমূহ শূদ্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান করে নেয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পনির্ভর জনগোষ্ঠী নতুন জাতির পরিচয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে, যারা অধিকাংশই মিশ্র জাতি হিসাবে সমাজে মর্যাদালাভ করেছিল।

তবে জাতিবিস্তারের এই প্রক্রিয়ায় জাতিগত অবস্থান যে সম্পূর্ণভাবে স্থবির বা অনড় হয়ে পড়েছিল, তা নয়। সমাজের গতিময়তার সঙ্গে পা ফেলে জাতিব্যবস্থায়ও সচলতা বিদ্যমান ছিল। নিম্ন বা অধস্তন জাতিগুলি অনেকক্ষেত্রেই আর্থিক বা সামরিক শক্তিবৃদ্ধি, উচ্চবর্ণের সংস্কৃতিকে আত্মীকরণের মাধ্যমে তাদের জাতিমর্যাদা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হত। অপরপক্ষে, উচ্চতর জাতি বিভিন্ন অনৈতিক ও অবৈধ কারণবশত তাদের পূর্ব জাতিগৌরব হারিয়ে নিম্নতর জাতিতে পরিণত হত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, সূত্রধার ও চিত্রকররা পূর্বে সৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত ছিল পরে তারা ব্রাহ্মণের অভিশাপে পতিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, অগ্রহার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারণে আলোচ্য কালপর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের কাজ ছিল মূলত লিখন। বারংবার ভূমিদান ও ভূমি বিতরণ নথিভুক্ত করার প্রচলনে এদের উত্থান ও অগ্রগতি হয়, এই শ্রেণী 'কায়স্থ' নামে অভিহিত। বর্ণব্যবস্থায় কিন্তু কায়স্থদের অবস্থান কোথাও স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় নি।

২.০ নারী ঃ সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা

নারী স্বাধীনতার প্রতি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের কোনো কালপর্বেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। ঋগ্বেদে সংহিতায় বর্ণিত সমাজ-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে অনুমান করা যেতে পারে আদি বৈদিক যুগে সম্ভবত নারীদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের কিছুটা অনুকূল পরিস্থিতি ছিল কিন্তু তাদের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই বস্তুত চোখে পড়ে, পরবর্তী যুগ পর্যায়গুলিতে তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্মৃতিগ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে।

২.১ শিক্ষাদীক্ষা

ইতিহাসের আলোচ্য পর্বে পূর্বাপর যুগের মত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রটি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তবে শিক্ষার চর্চায় ছেদ পড়েনি। এই শিক্ষাচর্চার মান এবং পরিসর এতটাই সীমিত ছিল যে সমসাময়িক অভিধানগুলিতে শিক্ষিকা বা অধ্যাপিকার কোনো প্রতিশব্দ দেখা যায় না। মনুসংহিতার টীকাকার মেয়েদের সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবের কথা বলেছেন, তবে রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষতার প্রশংসা করেছেন, যদিও সমাজের উচ্চকোটির নারীগণই এই সুযোগ লাভ করতে সমর্থ হতেন। গণিকারা যে নানাবিষয়ে সুশিক্ষিত হতেন, সে উল্লেখও রাজশেখরের লেখায় পাওয়া যায়।

২.২ নারীর বিবাহ

নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিবাহ। ভারতে সাধারণত আট প্রকার বিবাহরীতির উল্লেখ নানা উপাদানে বিধৃত হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য কালপর্বে তার অনেকগুলিই অনুসৃত হত না। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত এবং বৈধরীতি হিসাবে গণ্য হত। মেধাতিথি অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করেছেন, তবে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকন্যার বিবাহকে ভাল চোখে দেখা হয়নি। অসবর্ণ বিবাহ সমর্থিত হলেও মেধাতিথি রাক্ষস, গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহকে অসিদ্ধ বলে মনে করেছেন। মেধাতিথি বলেছেন যে, যৌবনপ্রাপ্তা হবার পর তিন বৎসরের মধ্যে কন্যাকে যদি তার পিতা 'পাত্রস্থ করতে না পারেন তবে সেক্ষেত্রে কন্যা নিজেই পাত্র নির্বাচন করতে পারে। বাক্‌দানের পর নির্বাচিত পাত্রের মৃত্যু হলে সেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ দেওয়া যেতে পারে। বিবাহের পর স্ত্রীর কোনো শারীরিক ত্রুটি দেখা দিলেও তাকে পরিত্যাগ করা যাবে না। তবে উক্ত বিধানগুলি সমাজে কতটা মেনে চলা হত সে ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। গন্ধর্ব বিবাহ ধর্মশাস্ত্রকারদের চোখে অনভিপ্রেত হলেও সেযুগে প্রেমজ বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত মেলে।

ধর্মশাস্ত্রকারগণ ক্ষেত্রবিশেষে নারীর পুনর্বিবাহের বিধান দিয়েছেন। পরাশরস্মৃতিতে বলা হয়েছে, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মৃত হলে, গৃহত্যাগ বা প্রব্রজ্যাগ্রহণ করলে, ক্লীব হলে এবং পতিত হলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। অগ্নিপুরাণেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। অপুত্রক রাজা এবং শূদ্রদের ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রথাকে সমর্থন করা হয়েছে। শ্বশুরকুলের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধবা নারীর সন্তান উৎপাদনের জন্যও নিয়োগ প্রথার সাহায্য নেওয়া যেত। মেধাতিথির মতে, স্বামী যদি ক্লীব বা নপুংসক হন তবে সেক্ষেত্রে

স্ত্রী নিয়োগপ্রথাকে গ্রহণ করতে পারে। তবে পুনর্বিবাহ ও নিয়োগপ্রথার প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল খুবই সংকীর্ণ, সব স্বামীহীনা বিধবার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হত না। সাধারণত ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিধবার জন্য কঠোর সংযম ও শুদ্ধাচারিণীর জীবনযাপনেরই বিধান দিয়েছেন। তাদের সম্পত্তি ও নিরাপত্তারক্ষার ভার প্রদান করা হয়েছে রাজার উপর।

২.৩ সতীপ্রথা

প্রাচীন ভারতবর্ষে আদি মধ্যযুগে অর্থাৎ গুপ্ত পরবর্তী সময় থেকে 'সতী' প্রথার প্রচলন দেখা যায়, তবে ঐতিহাসিকদের মতে বিত্তবানশ্রেণীর মধ্যেই সতীর প্রচলন ছিল। সতী প্রথা হল মূলত মৃতস্বামীর চিতায় তার সদ্যবিধবা পত্নীর সহমরণের নিষ্ঠুর এক প্রথা। অনুমান করা যেতে পারে, এই প্রথার উদ্ভব ও প্রচলনের মূলে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন দুরভিসন্ধি নিহিত ছিল, সম্ভবত সেই কারণে এই প্রথার ব্যাপকতা সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হয় নি। সাধারণভাবে রাজপরিবার, অভিজাতশ্রেণী এবং ধনকুবের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সতীপ্রথা প্রচলিত ছিল। কল্হনের রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায়, রাজা যশস্কর ও ক্ষেত্রগুপ্তের পত্নীর স্বামীর চিতায় সহমরণ হয়েছিল। চোল রাজবংশেও এই প্রথা অনুসৃত হত। রাজপুত পরিবারগুলিতে সহমরণ বা সতীপ্রথার অজস্র নজর রয়েছে রাজস্থানের প্রত্নসৌধগুলিতে। তবে এই প্রথা ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা, কারণ সমসাময়িক ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিধবার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে যে বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় তার প্রয়োজনই থাকত না যদি সতীপ্রথা একটি আবশ্যিক সামাজিক রীতি হিসাবে গণ্য হত।

২.৩.১ সম্পত্তির অধিকার

নারীদের সম্পূর্ণ অধিকারে যে সম্পত্তি গচ্ছিত হত তাকে স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'স্ত্রীধন'। মাতৃসম্পত্তি উত্তরাধিকার পরম্পরায় কন্যার অধিকারে আসত, এই সম্পত্তি স্ত্রীধনের আওতায় পড়ত, যার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হতেন কন্যাগণ। এক্ষেত্রে অবিবাহিতা কন্যারা অগ্রাধিকার পেতেন। বিবাহিতা কন্যারা প্রতীকী অর্থে সেই সম্পত্তির কিছু অংশ লাভ করতে পারতেন। স্ত্রীধন ছাড়াও স্ত্রী অন্য কোন সূত্র থেকে উপার্জনে কোনো বাধা ছিল না, তবে স্বামীর জীবিতকালে তা হস্তান্তর ও বিক্রয় করার কোনো অধিকার স্মৃতিশাস্ত্রে নারীদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় নি।

২.৪ গণিকাবৃত্তি

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গণিকাবৃত্তির ইতিহাস বহু প্রাচীন। অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে মনে করা যেতে পারে সমাজে তাদের আলাদা একটি স্থান ছিল, শুধু রূপোপজীবিনী নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও গণিকাদের বেশ পারদর্শিনী হতে হত। গণিকালয়ে বসবাসকারী গণিকার শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করত রাষ্ট্র, তার উপার্জন থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করার পাশাপাশি কৌটিল্য গণিকা বৃত্তিধারিণীদের বার্ধক্যে বৃত্তিদানেরও সংস্থান করেছেন। বৌদ্ধ, জৈন সাহিত্যে গণিকাবৃত্তিকে যথেষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তীযুগের মতই আদি মধ্যযুগেও গণিকাবৃত্তি আইন সম্মত বৃত্তিরূপে পরিগণিত হত। তাদের অধিকার ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত। দামোদরগুপ্তের 'কুট্টনীমতম' গ্রন্থে গণিকাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তারা কেবলমাত্র রূপবতীই হত না, যথেষ্ট শিক্ষিতা হত এবং বিভিন্ন শিল্পকলায় পারদর্শী হত। সঙ্গীনির্বাচনের ক্ষেত্রে এরা স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। মৃচ্ছকটিকম্ নাটকে বসন্তসেনার ভূমিকাটি তৎকালীন গণিকা সমাজের মূর্ত প্রতিরূপ।

গণিকার সূত্র ধরে আর এক শ্রেণীর নারীর উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক, এরা হল দেবদাসী। নগর-সভ্যতার উন্মেষ এবং ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মন্দিরকেন্দ্রিক সমাজ জীবনে দেবদাসীর উপস্থিতি ও প্রভাব প্রাচীন ভারতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এদের কাজ ছিল আপাতদৃষ্টিতে মন্দির দেবতার পূজার্চনা এবং আরতির সময় নৃত্যকলার প্রদর্শন। তবে অলিখিত কর্তব্যের মধ্যে অবশ্যই স্থান পেত মন্দিরের পুরোহিত শ্রেণীর মনোরঞ্জন করা। দেবদাসী সাধারণত তরুণী, রূপযৌবনা এবং নৃত্যপারঙ্গামা হলেই চলত কিন্তু গণিকা-কে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হতে হত। জৈন সাহিত্য 'বৃহৎকল্পভাষ্যে' বলা হয়েছে একজন উচ্চমানের গণিকাকে মোট বাহাত্তরটি বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে, যথা, গণিত, নানারকম শিল্প, রন্ধনবিদ্যা ইত্যাদি।

গণিকা ও রূপজীবিনী রাষ্ট্রকে আয়কর প্রদানের পরিবর্তে নগণ্য কিছু নিরাপত্তার দাবীদার ছিল। গণিকা কন্যাকে ধর্ষণ করলে ৫৪ পণ ও তার মায়ের আয়ের ১৬ গুণ অর্থদণ্ড ধার্য হয়, ঐ মেয়েটির বিবাহের পাত্রকেও ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু অর্থ দিতে হত। গণিকার বিদেশী প্রার্থীকে তার নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ছাড়া পাঁচপণ বেশী দিতে হত। গণিকা যদি তার পারিশ্রমিক পাবার পর কর্তব্যে রাজী না হত তবে তার প্রাপ্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড নির্দিষ্ট হত। গণিকার শারীরিক নিরাপত্তার জন্যও নানারকম দণ্ড ছিল যার পরিমাণ ১০০০ থেকে ৪৮০০০ পণ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রচিত 'নম্ময়সুন্দরীকথা' তে দেখা যায় গণিকার উপার্জনের শতকরা ২৫—৩০ ভাগ রাষ্ট্র রাজস্ব হিসাবে আদায় করত। মতি চন্দ্রের মতে[১], স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে গণিকাদের একান্ত কোনো অধিকার ছিল না। গণিকা এবং তার বিকল্প প্রতিগণিকা মাসিক বৃত্তি পেত, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার ভোগদখল ও দান করার অধিকারও ছিল। কিন্তু গণিকার মৃত্যুর পর তার কন্যার অধিকারে যখন মায়ের সম্পত্তি আসত তখন সেও জীবনস্বত্বের আইনে বন্ধক, বিক্রয়, দায়, পরিবর্ত এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। রাষ্ট্রের আপদকালে তার আয়ের অর্ধেক বাজেয়াপ্ত হত। গণিকাকে তার বৃত্তি থেকে মুক্তি দানের দুটি উপায় ছিল—প্রথমত, রাজার ইচ্ছানুসারে কোনো গণিকা কুলনারী হিসাবে সমাজে প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান পেতে পারতেন এবং দ্বিতীয়ত, কোনো উদারপ্রকৃতির পুরুষ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবার শর্তে গণিকালয়ের কর্ত্রীকে ২৪ হাজার পণ প্রদান করলে সেই গণিকা নারী মুক্তি পেতে পারত।

বাৎসায়নের কামসূত্রে বলা হয়েছে, রাজা অথবা ধনী নাগরিকবৃন্দের সঙ্গে কাব্য, নাটক, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনায় গণিকারা অংশ নিত। ভিন্ন ভিন্ন বণিক, শ্রেষ্ঠী ও ধনী 'নাগরক' এর গৃহে এই সম্মিলন 'গোষ্ঠী' নামে পরিচিত ছিল।

---

১. Moti Chandra, 'The World of Courtesans'.

২.৫ পারিবারিক জীবন

আদি-মধ্যযুগের স্মৃতিকারগণ নারীদের সম্পত্তির ক্ষেত্রে সীমায়িতভাবে কিছুটা অধিকার দিয়েছেন, পারিবারিক জীবনেও তাদের সুরক্ষার জন্য কিছু বিধিনিয়ম আরোপ করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু রূপায়িত হত সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। পিতৃতান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজ ও পারিবারিক জীবনে নারীর প্রকৃত অবস্থা খুব একটা সুখকর ছিল না বলেই অনুমান করা যেতে পারে। সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীর যোগদান অবাধ ছিল না। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেবার অনুমতিও তারা পেত না। পুরুষের বহুবিবাহকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও নারীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হত না। এককথায় বলা যায়, সমাজ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারীকে অবদমিত করে রাখার প্রবণতা আলোচ্যযুগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, যার ফলস্বরূপ তাদের মর্যাদা এবং গুরুত্ব পারিবারিক জীবনেও কমতে থাকে। তবে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীগণ অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাঁদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বিবাহ প্রথাও অনেক ব্যতিক্রমী ছিল। মালাবার অঞ্চলের নায়ার সমাজে নারীর বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। বস্তুত, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বাইরে যে সমাজ গড়ে ওঠে, সেখানে নারীর অধিকার অনেক বেশী ছিল। মাতৃক্রমানুসারী উত্তরাধিকার প্রথা মাতৃতান্ত্রিক বিবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

৩.০ বিবাহ প্রথা

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আট প্রকার বিবাহরীতির উল্লেখ করেছেন—অর্থশাস্ত্রেও এই উল্লেখ পাওয়া যায়। এই আটটি বিবাহরীতি হল—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব (এগুলির ক্ষেত্রে পিতা বা অভিভাবক কন্যাদান করতেন), গান্ধর্ব (পাত্র-পাত্রীর পছন্দ অনুসারে বিবাহ), আসুর (কন্যা ক্রয় করে বিবাহ), রাক্ষস (বলপূর্বক কন্যাহরণ) এবং পৈশাচ (গোপনে বিবাহ) মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম চারপ্রকার বিবাহকে সমর্থন করেছেন, অপর চারটি রীতি তাঁদের কাছে অনভিপ্রেত ছিল। স্মৃতিকারগণ প্রথম চারটি রীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পিতা বা অভিভাবকের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদানই সর্বোত্তম বিবাহপ্রথা। তবে ধর্মশাস্ত্রগুলির অনুমোদন না থাকলেও সমাজে অন্যান্য বিবাহরীতিগুলিও প্রচলিত ছিল। বিবাহের ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ সবর্ণ বিবাহকে স্বীকৃতি দিলেও অসবর্ণ বিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল। অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ অনুলোম বিবাহ নামে অভিহিত হয়েছে, যা স্মৃতিকারগণ অনুমোদন করেছেন। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের নারীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহে তাঁদের আপত্তি ছিল। তবে প্রতিলোম অনুমোদিত না হলেও সমাজে প্রচলিত ছিল। অসবর্ণ বিবাহের উদাহরণ হিসাবে রাজশেখর তাঁর কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি প্রতিহার মহেন্দ্রপালের ব্রাহ্মণ গুরু হওয়া সত্ত্বেও জনৈক চহমান বংশীয়া নারীকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়স নিয়ে শাস্ত্রকাররা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে পাত্র-পাত্রীর বিবাহযোগ্য বয়স হওয়া উচিত যথাক্রমে তিরিশ ও বারো অথবা চব্বিশ এবং আট। তবে একথাও বলা হয়েছে, যোগ্য পাত্র না পেলে কন্যার বিবাহ না হওয়াও বিধেয়। পরবর্তী স্মৃতিকাররা ক্রমশঃ বাল্যবিবাহের প্রতি বেশী জোর দিয়েছেন।

৪.০ সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, পিতা তাঁর জীবদ্দশায় নিজ ইচ্ছানুসারে সম্পত্তি বিলিবন্টন করতে পারবেন। অথবা তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রগণ পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে নিতে পারে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মনু জ্যেষ্ঠের অগ্রাধিকারের নীতি মেনে নিয়েছেন। যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য পূর্বপুরুষের সম্পত্তির ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্র উভয়েরই সমানধিকার দাবী করেছেন। গুপ্তোত্তর যুগে মেধাতিথির মনুস্মৃতিভাষ্য এবং বিশ্বরূপকৃত যাজ্ঞবল্ক্য ভাষ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত আইনগুলিকে কিছুটা পরিমার্জিত করা হয়েছিল।

পরবর্তী যুগে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে বিধিপ্রণেতা জীমূতবাহন জন্মগ্রহণ করেন। জীমূতবাহনের লেখা দুটি গ্রন্থ হল ব্যবহারমাতৃকা ও দায়ভাগ। দ্বাদশ শতকেরই দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম নেন যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা ভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বর। জীমূতবাহনের দায়ভাগ ও বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা আদি মধ্যযুগের সম্পত্তির অধিকার এবং উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। দায়ভাগ বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং অবশিষ্ট ভারতে অনুসৃত হত মিতাক্ষরা।

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মধ্যে মূলত প্রভেদ হল এই যে, দায়ভাগে পরিবারের প্রধানকে সম্পত্তির উপর একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে মিতাক্ষরায় পরিবারের প্রধানকে সম্পত্তির উপর এই সীমাহীন ক্ষমতাদান করা হয়নি। এই যুগে কতকগুলি ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিভাজন করা যেত না, যেমন—বিদ্যাধন। মধ্যযুগে বিদ্যাধন বলতে প্রধানত নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা গ্রাম থেকে আহরিত আয়কে বোঝাত যা ভূমিদানের মাধ্যমে করা হত। বিদ্যাধনের মত বীরত্ব দ্বারা অর্জিত সম্পদ বা শৌর্যধন বণ্টন করা যেত না, এই ধনও ভূমিদানের মাধ্যমেই বীরযোদ্ধারা লাভ করত।

৫.০ ধর্ম ঃ রূপান্তর ও ক্রমবিবর্তন

বৌদ্ধধর্ম ঃ

গুপ্তযুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারতা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যপ্ত হয়েছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় দেখা যায়, হীনযান বৌদ্ধমতবাদ একমাত্র পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের পূর্ব গৌরব না থাকলেও এই সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রভাব বর্তমান ছিল। পালরাজাদের সময় নালন্দা বিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

গুপ্তযুগের অবসানের পর থেকে সামবেদী মায়াবিদ্যা এবং যৌন অতীন্দ্রিয়বাদের আদিম ধারণা ভারতীয় ধর্মে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই ধারণা বৌদ্ধ ধর্মকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে যার ফলস্বরূপ উদ্ভব হয় বজ্রযান নামে তৃতীয় একটি বৌদ্ধ মতবাদের। এই বজ্রযান অষ্টম শতকে পূর্ব ভারতে বিশেষত বঙ্গদেশ এবং বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। বিহারের অন্তর্গত বিক্রমশীলা মহাবিহারটি বজ্রযান প্রধান বৌদ্ধদের প্রভাবিত ছিল।

বজ্রযান বিশ্বাস করত মোহিনী শক্তিই হল বজ্র যা আয়ত্ত করে মুক্তিলাভ করা যায়। তাই, এই নতুন শাখার নাম হয় বজ্রযান। একে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মও বলা হয়। বজ্রযান সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা ছিলেন বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের পত্নী, তারাগণ, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, মাতঙ্গী প্রভৃতি। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে

যৌনাচার, মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, পশুহত্যা এমনকি নরহত্যাও নিষিদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধধর্ম এইভাবে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্র বদল করে।

জৈনধর্ম ঃ

গুপ্ত যুগে জৈন ধর্মের দ্বিধাবিভাজন চরম ভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই জৈন সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারত ও উত্তরভারতে কতকগুলি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গুপ্তযুগে দক্ষিণভাতে জৈন ধর্ম রাজ আনুকূল্য লাভ করে। এই সময়ে জৈনধর্ম পন্ডিতরা প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃতে বিভিন্ন অনুশাসন গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেন, কারণ একমাত্র সংস্কৃতই ছিল অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে মতবিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম। গুপ্তযুগে পালিভাষায় গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বামী কার্তিকেয়, বট্টকেড়, যদিবৃষভ প্রমুখ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রণেতারা হলেন মহাতরঙ্গ, পূজ্যপাদ অকল প্রমুখ। এ যুগের জৈনশাস্ত্র ছিল ন্যায়শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

শৈবধর্ম ঃ

গুপ্তরাজাদের অধিকাংশ-ই বৈষ্ণব মতবাদে বিশ্বাসী হলেও তাঁরা উদারমতাবলম্বী ছিলেন, সেজন্য শৈবধর্মেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। খৃষ্টীয় পঞ্চম—ষষ্ঠ শতক থেকে দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে শৈবধর্ম বিরাজিত ছিল। শৈব সন্ত ও নায়নারদের রচিত স্তোত্র থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ—সপ্তম শতকে তামিল অঞ্চলে শৈব ধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বৈষ্ণব ধর্ম ঃ

গুপ্ত রাজগণ বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই এই কালপর্বে বৈষ্ণব ধর্মমত রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনের সুবাদে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিষ্ণুর অবতারগণের ক্রমবর্ধমান পূজার্চনার বিবরণ সমসাময়িক উপাদান-সূত্রগুলিতে বিধৃত হয়েছে।

বৈষ্ণবধর্মের বিস্তারের ফলে আদি-মধ্যযুগে বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য দুটিরই স্ফূরণ ঘটে। এই মূর্তিগুলি প্রধানত ত্রিবিধ ঃ স্থানক, আসন এবং শায়ন। স্থানক মূর্তিগুলি সাধারণত শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী। গুপ্ত-পূর্ব যুগের এই মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় না।

উপরিউক্ত ধর্মীয় মতবাদগুলি ছাড়াও সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল তা অবশ্যই আদি-মধ্য যুগের ইতিহাসে একটি নবতম অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বিষয়ে পরবর্তী এককে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬.০ ❑ আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন

আদি-মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যসহ আলোচনা রয়েছে পূর্ববর্তী এককে। মোটামুটিভাবে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ এলাকাতেই আঞ্চলিক ভাবার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছিল বলা যেতে পারে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুনিশ্চিত অভিমত হল, বাংলাভাষার আদি যুগ তথা এর গঠনকালের আদি পর্যায় কালপর্বটি হল আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খৃষ্টাব্দ। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতভাবে বাঙালী জাতি এবং বাংলা ভাষার সংস্কৃতির বিবর্তনে এক যুগান্তর রচনা করেছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বাংলাভাষায় লেখা চর্যাগীতগুলির মাগধী অপভ্রংশে গৌড়-বঙ্গীয় রূপের সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা বলেছেন যে, চর্যাগীতিগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন বাংলাভাষা। সেন রাজত্বকালে সংস্কৃতে রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যে লিপিবদ্ধ চব্বিশটি গানে স্থানীয় ভাষা ও লোকায়ত সংস্কৃতির নিবিড় সম্পর্ক আছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত রীতি অনুসৃত হলেও গীতগোবিন্দ কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দরীতি ও প্রকরণে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা অথবা বঙ্গদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব বর্তমান।

চর্যাগীতি ও দোহাগুলি ছাড়াও বাংলাভাষার নমুনা দেখতে পাওয়া যায় অন্যান্য কিছু সূত্রে। ১১২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে কল্যাণের চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মানসোল্লাস' নামক যে কোষগ্রন্থটি রচিত হয় তার গীতবিনোদ অংশটিতে প্রাচীনতম বাংলায় রচিত কয়েকটি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গানগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই গীতমালার প্রধান বিষয়বস্তু হল বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার এবং গোপিনীবৃন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, এই বাংলাগানগুলি বঙ্গদেশেই রচিত হয়েছিল যার পরিব্যাপ্তি ছিল মহারাষ্ট্র পর্যন্ত।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে রচিত জৈন সাহিত্য 'কুবলয়মালা' (৭৭৯ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থে মধ্যদেশে সিন্ধু, মেরু, মালব, লাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে গুর্জরদেশের বণিকদেরও পৃথকভাষা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। পালহনের 'নেমী-রাজুল-বারহমাসা' (১২৩৩ খৃষ্টাব্দ) এবং বিনয়চন্দ্রের নেমীনাথ-চতুষ্পদীকা' (১৩০০ খৃষ্টাব্দ) গুজরাটী ভাষায় রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে গুজরাটীর আবির্ভাব হয়েছিল সম্ভবত বাংলা ভাষা উদ্ভবের সমসাময়িক যুগে। বাংলা ভাষার সাথে যেমন শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃতের যোগ ছিল, তেমনি গুজরাটী ভাষার সাথে যোগ ছিল অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্যের।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মারাঠী সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক মুকুন্দরাজ দর্শনশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন বিবেকসিন্ধু। মানসোল্লাসে মারাঠী ভাষায় লেখা একটি গানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত খৃষ্টীয় দশম শতকের আগে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে নি।

দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলুগু, কানাড়া ও মালয়লম ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পূর্ববর্তী এককে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তামিল হল সর্বপ্রাচীন দক্ষিণী ভাষা।

পাল-সেন রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্যে রচনায় ব্যবহৃত গৌড়ীয় রীতির প্রধান দুটি লক্ষণ ছিল 'অর্থ ডম্বর' এবং 'অলংকার ডম্বর'। এই রীতি পূর্ণবিকাশ ঘটে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে।

৭.০ স্থাপত্য ও চিত্রকলা

খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের শিল্পকলায় আঞ্চলিকতার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশে রেখ-রীতি অনুযায়ী নির্মিত মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতি উত্তর ভারত ও উড়িষ্যার স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগীয় বাংলায় পাথর ও ইঁটের তৈরী বেশ কয়েকটি রেখ-দেউলের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। খৃষ্টীয় দশম শতকে প্রতিমা শিল্পেও অভিনবত্ব চোখে পড়ে।

নাগর রীতির অনুসরণে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমূহের বিকাশ লক্ষ্য করা যায় উড়িষ্যায় বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত অগণ্য মন্দির নির্মাণ কৌশলে। উড়িষ্যার মন্দিরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মুখ-মণ্ডপ বা জগমোহন, যা পীর-দেউল নামেও পরিচিত। নাগর রীতির অপর বৈশিষ্ট্য 'শিখর', যা গুপ্তোত্তর যুগে স্পষ্টভাবেই দেখা যেত।

মধ্য ভারতীয় মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনায় 'সপ্তরথ' ধারণা থাকলেও খাজুরাহোর মহাদেবের মন্দিরে পঞ্চরথের সন্নিবেশ প্রকটভাবে দেখা যায়। এখানকার মন্দিরে চতুষ্কোণরীতির পরিবর্তে আয়তাকার পরিকল্পনা লক্ষণীয়।

দ্রাবিড় শৈলী অবলম্বনে রাষ্ট্রকূট আমলে নির্মিত শ্রেষ্ঠ মন্দির স্থাপত্য হল ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির, এর চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ্য মণ্ডপ, নন্দীমণ্ডপ ও গোপুরম। চোল রাজত্বে ব্রোঞ্জশিল্পে উৎক র্ষের পরিচয় বহন করে নটরাজ মূর্তি।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে একটি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা দেখা যায়। ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি ত্রিমাত্রিক এবং চিত্রকলাসমূহ দ্বিমাত্রিক। অজন্তা ইলোরার গুহাগাত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধাতুমূর্তি নির্মাণও আদি মধ্য ও মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে পারসিক স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটে, এর ফলশ্রুতিতে উদ্ভব হয় ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য-শিল্প।

৮.০ অনুশীলনী

১। ভারতীয় সমাজে আদিমধ্যযুগে জাতিব্যবস্থার রূপান্তর কিভাবে ঘটে তা বর্ণনা করুন।

২। আলোচ্য যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। প্রাচীন ভারতের বিবাহরীতিগুলি সম্পর্কে কি জানেন?

৪। সম্পত্তির অধিকার ও উত্তরাধিকার আইন প্রসঙ্গে স্মৃতি-শাস্ত্রগুলির বিধানসমূহ সংক্ষেপে লিখুন।

৫। এই যুগে ধর্মের রূপান্তর ও ক্রমবিবর্তনে সমাজে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়?

৬। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও চিত্রকলা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করুন।

৯.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। রামশরণ শর্মা ঃ আদিমধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ২০০৩।

২। নীহাররঞ্জন রায় ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০।

৩। ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় ঃ ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, কলিকাতা, ১৯৯৩।

৪। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা, কলিকাতা, ১৯৮৭; প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, কলিকাতা, ২০০১।

৫। অতুল সুর ঃ ভারতের বিবাহের ইতিহাস, আনন্দ, কলিকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

৬। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ঃ দ্য মেকিং অফ্ আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া।

সপ্তম (খ) পত্র

পর্যায়—৪

একক ১ ❑ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা

২.০ ধর্ম ঃ সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

৩.০ ভক্তিবাদ

৪.০ শৈবধর্ম

৫.০ ভাগবত ধর্ম

৬.০ জৈনধর্ম

৭.০ বৌদ্ধধর্ম

৮.০ সরস্বতী

৯.০ কার্তিকেয়

১০.০ সূর্যপূজা

১১.০ হিন্দুধর্ম-সামাজিক অবলোকন

১২.০ অনুশীলনী

১৩.০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ প্রস্তাবনা

আলোচ্য এককটিতে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের সাদৃশ্য, সমন্বয় এবং তাদের একাত্মীকরণের প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মের স্থান অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল ধর্ম। ব্যক্তিগত স্তরে মানুষকে যেমন তার বর্ণধর্ম বা আশ্রমধর্ম পরিচালিত করত, তেমনই বৃহত্তর সমাজ-সংসারে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসংগঠনগুলি স্বভাবতই ছিল অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান এককে ভারতবের্ষর বহুমুখী ধর্মপ্রবাহের কয়েকটি ধারাকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিধির মধ্যে সৃষ্ট ধর্মীয় মতবাদসমূহ ও ব্রাহ্মণ্যধারার প্রতিবাদী বিভিন্ন ধর্মতমসমূহ চূড়ান্ত পর্যায়ে কিভাবে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত এবং আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ওতপ্রোতভাবে হিন্দুসমাজের মূলস্রোতে প্রবহমান ছিল সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.০ ধর্ম ঃ সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

'ধর্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যাহা ধারণা বা পোষণ করে'। তবে 'স্বাভাবিক গুণ' বা 'নৈতিক চরিত্র' অর্থেও ধর্ম শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। ধর্মকে যদি 'religion' অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখা যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়সীমায় বহু সংখ্যক ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। ঈশ্বর, পরলোক, পাপ-পুণ্যাদি সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস এবং শোক-তাপ-দুঃখ ও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত পাপকর্ম থেকে নিশ্চিত পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে অনুসৃত বিশেষ বিশেষ পূজার্চনা, আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঈশ্বরের অবতার বলে কথিত অথবা ঈশ্বর প্রেরিত কোনো দূত, ঋষি, জ্ঞানী বা সিদ্ধপুরুষ এই সকল ধর্মের প্রবর্তক বা প্রবক্তা। সাম্প্রদায়িক ধর্মের সহিত সমাজ বা গোষ্ঠীজীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। পাপভয়ে ভীত ও দুঃখপীড়িত মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন এক বা একাধিক মহাপুরুষ ঈশ্বরের নামে যে সকল বাণী প্রচার করে গেছেন সেগুলিকে ভিত্তি করে এক একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ এক বা একাধিক শাস্ত্র বিশেষে লিপিবদ্ধ ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বর প্রেরিত বা ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের বাণী, উপদেশ প্রভৃতিকে অভ্রান্ত সত্যজ্ঞানে বিবেচনা করে তার নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আচরণবিধির মধ্যে কিন্তু বহুস্থলে পার্থক্য ও সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। ইতিহাসের আলোচ্য কালপর্বে ব্রাহ্মণ্যে ধর্মের পরিধির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল ভক্তিবাদ, শৈবধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, ভাগবত ধর্ম প্রভৃতি। প্রতিবাদী ধর্মপ্রবাহে জন্ম নেয় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম। এছাড়া, ভারতবর্ষের মাটিতে জন্ম না নিলেও ইসলাম ধর্ম ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৩.০ ভক্তিবাদ

ভারতবর্ষে ভক্তিবাদের ধারাটি আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। তবে ভক্তিবাদের মূলতত্ত্বটি বেশ প্রাচীন বলেই অনুমান করা যেতে পারে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে ভক্তিবাদের ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে আর্যসভ্যতার যুগেরও পূর্ববর্তী সময়ের। পরবর্তী সময়ে তা আর্য ও অনার্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। অধ্যাপক সরকার তাঁর যুক্তির সমর্থনে মহেঞ্জোদড়ো থেকে আবিষ্কৃত দুটি সীলের উল্লেখ করেছেন। এখানে শিব-অনুকৃতির পুরুষমূর্তি চিত্রিত, যার দুপাশে নতজানু এবং উদ্বাহু উপাসকরা বিরাজমান। তবে এই প্রাগার্য তত্ত্বটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আদি বৈদিক সমাজে ধর্মাচরণ প্রক্রিয়া মূলত পুরোহিত বা আচার্য নির্ভর, যাগযজ্ঞাদি কেন্দ্রিক হওয়াতে ভক্তির উপাদানগুলি বিশেষ দৃশ্যমান হয় নি। আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, বরুণদেবের উদ্দেশ্যে রচিত সুক্তগুলির মধ্যে ভক্তিবাদের উপাদান পাওয়া যায়। ভরত গোষ্ঠীর আরাধ্য ভারতী দেবী বা কুশিক এবং

কাত্য গোত্রের আরাধ্যা কৌশিকী এবং কাত্যায়নী দেবী বিষয়েও এই কথা প্রযোজ্য। মিত্র, সবিতৃ, পূষণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উপাসিত হচ্ছেন সূর্যদেবতা। এর সঙ্গে সম্পর্কিত, ঋগ্বেদের একাধিক স্থানে বিষ্ণুর বিবিধ নাম, আবৃত্তি বা গানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে নামজপ বা নামসংকীর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। ঋগ্বেদে ভক্ত অভক্ত শব্দগুলির পাশাপাশি 'ভজামহে' (বিষ্ণুসূক্ত)-র উল্লেখ পাওয়া যায় যার মধ্যে ভক্তির সূত্র নিহিত আছে।

ভক্তিবাদের পরিপূর্ণ রূপটি ৎ. ্ধাবন করা যায় উপনিষদের যুগে। তবে তার পূর্বে যর্জুর্বেদের শতরুদ্রীয় অংশে শিব বা রুদ্রদেবতার শতনামের স্তুতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, এখানে শিবের প্রতি ভক্তের ঐকান্তিক ভক্তিবন্দনার রূপটি প্রতিভাত। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে 'প্রপত্তি' শব্দটির মধ্যে আত্মনিবেদনের আকুতি পরিস্ফুট, ব্রহ্মকে সর্বপ্রকার আনন্দের আধার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২.৭) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪.৩.৩২)। উপনিষদের নিরাকার এবং নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম পরবর্তী যুগে মহাকাব্য এবং ভক্তিপ্রধান সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছেন এবং পরিবর্তিত হয়েছেন ব্যক্তিগত দেবতা বা ঈশ্বরে। এই দেবদেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং আত্মনিবেদনে ভক্তি-ই ছিল একমাত্র অবলম্বন, যা যুক্তিতর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল না। মহাভারতের দ্বাদশ পর্বে বলা হয়েছে, ভক্তি বিহীন পূজা আয়োজনে শুধুমাত্র কঠোর নিয়মনীতির অনুশীলন জনিত কৃচ্ছ্রসাধনে কখনোই সেই দেবতার কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আরাধ্য দেবতা বিষয়ে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে ধ্যানের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে (৩৪০.১৯)। এই দ্বাদশপর্বে পুনরায় বলা হয়েছে, যাঁরা 'পঞ্চরাত্র' পাঠ সম্পর্কে অবগত, তাতে উল্লিখিত ধর্ম বা কর্তব্যসমূহ পালন করেন, দেবতার প্রতি ভক্তিতে অটল, তাঁরাই দেবতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন (১২.৩৫০.৭১)। মহাভারত বারংবার ভক্তিবাদের বর্ণনা করেছে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। দ্বাদশপর্বের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে দেবতার প্রসাদ ব্যতীত ভক্তের উত্তরণ সম্ভব নয়। নারদের মতে, দেবতার প্রতি গভীর প্রেমে ভক্তির স্বরূপ প্রতিফলিত; প্রেমের মাধ্যমেই পরম অভীষ্টকে লাভ করা যেতে পারে। দেবতার প্রতি যে ভক্তি তার সঙ্গে পার্থিব আকর্ষণের কোনো সমীকরণ করা সম্ভব নয়। জ্ঞান ও কর্ম ভক্তিকে অতিক্রম করতে পারেনা কারণ ভক্তিই চরমতম লক্ষ্য, ভক্তির উদ্দেশ্য অন্য কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানো নয়। ভক্তি প্রতিভাত হয় ভক্তের চিন্তন, বাক্য ও কর্মে। সমস্ত পার্থিব সম্পর্ক যেখানে নশ্বর ও সীমাবদ্ধ, দেবভক্তি সেখানে অনন্ত, অবিনশ্বর। নারদসূত্রে ভক্তির এই অমৃত-প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, 'সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ (দেবতায় অর্পণ) করে একমাত্র আমার (দেবতার) শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব' (১৮.৬৬)। ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে ভক্তিতত্ত্বে বহু আলোচনা করা হয়েছে। শাণ্ডিল্যসূত্রে বলা হয়েছে রস, রাগ, অনুরাগ সবকিছুর সমাহারে ভক্তির ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে, শুধুমাত্র জ্ঞানই ভক্তির আধার নয়। অনুরূপভাবে, ভক্তি এবং শ্রদ্ধাও সমার্থক নয়। নারদসূত্র অনুসারে, ভক্তির তার নিজেরই ফলশ্রুতি, যার উপায় এবং উদ্দেশ্যও একমাত্র ভক্তি। শাণ্ডিল্যের মতে, যোগ ও মনঃসংযোগের মাধ্যমে ভক্তিবৃদ্ধি করা যেতে পারে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চারপ্রকার ভক্তের উল্লেখ করেছেন—অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। তিনি বলেছেন, উক্ত চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে আমাতে নিত্যযুক্ত এবং একনিষ্ঠ ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ এখানে নিষ্কাম ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। ভক্তির সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক প্রসঙ্গে গীতায় সাংখ্যযোগীর নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। ভক্তি প্রকার ত্রিবিধ-তামসিক, রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। তবে নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিকে দুটি মূল ধারায় বিভক্ত ক রেছেন। উপরন্তু ভক্তির এগারোটি প্রধান ধারার উল্লেখ করে ভক্ত ও দেবতার সম্পর্কের পাঁচটি মাত্রা নির্ধারণ করেছেন, এগুলি হল যথাক্রমে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। ভক্তিলাভের উপায় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে নারদসূত্র (৪৩-৪৫) এবং নারদপঞ্চরাত্রে (২.২.২৬)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে 'স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহবি যান্তি পরাং গতি ্' (৯.৩০-৩২); অর্থাৎ ভক্তির পথই পরম শ্রেষ্ঠ পথ এবং এই পথ নারী, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য সকলের পরমগতি লাভের পথ হতে পারে।

ভক্তিবাদের প্রভাবে কালক্রমে আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে পূজার্চনার আড়ম্বর ও আচার-অনুষ্ঠান বিস্তৃত হতে থাকে। ধূপ-দীপ-পুষ্প-আলিপন-নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার দিনে দিনে বর্ণময় রূপ নেয়। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল দেবমূর্তি এবং দেবালয় নির্মিত হয় তাদের মধ্যে ভক্তিবাদের প্রভাব ক্রমশ পরিস্ফুট হতে থাকে। শুধু তাই নয়, নিত্যচর্চায় যে ধর্মাচরণ করা হত যেমন ব্রত, উপবাস, উৎসব, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ভক্তিবাদ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করত।

৪.০ শৈবধর্ম

শৈবধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। প্রাক্-আর্য যুগে এই ধর্মের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে, কারণ সিন্ধুসভ্যতার পর্বে পশুপতি শিবের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের একাংশ হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলে খোদাই করা পদ্মাসনে উপবিষ্ট পুরুষমূর্তিটিকে 'প্রোটো-শিব' বলে মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। যাইহোক, শৈবধর্মের একদিকে যেমন বৈদিক আর্য ধারার সম্ভাবনা রয়েছে অপরদিকে তেমনি প্রাগার্য অস্তিত্বের প্রবল সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, শৈবধর্ম কোনো একক ধর্মীয় প্রবাহ নয়, বরং বলা যেতে পারে এটি একাধিক পরম্পরাগত ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি সংহত ও সমন্বয়ী ধারা, যার মূলে রয়েছে গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তিকেন্দ্রিক এক ব্যক্তিগত দেবতার উপাসনা। শুধুমাত্র বৈচিত্র্যময় ভক্তিপ্রদর্শনের ব্যাপকতায় নয়, ভৌগোলিক বিস্তৃতিতেও শৈবধর্মের পরিব্যাপ্তি ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়ার সমাজ-সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছিল।

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে শিবের বিভিন্ন সমার্থক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, ধারণা করা যেতে পারে, তৎকালীন সমাজে শিবকে কেন্দ্র করে একটি ধর্মসম্প্রদায় সম্ভবত গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগত গ্রীক ঐতিহাসিক কুইন্টাস কার্টিয়াস রাফাস, স্ট্র্যাবো, ডিওডোরাস সেকুলাস প্রমুখের বিবরণে 'শিবয়' নামে এক শৈব অনুরক্ত উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের বাসভূমি ছিল পাঞ্জাবের ঝিলম ও চেনাব নদী অঞ্চলে। পতঞ্জলি

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ তাঁর রচিত মহাভাষ্যে 'শিবি' জনগোষ্ঠীর বাসস্থান নির্দেশ করেছেন শিবপুর বা শৈবপুরে।

সম্ভবত শৈবধর্মের প্রসার ঘটে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে। পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায়, রুদ্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য সমসাময়িক যুগে দেবতার উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ বা বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। রোগ-যন্ত্রণা নিরাময়কারী রুদ্রের প্রদত্ত ভেষজ বা ঔষধিকে 'শিব' অভিধায় চিহ্নিত করা হত, যা কল্যাণ বা মঙ্গলকর অর্থে ব্যবহৃত। উপাসানা বা পূজার নিমিত্ত নির্মিত শিবের মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হতে বলেও জানা যায়। পতঞ্জলির রচনায় 'শিব ভাগবত' নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তাঁর বর্ণনা অনুসারে শিবভাগবত সম্প্রদায় দণ্ড, অজিন ও লৌহ নির্মিত শূল ব্যবহার করতেন এবং কার্যসিদ্ধির জন্য ক্ষেত্রবিশেষে হিংসাত্মক পথও অবলম্বন করতেন। মহাভারতে পাশুপত সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মদেবের পুত্র, উমাপতি ভূতনাথ শিব শ্রীকণ্ঠ স্বয়ং পাশুপতধর্মের প্রবক্তা ছিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যে এই পাশুপত সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু বিবরণ আছে। লিঙ্গ পুরাণ (২৪ অধ্যায়), বায়ু পুরাণ (২৩ অধ্যায়), কর্ম পুরাণ (৫৩ অধ্যায়) ও শিবপুরাণ (৫ম অধ্যায়), থেকে জানা যায়, যখন বিষ্ণু বাসুদেব কৃষ্ণরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় মহেশ্বর 'নকুলিন' নামে নিয়ে ব্রহ্মচারীরূপ অবতার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। 'লকুলিন', 'নকুলীশ' এবং 'লকুলীশ' নামেও তাঁকে চিহ্নিত করা হত। নকুলিন মাহেশ্বর যোগের প্রচার শুরু করেছিলেন, তাঁর প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের নাম কুশিক, গর্গ বা গার্গ, মিত্রক বা মিত্র এবং রুষ্ট বা কৌরুষ্য। এই চারজন শিষ্য ক্রমে পাশুপত সম্প্রদায়ের চারটি শাখার প্রতিষ্ঠা করেন।

শুধুমাত্র সাহিত্যিক উপাদান থেকেই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকেও উপরিউক্ত বিবরণের সমর্থিত তথ্য পাওয়া যায়। মহীশূরে প্রাপ্ত হেমবতী লেখ (৯৪৩ খৃষ্টাব্দ), রাজস্থানের উদয়পুরে একলিঙ্গ মন্দিরের অদূরবর্তী স্থানে প্রাপ্ত নাথমন্দির লেখ (৯৭১ খৃষ্টাব্দ), সোমনাথ মন্দিরে উৎকীর্ণ চিন্ত্রা প্রশস্তি (১৩শ শতক) প্রভৃতি থেকে এ প্রসঙ্গে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। কুশিক, গর্গ, কৌরুষ ও মৈত্রেয় যথাক্রমে পাশুপত সম্প্রদায়ের চারটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা। মহাভারতের শান্তিপর্ব, পুরাণ ও লেখমালার সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুসারে পাশুপত ধর্মের প্রবর্তন করেন লকুলীশ বা নকুলিন অবতাররূপী শিব। পাশুপত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের সময়কাল সম্পর্কে আর. জি. ভাণ্ডারকার বলেছেন, পাঞ্চরাত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাশুপত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল। আমরা 'শিব ভাগবত' সম্প্রদায়ের কথা পাই খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। সুতরাং অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মতকে স্বীকার করলে অনুমান করা যেতে পারে 'শিব ভাগবত' এবং পাশুপত সম্প্রদায় অভিন্ন এবং সমার্থক ছিল।

পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ডি. আর. ভাণ্ডারকার, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন মথুরা স্তম্ভলেখের (৬১ গুপ্তাব্দ—৩৮১ খৃষ্টাব্দ) সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। উক্ত লিপিটিতে বলা হয়েছে, উদিতাচার্য নামে একজন মাহেশ্বর পাশুপত ধর্মের আচার্য তাঁর গুরু কপিল ও গুরুর গুরু উপমিতের

নামানুসারে কপিলেশ্বর এবং উপমিত্রের নামে দুটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। আরও জানা যায়, পরম্পরাগতভাবে উদিতাচার্য ছিলেন কুশিক থেকে ক্রমানুসারিক অধস্তন একাদশতম গুরু। কুশিক ছিলেন লকুলিশের চারজন শিষ্যের মধ্যে অগ্রণী। উদিতাচার্যের পূর্ববর্তী দশজন আচার্যের প্রত্যেকের জন্য যদি গড়ে পঁচিশ বৎসরকাল কালসীমা নির্ধারণ করা হয়, তবে মথুরা স্তম্ভলেখের ৩৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে কুশিকের সময়কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। লকুলিশের এই সময়কাল কিন্তু কোনমতেই তাঁকে শিবভাগবত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত করতে পারে না।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শিব ভাগবত ও পাশুপতদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল; যদিও সাদৃশ্য সবক্ষেত্রে অ. ভিন্নতার পরিচায়ক নয়। লকুলিশের পূর্বেও শিব-ভাগবত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত শেষোক্তজনের উদ্যোগে এই সম্প্রদায় ও মতবাদের সংস্কার সাধিত হয়। পুরাণ সাহিত্যের মতে, লকুলীশ ছিলেন শিবের অষ্টবিংশতিতম এবং শেষ অবতার।

পাশুপতধর্মে বন্ধন বা 'পাশ' মুক্তির উপায় রূপে পাঁচটি পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে। কার্য-কারণের সম্পর্ক বিচার শৈবদর্শনের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। যোগ দুই প্রকার—কর্ম ও নৈষ্কর্ম—কর্মের প্রকাশ ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির মাধ্যমে পক্ষান্তরে নৈষ্কর্ম্যের প্রকাশ অনুভবে। বিধি দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ, মুখ্যবিধি হল চর্যা বা আচরণ, চর্যা আবার দুই প্রকার, ব্রত ও দ্বার। ব্রতের মধ্যে স্থান পেয়েছে পবিত্র ভস্ম দেহে অনুলেপন করা, ভস্মমধ্যে শয়ন, হাস্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য, মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পরিক্রমা প্রভৃতি ক্রিয়াচার; দ্বার হল অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রমী কিছু আচরণ। পাশুপত ধর্মে মুক্তির সঙ্গে 'সিদ্ধাই' বা অলৌকিক ক্ষমতালাভের কথা বলা হয়েছে। অন্য ধর্মদর্শনে যা 'মোক্ষ' বা মুক্তি বলে অভিহিত, পাশুপত ধর্মে তাকে 'দুঃখান্ত' বা দুঃখ হতে চিরমুক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়।

৫.০ ভাগবত ধর্ম

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে 'ভগ' শব্দটি পাওয়া যায়, যার দ্বারা বিষ্ণুর যে সকল গুণাবলীকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই গুণসমূহের সমাহারে তিনি ভগবৎ বা ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বিষ্ণুর উপাসকগণ প্রথমদিকে 'ভাগবত' বলেই অভিহিত হতেন, পরবর্তীকালে তাঁরা 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত হন।

ঋগ্বেদে ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু হলেন সূর্য দেবতার স্বরূপ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম অধ্যায়ে বিধৃত একটি মন্ত্রের ভিত্তিতে কয়েকজন পন্ডিত মনে করেন ঋগ্বেদের বিষ্ণুই বৈষ্ণব ধর্মের অধিদেবতা। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-দ্বিতীয় শতকে রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম পাওয়া যায়। তবে নারায়ণ নামে কোনো দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। যাই হোক, ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেদ বর্ণিত বিষ্ণু বাসুদেব কৃষ্ণের সাথে অভিন্ন হয়ে যান।

মহাভারত রচনার সম্ভাব্য সময়কাল হল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক। এই মহাকাব্যে

কৃষ্ণকে নবরূপী দেবতার আসনে বসানো হলেও তাঁর নামানুসারে কোনো উপাসক সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই। কিন্তু ভাগবত ধর্মের সূচনা হয় বাসুদেবের পূজার্চনাকে কেন্দ্র করে। পানিনির অষ্টাধ্যায়ী (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক), পতঞ্জলির মহাভাষ্য (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) প্রভৃতি আকর গ্রন্থে বাসুদেব দেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের শান্তিপর্বে নর ও নারায়ণ নামে দুই মহাপুরুষের কৃচ্ছ্রসাধনার কথা জানা যায়, তবে এখানে তাঁরা দেবতা নন। প্রকৃতপক্ষে, ভাগবত ধর্মের মূল কথা হল বীরপূজা।

বাসুদেব ছিলেন বসুদেবের পুত্র এবং তাঁদের মাতা ছিলেন রোহিনী ও দেবকী। বেসনগর গরুড় স্তম্ভলেখ (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) থেকে জানা যায়, তক্ষশিলা-রাজদূত বিদিশায় এসে ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করেন। বাসুদেবের উদ্দেশ্যে একটি গরুড় স্তম্ভও তিনি প্রতিষ্ঠাপূর্বক উৎসর্গ করেন। প্রায় সমকালীন নাগরী এবং ঘোসুণ্ডি (রাজস্থান) শিলালেখ সঙ্কর্ষণ (বৃষ্ণিবংশ জাত বীর) ও বাসুদেবের (বৃষ্ণিবীর) পূজার নির্মিত্ত 'নারায়ণ-বাটিকা' প্রতিষ্ঠার তথ্য উৎকীর্ণ করেছে। নানাঘাট গুহালেখতে (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক) অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আর. জি. ভান্ডারকর পঞ্চবৃষ্ণিবীরের (সঙ্কর্ষণ বলদেব, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অনিরুদ্ধ) পূজায় পাঞ্চরাত্র ধর্মের ব্যূহবাদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। ব্যূহবাদে বলা হয়, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ বাসুদেবের অংশ। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে পাঞ্চরাত্র সংহিতাসমূহে, যেগুলির সময়কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতক ও তার পরবর্তী। ভাগবত ধর্মে 'ভগবান' বাসুদেবকে বিভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয়েছে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, বৈদিক বিষ্ণু, বাসুদেব কৃষ্ণ ও নারায়ণ মূলত যে কোনভাবেই হোক সূর্য উপাসনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তাঁদের ঐক্যসাধন সম্ভবপর হয়েছিল।

৬.০ জৈনধর্ম

জৈনধর্মের ইতিহাসে মহাবীর ছিলেন চব্বিশতম তীর্থঙ্কর। জৈনধর্ম প্রসারতালাভ করে মহাবীরের সময়ে। তাঁর পরবর্তীকালে আটশত বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত কালপর্বে জৈনধর্মমতাবলম্বীগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থ সংকলিত করেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত রত্ননন্দিনের 'ভদ্রবাহুচরিত' থেকে জৈনধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। মহাবীরের পরে যে তিনজন 'কেবলিন' এবং ছয়জন শ্রুতকেবলিন জৈনসঙ্ঘের পরিচালনার পুরোভাগে ছিলেন তাঁদের মধ্যে শেষ শ্রুত কেবলিন ছিলেন ভদ্রবাহু। তাঁর মৃত্যুর পর ঐ পদে আসীন হন স্থূলভদ্র।

খৃষ্টীয় শতকের সূচনার কয়েক শতকের মধ্যে বজ্রসেনের সময়ে জৈন সঙ্ঘে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি হয় যার ফলস্বরূপ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক দুই জৈনসম্প্রদায় পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে জৈনধর্মের বিভাজনের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল মহাবীরের কৈবল্যলাভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে অবশ্য জৈনধর্ম মগধ ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রসারতা লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে উৎকীর্ণ খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি কলিঙ্গাদেশে জৈনধর্মের প্রসারতা লাভের ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমান উড়িষ্যার উদয়গিরি-খন্ডগিরি পর্বতগুহাগুলি রাজ অনুকূল্যে জৈন ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে মথুরা অঞ্চল জৈনধর্মের একটি জনপ্রিয় কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়।

৭.০ বৌদ্ধধর্ম

একচ্ছত্র ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিবাদস্বরূপ যেমন জন্ম নেয় জৈন ধর্মমত, তেমনই গড়ে ওঠে বৌদ্ধধর্ম। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বুদ্ধের উপাসনা হত প্রতীক রূপে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মথুরা ও গান্ধারে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। স্তূপ ও চৈত্যের পাশাপাশি বুদ্ধের মূর্তিপূজা ক্রমশ বিস্তারলাভ করে। মহাযান পন্থী বৌদ্ধদের মতে, সূত্তপিটকে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি বা আদর্শ সঙ্কলিত হয়েছে। পালি নিকায় সাহিত্যের কিয়দংশেও অবশ্য মহাযান মতবাদ প্রতিফলিত। মহাযান মতবাদের সারাৎসার সর্বপ্রথম গ্রথিত হয় 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক বৌদ্ধ সাহিত্যে। ১৪৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়, এ থেকে মনে করা যেতে পারে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে মহাযান পন্থী বৌদ্ধমতবাদ শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, উপমহাদশের বাইরেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

লামা তারনাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, চতুর্থ মহাসঙ্গীতির সময়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল। 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'য় বলা হয়েছে, মহাযান ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণাপথে, পরবর্তীকালে প্রাচ্যদেশ ও উত্তরভারতে তা বিস্তৃতিলাভ করে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সম্ভবত অন্ধ্রপ্রদেশের মহাসাঙ্ঘিকদের কেন্দ্র থেকে মহাযানমতের উদ্ভব হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক নাগাদ কুষাণরাজ কণিষ্কের আমলে সমগ্র উত্তরভারতে মহাযান ধর্মমত প্রসারিত হয়। মহাযান মতের দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয় নাগার্জুন, আর্যদেব অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। গান্ধার ও মথুরার প্রায় সমসাময়িক শিল্পরীতিতে প্রতীক চিহ্নের পরিবর্তে মূর্তির প্রবর্তন দেখা যায়। সময়কালের নিরিখে অবশ্য গান্ধার নির্মাণরীতিতে সৃষ্ট বুদ্ধমূর্তি, মথুরা-বুদ্ধের পূর্ববর্তী। স্টেলা ক্র্যামরিশ মনে করেন, গান্ধার বুদ্ধমূর্তি প্রাচীনতম হলেও তা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে বুদ্ধমূর্তির উদ্ভব হয় গান্ধারে। মথুরা কেন্দ্রে ভারতীয় শিল্পধারায় যে গোড়াপত্তন হয়, তা পরিপূর্ণতা লাভ করে গুপ্ত যুগে।

প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধমূর্তি পূজার সঠিক সময়কাল সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। প্রতীকী পুজার্চনা থেকে মূর্তিস্থাপনের মাধ্যমে বুদ্ধের আরাধনা ঠিক কোন সময় থেকে প্রচলিত হয়, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ সন্দিহান। তবে কণিষ্কের মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তির ছাপ থেকে অনুমান করা যেতে পারে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই বুদ্ধমূর্তি উপাসনার প্রচলন ঘটে। কণিষ্ক প্রবর্তিত কুষাণ মুদ্রায় দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির পাশে একটি গ্রীক লেজেন্ড উৎকীর্ণ আছে, সেটি হল 'সকমন বোদো' অর্থাৎ শাক্যমুণি বুদ্ধ। এই মুদ্রায় মহাপুরুষের লক্ষণ-সমন্বিত বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে। মহাপুরুষের অবয়বে যে সকল লক্ষণ

প্রতীয়মান হয় বলে প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই সকল লক্ষণ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল তৎকালীন মুদ্রা ও ভাস্কর্য নির্মাণশৈলীতে। বুদ্ধমূর্তির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন মুদ্রায় বা হাতের ভঙ্গিমায় লক্ষ্য করা যায়।

৮.০ সরস্বতী

'সরস্বতী' শব্দটির সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। এখানে অবশ্য 'দেবী' রূপে নয়, একটি নদীকে চিহ্নিত করতে সরস্বতীর উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী ভূভাগটি ব্রহ্মাবর্ত নামে পরিচিত ছিল। বৈদিক বা আর্য সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিগণিত ব্রহ্মাবর্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী আর্যগণ পবিত্র সরস্বতী নদীর জল ব্যবহার করতেন। এই পবিত্র নদীর তীরে আচরিত নিত্য ধর্মাচরণ ও ধর্মানুষ্ঠানগুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সরস্বতী ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করেন—যজ্ঞানুষ্ঠানে আহূত দেবদেবীর তালিকায় ক্রমে সংযোজিত হয় দেবী সরস্বতীর নাম। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে 'অম্বিতমা' এবং 'নদীতমা' এই দুটি সম্বোধনে ভূষিত করা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী একজন শক্তিসম্পন্না দেবীরূপে বর্ণিত।

'সরস্বতী' নদীর মাহাত্ম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তাকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যে কারণটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক। সরস্বতীর তীরবর্তী কৃষিজমিতে চাষাবাদের জন্য নিরন্তর জলের চাহিদা পূরণ করত এই নদী। সেই হেতু কৃষি সম্পদ, সমৃদ্ধি, উর্বরতা এবং বংশধারার প্রবহমানতার ধাত্রী হিসাবে মাতৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠেন সরস্বতী। ঋগ্বেদে 'বাক' নাম্নী অপর আরেক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ধী এবং বাগ্মীতারও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বৈদিক সাহিত্য, সূত্র সাহিত্য এবং পুরাণে দেবী সরস্বতীর মাহাত্ম্য সুপরিস্ফুটভাবে বর্ণিত হয়েছে, শুধু তাই নয়, পৌরাণিক সাহিত্যে বিষ্ণুর অন্যতমা স্ত্রী রূপে সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় পাল-সেন যুগে বেশ কিছু বিগ্রহে বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বামপার্শ্বে সরস্বতীকে দেখা যায়। ধর্মীয় সাহিত্য ছাড়াও খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে বাণভট্টের রচনায়, হিউয়েন সাঙের পর্যটন বিবরণীতে এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত কল্হনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে সরস্বতীর উল্লেখ দেখা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মদর্শনেও সরস্বতী সম্পর্কিত একটি চেতনার উন্মেষ ঘটে, যা প্রতিফলিত হয়েছিল মহাযান বৌদ্ধধর্ম মতে। এই ধর্ম অনুশাসনে দশটি পারমিতার উল্লেখ দেখা যায়, এই নতুন ধারণার পথ ধরে দেবী সরস্বতীর বৌদ্ধধর্ম চিন্তায় প্রবেশ। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে মঞ্জুশ্রীর স্ত্রীরূপে বর্ণিত হয়েছেন সরস্বতী। বৌদ্ধ প্রতিমাশৈলীতে সরস্বতীর রূপ চতুর্বিধ—বজ্রসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদা এবং মহাসরস্বতী। ভারতীয় উপমহাদেশের গণ্ডি বেরিয়ে নেপাল, তিব্বত, জাভা, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে সরস্বতী বিদ্যা ও বাগ্মিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে সমাসীনা হয়েছেন। ধর্ম, বর্ণ, দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে দেবী সরস্বতীর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আজও সমানভাবে বর্তমান।

৯.০ কার্তিকেয়

ঋগ্বেদে প্রত্যক্ষভাবে কার্তিকেয় নামক দেবতার কোনো উল্লেখ নেই, তবে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা পররবর্তীকালে কার্তিকেয় নামক দেবতার ধারণা গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছিল। অর্থববেদের পরিশিষ্টপর্বে কার্তিকেয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেই কার্তিকেয় একজন স্বাধীন দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। মহাকাব্যদ্বয়ের বিভিন্ন অংশে কার্তিকেয় সম্পর্কে বহু কীর্তিগাথা বর্ণিত হয়েছে। আরণ্যক পর্বে তাঁকে স্কন্দ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে তিনি অগ্নিপুত্র। রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩৭ ও ৩৮ তম অধ্যায়ে সবিস্তারে কার্তিকেয় বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে পৌরাণিক সাহিত্য যে সুদীর্ঘকাল সময়ে রচিত হয় সেখানেও স্কন্দের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখা যায়। পুরাণগুলি যে সময়ে রচিত হয়েছিল সেই যুগে স্কন্দের মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য বহন করে 'স্কন্দ' নামক পুরাণটি।

ধর্মসাহিত্য ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় বহু সাহিত্যসূত্রে কার্তিকেয়-র উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রে (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ—৩য় শতক) নগরীর মধ্যভাগে যে সকল দেবদেবীর প্রকোষ্ঠ নির্মাণের বিধান দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত এবং বৈজয়ন্তের নাম উল্লিখিত হয়েছে। R.P. Kangle র অনুমান এই নাম চতুষ্টয় জয়ের প্রতীক বা কার্তিকেয়র বিভিন্ন নাম। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) বলা হয়েছে, সমকালীন সমাজে কার্তিকেয় একজন জনপ্রিয় দেবতারূপে পূজিত হতেন, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট দেবালয়ও স্থাপিত হত। পাণিনির টীকাকার ভিন্ন নামে কার্তিকের বন্দনা করেছেন। কুষাণযুগের কিছু মুদ্রায় স্কন্দ ও বিশাখ নামক দুই দেবতার নাম পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত বৃহৎসংহিতায় কার্তিকেয়র চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। আদিত্যসেনের অপসদ্ শিলালিপিতে স্কন্দের প্রতীকরূপে ময়ূরের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে কার্তিকেয় প্রায় জাতীয় দেবতার স্তরে উন্নীত হন।

পরবর্তীকালে দামোদর গুপ্তের কুট্টনীমত, বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত, ধনপালের তিলকমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে কার্তিকের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। কল্হনের রাজতরঙ্গিনীতে গৌড়দেশের পুণ্ড্রবর্ধন নগরীতে অবস্থিত কার্তিকেয় মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে কার্তিকেয় সুব্রহ্মণ্য বা মুরুগান নামে জনপ্রিয় ছিলেন। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্ নাটকে অবশ্য কার্তিকেয়ক একটু অন্যরকম ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে তিনি সমাজের ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবতারূপে চিহ্নিত।

১০.০ সূর্য পূজা

প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে সূর্যদেবের স্তুতিগান করা হয়েছে। মহাকাব্যে তিনি দেবেশ্বর আখ্যায় ভূষিত। সাহিত্যিক উপাদান থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ থেকে অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনকালে

সূর্য-উপাসকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। আনন্দগিরি ছয় শ্রেণীর সূর্য উপাসকদের কথা বলেছেন। তাঁরা সকলেই রক্তচন্দনের তিলক এবং রক্তবর্ণের ফুলমালা গলায় পরে গায়ত্রীজপ করতেন, তবে এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কিছু আদর্শগত তফাত ছিল। আদি-মধ্যযুগে কবি ময়ূরভট্ট তাঁর রচিত 'সূর্যশতক' গ্রন্থে সূর্যের স্তুতি বন্দনা করে একশত স্তব সন্নিবেশিত করেছেন। শুধু সাহিত্যগত সূত্রই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহে ধারণা করা যেতে পারে, উত্তর ভারতে আচরিত সূর্য উপাসনা পূর্ব ভারতীয় সূর্যবন্দনারীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

ইন্দোর তাম্রশাসন, মান্দাসোর শিলালিপি, গোয়ালিয়র প্রস্তরলিপি এবং আরও বহু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে সূর্যমন্দির নির্মাণের তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু রাজা ও রাজবংশ নিজেদের সূর্য-উপাসক বলে চিহ্নিত করেছেন। সূর্যমূর্তি পূজার প্রচলনের পূর্বে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে সূর্যপূজা করার রীতি ছিল। চক্র, পদ্ম, স্বর্ণবলয় প্রভৃতি প্রতীক সূর্য উপাসনার জনপ্রিয় প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হত।

আদি-গুপ্তযুগে নির্মিত সূর্যমূর্তিগুলি মূলত পূর্ববর্তী নির্মাণকৌশলের ধারা অব্যাহত রেখেছিল। রাজশাহী জেলার নিয়ামতপুর থেকে প্রাপ্ত ভাস্কর্য মথুরার কুষাণ সূর্যমূর্তির আদলে তৈরী হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু নতুনত্ব নজরে পড়ে। পরবর্তী গুপ্তযুগে পূর্বপ্রান্তে (বর্তমানে রাজশাহী মিউজিয়ামে সংরক্ষিত) দেওরা নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত ব্যাসল্ট পাথরের সূর্যবিগ্রহটির উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন।

বৃহৎসংহিতায় সূর্যদেবতার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া গেলেও তার রথ, অশ্ব বা পার্শ্বচর দেবদেবীর উল্লেখ নেই। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে এই বর্ণনা ব্যাপকতর। আদি মধ্যযুগে পূর্বভারতে প্রধানত যে সকল সূর্যমূর্তির অস্তিত্ব ছিল তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(১) দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তি এবং দুই পাশে সহচর দেবতাদের উপস্থিতি, যে গুলি সংখ্যায় সর্বাধিক

(২) পদ্মাসনে উপবিষ্ট সূর্যমূর্তি (সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প)।

বাংলা-বিহার অঞ্চলে খননকার্যের ফলে পাল-সেনযুগের যে সকল সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে পার্শ্বদেবতার মূর্তি ও আলংকারিক বাহুল্য দেখা যায়। সপ্তাশ্ববাহী রথ এগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যার খিচিং অঞ্চল থেকে দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট দুই ধরণের সূর্যমূর্তিই পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের বৈরহট্ট থেকে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের একটি সূর্যবিগ্রহের সাথে উপবিষ্ট দণ্ডী এবং পিঙ্গালের মূর্তি, দণ্ডায়মানা একাধিক নারীমূর্তি এবং সূর্যের দুই পাশে চারটি করে আটটি গ্রহমূর্তির চিত্র পাওয়া যায়, এই বিগ্রহে সূর্যকে 'সমস্ত রোগ-হর্তা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়িমল্লমের পরশুরামেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিটি দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীর অনন্য উদাহরণ। এখানে সূর্যের পদযুগল নিরাবরণ, সপ্তাশ্বরথ এবং সারথি অরুণ অনুপস্থিত, স্ত্রী-পুত্র পরিবারও সঙ্গে নেই—সূর্যের উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত এবং কাঁধ পর্যন্ত দুই হাতে দুটি আধফোটা পদ্মের কুঁড়ি শোভিত। তবে উত্তরভারতের মত দক্ষিণভারতে কিন্তু সূর্য উপাসনা সেভাবে প্রসারিত হয় নি।

বর্তমানে রাজশাহী মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দিনাজপুরের ঘাটনগর নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত কালো

ব্যাসাল্ট প্রস্তরে নির্মিত রেবন্ত মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত রেবন্তমূর্তিতে তাঁর মৃগয়ারূপটি ধরা পড়েছে। রেবন্ত হলেন সূর্যপুত্র, বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদানে রেবন্ত উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বিনীকুমার, মনুদ্বয় এবং যম ছিলেন সূর্যের অন্যান্য পুত্র। এই সূর্যপুত্রগণ পূর্বভারতে পূজিত হতেন।

১১.০ হিন্দুধর্ম—সামগ্রিক অবলোকন

আধুনিক ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের সর্বত্র 'হিন্দু' শব্দটি একটি জাতি বা ধর্মের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হলেও জাতিবাচক, অর্থে 'হিন্দু' নামটি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। ইসলামধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে বিস্তারলাভ করার পর ইসলাম কেন্দ্রিক প্রশাসন তথা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে অ-মুসলমানকে ভারতবাসীকে চিহ্নিত করার জন্য 'হিন্দু' নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। আপামর অমুসলমান ভারতীয় অধিবাসীর আচরিত বিভিন্ন ধর্মকে 'হিন্দু' ধর্ম রূপে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের একটি সাধারণ এবং সামান্যিকরণকৃত সংজ্ঞা প্রচলিত হয়। সুতরাং পূর্ব আলোচিত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, লৌকিক দেবদেবীর উপাসক প্রভৃতি অর্থাৎ ইসলাম ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রচলিত ভারতীয় ধর্ম হিন্দু ধর্ম বলেই ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠে।

বস্তুতপক্ষে, 'হিন্দু' কোনও একটি বিশিষ্ট ধর্মের নাম নয়। বৈদিক, পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণ্য, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল ধর্মই কালক্রমে 'হিন্দু' এই সাধারণ সংজ্ঞায় সূচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীকালে অবশ্য বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি, অর্থাৎ যে সব ধর্মে বেদ, 'বেদান্ত', 'বেদাঙ্গ' প্রভৃতি মূল ধর্মগ্রন্থ বলে গৃহীত হয় নি, সেইসব ধর্মের মানুষ অ-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উৎপত্তি বিবেচনা করলে ভারতে 'ইসলাম' ব্যতীত প্রাচীনকালের আর সকল ধর্মই হিন্দুধর্ম সূচিত করে।

১২.০ অনুশীলনী

১। 'ধর্ম' শব্দটির সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

২। ভক্তিবাদ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৩। শৈব ও ভাগবত ধর্ম সম্পর্কে কি জানেন?

৪। জৈনধর্মের উদ্ভব ও প্রসার কিভাবে ঘটে?

৫। বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৬। সরস্বতী ও কার্তিকেয় সম্পর্কে যা জানেন লিপিবদ্ধ করুন।

৭। 'হিন্দুধর্ম' বলতে কি বোঝায়?

১৩.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। জে. এন. ব্যানার্জী ঃ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ্ হিন্দু আইকনোগ্রাফি।

২। এ. কে. নারায়ণ (সম্পাদিত)) স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রী অফ্ বুদ্ধিজম।

৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ এজ অফ্ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি।

৪। আর. জি. ভান্ডারকর ঃ বৈষ্ণবিজম, শৈবিজিম্ এন্ড মাইনর রিলিজিয়াস সেক্ট্স্।

৫। চার্লস্ ইলিয়ট ঃ হিন্দুইজম্ এন্ড বুদ্ধিজম্ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

একক ২ □ খাদ্য, পানীয় এবং পোষাক-পরিচ্ছদ (Synthesis in Dress and Foods)

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ খাদ্য ও পানীয় ঃ আদিপর্ব

১.২ ঋগ্বেদ-সংহিতা—খাদ্য ও পানীয়

১.৩ পরবর্তী বৈদিক যুগ ঃ খাদ্য ও পানীয়

১.৪ ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্য ও উপষিদের যুগ

১.৫ ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ধর্মীয় সাহিত্য ঃ খাদ্য ও পানীয়

১.৬ সংস্কৃত-সাহিত্য ঃ খাদ্য ও পানীয়

১.৭ প্রাচীন বাংলা ঃ পানীয় ও খাদ্যাভ্যাস

২.০ পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ গোড়ার কথা

২.২ আঞ্চলিক তারতম্য

২.৩ শাস্ত্র-নির্দেশিত পোষাক

২.৪ প্রাচীন বাংলা ঃ পোশাক-পরিচ্ছেদ

৩.০ শেষ কথা

৪.০ অনুশীলনী

৫.০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ প্রস্তাবনা

আলোচ্য এককটিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কালপর্বে খাদ্য ও পানীয় এবং পোষাক-পরিচ্ছদের বিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি একজন সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারণের অপরিহার্য উপাদান হল অন্ন এবং বস্ত্র; তবে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্য, পানীয় বা পরিধেয় বস্ত্র বিভিন্ন প্রকার ছিল; এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সহাবস্থানই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। খাদ্যাভ্যাস এবং পোষাক পরিচ্ছদের কালক্রমিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতার ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্যিক উপাদান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের উপর। এই এককটিতেও উপরিউক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির সাহায্যে অলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.১ খাদ্য ও পানীয় ঃ আদিপর্ব

ভারতেবর্ষের প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য অনুধাবন করলে দেখা যায়, আর্যরা এদেশে আসার চার-পাঁচ শতাব্দীর মধ্যেই উৎপাদন ব্যবস্থায় কৌশলগত প্রকরণে বিপ্লব এসে যাওয়ায় উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে শ্রেণীবিভাগও দেখা দিয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমা হতে থেকেছে মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর হাতে। তারা নিরন্ন মানুষের মধ্যে বন্টন না করে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য পণ্য হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। ফলে নীচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্ষুধার অন্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয় নি।

ইতিহাসের প্রথম পর্বে মানুষ ফলমূল সংগ্রহ করত, তারপর শিকার করে মাংস সংগ্রহ করত, তারও পরের পর্যায়ে সে 'পশুপালন' করত, পশুপালনে খাদ্যসংস্থান অনেক বেশী নিশ্চিত ছিল। ভারতবর্ষে আসবার সময়েও আর্যরা যাযাবর পশুচারীই ছিল, অনেক পরে প্রগার্যদের কাছে চাষ করতে শিখেছিল। এ দেশে বসতি বিস্তারের উদ্দেশ্যে আর্যরা যখন প্রাগার্যদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় তখনও আর্যরা পশুপালকই ছিল এবং প্রাগার্যদের সম্পত্তি ও খাদ্য লুঠপাট করে খাবার সংগ্রহ করত, শিকার করত, সংগ্রহ করত বনের ফলমূল। কিন্তু এসব মিলিয়েও যা খাদ্য জুটত তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। শিকারের যুগ থেকে পশুপালনের যুগ পর্যন্ত খাদ্য সংকট ছিল আর্যদের নিত্যসঙ্গী। খাবারের জোগানে এইরূপ অনিশ্চয়তায় আর্যরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে; সেজন্য দেবতাদের কাছে খাদ্যের জন্য প্রার্থনা তাদের দৈনন্দিন প্রধান একটি প্রার্থনা ছিল। ঋগ্বেদ সংহিতার বহু স্তোত্রে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

১.২ ঋগ্বেদে-সংহিতা—খাদ্য ও পানীয়

ঋগ্বেদে অন্নের অন্তত চৌদ্দটি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। এখানে খাদ্য নিয়ে প্রার্থনা সংখ্যায় প্রচুর, যেমন—"তোমরা সৎকার্যকারীকে অন্নে ভরিয়ে দাও" (১/৪৭/৮), "আমরা যেন অন্ন, খাদ্য, সুরক্ষা সুখ ভোগ করি (২/১৫/৮), "উষা অন্ন দাও" (১/৪৮/১২), "হে ইন্দ্র, যেন ঐশ্বর্য এবং যা অতিশয় দীপ্ত এমন অন্ন, খাদ্য লাভ করি" (১/৫৩/৫), "ইন্দ্র ও অগ্নি তোমাদের কাছে অন্ন প্রার্থনা করছি" (৩/১২/৫) ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, নানাভাবে, নানাভাষায় দেবতাদের নিকট প্রচুর অন্নের জন্য স্তুতি বা প্রার্থনা করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ঋগ্বেদের যুগে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থাৎ প্রয়োজন মেটাবার মত অন্নের সংস্থান ছিল না। সম্ভবত যাযাবর পশুচারী আর্যদের জীবনযাত্রা কঠোর ও প্রচুর শ্রমসাধ্য ছিল, স্বভাবতই তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টিসাধনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছিল অধিক। প্রয়োজন শুধু অন্নের নয়, দুধের জন্য গাভীরও প্রার্থনা রয়েছে ঋগ্বেদে।

সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে অন্নের জন্য যে মহিমা কীর্তন এবং দেবানুগ্রহের নিমিত্ত স্তুতিগান করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় ক্ষুধা সম্পর্কে একটা আতঙ্কের মনোভাব জনমানসে কার্যকরী ছিল। সাধারণ মানুষ হিসাবে সমাজে যাদের স্বীকৃতি ছিল তারা সাধারণ খাবারই খেত, তবে আর্যসমাজের

বাইরে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী অন্য হীন খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হত। অরণ্যানী সুক্তে যথেচ্ছ স্বাদু ফল খাবার জন্যেও প্রার্থনা আছে। ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায় থেকেই খাদ্য ও পানীয় ছিল পশুমাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য, শস্য থেকে তৈরী খাদ্য, অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা ফল, মধু, সোমরস ও সুরা। ফল ও মধু আহরণ করা হত অরণ্য থেকে। পশুপালনের যুগে পশুহনন করে যজ্ঞ হত এবং খাওয়াও হত, দুধ ও দুধ থেকে তৈরী দই, ঘোল, ছানা, চরু বা পায়েস এসবও খাদ্যের অংশ ছিল।

ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ের মন্ত্রগুলি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অন্নবান হবার কামনা সে সমাজে একটি গভীর ও মৌলিক কামনা, এ কামনার ভিত্তি হল সার্বিক খাদ্যাভাব। মানুষ দেখছে লৌকিক প্রয়াসে এ ক্ষুধার সমাধান নেই, তাই দ্বারস্থ হচ্ছে দেবতাদের। এ প্রার্থনা বারংবার করা হচ্ছে বহু দেবতার কাছে, বিভিন্নভাবে, তাতে সমাজের সমবেত এক আর্তি ফুটে উঠছে।

১.৩ পরবর্তী বৈদিক যুগ ঃ খাদ্য ও পানীয়

অথর্ববেদে খাদ্যের সংজ্ঞা এবং সে সম্বন্ধে প্রার্থনায় কিছু বৈচিত্র্য আছে। এখানে ব্রীহি, তণ্ডুল, ওদন, শারিশাকা, শ্যামাক, মাষ ইত্যাদি ধান্যবাচক নানা শস্যের নাম যেমন পাওয়া যায়, তেমনই খাদ্যের অপর অংশ দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য ও মাংসের জন্য পশুপালের কুশল প্রার্থনাও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অথর্ববেদের শেষ পর্যায়ের একটি রচনাতে খাদ্যসম্ভারে কিছু বাহুল্য চোখে পড়ে। কুন্তাপসূক্তের একটি অংশে একজন স্ত্রী তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি তাঁর স্বামীর জন্য দই, ঘোল না যবসুরা কোনটি পান করার জন্য এনে দেবেন। তবে অনুমান করা যেতে পারে এই প্রতীকী সমৃদ্ধি শুধুমাত্র বিত্তবান মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আপামর জনসাধারণের জন্য নয়। তবে এ থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, তখন শস্য উৎপাদনে কিছুটা বৈশিষ্ট্য এসেছিল।

১.৪ ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্য ও উপনিষদের যুগ

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের যুগে খাদ্যাভাবের প্রচুর প্রমাণ মেলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণের বহু শ্লোকে খাদ্যাভাবের মূল সুরটিই বারেবারে ধ্বনিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বেশ কয়েকটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করার পরে তারা যখন ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হল, তখন প্রজাপতি তাদের জন্য খাদ্য সৃষ্টি করলেন। উপনিষদে অন্নের প্রতি যথাবিধি সমাদর প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি অংশে (৭.২৬.২) খাদ্যের বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১.৪.৯) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (২.৪.২৬) দিনে মাত্র দু'বার অন্নগ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত একটি গল্পে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিলে একজন মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যা হাতের কাছে জুটবে তাই ভক্ষণ করতে পারে এমন কি অন্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণেও কোনো বাধা নেই।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬.৮) অশ্ব, বৃষ, ছাগ ও মেষকে যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য কী চিহ্নিত করা হয়েছে, পক্ষান্তরে অন্যান্য কয়েকটি পশু সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা যেহেতু যজ্ঞপশুর সমগোত্রীয় নয় তাই তারা ভোজনেরও অযোগ্য। শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনায় (১১.৭.১.৩) পশু মাংস হল সর্বোত্তম খাদ্য। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সাহিত্য, আরণ্যক ও উপনিষদে পশুমাংস ভক্ষণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও নজীর দেখা যায়।

১.৫ ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ধর্মীয় সাহিত্য ঃ খাদ্য ও পানীয়

অন্নপ্রাশনে শিশুকে সর্বপ্রথম রন্ধন করা যে খাদ্য দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র এবং পরাশর স্মৃতিতে বলা হয়েছে শিশুটির পিতা তাঁর সন্তানের জন্য ছাগলের মাংস বা তিতিরজাতীয় পক্ষীর মাংস অথবা মৎস্য এবং সুসিদ্ধ চালের অন্ন প্রস্তুত করবেন। তিনি শিশুর দৈহিক পরিপুষ্টি, স্বর্গীয় জ্যোতি, সৌন্দর্য এবং ক্ষিপ্রতার জন্য দধি, মধু এবং ঘৃত সহযোগে উপরিউক্ত যে কোনো একটি খাদ্যবস্তু মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে শিশুকে ভক্ষণ করাবেন। আপস্তম্ভ গৃহ্যসূত্রে অন্নপ্রাশনে শিশুকে মাত্র একবার সুপক্ক অন্ন, দধি, মধু ও ঘৃত সহযোগে ভক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কাঠক সংহিতা ও মানব ধর্মসূত্রে কিন্তু পশুমাংসের উল্লেখ নেই।

বিষ্ণুপুরাণ (৩.১.৮৩-৮৪) এবং ব্রহ্ম পুরাণে খাদ্যবস্তুর একটি পর্যায়ক্রমিক তালিকা পাওয়া যায়। খাদ্য গ্রহণ কালে প্রথমেই মিষ্ট তরলজাতীয় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা বিধেয়। তালিকার দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে লবণ এবং তার পর অম্লজাতীয় খাদ্য এবং তিক্ত বা কষায় খাবার। আহারের শেষ উপকরণ হল দুগ্ধ। একজন গৃহীর পক্ষে ঘৃত সহযোগে আহরি করাকে আদর্শ বলে মনে করা হয়েছে।

স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ কোন্ কোন্ খাদ্য ভোজনের অযোগ্য এবং ভোজ্য বস্তু কার নিকট থেকে গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত তালিকা সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গৌতম ধর্মসূত্র, আপস্তম্ভ, বশিষ্ঠের ধর্মসূত্র, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ছাড়াও মহাভারতের শান্তিপর্ব, কূর্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভবিষ্যপুরাণের একটি পঙক্তির উপর ভিত্তি করে অপরার্ক জাতিদুষ্ট বা স্বভাবদুষ্ট কতকগুলি খাদ্যগ্রহণে বিরত থাকতে বলেছেন, এগুলি হল রসুন, পেঁয়াজ, পেঁয়াজজাতীয় কন্দ প্রভৃতি। ক্রিয়াদুষ্ট খাদ্যের মধ্যে সেই সব ভোজ্যবস্তুকে অন্তর্গত করা হয়েছে, যেগুলি চণ্ডাল, পতিত জাতি বা সারমেয়ের স্পর্শযুক্ত। কালদুষ্ট খাদ্য হল বাসী বা টাটকা নয় এমন খাদ্যবস্তু। গাভীর প্রসবের দশদিনের মধ্যে দোহন করা দুধ, এবং গ্রহণকালে গৃহীত খাদ্য। এ ছাড়াও সংসর্গ দুষ্ট, রসদুষ্ট প্রভৃতি খাদ্যের সম্পর্কেও অপরার্ক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে পশুপক্ষীর মাংস এবং মৎস্য ভক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুশাসন জারী করা হয়েছে। গৌতম, আপস্তম্ভ, বাশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, অপরার্ক এবং রামায়ণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে শজারু, শশক, বন্যবরাহ, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ছাড়া সকল পঞ্চ-নখরযুক্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণে নিষেধ করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রীয় বিধানে বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি যে সময়ে উদযাপন করা হয় না সেই সব মাসে ব্রাহ্মণ শিক্ষাগুরু বা পুরোহিতের মাংস ভক্ষণে কোনো বাধা ছিল না।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই কিছু ভেষজ এবং শাকসবজিকে খাদ্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রায় সব ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রে রসুন, পেঁয়াজ, মাশরুম প্রভৃতিকে খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাচীন ধর্মসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রে 'তাম্বুল' বা 'মুখবাস' সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। সম্ভবত খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে বা তার কিছুকাল পূর্বে দক্ষিণ ভারতে প্রথম তাম্বুল সেবনের প্রচলন হয় এবং ক্রমশ তা উত্তরদিকে পরিব্যপ্ত হতে থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রগুলির মধ্যে কৃত্য রত্নাকরে উদ্ধৃত সম্বর্তের ৫৫ সংখ্যক শ্লোক, লঘু হারীত, লঘু আশ্বলায়ন, জীবানন্দ সংকলিত ঔশনস তে নৈশাহারের পর তাম্বুল সেবনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১.৬ সংস্কৃত-সাহিত্য ঃ খাদ্য ও পানীয়

কালিদাস রচিত রঘুবংশে (৬.৬৪) পান-পাতা শোভিত পানগাছের বর্ণনা আছে। বাৎসায়নের কামসূত্রে (১,৪,১৬) বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি প্রাত্যহিক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সমাপনের পর তাম্বুল সেবনপূর্বক তার দৈনন্দিন কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় তাম্বুলের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। কাদম্বরী নাটকে রাজার প্রাসাদকে একটি পানের দোকানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যেখানে এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ইত্যাদি সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে। ব্রতখণ্ড নামক সাহিত্যে (চতুবর্গ চিন্তামণি, ২য় খণ্ড, প্রথমভাগ, ২৪২ পাতা) হিমাদ্রী রত্নকোষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, তাম্বুল বলতে বোঝায় পানপাতা, সুপারি বা গুবাক এবং চুণ; 'মুখবাস' হল এগুলির সঙ্গে এলাচ, কপূর প্রভৃতির সংমিশ্রণ। নিত্যাচার পদ্ধতি অনুসারে তাম্বুলে নয়টি উপকরণ সন্নিবেশিত হত, যেমন, সুপারি, পান, চুন, কর্পূর, এলাচ, লবঙ্গ, কন্‌কোল, নারকেলের শাঁস, মাতুলুঙ্গ ফল প্রভৃতি। ভাগভটের অষ্টাঙ্গসংগ্রহে তাম্বুল রচনায় খদির বা খয়েরের নির্যাসকে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

১.৭ প্রাচীন বাংলা ঃ পানীয় ও খাদ্যাভ্যাস

প্রাচীন বাংলার মানুষ তাদের খাদ্যের তালিকায় মূলত যে ভোজ্যবস্তুগুলিকে স্থান দিয়েছিল সেগুলি হল অন্ন (ভাত), মৎস্য, মাংস, ফলমূল ও শাকসব্জি এবং দুধ ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন উপকরণ। বাংলার বাইরে অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত ব্রাহ্মণগণ মৎস্য ও মাংস গ্রহণে অভ্যস্ত না থাকলেও বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এগুলি ভক্ষণে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে ভবদেব ভট্ট তাঁর রচনায় (প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ) যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, ব্যাস প্রভৃতির উদ্ধৃতি সংকলিত করে তাঁদের এই মৎস্য-মাংস গ্রহণকে যুক্তিগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা করেছেন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে (২.৫.৪৪-৪৬) ব্রাহ্মণের মৎস্য ভক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রোহিত, সকুল, শফর প্রভৃতি শুভ্র এবং আঁশ যুক্ত মৎস্য গ্রহণে ব্রাহ্মণের কোনো বাধা নেই। বিষ্ণুপুরাণ উদ্ধৃত করে শ্রীনাথাচার্য ধর্মীয় পার্বণের দিন ব্যতীত অন্য সময়ে মৎস্য মাংস ভক্ষণ অনুমোদন করেছেন। ইলিশের তেল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জি ও আনাজের ব্যঞ্জনের যে উল্লেখ জীমূতবাহনের রচনায় (কাল-বিবেক) পাওয়া যায় তা নিশ্চিতভাবে তৎকালীন মৎস্যপ্রিয় বাঙালী সমাজের চিত্রকেই পরিস্ফুট করে। সর্বানন্দের

'টীকা-সর্বস্ব' থেকে জানা যায় বঙ্গালের জনগণ শুকনো মৎস্য খেতে ভালবাসত। বাঙালীর পছন্দের মৎস্য সমূহের মধ্যে আমরা মাগুর, রোহিত, শকুল বা শোল, শৃঙ্গী বা শিঙ্গি, শফর, মৌলি বা মৌরলা, মৈনী, নলমীন, কর্কট, তিমি প্রভৃতির উল্লেখ পাই। পক্ষান্তরে ছাগ, মেষ, হরিণ, পায়রা প্রভৃতির মাংস প্রাচীন বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

গাভী, মহিষ ও ছাগদুগ্ধ থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্যবস্তু যথা, ঘৃত, মাখন, ছানা, পনীর, ক্ষীর, পায়েস, রকমারী মিষ্টান্ন নিঃসন্দেহে ভোজনরসিক বাঙালীর অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। তবে ভবদেবভট্ট স্বাস্থ্যবিধিসম্মত কারণে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারী করেন।

শুধু মৎস্য, মাংস বা দুগ্ধই নয় বিভিন্ন আহার্য ফলমূলেরও একটি দীর্ঘ তালিকা প্রাচীন প্রকরণ গ্রন্থ সমূহে সন্নিবেশিত হয়েছে, যথা—আম্র বা আম, কাঁঠাল, নারিকেল, বিল্বফল, বদরী, কমলালেবু, পিয়াল, ডালিম, তরমুজ, শশা, পাতিলেবু, তাল, কয়েতবেল, দ্রাক্ষা বা আঙুর, আমলকী, কদলী, শৃঙ্গাটক বা পানিফল, কশেরু, জম্বু, খর্জুর বা খেজুর এবং উদুম্বর। তাল এবং আখ বা ইক্ষু থেকে প্রস্তুত নির্যাস অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয় ছিল। আনাজ ও শাকসজিরও একটি দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে পটল, বার্তাকু বা বেগুন, কুষ্মান্ড বা কুমড়ো, অলাবু বা লাউ, মূলক বা মুলো, কাকেটিক বা কাঁকরোল, মাসক বা বররটি, তিন্তীরী বা তেঁতুল প্রভৃতি। শাকসজির যে উল্লেখ রয়েছে তা হল সরিষা, বেত্রাগ্র বা বেতোশাক, কচু, সুনিসন্নক বা সুষনিশাক, কলম্বিকা বা কলমি, হরিদ্রা, নিম্ব, হিমমেচিকা বা হেলেঞ্চা প্রভৃতি। রন্ধনের মশলাপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মরিচ, লবঙ্গ, জীরক, এলাচ, জাফরান, আদা, কর্পূর, হিং, রাঁধুনী এবং আরও কিছু উপকরণ। অন্ন বা ভাতের সঙ্গে মুগ, মুসুর, চণক বা ছোলা, কল্য (কলাই) অড়হক বা অড়হর, মাস-কলাই প্রভৃতি ডাল এবং যব সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য ছিল। চিপিটক বা চিঁড়া এবং খই-এর ব্যবহারও তখন অজানা ছিল না।

এবার পানীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। আলোচ্য কালপর্বে যে উত্তেজক পানীয়টির বহুল ব্যবহার হত তা প্রধানত প্রস্তুত হত ভাত, গুড়, ময়দা বা আটা এবং মধু সমভিব্যহারে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। তবে অন্যান্য মাদক পানীয়েরও ব্যবহার সে যুগে ছিল। চর্যাপদে মাদক ও মাদক-বিপণির উল্লেখ পাওয়া যায়। মধুক বা মহুয়া এবং তাল বৃক্ষের উল্লেখ সম্ভবত এদের ফল থেকে নির্গত নির্য্যাস বা রস থেকে মাদক জাতীয় পানীয় প্রস্তুতিকরণের ইঙ্গিত দেয়। ভবদেব অবশ্য ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ উভয় জনগোষ্ঠীকেই মাদক পানীয় গ্রহণে বিরত থাকতে বলেছেন। তবে সমাজে সুরাপানের প্রচলন ভালোভাবেই ছিল এটুকু অনুমান করা যেতে পারে। বৃহদ্ধর্মপুরাণের সাক্ষ্যে তান্ত্রিক দেবদেবীর উপাসনায় সুরা সেবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নৈষধচরিতের লেখক শ্রীহর্ষ খুব সম্ভবত বাঙালী ছিলেন। তাঁর রচনায় বাংলাদেশে আচরিত কতকগুলি প্রথার বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে একটি বিবাহের প্রীতিভোজের বর্ণনা রয়েছে যার উপকরণগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে নিরামিষ শাকসজি ও মৎস্যের বিভিন্ন পদ, ছাগল ও হরিণের মাংসের বিভিন্ন পদ, রকমারি

মিষ্টান্ন, সুস্বাদু পানীয় প্রভৃতি এবং ভোজন সমাপনান্তে সুবাসিত একটি পানের খিলি। একজন সাধারণ গৃহস্থ সুপক্ক তণ্ডুল, সর্ষে শাক, তরল দধি ও সুলভ মিষ্টান্ন গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকত। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক নাগাদ রচিত 'প্রাকৃত-পেঙ্গল' গ্রন্থে এই তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, একজন সুখী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাঁর সহধর্মিনী স্ত্রীর পরিবেশিত গদ্য-ঘৃত সহযোগে ফ্যানসহ গরম ভাত, গরম দুধ, ছোট মাছের পদ এবং নালিত বা পাট শাকের তরকারি ভক্ষণ করে তৃপ্ত হত।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে প্রাচীনকালে বাংলার অধিবাসীগণের খাদ্যাভ্যাস যা ছিল, আধুনিক যুগে তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। আমরা যদি আরও সুদূর অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখব মেগাস্থেনিস (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক) বর্তমান বিহার জেলার জনগণের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে প্রায় সমমতই পোষণ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে বসবাসকালে কয়েকজন পুরোহিতকে ভোজনে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাঁকে বলা হয় অপরিমিত খাদ্যের বন্দোবস্ত করাই হল (বাংলাদেশের) প্রাচীন রেওয়াজ, শুধুমাত্র উদরপূর্তির পক্ষে যথেষ্ট আহারের ব্যবস্থা রাখলে কী মানুষের কাছে একান্তই হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ইচিঙের ভারত সম্পর্কীত বিবরণ থেকে আমরা এ তথ্য পাই। বস্তুতপক্ষে, ভুরিভোজনের পর খাবার পাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যবস্তু অবশিষ্ট রাখার রীতি বাংলাদেশের প্রচলিত ছিল।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্ন উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রথমেই ঘৃত সহযোগে তণ্ডুল, তারপর শাকসব্জি, ঝোল প্রভৃতি এবং শেষে দুধ-ভাত বাঙালীর মধ্যাহ্ন ভোজনে স্থান পেত। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই তালিকায় লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। হলায়ুধের রচিত 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব' গ্রন্থে প্রথমে মিষ্টান্ন তৎপরবর্তী স্থানে যথাক্রমে লবণ-যুক্ত এবং অম্লজাতীয় খাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাদ্য গ্রহণের সমাপ্তি ঘটত তিক্তরসযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে। হাজরাটের অধিবাসীগণের মধ্যে এই খাদ্যরীতির প্রচলন ছিল।

গুপ্তযুগে আগত চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন তৃপ্ত ও সুখী ভারতবাসীদের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন; তিনি বলেছেন, এই দেশের জনগণ নিরামিষ আহার অধিকতর পছন্দ করত, তারা পেঁয়াজ ও রসুন ভক্ষণ করত না। তাদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস বিশেষ ছিল না। শুধুমাত্র চণ্ডাল এবং ঝাড়ুদারদের মধ্যে মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণের প্রবণতা ছিল। তবে তারা বাস করত গ্রাম বা নগরের বাইরে।

২.০ পোষাক-পরিচ্ছদ

গোড়ার কথা

প্রস্তরযুগের মানুষ জীবজন্তু শিকার করে তার লোমময় চর্মকে পোষাক বা অঙ্গাচ্ছাদন রূপে ব্যবহার করত। অস্থিনির্মিত সীবনযন্ত্রে তা গ্রথিত হত। সেইজন্য অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন মানুষ প্রথমে প্রাণীচর্ম ও পরে তৃণ বৃক্ষাদির পল্লব বা বল্কল এবং কার্পাস বা অন্যান্য তন্তুকে পরিধেয়ের প্রধান উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশের মানবগোষ্ঠীর পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, পুরুষের প্রধান পরিধেয় ছিল সেলাই না করা বস্ত্রখণ্ড বা ধুতি বা কোথাও সেলাইযুক্ত পরিধেয় 'প্যান্ট' জাতীয় পোষাক। অঞ্চলভেদে ধুতির দৈর্ঘ্য ও পরিধান রীতির তারতম্য দেখা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া বা জলবায়ুর তারতম্য, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানব গোষ্ঠীর পারস্পরিক সংশ্লেষে ও মিলন বহুক্ষেত্রে পোষাক পরিচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার তারতম্য ও বৈচিত্র্য এনেছে।

২.২ আঞ্চলিক তারতম্য

পুরুষের পরিধেয় ধুতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোঁচা-সহ কাছা দিয়ে ধুতি পরলে তা স্বভাবতই দৈর্ঘ্যে অনেক বেশী হওয়া প্রয়োজন, পক্ষান্তরে ধুতিকে লুঙ্গি জাতীয় বস্ত্রখণ্ড রূপে ব্যবহার করলে তার দৈর্ঘ্য হয় অনেক কম। পাঞ্জাবের কোনো কোনো অঞ্চলে 'টম্বা' এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, কেরলে 'বৌষ্টি' বা 'ভেট্টী'র ব্যবহার দেখা যায়। ছোটনাগপুরের ওঁরাও উপজাতি, বস্তার জেলার গোন্ড বা রাজপুতানার ভীল উপজাতির অনেকে স্বল্প পরিসর লম্বা বস্ত্রখণ্ডকে কোমরে ঘুনসীর সাহায্যে আটকিয়ে রাখে। বিভিন্ন রকমের প্যান্ট বাদ দিলে প্রায় তিন রকমের পায়জামা দেখা যায়। খুব ঢিলে পায়জামা, চুড়িদার বা আঁট পায়জামা আর পায়ের কাছে পাড়ের মত সালোয়ার পায়জামা। সাধু-সন্ন্যাসীরা কৌপীন বা গৈরিক আলখাল্লা ব্যবহার করেন।

কোথাও কোথাও জামার উপর চাদর বা 'অঙ্গাবস্ত্রম' ব্যবহার হয়। এই অঙ্গাবস্ত্র জম্মু, কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে 'পজ', 'ফেরান', 'চলা', 'চড়া' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে উত্তরীয় ব্যবহৃত হয়; বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণদের মধ্যে নগ্ন গাত্রে নামাবলী পরিধানের রীতি আছে।

আমাদের দেশের অনেক জায়গায় পুরুষের পাগড়ী, টুপি বা নানারকমের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে থাকেন। আসাম অঞ্চলের উপজাতিগোষ্ঠীর অনেকে বাঁশের বা বেতের টুপিতে রঙিন পাখীর পালক, জীবজন্তুর লোম, নখ বা দাঁত আটকিয়ে নেয়। মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র ও মহীশূরে শিরস্ত্রাণ অত্যন্ত জনপ্রিয়। উত্তর ভারত ও বিহার অঞ্চলে টুপির নানা ধরণ দেখা যায়। নেপালী, ভুটিয়া, লেপচারা পশম বা সূতীর টুপি ব্যবহার করে।

স্ত্রীলোক বা মহিলার পোষাকে আঞ্চলিকতার প্রভাব বেশী করে লক্ষ্য করা যায়। মহিলার পোষাক সাধারণত শাড়ী, সেলাইকরা পায়জামা বা সালোয়ার-কামিজ, ঘাগরা, লহঙ্গা, কাঁচুলি, ব্লাউজ এবং লম্বা এক খণ্ড বা দুইখণ্ড বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাশ্মীর, জম্মু ও হিমাচল প্রদেশে কামিজ-কুর্তা হল লম্বা হাতাওয়ালা ব্লাউজ। কাশ্মীরের হিন্দু মহিলারা ঢিলে কামিজ বা 'ফেরন' পরেন। মেয়েদের অনেকে ঘোমটার মত ওড়না, লুগড়া, তরঙ্গা, কোথাও বা কালপুকা বা গুজ ব্যবহার করেন। অনেকে দোপাট্টা নামক বস্ত্রখণ্ডে মস্তক আবৃত করে থাকেন। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে ছয় হাত থেকে কুড়ি হাত পর্যন্ত লম্বা বস্ত্র কোমরে আটকান থাকে, তা ঘাগরা বা লহঙ্গা নামে পরিচিত।

২.৩ শাস্ত্র নির্দেশিত পোষাক

অথর্ববেদে বলা হয়েছে একজন ব্রহ্মচারীর পোষাক কৃষ্ণসারের চর্ম দ্বারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। সাধারণত ব্রহ্মচারীরা দুই খণ্ড পোষাক পরিধান করতেন্। একখণ্ড শরীরের নিম্নাংশ আচ্ছাদিত করার জন্য, একে 'বাস' নামে অভিহিত করা হত, এবং অপর বস্ত্রখণ্ডটি দেহের উপরিভাগ আবৃত করত, এই বস্ত্রকে বলা হত উত্তরীয়। আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে (৯.৯.৩.৩৯—১.১.৩.১—২) বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণভুক্ত ব্রহ্মচারীগণ যথাক্রমে শণ, অতসী এবং অজিন বা মৃগচর্ম দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রখণ্ড (বাস) পরিধান করবেন। কিছু ধর্মশাস্ত্রকারের অনুশাসন অনুসারে, ব্রাহ্মণধর্মের নিম্নাংশ আচ্ছাদনের জন্য রক্তাভ-পীতবর্ণের সূতীর বস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের জন্য রঞ্জীন বস্ত্র এবং বৈশ্যদের জন্য হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রখণ্ড নির্দিষ্ট হয়েছে। মনুস্মৃতি এবং পরাশরস্মৃতিশাস্ত্রে বৈশ্যদের ক্ষেত্রে 'অজিন' বা মৃগচর্মের পরিবর্তে 'আভীক' বা পশমজাতীয় পোষাক পরিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে (১১.৬৪—৬৭) একজন ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মচারী) পরিধেয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তার নিম্নাংশের পোষাক শুভ্র এবং সম্পূর্ণ নূতন হওয়া উচিত, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পোষাক সম্পর্কে অবশ্য আপস্তম্ভের সঙ্গে মনু ও পরাশর একমত। তাঁরা বলেছেন, সবক্ষেত্রেই নিম্নবস্ত্র প্রস্তুত হওয়া উচিত শন, অতসী বা কুশতৃণ (চীর) বা পার্বত্য ছাগের (কৃতপ) লোম থেকে।

শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মচারী এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্যই নয়, একজন সাধারণ গৃহস্থের পোষাক সম্পর্কেও ধর্মসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি যথেষ্ট সরব। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যেও বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বস্ত্র-বুনন এবং তন্তুজাত বস্ত্রের উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'তন্তু' এবং 'ওতু'-র উল্লেখ আছে, এছাড়া 'বাস' এবং 'বস্ত্র'-এর কথাও বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, বৈদিক যাগযজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ কালে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করার রীতি প্রচলিত ছিল। কাঠক সংহিতা (১৫.১) অনসুারে ক্ষৌমবস্ত্র (linen) নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় ক্রিয়ার পারিশ্রমিক রূপে গণ্য হত। অথর্ববেদে (৮.২.১৬) একজন ব্যক্তির পরিধেয় হিসাবে 'বাসঃ' এবংম 'নীবি' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শরীরের উর্ধ্বভাগের আবরণ বাসঃ এবং নিম্নভাগের বস্ত্র নীবি নামে অভিহিত হত। ঋগ্বেদে সম্ভবত আঙরাখা (ঢিলা কোটবিশেষ) জাতীয় কোনো পোষাক-কে চিহ্নিত করতে অধিবাস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২.৩.৬) লোহিতবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র এবং শুভ্রবর্ণের পশমজাত বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্য পর্যালোচনা করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সেযুগের পোষাক-পরিচ্ছদ হিসাবে সাধারণত ক্ষৌমবস্ত্র বা পশমবস্ত্র ব্যবহার করা হত। রেশম থেকে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহৃত হত অত্যন্ত সমারোহপূর্ণ ভাবগম্ভীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, এ ক্ষেত্রে রক্তবর্ণ অজিণ বা মৃগচর্মও অবশ্য ব্যবহৃত হত। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে সূতীবস্ত্রের প্রচলন ছিল কি না সে ব্যাপারে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে ধর্মশাস্ত্রসমূহ, বিশেষত মনুস্মৃতির তথ্য থেকে এটুকু বলা যেতে পারে, সূত্রসাহিত্যের যুগ শুরু হবার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই সূতীবস্ত্র ব্যবহারের রীতি সমাজে ছিল। আরিয়ান (Arrian) নামক গ্রীক ঐতিহাসিক বলেছেন ভারতীয় পোশাক প্রস্তুত করার জন্য সূতার ব্যবহার হত।

আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, একজন গৃহস্থ সর্বদা দেহের উর্দ্ধাংশে আবরণ ব্যবহার করবে তবে তার পরিবর্তে উপবীত ধারণ করলেও চলবে। গৌতম, আপস্তম্ভ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারদের মতে, একজন স্নাতক বা গৃহস্থের পক্ষে শুভ্র বসন পরিধান করাই বাঞ্ছনীয় এবং তারা যদি বিত্তশালী হন তবে কখনই মলিন পোষাক বা রঙ করা পরিধেয় ব্যবহার করবে না। অপরাপর ব্যক্তির মত বহুমূল্য পরিধেয় ব্যবহার থেকেও তাদের বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (২.৮.২৪) একটি উদ্ধৃতি সন্নিবদ্ধ হয়েছে, যার মর্মার্থ হল, একজন মানুষ রক্তাভ বস্ত্র পরিধানপূর্বক জপ, হোম, দানগ্রহণ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভোগ্যবস্তু উৎসর্গ প্রভৃতি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হলে তা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায় না। সে যুগে সাধারণ মানুষ পরিধেয় বস্ত্র রঙীন করতে নীল ব্যবহার করত বলে জানা যায়। মহাভারতের বক্তব্য অনুসারে, পথ চলা কোনো ব্যক্তির পোষাকের সঙ্গে ভগবদ্ উপাসনাকালে পরিহিত পোষাকের পার্থক্য অবশ্যই থাকা উচিত।

২.৪ প্রাচীন বাংলা ঃ পোষাক-পরিচ্ছদ

সাহিত্যিক উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে অনুমান করা যেতে পারে, প্রাচীন বাংলার নারীপুরুষ একখণ্ড বস্ত্র দেহের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য এবং অপর একখণ্ড বস্ত্র উপরিভাগে ব্যবহার করত যা উত্তরীয় এবং ওড়না নামে অভিহিত হত। প্রাচীন বঙ্গদেশ সুদূর অতীতকাল থেকেই উন্নত মানের বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র রূপে সুখ্যাতি অর্জন করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গে প্রস্তুত শুভ্র ও স্নিগ্ধ কোমল বস্ত্র 'বঙ্গক' নামে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলার উত্তরাংশে (যা পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল) প্রস্তুত কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র 'পৌণ্ড্রক' নামে অভিহিত। উত্তর বাংলায় 'ক্ষৌম' এবং 'পত্রোর্ণ' নামক রেশমজাতীয় বস্ত্র উৎপাদিত হত বলে জানা যায়। কৌটিল্য বাংলাদেশে তৈরী সুতীবস্ত্রেরও উল্লেখ করেছেন, যা 'কার্পাসিক' নামে পরিচিত ছিল।

সম্ভবত 'ক্ষৌম' বস্ত্র ছিল অমসৃণ, কর্কশজাতীয়, তবে পূর্ব ও উত্তর বাংলায় উৎপন্ন দুকুল অত্যন্ত কোমল এবং উৎকৃষ্ট মানের ছিল। খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভের বহুপূর্বেই প্রাচীন বাংলা বস্ত্রশিল্পে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করে। 'পত্রোর্ণ' নামক বস্ত্র সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা কঠিন, সম্ভবত অমসৃণ রেশমজাত একপ্রকার বস্ত্র 'পত্রোর্ণ' নামে অভিহিত হত। টীকাকার অমর বলেছেন, (২.৬.৩.১৪) পত্রোর্ণ হল ধৌত করা শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র। কৌটিল্যের মতে, নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল এবং বটবৃক্ষের পত্র-সঞ্জাত কীটের লালা থেকে এই জাতীয় বস্ত্রের পত্র-সঞ্জাত কীটের লালা থেকে এই জাতীয় বস্ত্রের তন্তু প্রস্তুত করা হত। তাঁর অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় মগধ, পুণ্ড্র এবং সুবর্ণকুড্য এই তিন প্রদেশে উত্তম পত্রোর্ণ উৎপন্ন হত।

শুধুমাত্র প্রাচীনযুগেই নয়, বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প আদিমধ্য এবং মধ্যযুগের তার উৎকর্ষতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের রচিত 'পেরিপ্লুস অফ্ দ্য এরিথ্রিয়ন সী' গ্রন্থে সিন্ধুর মোহনা থেকে গঙ্গা পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের থেকে অত্যুৎকৃষ্ট, উন্নততম, অতীব সুক্ষ্ম মসলিন রপ্তানী হবার তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। আরব লেখকদের

রচনাতেও পরবর্তীকালে বাংলার বস্ত্রশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। আরবীয় নাবিক সুলেমান খৃষ্টীয় নবম শতকে লিখেছেন, বাংলাদেশের রুহ্মি (?) নামক প্রদেশে একজাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হত যা অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। এই বস্ত্র এতই সুক্ষ্ম তন্তু দ্বারা তৈরী যে, একটি আঙটির মধ্য দিয়ে সমগ্র পরিধেয় বস্ত্রটি ঢোকানো ও বার করা যেত। তবে সুলেমানের ঐ তথ্য লোকমুখে শোনা, তিনি এই সূতীবস্ত্রের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে আগত মার্কো পোলোর মতে, সূতীবস্ত্রের বাণিজ্যে বাংলাদেশের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ছিল।

প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অলংকার সম্পর্কে তৎকালীন ভাস্কর্যসমূহ যথেষ্ট আলোকপাত করে। এ প্রসঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ভাস্কার্যাবলীর সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে পুরুষের পরিহিত ধুতি সাধারণত অনেকটা হ্রস্ব বা খাটো হত, যাতে বড়জোর হাঁটু পর্যন্ত আবৃত হত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আরও খাটো ছিল। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধুতি পরিহিত মূর্তি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রূপেই দেখা যায়। ধুতির মধ্যভাগ নাভীর নিম্নভাগ থেকে দেহের নিম্নভাগ আচ্ছাদিত করত। ধুতির প্রথম ও শেষ প্রান্ত একত্রে শরীরের পিছনে কোমরে গোঁজা থাকত। নাভীর নিম্নে কোমরবেষ্টন করে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে একটি, দুটি বা তিনটি বন্ধনীর সাহায্যে ধুতিকে দেহের সঙ্গে আটকিয়ে রাখা হত। কখনও কখনও ধুতির বামপ্রান্ত পশ্চাতে বন্ধনপূর্বক দক্ষিণপ্রান্তটি সামনে কয়েকটি ভাঁজে ঝুলিয়ে রাখারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

পাহাড়পুর ভাস্কর্যশৈলীতে নারীর পরিধেয় পোষাক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত নারীর পোষাক ছিল শাড়ী, শাড়ীর দৈর্ঘ্য স্বাভাবিভাবেই ধুতির থেকে বেশী, যা পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করত। পালযুগের পাহাড়পুর শৈলীতে নারীর পোষাক-পরিচ্ছদ সাবলীল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন বাংলায় পুরুষ ও মহিলাদের পরিধেয় ধুতি ও শাড়ী কখনই দেহের উর্ধ্বভাগ আবৃত করতে ব্যবহৃত হত না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরীয় বা ওড়না দ্বারা দেহের উপরিভাগ আবৃত করা হত। নারীর বরতনু শোভিত হত 'চোলি' বা স্তনপট্টে। এছাড়া, দেহের উপরাংশে নাভীর উপরিভাগ থেকে বাহু পর্যন্ত একপ্রকার অন্তর্বাস ব্যবহার করতেন খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকের মহিলাগণ। শাড়ী, বাল বাহুল্য, নানারকম বৈচিত্র্যময় কারুকার্যে শোভিত হত, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরাও এইরূপ ধুতি ব্যবহার করতেন। দৈনন্দিন জীবনে সম্ভবত উপরিউক্ত পরিচ্ছদগুলিই সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতেন।

জীমূতবাহনের দায়ভাগে সভা-সমিতি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিধেয় পোষাক প্রসঙ্গে কিছু বিশেষ ধরণের পরিচ্ছদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ধারণা করা কঠিন, তথাপি ব্যতিক্রমী কিছু পোশাকের নিদর্শন রয়েছে তৎকালীন ভাস্কর্যে। এই সকল ভাস্কর্যের সাক্ষ্যে নর্তকীদের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পায়জামা জাতীয় আঁটোসাটো পোষাক খোদিত হয়েছে। এদের দেহ বেষ্টন করে শোভা পেত প্রলম্বিত ওড়না। পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রাপ্ত কৃষ্ণের মূর্তি পর্যবেক্ষণ করলে শিশুদের পরিধেয় পোষাক ও অলঙ্কার সম্পর্কে একটি ধারণা করা যেতে পারে। কৃষ্ণের দেহের মধ্যভাগ (বক্ষ থেকে উদর) পর্যন্ত উত্তরীয়ে আবৃত হয়েছে, নিম্নভাগে খাটো ধুতি সুশোভনভাবে পরিহিত।

৩.০ শেষ কথা

ঐতিহাসিক যুগের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই ভারতের সাথে অন্যান্য বহুদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এইসব সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল দৃঢ়মূল ও সুদূরপ্রসারী। অপরাপর দেশগুলি যেমন প্রভাবিত হয়েছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায়, তেমনই ভারতবর্ষেও এসেছিল বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব। এই পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে, উন্নততর হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে, ভারতীয় জনজীবনে, সামাজিক প্রাত্যহিকতার চিরকালীন অনুবর্তনে খাদ্যাভ্যাস এবং পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব নিশ্চিতভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কিছু বলার অবকাশ নেই, কারণ আমাদের হাতে তথ্যভিত্তিক উপাদান এতটাই অপ্রতুল যা দিয়ে প্রাচীন, আদি-মধ্য বা মধ্যযুগের ভারতের খাদ্য-বস্ত্র সম্পর্কীত ধারাবাহিক 'ইতিবৃত্ত' রচনা সম্ভব নয়।

৪.০ অনুশীলনী

১। ঋগ্বেদে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে কি তথ্য পাওয়া যায়?।

২। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্রে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে কি কি অনুশাসন লিপিবদ্ধ হয়েছে?

৩। সংস্কৃত-সাহিত্যে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

৪। প্রাচীন বাংলায় অনুসৃত খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৫। পোষাক-পরিচ্ছদের আঞ্চলিক তারতম্য কি রূপ ছিল?

৬। শাস্ত্র-নির্দেশিত পোষাক সম্পর্কে কি জানেন?

৭। পোষাক-পরিচ্ছদে প্রাচীন বাংলা কতটা সমৃদ্ধ ছিল?

৮। প্রাচীন বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বস্ত্র প্রস্তুত হত? এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে কি বলা হয়েছে বিস্তৃতভাবে লিখুন।

৫.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। সুকুমারী ভট্টাচার্য ঃ বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য, ১৯৯৮

২। পি. ভি. কানে ঃ হিস্ট্রী অফ্ ধর্মশাস্ত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ হিস্ট্রী অফ্ এনশিয়েন্ট বেঙ্গাল, ১৯৭৪

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
২.০ বস্তুবাদী দর্শন ও তার শাখাপ্রশাখা
৩.০ ষড়দর্শন
    ৩.১ সাংখ্য
    ৩.২ যোগ বা পাতঞ্জল
    ৩.৩ ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন
    ৩.৪ মীমাংসা দর্শন
    ৩.৫ বেদান্ত দর্শন
৪.০ বৌদ্ধধর্ম দর্শন
৫.০ জৈনধর্ম দর্শন
৬.০ অনুশীলনী
৭.০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ প্রস্তাবনা

আলোচ্য এককটিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনবিষয়ক তত্ত্ব এবং দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছিল তথ্যের আলোকে যে সকল মতাদর্শের আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রাক্ আদিমধ্য যুগ থেকে মধ্যযুগ এই কালপর্বে উক্ত দর্শনমূলক চিন্তাভাবনা সমূহ মূলত এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

প্রাচীন ভারতে দার্শনিক জ্ঞান অর্জনের ওপর অতীব গুরুত্ব আরোপ করা হত। কৌটিল্য দর্শনশাস্ত্রকে বলেছেন সকল জ্ঞানের দীপবর্তিকা, সকল বিধি-বিধানের স্তম্ভস্বরূপ। উপনিষদসমূহেই আমরা দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার কাঠামোর অভ্যন্তরে দুটি প্রধান ধারা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংঘর্ষের প্রথম লক্ষণসমূহের প্রকাশ। খৃষ্টজন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীগুলিতে যখন বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা সুস্পষ্টরূপে পরিগ্রহ করে, এই সংঘর্ষও তখন বিশেষ স্পষ্ট চেহারা নেয়। বস্তুবাদী দার্শনিক ধারায় (লোকায়ত, চার্বাক ইত্যাদি) বিধৃত হয় তার ধ্যানধারণার সুসজ্জাত ও বিস্তৃত বিশদীকরণ। ওই বিশেষ যুগে

দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বড় বড় সাফল্য অর্জিত হবার ফলে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অর্জিত এক নতুন স্তর এর পথ প্রশস্ত করে দেয়।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে ওই সময়কার ভারতীয় চিন্তাবিদরা ইউরোপীয় ধ্রুপদী দার্শনিকদের মত একই জাতীয় সমস্যাদির উত্থাপনে রত। শুধু তাই নয়, একে অপরের থেকে নিরপেক্ষভাবে ওই সমস্যাদির একই সমাধানেও উপনীত হচ্ছেন।

২.০ বস্তুবাদী দর্শন ও তার শাখা প্রশাখা

ভারত সংস্কৃতির ইতিহাসে বস্তুবাদ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ধারা মূলত সংস্কারকামীর রূপ নিয়ে প্রতিভাত। এমন কি সেই আদিযুগেও এই চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য নিহিত ছিল অন্ধ ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও ধর্মীয় উন্মাদনার জীর্ণ কুসংস্কারের প্রতিরোধক শক্তিরূপে।

লিখিত আকরসূত্র সমূহে বস্তুবাদী দর্শনের কয়েকটি শাখার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল 'লোকায়ত' নামের শাখাটি। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, দর্শনের এই শাখাটির নামের অর্থ 'পার্থিব জগতের সঙ্গে সংযুক্ত' অথবা 'জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত' বা 'জনসাধারণের মধ্যে প্রাপ্তব্য'। বস্তুতপক্ষে, দর্শনের এই শাখাটির চরিত্র ছিল ভাববাদ-বিরোধী। 'লোকায়ত' ধারার উদ্ভবের ফলে বস্তুবাদী ধ্যানধারণার বিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটি স্তর দেখা দিল, যদিও পরবর্তীকালে বস্তুবাদীরা বেশীরভাগই চার্বাক নামে পরিচিত হন, তবে এই পরিভাষাগত পার্থক্য মতবাদের ক্ষেত্রে কোনো মূলগত পার্থক্যের দ্যোতক ছিল না। লোকায়ত চিন্তাধারার উদ্ভবের প্রশ্নটি আজও বিতর্কমূলক। কখনও কখনও এর সম্পর্ক দেখানো হয় স্থানীয় জনসাধারণের আদিম ধ্যানধারণার সঙ্গে। সেক্ষেত্রে লোকায়ত চিন্তাধারার সঙ্গে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের বিরোধের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই চিন্তাধারার কিছু কিছু দিক অনুধাবন করলে এরকম একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও এই দার্শনিক ধারার সামগ্রিক স্বরূপ কিন্তু উন্নত স্তরের দার্শনিক মননের পরিচায়ক এবং এর মৌল প্রস্তাবনাগুলিকে কোনোমতেই আদিম জনগোষ্ঠীর জীবন-বিশ্বাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায় না।

লোকায়ত চিন্তাধারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের মতে, লোকায়ত তিনটি দার্শনিক মতবাদের অন্যতম। লোকায়ত ধারার প্রতিনিধিদের উল্লেখ অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিতে, মহাকাব্যগুলিতে, পতঞ্জলির ব্যকরণে, বাণভট্টের হর্ষচরিতে ও অন্যান্য রচনায় পাওয়া যায়। লোকায়ত চিন্তাধারার অন্তর্গত ধ্যানধারণার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় উপনিষদসমূহে। বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তার অপেক্ষাকৃত বিশদ উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে। এইসব চিন্তাভাবনার প্রবক্তা হলেন ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে স্বীকৃত সর্বপূজিত ঋষিরা।

'ইন্দ্রিয়ানুভূতি' বা প্রত্যক্ষ-ই 'জগৎ' বা প্রমাণ সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান আহরণের একমাত্র উৎস—এই তত্ত্বই লোকায়ত দর্শনের ভিত্তি। এই দর্শন অনুযায়ী কর্তৃস্থানীয় পন্ডিতদের দৃঢ়ব্যক্ত মতামত, তাঁদের প্রচারিত দৈব প্রত্যাদেশ কিংবা ধর্মশাস্ত্র এসব কিছুই প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়ে আহৃত ধারণাকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ নয়। লোকায়ত চিন্তাধারার অনুসারীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিরস্থায়ী বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন মৌল উপাদানে গঠিত সকল বস্তুতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটছে তা নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা বিধান। লোকায়ত ও চার্বাক পন্থীরা মানুষের চারপাশে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে স্বার্থপরের মনোভঙ্গিকে কখনও সমর্থন করে নি।

বস্তুবাদী চিন্তাধারার ঐতিহ্য ভারতে প্রবহমান ছিল দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে। ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ধারার প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষিত হয়। এই বস্তুবাদী চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ, বক্তব্যসমূহের গভীরতা শুধু যে ইউরোপীয় ধ্রুপদী দার্শনিকদের অর্জিত কীর্তির সমকক্ষ ছিল তা-ই নয়, প্রায়ই তা সে কীর্তিকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

৩.০ ষড়দর্শন

হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত দর্শনশাস্ত্রকে কাল-প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে বিভাজিত করা হয় ছয়টি দর্শনে বা দার্শনিক ধারায়। এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে ঐক্যসূত্র হল এগুলির অন্তঃস্থিত কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা দ্বারা হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদের সংযুক্তিও নিরূপিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রধান হল, ছয়টি দার্শনিক ধারাই স্বীকার করে নিয়েছে বেদ সমূহের প্রতি ও কর্মযোগের বিধিবিধানের প্রতি তাদের আনুগত্য, এবং আস্থা জানিয়েছে মানব অস্তিত্বের পরম লক্ষ্য হিসেবে চরম মোক্ষলাভে। দর্শনের আলোচ্য ছয়টি শাখা হল—সাংখ্য, যোগ বা পাতঞ্জল, ন্যায় এবং বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত।

৩.১ সাংখ্য

সাংখ্য-দর্শনের উৎপত্তি ও তার প্রকৃতি নিরূপণ এক জটিল ব্যাপার। অত্যন্ত প্রাচীন যুগেই সাংখ্যের উদ্ভব ঘটে। কৌটিল্য উল্লিখিত ত্রিদর্শনের অন্যতম হল সাংখ্য। বদরায়ন রচিত ব্রহ্মসূত্রে (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত) সাংখ্যের কিছু কিছু দার্শনিক ধ্যানধারণাকে আক্রমণ করা হয়েছে। মৌর্য যুগেই সম্ভবত সাংখ্য দর্শন এক স্বনির্ভর দার্শনিক ধারায় পরিণত হয়েছিল।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী, সাংখ্য-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয় ঋষি কপিলকে। তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে-কপিল ঋষির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইনিই সেই কপিল কি না তা নির্ণয় করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে রচিত ঈশ্বরকৃষ্ণের একটি পুঁথিতে সাংখ্য-দর্শনের আদিরূপের পুনর্নির্মাণ সাধিত হয়েছে। সাংখ্যের আদি রূপের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। এ ব্যাপারে একমাত্র পথ-দিশারী হল বদরায়ণে ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা সাংখ্য-দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন তাকে 'প্রধান করণবাদ' অথবা 'অচেতন করণবাদ' আখ্যা দিয়ে। তবে সাংখ্য দর্শনকে বদরায়ন বেদান্তের প্রধান প্রতিপক্ষ বলে মনে

করেছেন। সম্ভবত তৎকালীন সমাজে এই দর্শনের প্রভাব এবং তাঁর নিজের দার্শনিক বিশ্বাসের সঙ্গে এর মতাদর্শগত বৈসাদৃশ্যই ছিল এর কারণ। এ ব্যাপারে শঙ্করাচার্যও তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের যে সমস্ত অধ্যায়ে সাংখ্য-দর্শন নিয়ে আলোচনা আছে সেই অধ্যায়গুলি সম্পর্কে শঙ্কর-রচিত বিশদ টীকা ভাষ্যে তিনিও জোর দিয়ে বলেছেন যে বৈদান্তিকের পক্ষে এই বিশেষ দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে জয়লাভ অপর সকল বিরোধী মতের বিরুদ্ধে জয়লাভের সামিল।

সাংখ্য-দর্শনের প্রধান তাত্ত্বিক ভিত্তিটি হল এই যে, বিশ্বের আদি বস্তু-নিদান প্রকৃতি বা প্রধান -অনাদিকাল থেকে বিরাজিত এবং নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া অপর কোনো বাহ্য কারণে তা প্রভাবিত হয় না। সাংখ্যের পুঁথিতে মূল-প্রকৃতি বা আদি প্রকৃতি 'প্রকৃতি' শব্দের তুল্যমূল্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অস্তিত্বের সকল রূপই আদি উৎস সৃষ্ট বলে প্রকৃতির বিশ্বজনীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রকৃতিকে পাওয়া যায় দুই রূপে-ব্যক্ত (স্বপ্রকাশ) ও অব্যক্ত (অপ্রকাশ)। উপনিষদসমূহ থেকে এই ধারণা দুটি গৃহীত হলেও সাংখ্যে তা ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সাংখ্য-দর্শনের সমর্থকগণ কার্য-কারণ সম্পর্কিত যে তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করেছেন তা হেতুবাদ নামেও পরিচিত। এই তত্ত্বকে সৎকার্যবাদ (কারণের মধ্যে) কার্যের উপস্থিতি ও সে কারণে কার্যের উদ্ভব সম্পর্কিত তত্ত্ব) আখ্যায় ভূষিত করা হয়। উপরিউক্ত দার্শনিকগণের মতে, কার্য যদি কারণের মধ্যে উপ্ত না থাকে, তাহলে বলতে হয় শূণ্য থেকেই উদ্ভব ঘটে তার, অর্থাৎ তাহলে প্রতিটি নতুন ঘটনার সংঘটনের জন্যে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির হস্তক্ষেপের দরকার করে। বস্তুত, কোনো বিশেষ কার্য একমাত্র সুনির্দিষ্ট কোনো প্রাথমিক কারণ থেকেই উদ্ভূত হতে সমর্থ। অবশ্য কারণের মধ্যে কার্যের উপস্থিতির নিছক, সরল স্বীকৃতির অর্থ হল বিশ্বজগৎ কে পরিবর্তনসাধনে অসমর্থ, অনড় ও জড় অবস্থাপ্রাপ্ত বলে মনে করা।

সাংখ্য-দর্শনের অপর একটি ভিত্তিপ্রস্তর হল তার বিবর্তনের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বস্তুপদার্থ হল এমন কিছু, আদিতে যার অস্তিত্ব ছিল এক সংহত অব্যক্ত রূপে। আমাদের ইন্দ্রিয়সত্ত্বার জগতে এই অব্যক্ত রূপের প্রতিফলন ঘটে তিনটি গুণ বা প্রকৃতির সাহায্যে, এগুলি হল তমস্ (অন্ধকার), রজস্ (প্রচণ্ড আবেগ বা ভোগ), এবং 'সত্ত্ব' (অন্তঃসার, সত্য)। সাংখ্যদর্শনে এই তিনটি গুণ মূলত নতুন তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়েছে।

সাংখ্য-দর্শন ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও নানাধরণের ধর্মীয় আন্দোলন উভয়ের ওপরই বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। এর মূল প্রতিপাদ্য হল, যে-কোনো রূপেই হোক না কেন পরব্রহ্মের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করা এবং নরত্ব আরোপিত দেবতার ব্যক্তিস্বরূপের ধারণাটিকে বর্জন করা।

৩.২ যোগ বা পাতঞ্জল

দর্শনসমূহের মধ্যে যোগ বা পাতঞ্জল দর্শনের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট। ধ্রুপদী যোগ-দর্শনের সূত্রপাত বলে ধরা হয় ঋষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' নামের পুঁথিটিকে। এই পুঁথিটিতে যোগ-দর্শনের সবকটি মূল প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বগুলিকে আরও বিকশিত ও পরিণত করে তোলা

হয়েছে বহু রচনায়। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'যোগসূত্র' সম্বন্ধে ব্যাসের ব্যাখ্যা সমন্বিত 'ব্যাসভাষ্য' (খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) এবং বাচস্পতির 'তত্ত্ববৈশারদী' (খৃষ্টীয় নবম শতক) গ্রন্থ দুটি। এই গ্রন্থদ্বয়ে যোগ-দর্শনের পারিভাষিক শব্দাবলীর বিশদ টীকা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং পতঞ্জলির যোগসূত্রের কিছু কিছু অংশ অনুধাবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে।

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে সাংখ্য এবং যোগ-দর্শনের ধারা দুটিকে পরস্পর পরিপূরক দুই ধারা রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। বস্তুত, সাংখ্য-দর্শনের বহু ধ্যানধারণাই যোগদর্শনে গৃহীত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক মৌল ধারণাগুলির ব্যাখ্যাকেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে যোগ-দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে গণ্য করা হয়। পতঞ্জলির মতে, চিত্ত অর্থাৎ মন হল এক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপার, যদিও এ বস্তু ব্যক্তিবিশেষের সুনির্দিষ্ট অবস্থার সরল প্রতিরূপ উৎপাদন ছাড়া আরও বেশী কিছু প্রকাশ করে। বাস্তবে প্রকাশিত মানসিক অবস্থাগুলিকে বলা হয়েছে নানাবিধ 'ক্লেশ' বা কষ্ট, ধরে নেওয়া হয়েছে যে চিত্তের আদি ও অনির্দেশ্য অস্তিত্বের অবস্থা এই সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত অবস্থা।

পতঞ্জলি পাঁচরকম ক্লেশের কথা বলেছেন। তাঁর এই তালিকার প্রকৃতি ও ক্লেশের বিন্যাসের ক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায় তালিকাটির শুরু হচ্ছে 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞতা দিয়ে। এক্ষেত্রে উপনিষদসমূহের অন্তর্গত ভাববাদী ধারার মূল নীতিটিকে আরোপ করা হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় ক্লেশটি হল অস্মিতা, অহংবোধের সঙ্গে মানুষের দেহ ও তার ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক ধরণধারণের সমীকরণ এটি। এখানেও উপনিষদের প্রভাব লক্ষণীয়। তৃতীয় ক্লেশ রাগ হল দৈহিক সুখ, আনন্দসম্ভোগ ও জীবনে সাফল্যলাভের বাসনা। এই তালিকার সর্বশেষে আছে অভিনিবেশ।

পতঞ্জলির গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বও কয়েকটি মৌল-ধারণার কারণে বিশিষ্ট। পতঞ্জলি ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার ছিল ধর্মে মতি আছে এমন ব্যক্তিবিশেষকে মনস্তাত্ত্বিক শৃংখলা অর্জনের নিয়মবিধি অর্থাৎ যোগের তথাকথিত 'অষ্টমার্গ' শিক্ষা দেওয়া। এই সমস্ত উন্নতির সোপানে আরোহণ আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে নানা কলাকৌশলের বর্ণনা যোগদর্শনের সকল পুঁথির অধিকাংশ অধিকার করে রেখেছে।

যোগের দার্শনিক মতাদর্শের পরিণতি ঘটেছে জগতের ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী 'পরম সত্তা'র বা ঈশ্বরের বর্ণনায়। ঈশ্বর সকল পূর্ণতার অধিকারী এবং ভক্তকে 'চরম লক্ষ্য'—অর্জনে সাহায্য করে থাকেন তিনি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল পতঞ্জলির নিজের রচনায় ঈশ্বরের উল্লেখ আছে যৎসামান্যই। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থক প্রথম যুগের যোগ-দর্শনে কার্যত ব্যক্তিত্ব আরোপিত দেবতার ক্রিয়াকলাপ বর্ণনার বিশেষ স্থান সংকুলান হয় নি।

মোটের ওপর, এই মৌল দার্শনিক ধারার পর্যালোচনা প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রবণতার মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল বিকাশটি অপেক্ষাকৃত কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে।

৩.৩ ন্যায় এবং বৈশেষিক-দর্শন

এই দুটি দার্শনিক ধারার উদ্ভব ঘটে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এবং গুপ্ত যুগ নাগাদ সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে ন্যায় ও বৈশেষিক মতবাদদ্বয়। এই ধারা দুটি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। দুটি ধারাই ছিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যার অভিমুখী, যদিও ন্যায়দর্শন বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিল আধ্যাত্মিক জ্ঞানতত্ত্বের সমস্যাদির দিকে এবং তার মূল উদ্দেশ্য ছিল অবধারণার মাধ্যমে হিসেবে যুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটানো। পরবর্তী যুগে সেজন্য ন্যায় শব্দটি যুক্তি বা তর্কবিদ্যা রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় ধারাটি শরীরী সত্তা এবং যে-অন্তঃসারগুলির সমবায়ে সত্তা গঠিত সে সম্পর্কিত তত্ত্বগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। এই দুটি ধারার দার্শনিকগণ কখনও পরস্পরের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নি; বরং নৈয়ায়িকরা বৈশেষিক ধারার অধিবিদ্যাকে মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করতেন অধিবিদ্যা হল তাঁদের নিজেদের জ্ঞাননত্ত্বেরই স্বাভাবিক সম্প্রসারণের ফল।

বৈশেষিক দর্শনশাস্ত্রীরা গোড়ার যুগে যে-দার্শনিক চিন্তা প্রচার করেন তা ছিল ভারতের যুক্তিবাদী চিন্তা-ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য এক অংশ। তবে লোকায়ত-দর্শনের থেকে এ দর্শনের পার্থক্য হল পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনের মতবাদ ভাববাদ ও আস্তিক্যবাদের কাছে অনেকগুলি বিশেষীকৃত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নতিস্বীকার করে।

'বৈশেষিক' শব্দটি সংস্কৃত 'বিশেষ' (নির্দিষ্টরূপে স্বতন্ত্র) শব্দ থেকে উৎপন্ন। এই মতাদর্শের মূল কথা হল যা সাধারণ ও যা বিশেষ তাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয়। এই মতের অনুসারীগণ সাধারণ ও সুনির্দিষ্টকে সত্তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে এক অখণ্ড ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান হিসেবে দেখেছেন। আবার সেইসঙ্গে বিশেষকে বুঝেছেন তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনোকিছু রূপে আর সাধারণকে দেখেছেন মানুষের যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে প্রণালীবদ্ধ প্রথমোক্ত ওই বিশেষ সম্পর্কীত বহুবিধ তথ্যাদির যোগফল হিসাবে। এ ব্যাপারে বৈশেষিক-দর্শন যে সমস্ত সমাধান লিপিবদ্ধ করেছেন তা যে সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক বিচারে অকাট্য তা নয়।

বৈশেষিক-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কণাদ (খৃষ্টীয় শতকের সূচনার কোনো এক সময়)-এর মতে বস্তুবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এমন সমস্ত পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে পরমাণুগুলি কারোর সৃষ্টি করা নয়, যেগুলি চিরন্তন এবং অবিনশ্বর। এই কেন্দ্রিয় তত্ত্বটির অস্তিত্ব বৈশেষিক-দর্শনকে আস্তিক্যবাদী দর্শন হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব করে তুলেছে। পরবর্তী যুগে অবশ্য কণাদের রচনাবলীর ভাষ্যকাররা চেষ্টা করেছেন সে রচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে নিয়মিতভাবে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলিকে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ-বিষয়ক ঘটনারূপে প্রতিভাত করতে। কণাদ পরমাণুসমূহকে চারটি মূল উপাদানের গুণ বিশিষ্ট চারটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন কীভাবে বহুবিচিত্র ধরণে পরমাণুসমূহ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সকল প্রকার জড় পদার্থ ও জীবন্তপ্রাণীর জন্ম দেয়। কণাদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, তা ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং তারপর তা ধ্বংস হয়ে যায় বিশ্বজননী প্রলয়ে, অতঃপর এই

প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয় প্রথম থেকে। তাঁর মতে, বিশ্বজননী প্রলয়ের মুহূর্তে পরমাণুসমূহ বিলুপ্ত হয় না, ওই মুহূর্তে যা ঘটে তা হল পরমাণুসমূহের মধ্যেকার সেই পারস্পরিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় যে যোগসূত্রে মানুষের বোধগম্য ঘটনাবলীর উদ্ভব ঘটে। তদুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুনর্জন্ম সংঘটিত হয় পরমাণুসমূহের উপর্যুপরি সংযোগসাধনের ফলে এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে লৌকিক।

কণাদ-প্রচারিত, মতবাদের অন্যতম প্রধান একটি তত্ত্ব হল 'বস্তুপদার্থ' সম্পর্কিত। প্রাচীন, আদিমধ্য এবং মধ্যযুগে এই অভিনব দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দ্রব্য হল অন্য সবকিছু-নিরপেক্ষ এক বিষয়মুখ বস্তু, যা অন্যান্য দ্রব্য ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল এবং যা অবিনাশী। প্রথমদিকে বৈশেষিক দর্শন-বিষয়ক রচনাবলীতে বিশ্বজননী আত্মা বা পরমাত্মার ধারণাটি উপেক্ষিত হয়েছে। সেখানে স্বীকৃতি পেয়েছে কেবলমাত্র 'ব্যক্তিগত আত্মিক বস্তু' বা আত্মা। পরবর্তী যুগের বৈশেষিক রচনাসম্ভারে অবশ্য বেদান্ত দর্শন থেকে গৃহীত পরমাত্মার ধারণাটি সমগ্রভাবে এই দর্শনের অঙ্গীভূত হয়েছে। ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে এই দুটি দার্শনিক ধারার তাৎপর্য প্রধানত নিহিত যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়দুটির ওপর বিরল মাত্রায় গুরুত্ব আরোপে। ঋষি গৌতমের ন্যায়সূত্রে যুক্তিবিদ্যার নানা মৌল ধারণার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ একটি ক্ষেত্র হিসেবে যুক্তিবিদ্যার সৃষ্টি ও তার বিশদীকরণের ব্যাপারে ভারতীয় ন্যায়দর্শনের অবদান অপরিসীম। সমগ্রভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রভাব যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ফলপ্রসূ। ন্যায় দর্শনের বিশিষ্ট সাফল্যসমূহ ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের গোড়ায় দিঙনাগ ও ধর্মকীর্তির মতো সুবিখ্যাত নৈয়ায়িকদের নিজস্ব মতবাদ বিকাশের পক্ষে ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

কণাদের পরমাণু-তত্ত্বের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য দেখা যায় গ্রীকদের, বিশেষত এমপিডোক্লিসের প্রচারিত পরমাণু তত্ত্বের। এমপিডোক্লিস কণাদের মত চারটি 'মৌল' পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বৈশেষিক দর্শন ও ডিমোক্রিটসের দর্শনের মধ্যেও কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ডিমোক্রিটসও বস্তুপদার্থের নানাবিধ প্রক্রিয়াকে অদৃশ্য কণা বা পরমাণুসমূহের গতি ও পরস্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল বলে গণ্য করেছেন। বৈশেষিক দর্শন ও গ্রীক বস্তুবাদী দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির মতবাদের মধ্যে এই সাদৃশ্যটি বিপুল তাৎপর্য বহন করে। অবশ্য এই সাদৃশ্য গ্রীক সংস্কৃতির ওপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে কি না তা বলা দুরূহ তবে এটুকু বলা যেতে পারে সে যুগে দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতার অন্তর্গত দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে এক ধরণের সমান্তরাল ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল।

৩.৪ মীমাংসা-দর্শন

মীমাংসা-দর্শন আগাগোড়াই বেদসমূহকে প্রামাণ্য হিসাবে উল্লেখ করেছে। এই দার্শনিক শাখা রক্ষণশীল হিন্দু ঈশ্বরতত্ত্বের থেকেও প্রবলতরভাবে কোনো আপসমূলক সমাধানের পথ অন্বেষণে অনীহা জানিয়েছে। বেদসমূহের মূল পাঠ বা সংহিতাগুলিকে এই দর্শন গ্রহণ করেছে যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তি

হিসাবে। অপরাপর বহু ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক ধারার মতো মীমাংসা দর্শনও গভীরভাবে ব্যবহারিক, তবে প্রয়োগ বিধিটি একটু অন্যরূপ। এই দর্শনের কেন্দ্রিয় আলোচ্যবস্তু হচ্ছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নীতি ও ধরণধারণ এবং পূজার্চনার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কিত। তবে এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির বিশদীকরণের ব্যাপারে মীমাংসা দর্শনের বক্তব্য বৈদিক ঐতিহ্যের খাঁটি মর্মবাণীটি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যেমন বেদসমূহে বলা হয়েছে বলিদান নিবেদিত হবে দেবতার উদ্দেশ্যে, অথচ মীমাংসা-দর্শনের মতে বলিদান গ্রহণেই দেবতার অস্তিত্ব নিহিত। দেবতারা এখানে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও মানবজীবনের চলাচলে হস্তক্ষেপকারী প্রকৃতির বহুতর অধীশ্বর নন, তাঁরা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ছকে এক অপরিহার্য যোগসূত্র।

মীমাংসা-দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা। মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত জৈমিনি 'স্বচ্ছ জ্ঞান' বা প্রমাণের দুটি উৎসের উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে ন্যায় দর্শন যেখানে বস্তুসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বা অনুরূপতা বিচারের প্রশ্নে যুক্তিবিদ্যার অবরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন, সেখানে মীমাংসা-দর্শনের অস্ত্র হল যুক্তিবিদ্যার আরোহী পদ্ধতি। মতাদর্শের বিচারে রক্ষণশীল মীমাংসাদর্শন এবং ন্যায়দর্শন এক এবং অভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে বিচারের সময় পরস্পরের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়ার এই মজ্জাগত অভ্যাস অন্যান্য দার্শনিক মতাদর্শাবলম্বীদের মত মীমাংসা দর্শনেও প্রকট।

মীমাংসা ধারার দার্শনিকগণ প্রস্তাবনা বা স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির ধারণাটির প্রবর্তন করেছেন। এই ধারণাটির তাৎপর্য হল, যদি কোনো ঘটনা বা অন্য কোনো ব্যাপার আমাদের কাছে অকারণ বলে মনে হয় তাহলে আমরা ব্যাপারটির পরোক্ষ একটি ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হই এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত যথার্থ কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হই। ফলে ভারতীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই প্রথম অবধারণা অর্জনের প্রক্রিয়ার অনুমানভিত্তিক প্রকল্পের ধারণাটি দানা বাঁধে।

প্রসঙ্গত এটিও লক্ষণীয় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মীমাংসা দর্শনের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তববাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত। এই দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়মুখ অস্তিত্ব এবং তার অবধারণযোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহপোষণ করা হয় নি, যদিও জৈমিনি শুধু বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধেই নয়, সাংখ্য দর্শনের বিরুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে লেখনী ধরেছিলেন।

মীমাংসা-দর্শনের অঙ্গীভূত আলোচ্য বাস্তববাদ বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য এই কারণে যে এই দার্শনিক ধারাটি অন্যান্য দার্শনিক ধারা থেকে ভিন্নতর এবং বেদ সমূহের পূজা অনুষ্ঠানের নীতি ও রীতির নিঃশর্ত অনুগামী। সেই কারণে এখানে উল্লেখ্য যে, ঐতিহ্যসিদ্ধ ধ্যানধারণাগুলির সত্যতা যাচাই করার এবং সেগুলিকে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের অধীন করার যে প্রয়াস তৎকালীন যুগে এক সাধারণ প্রবণতাস্বরূপ ছিল তা এমন কি মীমাংসা দর্শনের মতো ঘোর রক্ষণশীল একটি মতাদর্শকেও প্রভাবিত না করে পারে নি।

৩.৫ বেদান্ত দর্শন

ভারতীয় ষড়দর্শনের ঐতিহ্যসিদ্ধ তালিকার শেষে সর্বদাই স্থান পেয়ে এসেছে 'মীমাংসা' ও 'বেদান্ত' নামের দার্শনিক ধারা দুটি। এই ধারাদুটি এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত যে কখনও কখনও বেদান্তকে আখ্যাত করা হয়েছে 'উত্তর মীমাংসা' নামে আর 'মীমাংসা' দর্শনকে বলা হয়েছে পূর্ব বা আদি মীমাংসা। মূলত এই দুই দার্শনিক মতবাদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ নানা পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তাদের মৌলনীতি সমূহ ও সাধারণ মর্মবাণী উভয়ক্ষেত্রেই অভিন্ন। এই দুটির মতাদর্শের মধ্যে প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল কোনটির তা নিরূপণ করা অসম্ভব, সম্ভবত এই দুটি ধারার সংমিশ্রণে একটি অখণ্ড দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হয় মধ্যযুগের শেষার্ধে।

মধ্যযুগে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল ঠিকই তবে এর উদ্ভবের ইতিহাস কিন্তু বহু প্রাচীন। ঋষি বদরায়নের রচনা বলে কথিত প্রথম বিশুদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। বৈদান্তিকরা অবশ্য প্রমাণ করতে চান যে তাঁদের এই দার্শনিক মতাদর্শটির সূচনা উপনিষদসমূহ থেকে, উপনিষদের পুঁথিগুলিকেই তাঁদের সকল দার্শনিক রচনার আদি উৎস বলে তাঁরা মনে করেন। এই বক্তব্য অবশ্যই উদ্দেশ্যপূর্ণ। বদরায়ন তাঁর গ্রন্থে বেদান্ত-দর্শনের মূল নীতিগুলি বিবৃত করেছেন, যদিও তা প্রকাশ করেছেন প্রধানত নেতিবাচক উক্তির সাহায্যে। যেমন তিনি বলেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনোমতেই বস্তু পদার্থের শক্তিসমূহ থেকে উদ্ভূত হয় নি, একমাত্র বাস্তব সত্য হল 'ব্রহ্মন্' এবং যা কিছু বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন তা বহুবিচিত্র রূপে এই ব্রহ্মন্ থেকেই উদ্ভূত।

বদরায়নের অসম্ভব সংক্ষিপ্ত, সূত্রাকার রচনা স্বভাবতই দেশে ভাষ্য-রচনার ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটায়। মধ্যযুগের একেবারে সূচনায় গৌড়পাদ এই দার্শনিক মতবাদের প্রথম যে ভাষ্যখানি লেখেন তা আজও বিদ্যমান। পরবর্তীকলে বেদান্ত-দর্শনের এই ধারাটি ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকের নামানুসারে বিভিন্ন উপধারার রূপ নেয়। এই উপধারাগুলি শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, বল্লভ ও নিম্বার্কের নামাঙ্কিত। এই দর্শনশাস্ত্রীদের প্রত্যেকেই তাঁদের মূলগ্রন্থ রচনা করেন বদরায়নের ব্রহ্মসূত্রের নিজস্ব ভাষ্যের আকারে। তবে এগুলির মধ্যে মাত্র দুইটি—শঙ্কর ও রামানুজের রচিত ভাষ্যদ্বয় পরে বেদান্ত দর্শনের বিকাশে কার্যত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয়।

শঙ্কর (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) ও রামানুজের (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী) বহুসংখ্যক দার্শনিক রচনা বেদান্তের মতবাদকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। শঙ্করের মতবাদ অনুসারে পরব্রহ্ম থেকে জাত এই বিশ্বসংসার মায়া বা ইন্দ্রজালমাত্র। বস্তুভিত্তিক প্রকৃতি প্রয়োগিক 'অহম্' এর মতই অবাস্তব। কেবলমাত্র আত্মন পরম বা ব্রহ্মনের যেন বা অভিক্ষেপ হিসেবেই কাল্পনিক মানসিকতার সমষ্টিকে প্রভাবিত করে, একেই প্রতিদিনের ভাষায় বলা হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব। বেদান্তধারার অন্তর্গত দুই প্রধান প্রবণতার মধ্যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিতর্কের বিষয় হয়েছিল কার্যত ধর্মীয় আচার-আচরণ ও অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি। শঙ্করাচার্য কেবলমাত্র 'জ্ঞানমার্গ' কেই (অর্থাৎ ব্রহ্মনের বিশ্বজনীন ও সর্বব্যাপী বাস্তবতার পটভূমিতে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার

মায়াময় বা অলীক প্রকৃতি সম্পর্কে চেতনাকেই) সঠিক ও সত্য বলে মনে করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে 'অহম' ও 'আত্মন্-ব্রহ্মণ্' সম্পূর্ণ এক এবং অভিন্ন। অপরপক্ষে 'ধর্মীয় প্রেমমার্গ'-এর প্রবক্তা রামানুজ ব্যক্তিসত্ত্বার দেবসত্ত্বার সঙ্গে একাত্মতাসাধনকেই পরম লক্ষ্য হিসাবে দেখেছেন, তবে তাঁর প্রার্থিত এই একাত্মতা সাধনের ফলে ভক্ত তার উপাস্য দেবতার সংস্পর্শে এলেও দেবতার সমকক্ষ হয়ে ওঠে না।

শঙ্কর প্রচার করলেন এক সর্বব্যাপী ভাববাদী অদ্বৈতবাদ এবং বহির্বিশ্বের বহুবিচিত্র ব্যাপারসমূহকে 'মহাজাগতিক পরম' বা ব্রহ্মণের আত্মপ্রকাশ রূপে ব্যাখ্যা করলেন। ক্রমে শঙ্করের দার্শনিক মত সমগ্রভাবে বেদান্তের মত বলেই পরিচিত হল। রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম এই দর্শনশাস্ত্রীর মতবাদকে গ্রহণ করে নিল নিজস্ব আনুষ্ঠানিক মতাদর্শ হিসেবে।

যদিও বিশেষ একটি যুগে এই বেদান্ত দর্শন প্রধান একটি দার্শনিক ধারা হিসেবে দেখা দিয়েছিল তবু ঐতিহ্যসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে এটি যে অন্যতম একটি ধারামাত্র এই সত্যটি কিন্তু বিলুপ্ত হল না। বস্তুত, ওই একই সময়ে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর অপরাপর নানা দার্শনিক ধারা নতুন-নতুন ভাবধারার প্রচারে নিরত ছিল। ফলত বেদান্ত-দর্শনের প্রাধান্য অব্যাহত থাকলেও অন্যান্য চিন্তাধারার বিশেষত বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনের ব্যাপক প্রভাব জনসমাজে অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

৪.০ বৌদ্ধধর্ম-দর্শন

বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাসের একেবারে আদিকাল থেকেই ওই ধর্মের অনুসারকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নানা চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। মৌর্য-যুগ নাগাদ উদ্ভব ঘটে দুটি প্রধান ধারার--স্থবিরবাদিন এবং মহাসাঙ্ঘিক অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদার নিয়মকানুন প্রচলনের পক্ষপাতী। এই শেষোক্ত চিন্তাধারাই ছিল মহাযান (মহৎ বাহন বা পথ) ধর্মমতের ভিত্তি। এই মতের অনুসারীরা তখন থেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতে শুরু করেন হীনযান (লঘু বাহন বা পথ) ধর্মমত থেকে।

খৃষ্টজন্মের পরবর্তী প্রথম কয়েক শতক ধরে মহাযান দর্শনের ধারা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত ছিল 'মাধ্যমিক' এবং 'যোগাচার নামের মতবাদ দুটি। অসামান্য পান্ডিত্যসম্পন্ন দুই দর্শনশাস্ত্রী নাগার্জুন ও আর্যদেবকে (উভয়েই সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মানুষ) প্রথমোক্ত মাধ্যমিক ধারার প্রবক্তা মনে করা যেতে পারে। তবে মহাযান ধর্মমত সংক্রান্ত পুঁথি এই দুই দার্শনিকের আমলেও প্রচলিত ছিল এবং নাগার্জুন তাঁর গ্রন্থে সেইসব পুঁথির কথা উল্লেখও করেছেন।

মাধ্যমিক দর্শনের মূল ভিত্তি হল 'শূন্যতার' তত্ত্ব এবং এই কারণে এই চিন্তাধারাটিকে প্রায়শই চিহ্নিত করা হয়েছে 'শূন্যবাদ' আখ্যায়। নাগার্জুনের মতে, নিখিল বিশ্বে ঐহিক বা আত্মিক যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তা-ই অবাস্তব। আবার সেই সঙ্গে তাঁর মতে শূন্য হল অনস্তিত্বের অভাব, দ্বৈতভাবের সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অতএব শূণ্য নেতিবাচক নয়, অস্ত্যর্থক তাৎপর্যের দ্যোতক। এ থেকে মাধ্যমিকপন্থীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে নির্বাণ এবং সংসার দুই পরস্পরবিরোধী ব্যাপার নয়। তাঁদের শিক্ষা অনুযায়ী সবকটি পারমিতার চর্চার ফলে এবং নৈতিক শুদ্ধতার চরম স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে প্রভেদ

লুপ্ত হয়ে যায়। ভেদ-লুপ্ত হয় নির্বাণ ও জগৎ সংসার, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে। বুদ্ধের শিক্ষা ও তাঁর ধর্মকে মাধ্যমিক পন্থীরা বললেন শূণ্য'। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার হল নাগার্জুনের এই মতবাদ মহাযান দর্শনচর্চার বিকাশের ক্ষেত্রে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের সূচনায় ভারতের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

অপরদিকে, আসঙ্গ ও বসুবন্ধু—এই দুই দর্শনশাস্ত্রীকে বলা হয় 'যোগাচার' ধারার প্রতিষ্ঠাতা। এদের আবির্ভাবকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতক। এই দার্শনিকধারার অনুসারীরা কেবলমাত্র মানুষের চেতনা বা মনকেই বাস্তব বলে মনে করতেন এবং গোটা ঐহিক জগৎ কে বলতেন 'অবাস্তব মায়ামাত্র'। এর ফলে যোগাচারীরা তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন মানুষের চেতনা ও মানুষের ধ্যানে মনোনিয়োগের শক্তিকে নিখুঁত করে তোলার পদ্ধতিগুলির দিকে।

মহাযানের মাধ্যমিক ধারাটি এশিয়ার বহু দেশে এবং বিশেষ করে দূর প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সে সব দেশে স্থানীয় ধর্মমতগুলির সঙ্গে এটি সহজে মিশে গিয়েছিল।

৫.০ জৈন ধর্মদর্শন

জিন-প্রচারিত ধর্মশিক্ষার অন্তঃসারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গোড়ার দিককার জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে। এইসব গ্রন্থে মানুষের বিশ্ববোধের ভিত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে লভ্য জগৎ সম্বন্ধে মানুষের তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে। জৈন দর্শনে বস্তুজগৎ ও আত্মিক জগৎকে দুই বিরুদ্ধ শক্তি রূপে উপস্থাপিত করা হয় নি; বলা হয়েছে মানুষের অনুভব ও চিন্তার ক্ষমতা ঠিক সেই রকমই জীবনের এক স্বাভাবিক লক্ষণ, যে-লক্ষণ অনুক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে মানুষের চারপাশের প্রকৃতি জগতে। প্রাথমিক ভাবে এই নীতিসূত্রটিকে আংশিকভাবে বস্তুবাদী চিন্তার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ বলে মনে হতে পারে, তবে তা শুধুমাত্র আপাতদৃষ্টিতে, কেন না জৈনধর্ম আলোচ্য এই নীতিসূত্রের মধ্যে যে কোনোদিকে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অবকাশ রেখে সুশৃংখলভাবে দুটি সম্ভাবনাকেই বিকশিত করেছে। এই তত্ত্ব কেবল যে আত্মিক জগৎকে 'বস্তুভূত' করেছে তাই নয়, বস্তুজগৎ কেও ধরে তুলেছে আত্মিক। এতে আত্মা সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাকে একেবারে চূড়ান্ত বা চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আত্মা সর্ববস্তুতে বিরাজমান, আত্মা অবিনশ্বর এবং তা ঈশ্বরসৃষ্ট নয়।

জৈন মতাদর্শের মূলকথা হল 'পরম মুক্তি', অর্থাৎ সকল বাসনা কামনা ও পার্থিব বন্ধনের নাগপাশ থেকে এমন এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যে অবস্থায় ব্যক্তিসত্ত্বা মিশে যাবে 'নৈর্ব্যক্তিক, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্রতায়। জৈন দর্শনে নিহিত বাস্তববাদ বিজ্ঞানের নানক্ষেত্রে এই ধর্মের অনুসারীদের আগ্রহী করে তোলে।

৬.০ অনুশীলনী

১। বস্তুবাদী দর্শন ও তার শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। ষড়দর্শন বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। সাংখ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৪। যোগ বা পাতঞ্জল দর্শন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৫। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের বিশেষত্ব কি?

৬। মীমাংসা ও বেদান্তের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন।

৭.০ গ্রন্থপঞ্জী

১। এস. রাধাকৃষ্ণন ঃ ইন্ডিয়ান ফিলসফি।

২। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ লোকায়ত ঃ এ স্টাডি ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়ান মেটিরিয়ালীজম্; নিউ দিল্লী, ১৯৫৯

৩। এস. দত্ত ঃ আর্লি মোনাস্টিক বুদ্ধিজম্ ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪১-৪৫

৪। এ. কে. ওয়ার্ডার ঃ আউটলাইন অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি, দিল্লী, ১৯৭১

৫। বি. এল. সুজুকি, মহাযান বুদ্ধিজম্, ১৯৫৯

একক ৪ ❑ যৌগিক ভারতবর্ষ—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ তুর্কী-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ
১.২ সাংস্কৃতিক অঙ্গীকরণ-প্রক্রিয়া
২.০ সুফী আন্দোলন
৩.০ চিস্তি ও সুরাবর্দি সিলসিলাহ্
৪.০ ভক্তি আন্দোলন
৫.০ বৈষ্ণব আন্দোলন
৬.০ উর্দুভাষার ক্রমবিকাশ
৭.০ ধর্ম ও দর্শন
৮.০ শিল্প ও স্থাপত্য
৯.০ সঙ্গীত
১০.০ অনুশীলনী
১১.০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ প্রস্তাবনা

অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় উত্তরদিক থেকে যে আরব আগ্রাসকগণ ভারত আক্রমণ করেন তাঁরা সিন্ধুদেশ জয় করে সেখানে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলস্বরূপ সিন্ধুদেশ ভারতের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে ভারতের সামগ্রিক বিকাশ ব্যাহত হয় না। তবে একাদশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ভারত বারে বারে তুর্কী বংশোদ্ভূত মুসলমান আগ্রাসকদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এই সমস্ত অভিযান পরিচালিত হয় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ রূপে। ভারতীয় রাজ্যগুলি তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্তর্কলহে ও যুদ্ধবিগ্রহে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তাদের পক্ষে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ফলে কালক্রমে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে মুসলমান বিজেতাদের শাসনাধীনে বিশাল রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইতিহাসে দিল্লীর সুলতানশাহী নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্য পরবর্তীকালে দক্ষিণ অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়। দিল্লীর সুলতানশাহীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ভারতবর্ষের সামগ্রিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতবর্ষে তথাকথিত মুসলিম আধিপত্যের গোড়াপত্তন হয়।

আলোচ্য এককটিতে হিন্দু প্রধান রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসানে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হবার পর ভারতবর্ষের সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ইতিহাস কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সে সম্পর্কে সম্যকভাবে আলোকপাত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১ তুর্কী-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ

ভারতবর্ষে তুর্কী আগ্রাসকদের প্রথম আক্রমণ সংঘটিত হয় ১০০৯ খৃষ্টাব্দে। পরে গজনীর মাহমুদের (৯৯৮ খৃষ্টাব্দ—১০৩০ খৃষ্টাব্দ) সৈন্যদল পর্যন্ত পাঞ্জাব আক্রমণ করে। মাহমুদ ১০২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রতিবছর শীতকালে ভারত আক্রমণ ও সেদেশে অনুপ্রবেশ করতে থাকেন। এই সকল অভিযানকালে তিনি হিন্দুমন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন করেন এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের রাজাগণ বংশ-পরম্পরায় যে সমস্ত ঐশ্বর্য ও বৈভবে দেবালয়গুলিকে সুসজ্জিত করেছিলেন সেই বিপুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করতেও দ্বিধা করেন নি। এতদ্ব্যতীত, স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে বলপূর্বক তোলা বা খেসারত আদায় করাও ছিল মাহমুদের সৈন্যদলের নিয়মিত কর্তব্য।

উত্তর ভারতে মাহমুদের এই আগ্রাসনের এলাকা ছিল বহুবিস্তৃত তবে একমাত্র ভারতের যে অঞ্চলটি তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যক্ষ শাসনের প্রবর্তন করেন তা হল পাঞ্জাব।

দ্বাদশ শতকের সত্তরের দশকে আগ্রাসক শাসকদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের সুযোগ নিয়ে ঘুরের ছোট সামন্ত রাজ্যের শাসকরা ১১৭৩ খৃষ্টাব্দে গজনী এবং ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরও দখল করে নেন। মহম্মদ ঘুরী ১১৯১ খৃষ্টাব্দে তরাইনে যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের রাজপুত রাজ পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হলেও পরের বছর ওই একই যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। মহম্মদ ঘুরী নিহত হবার পর তাঁর এক তুর্কী ক্রীতদাস ও উত্তর ভারতে মহম্মদের শাসক-প্রতিনিধি কুতবউদ্দিন আইবক (১২০৬ থেকে ১২১০ খৃষ্টাব্দ) নিজেকে ঘুরী শাসিত ভারতীয় রাজ্যের স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করেন ও দিল্লীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে দিল্লীতে জন্ম হয় সুলতানশাহীর।

খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পালাবদল ঘটলেও সামাজিক চিত্রটির কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় নি। উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী এবং অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান স্বভাবতই বিশেষ ছিল না। সমাজ ও ধর্মীয় অনুশাসনে পরিচালিত হিন্দু জনগোষ্ঠীর পক্ষে ইসলামধর্মী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বা পঙক্তিভোজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলেই বিবেচিত হত। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জাতিগত বিধিনিষেধ কিন্তু মুসলমান গোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দু উচ্চবর্ণ বা শূদ্র জাতিভুক্ত জনগণের সামাজিক সংযোগে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। বহুক্ষেত্রেই আমরা দেখি, হিন্দু সৈন্যগণ মুসলমান শাসকের অধীনে বাহিনীতে নিয়োজিত হয়েছে। অধিকাংশ মুসলমান অভিজাত বা জমিদারের ব্যক্তিগত আধিকারিকের পদে অধিষ্ঠিত হতেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। প্রশাসনের আঞ্চলিক স্তরে হিন্দুদের প্রভাব ছিল একচ্ছত্র।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী নাগাদ মধ্য-এশিয়ার আদি বাসভূমি থেকে যে তুর্কী আগ্রাসকদের আগমন ঘটেছিল তাদের কিন্তু শুধুমাত্র নিষ্ঠুর বর্বর অভিযানকারী বলে মনে করা সঙ্গত নয়। পূর্ববর্তী মধ্য এশিয় আক্রমণকারীগণ যেমন বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করেছিল তারাও সেরূপ দীক্ষিত হয়েছিল ইসলাম ধর্মে, সেই সঙ্গে অতি দ্রুততায় আঞ্চলিক সংস্কৃতিকেও তারা গ্রহণ করেছিল। এই সময় আরব্য পারসিক সংস্কৃতি মরক্কো এবং স্পেন থেকে শুরু করে ইরান ও তৎসংলগ্ন প্রদেশে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই অঞ্চলের জনগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং নৌবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করে। সমুদ্রবাণিজ্যের ইতিহাসে আরব বণিকদের ভূমিকা সুবিদিত, বিশেষত বাংলার সমুদ্রবাণিজ্যে আরব বণিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। আরব বিবরণীতে বঙ্গোপসাগর বহর হরকল নামে অভিহিত। 'বহর' এর অর্থ সমুদ্র; হরকল বলতে বোঝায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হরিকেল।

যাইহোক, তুর্কীগণ ইসলাম ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং সন্নিবদ্ধতা নিয়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। শুধু তা-ই নয়, প্রশাসন, নান্দনিক শিল্প ও স্থাপত্যেও তাদের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির সঙ্গে তুর্কী সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে কালক্রমে ভারতবর্ষে এক উন্নততর ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে। তবে এই সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রক্রিয়ার ইতিহাস সুদীর্ঘায়িত; বহু ভাঙাগড়ার মাধ্যমে যা যুগে যুগে নব নব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প-স্থাপত্য এমন কি সামাজিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুস্পষ্ট ও নিয়মিত অনুশীলনে সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াটি ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। তবে এই মিশ্র সংস্কৃতি বহু উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছিল এবং স্থান-কালভেদে বিভিন্ন রূপে উন্মোচিত হয়েছিল।

১.২ সাংস্কৃতিক অঙ্গীকরণ প্রক্রিয়া

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতের আঙিনায় সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্য দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মবিশ্বাস একে অপরকে প্রভাবিত করেছিল। ইসলাম ধর্মী পণ্ডিতগণ যেমন হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞান, যোগ এবং বেদান্ত, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন, তেমনই আরব ঘরানার মুসলমান মনীষীগণের নিকট থেকে হিন্দু বিদ্যোৎসাহীরা ভূগোল, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এই পারস্পরিক আদান-প্রদান প্রতিফলিত হয়েছিল ভাষার ক্ষেত্রেও, যা আমরা দেখি হিন্দীভাষার উন্নতিসাধনে; এই হিন্দীর উৎকর্ষতা থেকেই উদ্ভব ঘটে উর্দুভাষার। বহু মুসলমান শাসক হিন্দু পরিবারগুলির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। শেষোক্ত প্রবণতাটি নিঃসন্দেহে হিন্দু মুসলমান সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে আলোচ্য যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

ইন্দো-ইসলাম সংস্কৃতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মুলত যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হল হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি এবং তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কালক্রমে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ধারাবাহিকতা একটি নতুন যৌগিক সংস্কৃতির জন্ম দেয় যা খাঁটি হিন্দুত্ব

প্রভাবিত বা নির্ভেজাল ইসলামপন্থা ছিল না, বরং এই যৌগিক সংস্কৃতি উভয়ের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির সমাহারে সমৃদ্ধ ও অনন্য মহিমায় প্রতিভাত হয়েছিল। ইন্দো-ইসলাম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে যে সকল কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হল (১) প্রশাসনিক ব্যবস্থা (২) একটি সর্বজনীন ভাষার উদ্ভব (৩) সুফী ও ভক্তি আন্দোলন এবং (৪) ইন্দো-পারসিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

২.০ সুফী আন্দোলন

ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় শতাব্দী বা হিজিরায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী এক বিশেষ শ্রেণীর সাধু বা নির্জনতাপ্রিয় ফকিরদের সুফী আখ্যা দেওয়া হয়। 'সুফ' শব্দটি থেকে 'সুফী' কথাটির উদ্ভব। প্রথমোক্ত শব্দটির মূল অর্থ হল পশম বা উল। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন উক্ত শ্রেণীর সাধু সম্প্রদায় সাধারণত পশমজাত একপ্রকার পোশাক পরিধান করতেন বলেই তাঁরা সুফি নামে অভিহিত। সাধারণভাবে সুফীবাদের মূল বলে ইসলামকে গণ্য করা হলেও নিরপেক্ষবিচারে পরবর্তীকালে এই মতবাদের উপর হিন্দু বেদান্তের প্রভাব অনস্বীকার্য। এমন কি সুফীবাদের উত্তর যুগে এর উপর বৌদ্ধ দর্শন, নিওপ্লেটোনিক দর্শন প্রভৃতির প্রভাবও স্বীকার করা হয়। এটিই নব সুফীবাদ। আদি সুফীবাদ প্রধানত নীতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নব সুফীগণ কেবল যে বৈরাগ্যধর্মী ছিলেন তা-ই নয়, তাঁরা মরমী ভক্তও ছিলেন, তাই নব সুফীমতকে মরমিয়াবাদ মূলক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রসিদ্ধ সুফী জামির মতে আবু হাসিম-ই প্রথম সুফী। ইসলামের আবির্ভাবের সূচনাকালে ভক্তিবাদী কিছু সর্বত্যাগী মানুষ ইসলাম সাম্রাজ্যের নৈতিক অবক্ষয় এবং সম্পদ প্রদর্শনের কুৎসিত প্রবণতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুফীবাদের আশ্রয় নেন। প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য সুফীদের মধ্যে ছিলেন রাবিয়া নাম্নী এক সাধিকা/(খৃষ্টীয় অষ্টম শতক) এবং মনসুর বিন হাল্লাজ (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক)। নব সুফীমতের প্রচারকদের মধ্যে মারুফ আল কারখী, আবু সুলেমান, আল্ দারানী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু আল্ ঘজালী (মারা যান ১১১২ খৃষ্টাব্দে) সুফী ধর্মের সহিত ইসলাম ধর্মের সমন্বয় বিধানে অগ্রণী ছিলেন।

আল ঘজালীর (১০৫৯—১১১২) সম্পূর্ণ নাম আবু হামিদ মুহম্মদ বিন মুহাম্মদ অল্-তুসী অল্ শফীঈ-অল ঘজালী। ইনি প্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিদ্। ৪৫১ হিজরা বা ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুন্নী মতাবলম্বী পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। ১০৯১ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে নিজামিয়া মাদ্রাসায় ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ঘজালী শাফিঈ আইনশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি ধর্মকে শুধু যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চান নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা ঈশ্বর উপলব্ধিই ঘজালীর অভিষ্ট ছিল। ঘজালী তাঁর সুফী-মত গ্রহণ করার কাহিনী আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুফী দর্শন ও বিচারধারা সম্পর্কে ঘজালী রচিত প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ 'ইহ্য়া-উলুম অল্-দীন' ১০৯৯-১১০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত তিন সুফী কবি ফরিদ-উদ-দীন আত্তার, জালালুদ্দীন রুমি ও শেখ সাদীর আবির্ভাবে সুফী মতবাদের মহিমা খুবই বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য কালপর্বে সুফীসমাজ বারোটি সম্প্রদায় (order) বা 'সিলসিলাহ' তে বিভক্ত ছিল। এই সম্প্রদায়গুলির নেতৃত্বে থাকতেন একজন প্রসিদ্ধ গুরু বা পীরসাহেব। পীব বা গুরুর সঙ্গে তাঁর অনুগামী শিষ্য বা ভক্তবৃন্দের সংযোগসাধনের মাধ্যমে সুফীবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। পীর বা ধর্মগুরু তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী বা 'ওয়ালী' মনোনীত করতেন।

সুফীমতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি-অনন্ত। সুফী মতবাদীদের কেউ কেউ বলেন ঈশ্বর জগতে লীন হয়ে আছেন, তিনি জগতের অতিরিক্ত কিছু নন। এই মতে ঈশ্বরই বিশ্ব, বিশ্বই ঈশ্বর। এমন কি এঁরা বলেন, ঈশ্বর স্বয়ং-ই জগৎ। আবার কোনো কোনো সুফীর মতে ঈশ্বর জগল্লীন নন তিনি জগৎ বহির্ভূত তবে জগতের অতি নিকটবর্তী। জগল্লীন বলতে জল ও সুরার মত মিলিয়ে যাওয়া বোঝায়। পক্ষান্তরে জগৎ বহির্ভূত অথচ অতি নিকটবর্তী বলতে বুঝতে হবে ঈশ্বর ও বিশ্বের সম্পর্ক জল ও তৈলের ন্যায় ধর্ম পৃথক কিন্তু পরস্পর অতি নিকটবর্তী। একশ্রেণীর সুফীর মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও সগুণ উভয়েই। নির্গুণ রূপে তিনি শুদ্ধ স্বরূপ, নির্বিশেষ, সকল ভেদ বর্জিত। সগুণরূপে তিনি নিজেঃ স্বরূপে অনভিব্যক্তভাবে নিহিত গুণাবলীকে ব্যক্ত করেন। এইরূপে তিনি ঈশ্বর অথবা দেবতা (Divinity)। আর একদল সুফী মনে করেন ঈশ্বর সর্বদাই সগুণ এবং সবিশেষ। সনাতমপন্থী সুফীগণের মতে ঈশ্বরের গুণাবলী 'ঈশ্বর থেকে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। সুফী দর্শনে ঈশ্বরের সাতটি গুণ ধরা হয়েছে—প্রাণ, জ্ঞান, সংকল্প, বল, বাক্য, শ্রবণ ও দর্শন।

সুফীগণের মতে ঈশ্বরের গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এই মতে ঈশ্বর ও তাঁর নামাবলী অভিন্ন। ঈশ্বরের নামাবলী দুই শ্রেণীর ঃ স্বরূপবাচক অর্থাৎ আল্ আহাদ বা এক ও অদ্বিতীয়; এবং গুণবাচক অর্থাৎ আল্ রহমান বা করুণাময়। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম আল্লা। ঈশ্বর জগৎ ও মানবকে সৃষ্টি করলেন মানবের নিকট নিজেকে জ্ঞাত করার জন্য। অন্য সুফী মতে, ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপকে জানবার জন্যই জগৎ, জীব, মানব ও পরিশেষে সিদ্ধপুরুষগণকে সৃষ্টি করলেন। এই সিদ্ধপুরুষ বা পূর্ণ মানবই ঈশ্বরের দর্পণস্বরূপ।

অধিকাংশ সুফীর মতে জগৎ সাদি ও সান্ত্ অর্থাৎ অনিত্য। যদিও এ বিষয়ে মতান্তর আছে। যেমন একমতে জগতে ক্রমবিবর্তন চলছে, যথা জড় বস্তু, উদ্ভিদ, পশুপক্ষী মানব। আবার মানব, দেবদূত, ঈশ্বর। এইখানেই বিবর্তনের সমাপ্তি। কোনো কোনো সুফী জগতকে ক্ষণিক বলে মনে করেন, তবে এই মতবাদীর সংখ্যা কম। জীবের স্বরূপ সম্পর্কে সুফীরা বলেন, মানব জড়দেহেন্দ্রিয় ও অজড় আত্মার সমাহার।

অধিকাংশ সুফীর মতে ঈশ্বর পূর্ণ মানবের মাধ্যমে জগতে অবতরণ করে পুনরায় ঐ একই মাধ্যমে নিজস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ একমাত্র পূর্ণ মানব বা সিদ্ধ পুরুষই ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি। কিন্তু তাই বলে সুফীরা অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না। সাধারণভাবে সুফী মতে ঈশ্বর জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ তথা মোক্ষস্বরূপের দুইটি দিক ঃ নঞর্থক ধ্বংস অর্থাৎ আমিত্বের বিনাশ এবং সদর্থক 'স্থিতি' অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপের বিকাশ। অধিকাংশ সুফীর মতে মোক্ষলাভ এই জগতেই এবং বর্তমান জীবনেই সম্ভবপর। তবে

সনাতন পন্থী সুফীদের মতে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব ইহলোকে নয়, পরলোকে। ঈশ্বরের সহিত মিলনাভিলাষী সাধককে সুফীরা বলেন—'পর্যটক' এবং মানবের ঈশ্বরলাভের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'পর্যটন'। 'পর্যটক' হবার জন্য গুরুর বা পীরের নিকট হতে সুফীসাধনমার্গের নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করতে হবে। তাঁর যোগ্যতায় গুরু সন্তুষ্ট হলে তাঁকে দীক্ষিত করবেন এবং তালি দেওয়া পোষাক (বৈরাগ্য ও দারিদ্র্যের চিহ্ন) দেবেন। সুফী মতে পর্যটককে সাতটি সোপান অতিক্রম করতে হবে—অনুতাপ, সংযম, বৈরাগ্য, দারিদ্র্য, ধৈর্য, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং সন্তোষ। মতান্তরে শেষ চারটি সোপান হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন। এঁদের মতে প্রেমই সুফী ধর্মের মূলতত্ত্ব এবং ঈশ্বর-মানবের মিলনসেতু। সুফীরা বিচারবুদ্ধি লব্ধ স্থিরতাধর্মী জ্ঞান অপেক্ষা আবেগপ্রধান উন্মাদনার ও প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সুফী মতাদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, প্রাণায়াম প্রভৃতিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু যোগী সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্ব থেকেই মধ্য এশিয়ায় ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ছিল। ইসলামী সংস্কৃতিতে স্বভাবতই পরমযোগী পুরুষ রূপে বুদ্ধের একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পরও যোগী সম্প্রদায় পশ্চিম এশিয়া পরিভ্রমণে যেতেন; সংস্কৃতভাষায় লেখা যোগী গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড' পারসিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এইভাবে ভারতবর্ষে আগমণের পূর্বেই সুফী মতাবলম্বীগণ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপসমূহ আত্মস্থ করতে সক্ষম নয়। তবে বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারা বা বৈদান্তিক মতাদর্শ সুফীবাদকে প্রভাবিত করেছিল কি না তার বিতর্কের বিষয়।

সুফীবাদী তাত্ত্বিক এবং আধুনিক বহু চিন্তাবিদের মতে সুফীবাদের ধারণা কোরান-সঞ্জাত। যাই হোক, সুফী মতবাদের সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধ্যানধারণার বহু সাদৃশ্য আছে সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। সুফী মতবাদীদের মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, বা-শারা (যাঁরা ইসলামী বিধি (শারা) অনুসরণ করেন) এবং বে-শারা (যাঁরা কঠোরভাবে ইসলামী অনুশাসন পালনে দায়বদ্ধ নন)। এই দুই ধরণের সুফী সম্প্রদায়ই ভারতবর্ষে বসবাস করতেন। শেষোক্ত মতাবলম্বীগণের বেশীর ভাগই ছিলেন ভবঘুরে সাধু-সন্ত।

৩.০ চিস্তি ও সুহরাবর্দি সিলসিলাহ্

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে উত্তরভারতে যে দুটি বা-শারা আন্দোলন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে সে দুটি হল চিস্তি ও সুরাবর্দি সিলসিলাহ্। ভারতবর্ষে চিস্তি আন্দোলনের প্রবক্তা হলেন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি।

মৈনুদ্দিন চিস্তি ছিলেন একজন দরদী সুফী সাধক। তাঁর প্রকৃত নাম মুইন অল-দীন মুহাম্মদ। প্রকৃত নিবাস সেস্তানে, মইমুদ্দিন ১১৪২ খৃষ্টাব্দে (হিজরা ৫৩৭ অব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে তাঁর পিতা হসনের মৃত্যুর পর ভ্রমণে বহির্গত হয়ে মৈনুদ্দিন বাগদাদে এলে সেখানে কয়েকজন সুফী সাধকের প্রভাবে

তিনি সুফী ধর্মাবলম্বী হন। পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয় এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১১৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ চিস্তি দিল্লীতে আসেন। লাহোর ও দিল্লীতে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর তিনি আজমীড়ে যান। সেখানেই আনুমানিক ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। চিস্তির কর্মজগৎ সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও তাঁর অনুগামী বখ্‌তিয়ার কাকী এবং তাঁর শিষ্য ফরিদ-উদ-দীন গঞ্জই-শকর প্রভৃতির মাধ্যমে আধুনিক হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে চিস্তির মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছিল।

চিস্তি ঘরানার প্রসিদ্ধতম সাধক ছিলেন নিজাম উদ্দিন আউলিয়া এবং নাসিরুদ্দিন চিরাগ-ই দিল্লী। এই সুফী সাধকদ্বয় জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের প্রান্তিক ও দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অমায়িকভাবে সংযোগ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত সুফীগণ জনগণের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, এই ভাষা ছিল হিন্দওয়াই বা হিন্দী। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার এখানে ছিল অবাধ। সুফী সাধু সন্তদের যোগাযোগ স্থাপনের এবং সুফী মতাদর্শ প্রচারের মূল মাধ্যম ছিল সঙ্গীত, যা 'সামা' নামে পরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে নাসিরুদ্দিন চিরাঘ-ই দিল্লীর মৃত্যুর পর চিস্তি সাধকগণের প্রভাব দিল্লী অঞ্চলে কমে গেলেও পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে তা বিস্তৃত হয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে সুরাবর্দি সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেও শুধুমাত্র পাঞ্জাব ও মূলতান অঞ্চলেই তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। এই ঘরানার দুই প্রবাদপ্রতিম সাধক হলেন শেখ শিহাবুদ্দিন সুরাবর্দি এবং হামিদ উদ্দিন নাগরি। সুরাবর্দি সাধকগণ দারিদ্র্যের জীবনযাপনে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৪.০ ভক্তি আন্দোলন

'ভজ' ধাতু থেকে ভক্তি শব্দের উৎপত্তি। অদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ ইত্যাদির ন্যায় শুদ্ধ ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়নি। কারণ ভক্তির একটি আশ্রয় প্রয়োজন—'বিষ্ণু', 'শিব বা শক্তির। অনেকে বলেন যে খৃষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্ম থেকেই হিন্দুধর্মে ভক্তির প্রবেশ। কিন্তু ভারতবর্ষে বৈদিকযুগ থেকেই ভক্তির ধারা প্রবাহিত। ঋগ্বেদ সংহিতায় কয়েকটি সূক্ততেই সখ্য এবং মধুর আভাসযুক্ত ইন্দ্রস্তুতি আছে। বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত।

যাইহোক, খৃষ্টীয় সপ্তম এবং দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের প্রকৃত ক্রমবিকাশ ঘটে। শৈব অনুগামী নয়নার এবং বৈষ্ণব অলবারগণ বরাবরই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসৃতব্য কৃচ্ছসাধনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি। তারা জাতি ব্যবস্থার কঠোরতার বিরোধিতা করেছিল এবং স্থানীয় ভাষায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রেমের বাণী ও ঈশ্বরে অচল ভক্তির মতবাদ প্রচার করেছিল।

তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদী আন্দোলন ক্রমবিকশিত হলেও উত্তরভারতে এই মতবাদের বিস্তারলাভ ঘটেছিল অত্যন্ত শ্লথগতিতে। সম্ভবত এর কারণ হল দক্ষিণভারতে

জনপ্রিয় নায়নার ও অলবর সম্প্রদায় তাঁদের গন্ডির বাইরে ভক্তিবাদের প্রচারে সমর্থ হন নি প্রধানত স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের জন্য। সমগ্র দেশে এই সময় সংস্কৃত ভাষাই ছিল গ্রহণযোগ্য। এই ভাষার মাধ্যমেই ভক্তিবাদ ক্রমে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। যে সকল ভক্তিসাধক এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেন মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসী নামদেব (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক) এবং রামানন্দ (চতুর্দশ—পঞ্চদশ শতক)। নামদেবের সঙ্গে দিল্লীর সুফী সাধকদের সুসম্পর্ক ছিল। রামানুজের অনুগামী 'রামানন্দ ভক্তিবাদের মূল মতাদর্শ প্রচার করেন চতুবর্ণের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন রবিদাস, কবীর, সেন, সাধন প্রভৃতি প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ। নামদেব ও রামানন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় ভক্তি আন্দোলন সামাজিক সংস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করে।

অনেক সময় বলা হয় যে, কবীর, নানক, দাদু, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, সুরদাস প্রভৃতির সময় থেকেই জনগণের মধ্যে ভক্তির আন্দোলন আরম্ভ হয়। যদিও এঁরা ভক্তিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন, তথাপি এ তথ্য অবিসংবাদিত যে এই আন্দোলনের শুরু হয় বহু পূর্বে দক্ষিণ ভারতে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈষ্ণব অলবর বা আড়বার এবং শৈব নায়নার সন্তগণ ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। ভক্তি আন্দোলনের তখনই সূত্রপাত। পরে আচার্য রামানুজ আড়বারদের মতের সঙ্গে বেদান্তের সামঞ্জস্য বিধান করেন। মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক এই তিন বৈদান্তিক আচার্যের সম্প্রদায় ভক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি সাধন করেন—শ্রীচৈতন্যে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

৫.০ বৈষ্ণব আন্দোলন

খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে আড়বার অর্থাৎ ভগবানের প্রেমে আত্মহারা ভক্তগণ আবির্ভূত হয়ে দিব্য প্রবন্ধাবলী রচনা করেন। আড়বারদের পরে বৈষ্ণব আচার্যগণের আবির্ভাব হয় ও নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যমুনাচার্যই শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যদিও রামানুজাচার্যের (১০১৬—১১৩৭ খৃষ্টাব্দ) খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ। এরপর নিম্বাকাচার্য (আনুমানিক কাল ১১১৪—৬২ খৃষ্টাব্দ) ও মধ্বাচার্য (১১৯৭—১২৭৬ খৃষ্টাব্দ) নিজ নিজ সম্প্রয়াদের প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগে ভীমানদীর তীরে পাণ্ডারপুরে বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

আসামের মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শঙ্করদেব (১৪৬৩—১৫৬৮ খৃঃ) জ্ঞানমিশ্রাভক্তি প্রচার করেন। রামানুজাচার্য থেকে শঙ্করদেব পর্যন্ত সকলেই আচার্য বলে সম্মানিত কিন্তু বাংলাদেশের শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ভক্তগণ কর্তৃক সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপে পূজিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস এবং গদাধর পঞ্চতত্ত্বরূপে পূজিত হন। কর্ণাটক বংশীয় সনাতন, তাঁর ভ্রাতা রূপ ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব, দক্ষিণের গোপাল ভট্ট, বারাণসীর রঘুনাথ ভট্ট ও বাংলার রঘুনাথ দাস ছয় গোস্বামী রূপে সম্মানিত। শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণায় এঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশ করেন।

বৈষ্ণবধর্মে প্রচারের ফলে স্ত্রীজাতি ও তথাকথিত নীচবর্ণের ব্যক্তিরা নতুন সামাজিক মর্যাদালাভ করেন। তামিল, তেলুগু, কন্নড়, হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া ও মারাঠী সাহিত্য বৈষ্ণব লেখকদের দ্বারা পুষ্ট হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বৈষ্ণব ধর্মের দান অসামান্য।

৬.০ উর্দু ভাষার ক্রমবিকাশ

উর্দু হল পশ্চিমী হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর মুসলমানী সংস্করণ; এ ভাষার মূল মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী অঞ্চলের ভাষা। তুর্কী, ফারসী প্রভৃতি মুসলমানদের কথ্য ভাষায় পরিণত হবার জন্য উর্দুর মধ্যে বহু আরবী-ফারসী শব্দ প্রবেশ করেছে। তদুপরি লেখার ও সাহিত্যের ভাষা রূপে গৃহীত হওয়ায় এতে প্রথম থেকেই ফারসী লিপি গৃহীত হয়েছিল।

প্রথমদিকে এই ভাষা সাধারণ লোকে বলত অথবা সুফী ফকিরেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার জন্য উর্দু ভাষার সাহায্য নিতেন, এই কারণে 'উর্দু'র একাধিক নাম প্রচলিত আছে। উর্দুর প্রাথমিক রূপ সুফী ফকিরদের বাণী অথবা সাধারণ মানুষের কথোপকথনের মধ্যে পাওয়া যায়। উর্দুর উপর সর্বপ্রথম পাঞ্জাবী ভাষার প্রভাব পড়ে। দক্ষিণ ভারতে যে উর্দুর ব্যবহার ছিল, উত্তর ভারতে তাকে নিম্নশ্রেণীর ভাষা বলে গণ্য করা হত। মুসলমানদের ভারত আগমনের ফলে যেমন এখানকার জীবনযাত্রা প্রভাবিত হয়েছিল, সেইরূপ এখানকার জীবনযাত্রাও তাদের সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। তারা এখানকার ভাষাসমূহ আয়ত্ত করে তার মাধ্যমে আপন চিন্তাধারা প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে লাহোরের খ্বজা মসুদ সাদ্ সলমনের নাম (১১৬৬ খৃষ্টাব্দ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দীতে তাঁর কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের প্রারম্ভিক ইতিহাসে কবি আমীর খুসরুর (১৩২৪) রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উর্দু ভাষার সাহিত্যিক রূপের বিকাশের চিহ্ন সর্বপ্রথম দেখা যায় দক্ষিণ ভারত ও গুজরাটে। গেসূদরাজ, মীরনজী সমসুল উশশাক, বুরহানউদ্দীন জানম, নিজামী, ফিরোজ, মহমূদ, অমীনুদ্দিন আলা প্রভৃতির রচনা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বাহমনী রাজ্যের পতনের পরে দক্ষিণভারতে পাঁচটি রাজ্যের সৃষ্টি হলে উর্দুর উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত হয়।

৭.০ ধর্ম ও দর্শন

প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন এবং শিল্পে তিনটি প্রধান জাতির প্রভাব অনস্বীকার্য, প্রথম হল হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা, দ্বিতীয়, আর্যজাতি, যাঁরা সম্ভবত উত্তর-পশ্চিমের পথ দিয়েই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং তৃতীয় হল দ্রাবিড় জাতি, যাদের কেন্দ্র অতি প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষিণভারতে গভীরভাবে প্রোথিত।

ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন স্তর বৈদিক সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। বেদ পাঠ করলে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি স্তরভেদে আচরণ ভিত্তিক ধর্মচর্যার উপর গুরুত্বও নজর এড়ায় না। আবার অন্য এক স্তরে যজ্ঞসমূহের ধর্মাচরণের পরিবর্ত রূপে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন ধরণের ধ্যান। বৈদিক

অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে কালক্রমে গড়ে ওঠে মীমাংসা দর্শন। বেদান্তধারায় রচিত উপনিষদগুলির সংখ্যা সাধারণভাবে এগারো, পরে এই ধারার অনুসরণে আরও গ্রন্থ রচিত হয় যেগুলি উপনিষদ পরিচিতির দাবী রাখে। উপনিষদের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদগীতার সমন্বয় সাধনে পথিকৃৎ ছিলেন শঙ্করচার্য। উত্তরভারতের বৈদিক সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভক্তির মাধ্যমে শৈব নয়নার ও বৈষ্ণব আলবার শ্রেণীর সাধুদের সঙ্ঘ গড়ে ওঠে বিভিন্ন স্থানে। শঙ্করাচার্য নিজেও একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠক ও প্রচারক ছিলেন।

আনুমানিক একাদশ শতকে ভাগবত রচিত হয়। ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে আর এক বেদান্ত দার্শনিক মধ্বাচার্য বা আনন্দতীর্থে উল্লেখযোগ্য। তিনি শঙ্করাচার্যের বিপরীত মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে জয়তীর্থ ও ন্যায়ামৃত রচনাকার ব্যাসতীর্থ উল্লেখযোগ্য।

৮.০ শিল্প ও স্থাপত্য

আলোচ্য কালপর্বে ভারতবর্ষের শিল্প ও স্থাপত্যে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেছে। ইসলামধর্মী সংস্কৃতি ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বেই দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্যরীতিকে অনুসরণ করে মুসলমান শিল্পীগণ এক উন্নত ধরণের শৈল্পিক ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। হিন্দুরীতির স্থাপত্যশৈলী কিন্তু এই ধারার প্রভাব থেকে সেই সময়ে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান শক্তির অনুপ্রবেশের পর হিন্দু মুসলমান শিল্পরীতির অপূর্ব সংমিশ্রণে এক নতুন শিল্প চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই সমন্বয়িত মিশ্রণের দ্রুত বিস্তৃতির অন্তরালে কয়েকটি বিষয় কাজ করেছিল। প্রথমদিকে আগত মুসলমান আগ্রাসনকারীগণ ভারতবর্ষে তাঁদের বসবাস ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অট্টালিকা বা সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন হিন্দু শিল্পী ও স্থপতিদের দ্বারা। স্বভাবতই এই সকল শিল্পী ইমারত গঠন প্রক্রিয়ায় ইসলামী বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সাথে হিন্দু শৈল্পিক রীতিরও সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজকীয় স্থাপত্যে হিন্দু-মুসলমান গঠন রীতির এই অন্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এই উভয় সংস্কৃতির সমন্বিত ধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল ইশা খান ও হুমায়ুনের স্মৃতিস্তম্ভ এবং ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ।

হ্যাভেলের মতে মোগল আমলে ভারতীয় শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল। জন মার্শাল বলেছেন ভারতীয় স্থাপত্যে কোনো একটি বিশেষ ধরণের রীতি ছিল না। সম্রাট ও আঞ্চলিক শাসকদের ব্যক্তিগত রুচির ওপর স্থাপত্য নির্মাণ নির্ভর করত। বাবরের পর ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে পারসিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আকবর পারসিক শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে ভারতীয় ও পারসিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটে। আকবরের উত্তরাধিকারীদের আমলে ভারতীয় শিল্প সম্পূর্ণ দেশীয় প্রভাবে গড়ে ওঠে এবং পারসিক প্রভাবের বিলুপ্তি ঘটে।

মোগল আমলের স্থাপত্য আলংকারিক কারুকার্যাদি ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। আকবরের আমলে আগ্রা ও ফতেপুরসিক্রীর প্রাসাদগুলিতে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফার্গুসন ফতেপুর সিক্রীতে 'মহৎ প্রাণের প্রতিবিম্ব' বলে অভিহিত করেছেন। স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর নির্মিত স্থাপত্যে আলংকালিক কারুকার্য কালজয়ী মহিমায় উদ্ভাসিত। শুধুমাত্র কারুশৈলীতেই নয়, মোগল আমলে চিত্রাঙ্কনের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অঙ্কনশিল্পে মোগল ঘরানার উৎকর্ষতা সুপ্রাচীন। বাবরের ভারত অভিযানকালে বেহজাদ নামক এক শিল্পী ছিলেন অঙ্কনশিল্পের পুরোধা স্বরূপ; তাঁকে আদর্শ রূপে গণ্য করে বহু শিল্পী তাঁদের শিল্প সাধনাকে সার্থক করে তোলেন। অজন্তাগুহার শিল্পশৈলীতে তিমুরিদ ঘরানার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক তারাচাঁদ অজন্তার চিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গে বলেছেন "Upon the plasticity of Ajanta were imposed the new laws of symmetry, proportion and spacing imported from Samarkand and Herat. To the old pomp, new splendeurs were added and to the old free and easy naivete of life, a new sense of courtly correctness and rigid etiquette". এই ইন্দো-ইসলামিক ঘরানা কালক্রমে বিভিন্ন রকম শাখায় বিকশিত হয়ে নানা শিল্পরীতির সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দুরীতির প্রভাব যেমন পরিস্ফুট হয় তেমনই আবার কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলামী ঘরানার আধিপত্য নজরে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জয়পুর, কাংড়া এবং হিমালয় অঞ্চলের হিন্দু রাজ্যগুলিতে প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুসৃত হয়েছিল; পক্ষান্তরে, দাক্ষিণাত্য, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর এবং পাটনায় ইসলামীরীতি অনেক সুগভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৯.০ সংগীত

ভারতীয় মার্গসংগীতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ইসলামী সংস্কৃতিকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে। সুলতানী আমলে আমীর খসরুর মত সুপ্রসিদ্ধ সংগীতসাধকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ভারতীয় সুরমূর্ছনায় আপ্লুত হয়ে তাঁর কাব্য উপস্থাপনা করতেন; তাঁর সৃষ্ট কাওয়ালী এবং খেয়াল বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। হিন্দু সংগীত ঘরানায় ব্যবহার্য সেতার, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং ধ্রুপদ সংগীত মুসলমান রাজদরবারে অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। মোগলযুগে বিশেষত আকবরের আমলে বহু রাজন্য এবং সভাসদ সঙ্গীতসাধকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী ও বাদ্যকারগণের নিরলস সাধনায় তারানা, ঠুংরী, গজল প্রভৃতি বিভিন্ন রাগ সংগীতের জন্ম হয়। উত্তর ভারতীয় মার্গসংগীতে হিন্দুস্থানী ঘরানার ক্রমবিকাশ ঘটে মোগলযুগ থেকেই। হিন্দু মুসলমান মিশ্র সংস্কৃতির আর এক অনবদ্য সৃষ্টি হল কত্থক নৃত্য।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে সুফী সাধকগণ ভারতীয় কাব্য এবং মার্গসংগীতকে পারসিক কাব্য বা সঙ্গীতের তুলনায় অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী বলে মনে করেছিলেন। আমীর খসরুর হাত ধরে যে নতুন

সাঙ্গীতিক ধারা জন্মলাভ করেছিল তাকে 'ইন্দো-পারসিক ঘরানা' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শুধুমাত্র দিল্লীর সুলতানগণই নয় আমির খসরুর গুণমুগ্ধ ছিলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মত সুফী সন্ত। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্য জয় করার পর সেই অঞ্চলের বহু সংগীত সাধক দিল্লী চলে আসেন। আমীর খসরু তাঁদের কাছ থেকে কর্ণাটক ঘরানার দক্ষিণী সংগীতের ধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করে প্রাচীন ভারতের মার্গসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের যে সকল সংগীতশিল্পী দিল্লীতে চলে আসেন তাঁদের অগ্রগণ্য ছিলেন নায়েক গোপাল। তাঁর সঙ্গে আমীর খসরুর সাঙ্গীতিক প্রতিযোগীতা সম্পর্কে সাহিত্যিক উপাদানে একাধিক উপকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সকল কাহিনী থেকে এই সত্যটুকু অন্তত উন্মোচিত হয় যে, দক্ষিণী সাঙ্গীতিক রীতিকে আমীর খসরু খুব ভালভাবে রপ্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল খসরুর রচিত বেশ কয়েকটি সঙ্গীত সম্পর্কিত টীকায় তাঁর উদ্ভাবিত বলে কথিত সেতার নামক বাদ্যযন্ত্রটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী টীকাভাষ্যগুলিতে খসরুর রচিত বা সৃষ্ট উনিশটি রাগসঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে খেয়াল, তারানা এবং কাওয়ালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১০.০ অনুশীলনী

১। ভারতবর্ষে তুর্কী-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কিভাবে ঘটেছিল?

২। সুফী আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৩। ভারতবর্ষে ভক্তি আন্দোলন কিভাবে প্রসারলাভ করে?

৪। উর্দূভাষার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৫। ভারতবর্ষের শিল্পস্থাপত্যে কিভাবে বিদেশী প্রভাব ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়?

৬। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারতীয় ঘরানার সাথে ইসলামী রীতির কিরূপ মেলবন্ধন ঘটে?

১১.০ গ্রন্থপঞ্জী

কেম্ব্রিজ হিস্ট্রী অফ্ ইন্ডিয়া ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।

সি. টি. গ্যারেট ঃ দ্য লেগেসি অফ্ ইন্ডিয়া।

আব্দুল লতিফ্ ঃ এ্যান আউটলাইন অফ্ দ্য কালচারাল হিস্ট্রী অফ্ ইন্ডিয়া।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পা) ঃ হিস্ট্রী এন্ড কালচার অফ্ ইন্ডিয়ান পিপল্।

অষ্টম (খ) পত্র

পর্যায়—১

একক ১ ❑ আদি মধ্যযুগ : সংজ্ঞা ও পরিধি - প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ

গঠন :

১.০ আদি মধ্যযুগ : সংজ্ঞা ও পরিধি

১.১ প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ

১.২ অনুশীলনী

১.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ আদি মধ্যযুগ : সংজ্ঞা ও পরিধি

ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সভ্যতার আদি মধ্যযুগের ধারণা প্রধানত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তাঁরা মার্কস কর্তৃক আলোচিত এশিয়ার অন্যান্য সমাজব্যবস্থার সাথে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের পরিবর্তনবিমুখ সমাজ, অর্থনীতি ও উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য খন্ডন করেছেন। এইসব ঐতিহাসিকগণ ইউরোপীয় ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের যুগবিভাজনকে গ্রহণ করেছেন যার মূল কথা হল সমাজের অভ্যন্তরীণ কার্যধারার গতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিবর্তন ঘটে। মূলত এই পরিবর্তন সাধিত হয় উৎপাদন সম্পর্ক ও প্রকৃতির মধ্যে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের অনেকেই প্রথমদিকে যান্ত্রিকভাবে প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন। এর ফলে সাধারণভাবে সমাজের প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণের ধারণার প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বিতর্কিত বিষয়টি হল মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা সৃষ্ট এক সাধারণ ধারণা যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, আদর্শ, ধর্ম ও রাজনীতির সহজাত গঠনে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন আদি বা প্রাচীনযুগ এবং মধ্যযুগের বিভাজনের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে। এই পর্যায়ের সামাজিক পরিবর্তনের চরিত্রের সঙ্গে শাসকগণের রাজবংশ বা শাসকগণ কর্তৃক অনুসৃত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ঠিক হবে না। তাই বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বি. এন. দত্ত, ডি. ডি. কোশাম্বী এবং আর. এস. শর্মার প্রশংসনীয় গবেষণার ফলশ্রুতি হল পূর্ববর্তী জেমস মিল এবং তাঁর উত্তরসূরী ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদী এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পন্ডিতদের ভারত ইতিহাসের যুগবিভাজনের ধারণাকে নাকচ করা।

১.১ প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতে গেলে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে কেন 'আদি মধ্যযুগ' বলা হবে? বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালের ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় মধ্যযুগের তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শাসকগণের বংশ বা তাঁদের অনুসৃত ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক পর্যায়কে প্রাচীন ও আধুনিক যুগ থেকে পৃথক করা যায় না।

প্রথম সহস্র বছরের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি মধ্যযুগের তিনটি পর্যায়ের নমুনা তুলে ধরেছেন। প্রথম পর্যায় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায় দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম চার দশক পর্যন্ত এবং শেষ পর্যায়ের পরিধিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম চার দশক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে গবেষকদের আলোচনা ভারত ইতিহাসের যুগবিভাজনের আরও অর্থবহ ধারণা তুলে ধরেছে। যাই হোক এটি স্পষ্ট যে, নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক আখ্যায়িত প্রথম পর্যায় একদিকে প্রাচীন ও অপরদিকে মধ্যযুগ থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভূষিত। ভারত ইতিহাসের প্রতি এই সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক পরিবর্তনশীল গতিপথ অন্বেষণের মাধ্যমে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগে রূপান্তরের ধারণাকে যোগ করেছে। এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সময় থেকে যিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রেণিসংঘাত ও সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের উল্লেখ করেছেন। ডি. ডি. কোশাম্বীও বলেছেন যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বোধগম্য করতে সামন্ততন্ত্রের উদাহরণ ব্যবহৃত হয়, যা ইতিহাসের নতুন পর্যায় অনুধাবনে যুক্তির সঞ্চার করে। কোশাম্বী তাঁর "Stages of Indian History" নিবন্ধে স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিবর্তনের দ্বি-স্তরীয় পর্যায়কে আরও বিকশিত করেছেন। তিনি ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। যাই হোক তাঁর ভারত ইতিহাসের বিবর্তনমূলক পরিকাঠামোয় পঞ্চম পর্যায়টি সুনিশ্চিতভাবে 'শুধু সামন্ততন্ত্র' নামে চিহ্নিত, যার সূত্রপাত গুপ্তোত্তর যুগে এবং ১২০০ সালের পর মুসলিম বাণিজ্যিক ও সামরিক অনুপ্রবেশের পর যা আরও উদ্দীপিত হয়। এটি নীহাররঞ্জন রায় যাকে মধ্যযুগের প্রথম পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন তার সঙ্গে মানানসই হয়েছে। এই নতুন পর্যায় যাকে আদি মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে সেটি কোশাম্বীর মতানুসারে সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য-আশ্রিত। এই ধারণা পরবর্তীকালে আর. এস. শর্মা কর্তৃক পরিবর্তিত বা বি. এন.এস. যাদব, ডি.এন.ঝা., বিশ্বমোহন ঝা, আর. এন. নন্দী. এবং আরও অনেক গবেষক যেমন হরবংশ মুখিয়া, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা এটিকে আরও ব্যাপক ভিত্তি সমন্বিত সামাজিক বিবর্তনের অন্তর্নিহিত উদাহরণ হিসেবে দেখেছেন। প্রকৃত বিষয় হল এই নতুন পর্যায় বিবর্তিত হয়েছে গুপ্তোত্তর যুগের মধ্যবর্তীকাল থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজপুতদের উত্থান পর্যন্ত। এই পর্যায় বিগত আদি পর্যায়ের থেকে বিচ্যুত হলেও সম্পূর্ণভাবে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু এর মধ্যে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের সুপ্ত বীজ নিহিত ছিল। সুতরাং পূর্বের প্রাচীন ভারতকে দুটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি আদি ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক পর্যায় এবং দ্বিতীয়টি আদি মধ্যযুগ যার ব্যাপ্তি ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া মধ্যযুগের পূর্ব পর্যন্ত।

সুতরাং আদি মধ্যযুগ ভারতের ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক পর্যায় যা কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ এবং যা এই যুগকে মধ্যযুগ থেকে পৃথক করেছে। ভারত ইতিহাসের বিবর্তনের একটি নতুন স্বচ্ছ পর্যায়কে আদিমধ্য যুগ আখ্যা দেওয়ার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, এক সাংস্কৃতিক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে ঐতিহাসিক বিবর্তন হল একটি অন্তর্নিহিত পদ্ধতি যা সমাজের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলির অন্তর্নিহিত গতিশীলতার দ্বারা সংঘটিত। এই বিবর্তন সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে কোন উপাদান দায়ী তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ হতে পারে। কোশাম্বীর মতে, এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়টি কার্যকরী ছিল তা হল উৎপাদন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে ইতিহাসে কালের সীমানা নির্দিষ্ট হবে যুদ্ধ বা বংশগত পরিবর্তনের দ্বারা নয়, হবে উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্ক অনুযায়ী।

কোশাম্বী স্বীকার করেছেন যে, বড় যুদ্ধ, শাসকশ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, ধর্মীয় অভ্যুত্থান জনগণের উৎপাদনশীল

সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু সেটি সংশ্লিষ্ট সমাজের অনুন্নত অবস্থার জন্য যেখানে সঠিক সামাজিক শক্তি যা ঐতিহাসিক বিকাশের নেপথ্যে কাজ করে, সেই শক্তি সুপ্ত থাকে। কোশাম্বী ইতিহাসের বিবর্তনে মার্কসবাদী ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন এবং সেই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে আর. এস. শর্মা ও অন্যান্যরা গ্রহণ করেছেন। এঁরা সামন্ততন্ত্রের ভারতীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে আদি মধ্যযুগের অস্তিত্ব নিরূপণ করেছেন। কোশাম্বী ও শর্মা কর্তৃক আদি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি শুরু হয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে যা প্রশাসন এবং তদানীন্তন জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর অন্যান্যদের অবদানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অপরদিকে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার হরবংশ মুখিয়া ভারত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন সাংস্কৃতিক পর্যায়কে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র বিষয়ক আলোচনাকে অপ্রতুল বলে মনে করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'The Feudalism Debate' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি তত্ত্বগত ও পরীক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি বিতর্কের ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গঠনে স্বাধীন কৃষি অর্থনীতির ভূমিকাকে প্রশ্ন করেছেন যা মধ্যযুগের ভারতকে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ ও অর্থনীতি থেকে পৃথক করেছে।

'আদি মধ্যযুগ' সম্পর্কিত যুগবিভাজন সাধারণভাবে গৃহীত হলেও সাংস্কৃতিক পর্যায়কে যে সমস্ত বিষয় স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তা নিয়ে মার্কসবাদী ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আবার পূর্বতন পণ্ডিতবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

১.২ অনুশীলনী

১. ভারত ইতিহাসের আলোচনায় 'আদি মধ্যযুগ'কে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

২. ভারত ইতিহাসে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

১.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১. D.N. Jha : Early India - A concise History

২. D.N. Jha (ed.) : The Feudal Order

৩. D.D.Kosambi : An Introduction to the study of Indian History

৪. R.S. Sharma : Indian Feudalism

৫. R.S. Sharma : Social Changes in Early Medieval India

৬. B.D.Chattopadhyay : The Making of Early Medieval India

একক ২ ❑ কারণগত উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য

গঠন :

২.০ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে ডি. ডি. কোশাম্বীর অভিমত
২.১ আর. এস. শর্মা এবং ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা
২.২ সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য
২.৩ ভক্তিবাদের অভ্যুত্থান
২.৪ রাজসভার রীতিনীতির উত্থান
২.৫ আদি মধ্যযুগীয় সামাজিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের উপর আরও আলোচনা
২.৬ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত বিতর্কের উপর আরও আলোচনা
২.৭ অনুশীলনী
২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে ডি. ডি. কোশাম্বীর অভিমত

ঐতিহাসিক কোশাম্বী ভারতীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের বিবর্তনের দ্বিবিধ উপপর্যায় লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে প্রথম পর্যায় মৌর্যোত্তর যুগে সূচিত হয়, যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহারিক মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও পণ্য উৎপাদনের ঘনত্ব বা মাথাপিছু পণ্য উৎপাদন অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। কোশাম্বী ভূমি অর্থনীতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বৃহৎ পরিবারের অস্তিত্ব ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। পারিবারিক ভূসম্পত্তি বংশগত হয়ে দাঁড়ায়, যা ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। বিশেষত গুপ্তযুগে উপজাতীয় ক্ষমতা সামন্ততান্ত্রিক অধিকারে পরিণত হয় এবং বিজিত রাজা, রাজন্যবর্গ বা প্রধান বিজয়ীর অধীনে সামন্তে পরিণত হয়।

কোশাম্বী এই পর্যায়কে উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের উত্থান বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের (feudalism from above) অর্থ হল এমন এক অবস্থা যেখানে শক্তিশালী রাজা তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ কর ধার্য্য করেন এবং যতদিন তাঁর অধীনস্থ শাসক শক্তিমান রাজাকে কর দান করবেন ততদিন তিনি নিজ ক্ষমতার দ্বারা শাসন করবেন, এমনকি নিজ রাজ্যে নিজস্ব ইচ্ছার প্রয়োগ করতে পারবেন। এই অধীনস্থ শাসক উপজাতীয় প্রধানও হতে পারেন। এঁরা সাধারণভাবে কোন ভূম্যধিকারী শ্রেণি যাঁরা কোনরূপ মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে জমির উপর প্রত্যক্ষ শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এই পর্যায়ের পরিপূর্ণ পরিণতি ঘটে গুপ্তযুগে।

পরবর্তী পর্যায়ে কোশাম্বী নিচু থেকে সামন্ততন্ত্রের (feudalism from below) বিকাশ বর্ণনা করেছেন সেই সময় থেকে যখন ভূম্যধিকারী শ্রেণির উপর স্থানীয় সামন্ত প্রতিনিধিদের উত্থান ঘটে। ভূম্যধিকারী শ্রেণির বেশিরভাগ জমি দ্রুত সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই ভূম্যধিকারীরা উচ্চতর সামন্ত প্রধানদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। এটিই ছিল নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র। ১৯৫৬ খৃঃ কোশাম্বী এই পর্যায়ের আরও সমালোচনামূলক

সংজ্ঞা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র হচ্ছে পরবর্তী পর্যায় যেখানে রাষ্ট্র এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রামে একশ্রেণির ভূম্যধিকারীর বিকাশ ঘটে, যারা কালক্রমে স্থানীয় জনগণের উপর সশস্ত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করে। সামরিক ক্ষমতা থাকার কারণে এই শ্রেণি অপর কোন শ্রেণির হস্তক্ষেপ ছাড়াই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দাবী করত। কর সংগৃহীত হত ক্ষুদ্র মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা যেখানে উঁচু থেকে সামন্ততন্ত্রে সরাসরি রাজকীয় আধিকারিকদের দ্বারা কর সংগৃহীত হত।

২.১ আর.এস. শর্মা এবং ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যা

বি.এন.দত্ত, এস.এ.ডাঙ্গে এবং ডি.ডি.কোশাম্বী কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে ভারত ইতিহাসের গতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা সম্পর্কিত যুক্তির অনুসরণ করেছেন আর.এস.শর্মা। এঁরা সকলেই যে শুধুমাত্র পরিবর্তনের সময়কাল নির্দেশ করেছেন তা নয়, সেই পরিবর্তনের প্রকৃতিও নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৫৮ খৃঃ-এ—আর. এস. শর্মা পরিবর্তনশীল কৃষিসমাজের গঠন সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের চেষ্টা করেছিলেন। যেমন,আদি ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি সম্পর্ক এবং কররীতি। শর্মা এই পরিবর্তনের গতি এবং বৈশিষ্ট্য 'সামন্ততন্ত্রে'র আলোকে ব্যাখ্যা করেন ১৯৬৫ খৃঃ-এ—প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'Indian Feudalism'-এ। দ্বি-পর্যায় বিশিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে শর্মা কোশাম্বীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তাঁর মতে প্রচীন ভারতে ব্রাহ্মণদের, মন্দিরগুলিকে বা বৌদ্ধ মঠে জমিদানের ব্যবস্থা থেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং এর ফলে ভূমি অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন মধ্যবর্তী শ্রেণির আবির্ভাব হয় যারা ভূমিভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। শর্মা স্পষ্টতই সামন্ততন্ত্রের উত্থানকে গুপ্তোত্তর যুগের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, যখন এক নতুন জীবনধারার সূত্রপাত ঘটেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে এই সময় বাণিজ্য এবং নগরায়ণের অবক্ষয়ের ফলে ভূমিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের উত্থান সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের ইঙ্গিত বহন করে। এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয় যা পরবর্তীকালে 'আদি মধ্যযুগ' নামে অভিহিত হয়। ইতিমধ্যে নীহাররঞ্জন রায় আদি মধ্যযুগের ব্যাখ্যা দিয়েছেন কতকগুলি নির্দিষ্ট বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে যা প্রকৃত মধ্যযুগ নামে পরিচিত।

২.২ সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত আর. এস. শর্মার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Indian Feudalism'-এ ভারতের আদি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা স্পষ্টত দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক। যেহেতু এই পর্যায় আদি মধ্যযুগের সমাজ রূপে চিহ্নিত, তাই শর্মার মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি এই পর্যায়ে আরোপিত। সেগুলি হল—

ক) প্রচলিত ধর্মীয় ভূমিদান রীতি অনুযায়ী ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ে সৃষ্ট মধ্যবর্তী শ্রেণি রাজকীয় আধিকারিকদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রশাসন পরিচালনা করার কর্তৃত্ব লাভ করতেন এবং আর্থিক ও বিচারবিষয়ক অধিকার ভোগ করতেন। পরবর্তীকালে যোদ্ধাশ্রেণিও এই প্রকার অধিকার ভোগ করতে থাকেন।

খ) সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং প্রাদেশিক প্রশাসনিক পদগুলির বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

গ) প্রদেশ এবং প্রান্তিক সীমানায় সামন্ততান্ত্রিক আইনের সৃষ্টি হয়।

আর্থ-সামাজিক জীবনে এই নতুন যুগের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বাজারভিত্তিক নগদ অর্থনীতি এবং নগরকেন্দ্রিকতার অবক্ষয়, যার ফলশ্রুতি কৃষিক্ষেত্রে অন্তঃপ্রবাহ। এর সঙ্গে মধ্যবর্তী ভূমিমালিকশ্রেণির সৃষ্টি হয় যারা তাদের গোষ্ঠীগত অধিকার সমর্পণ করে ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে। ক্ষুদ্র কৃষকমালিক কালক্রমে ভূমিদাসে পরিণত হয় এবং বাজারের জন্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদন হ্রাস প্রাপ্তির ঘটনা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের উত্থান ঘটায়। আর. এস. শর্মার এই গবেষণাপত্র পূর্বগ্রাহ্য দুটি প্রধান বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা- ক) গুপ্তোত্তর যুগ থেকে মুদ্রার স্বল্পতা যা শর্মাকে মুদ্রা-অর্থনীতি ও পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের হ্রাসপ্রাপ্তিকে অনুমান করতে সাহায্য করেছে। খ) কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত হওয়া যার প্রভাব পড়েছে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিসম্পর্কের উপর। এই দ্বিবিধ উপাদান সম্পর্কেই পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ প্রশ্ন তুলেছেন।

আদি মধ্যযুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনায় তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল ক) আঞ্চলিকতা, খ) সামন্ততন্ত্র, গ) গ্রাম্য সংস্কৃতি। ১৯৬৭ খৃঃ—এ নীহাররঞ্জন রায় বৃহত্তর মধ্যযুগের অংশবিশেষ হিসেবে আদি মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক পর্যায়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তিনি মধ্যযুগের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলেছেন।

১) আঞ্চলিক বংশগত শাসকবর্গের উত্থানের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন চিত্রিত হয়েছে। রায় এটিকে ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

২) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুদ্রা অর্থনীতি থেকে স্বাভাবিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

৩) সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে আঞ্চলিক মাধ্যম যেমন অক্ষর, ভাষা, সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কেলাসন পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

৪) ধর্মীয় পরিমণ্ডলেও নতুন যুগের সূচনা দেখা যায় প্রশস্ত ধর্মীয় বর্ণচ্ছটার মধ্যে দল ও উপদলের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা।

৫) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই নতুন যুগে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিল্পের সূত্রপাত হয় এবং বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে যেগুলি পূর্ব উড়িষ্যা, মধ্যভারতীয়, পশ্চিম ভারতীয়, মধ্য-দক্ষিণাত্য ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়েছে। এই শিল্পীগোষ্ঠীগুলির নামকরণ হয়েছে প্রভাবশালী আঞ্চলিক রাজবংশের নামে যাদের রাজত্বকালে এদের বিকাশ ঘটে যেমন, পল্লব শিল্প, চোল শিল্প, পাল-সেন শিল্প ইত্যাদি।

এইভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা 'আদি মধ্যযুগ' নামক নতুন উপপর্বের ধারণাকে অপরিহার্য করে তুলেছে। নীহাররঞ্জন রায়ের প্রস্তাবিত মধ্যযুগের ধারণা এবং আনুষঙ্গিক আদি-মধ্যযুগের পর্যায়ের ধারণা অনুসরণ করে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা যথা আর. এস. শর্মা, বি. এন. এস. যাদব 'কলিযুগ'-এর ধারণা তুলে ধরেছেন যা ছিল এক প্রাচীন দেশজ ধারণা। এইসকল ঐতিহাসিকেরা আদি মধ্যযুগের সূত্রপাতের ক্ষেত্রে গুণগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। কলিযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য যা পুরাণে উল্লিখিত আছে তা হল মিশ্রজাতির উত্থান বা বর্ণসংকর। এর অনুষঙ্গী হল সামাজিক সংকট যা বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের ফলশ্রুতি। এর ফলে দেখা যায় শূদ্র ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈরিতা, বৈশ্যদের করদান প্রত্যাখ্যান, করভারে জনগণের দুর্দশা, চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি, পরিবার ও সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপর সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি ম্লেচ্ছ রাজন্য প্রভাব। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ অনুযায়ী সামাজিক সংকটের তিনটি পর্যায় আছে। এগুলির মধ্যে প্রথম পর্যায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এর সময়কাল তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে। পরবর্তী পর্যায়ের সময়কাল হল অষ্টম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে। পণ্ডিতবর্গ উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত ও বাংলার লেখমালার

উল্লেখ করে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীকালকে 'কলিযুগ' বলে বর্ণনা করেছেন। উভয় সময়কালকে একত্রীভূত করে পণ্ডিতবর্গ বলেছেন যে, প্রথম সহস্র বছরের প্রথমার্ধে ভারতীয় সমাজ তীব্র যন্ত্রণার আবর্তে পড়েছিল যা একটি সামাজিক পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছিল।

বি. এন. এস. যাদব কলিযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে 'প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে' রূপান্তর লক্ষ্য করেছেন যে সময় বিভিন্ন ঘটনার মিশ্রণ ও প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। যেমন, বৈদেশিক আক্রমণ, বিদেশী সমেত অভিজাত শাসকশ্রেণির লক্ষণীয় উত্থান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, খরা, অর্থনৈতিক মন্দা, আনুষঙ্গিক শহর ও বাণিজ্যিক অর্থনীতির পতন, চতুর্বর্ণের অশান্তি যার সূত্রপাত শূদ্রের উত্থানের মধ্য দিয়ে, বৈশ্যের পদমর্যাদা হ্রাস, পুরাতন অভিজাত শাসকশ্রেণি ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মর্যাদা হ্রাস, তীব্র সামাজিক সংঘাত, নতুন উদীয়মান শাসকশ্রেণির অত্যাচারের মাত্রাবৃদ্ধি এবং নির্যাতনমূলক শ্রম যা কৃষকদের পরাধীন করে রাখে, প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা, সাধারণভাবে চিরাচরিত নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিলুপ্তি প্রভৃতি। বি. এন. এস. যাদব মহাভারত, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎসপুরাণ, ভগবৎপুরাণ প্রভৃতির অংশবিশেষ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেছেন যে ভবিষ্যৎ অধঃপতনের ভবিষ্যতবাণী কলিযুগে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং একদিকে সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে কলিযুগের দৃষ্টরূপ অনুযায়ী ঐতিহাসিক ডি.ডি.কোশাম্বী, আর. এস. শর্মা, বি. এন. এস. যাদব ভারত ইতিহাসের আদি মধ্যযুগের পর্যায় ও সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। এই গবেষণা অনুসরণ করে প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা আদি মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যকে এক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেছেন। আর. এন. নন্দী ভারত উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেছেন সেগুলি হল জায়গীরপ্রাপ্ত জমির সম্প্রসারণ, নিষ্কর জমির সংখ্যাধিক্য, কৃষকদের অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করার অস্ত্র হিসেবে মন্দিরের আবির্ভাব, দান ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জমির হস্তান্তর যার ফলে ক্রীতদাসসুলভ শ্রমিকদের দ্বারা চালিত ব্যক্তিগত খামারের উদ্ভব, যৌথ জমিগুলি ব্রাহ্মণদের মুক্ত জমিতে রূপান্তর, শ্রমিকদের সন্তোষ অনুযায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধীর পরিবর্তন এবং সেখানে শস্যের ভাগীদার ব্যতিরেকে এক নতুন ক্রীতদাসসুলভ শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব, শ্রমের হীনমন্যতা এবং স্থবিরতা, ব্রাহ্মণ এবং সামন্তদের মধ্যে সংঘাত, প্রতিবেশী গ্রামের নিষ্কর জমির ব্রাহ্মণ মালিকদের মধ্যে সংঘাত, গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে সামন্ত নেতার সংঘাত এবং সর্বোপরি কর এবং কর আদায়কে কেন্দ্র করে কৃষকদের উপর অত্যাচার। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি স্বল্পালোচিত আসামের উপর আলোকপাত করেছেন। অমলেন্দু গুহের গবেষণায় উপজাতিতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রে রূপান্তরের কারণ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে সামন্ততন্ত্রের পূর্বে নগরায়ণ এবং মুদ্রা অর্থনীতির অভাবের ফলে ক্রমশ অন্তর্নিহিত আঞ্চলিক শক্তির মধ্য থেকেই সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। আর্থরাজনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে ভুঁইয়াদের বিকাশ, যাকে গুহ ইংলন্ডের ১৮৩২ খৃঃ পূর্ব পর্যন্ত ভূস্বামীদের মাধ্যমে শাসনের সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন, যে শাসন নিয়ে এসেছিল বংশানুক্রমিক শাসন এবং মধ্যবর্তী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতার স্তরবিন্যাস যার নীচে ছিল উপজাতি এবং প্রাচীন অহম রাজা যা ছিল বিকেন্দ্রীভূত রাজ্যের অংশবিশেষ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দুটি উপাদান বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেগুলি হল, ক) নীচুতলা থেকে নতুন বৈষ্ণবীয় আন্দোলন এবং খ) উপর থেকে রাজনৈতিক ঐক্য যা চরিত্রে ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এই দ্বিবিধ উপাদান সমাজের একীভবনের পথ প্রশস্ত করেছে। গুহের মতে এটি ঘটনাচক্রে হিন্দুত্ববাদ ও অব-উপজাতীয়করণের পথ দেখিয়েছে। যদিও গুহের গবেষণা সঠিক মধ্যযুগের সময়কালের মধ্যে আবদ্ধ তবুও এটি ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে আর. এন. নন্দীর বক্তব্যের পরবর্তী সংস্করণ যার সঙ্গে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আদি মধ্যযুগের বিকাশ সম্পর্কে ডি. এন. ঝা, কেশবন ভেলুথাট, এন. কারাশিমা, বিশ্বমোহন ঝা, কে. এম. শ্রীমালি প্রমুখের নতুন বক্তব্য যুক্ত করা যেতে পারে। এঁরা সকলেই অপর কয়েকটি আর্থ-সামাজিক বিকাশের উপর জোর

দিয়েছেন যা সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবকে সুনিশ্চিত করেছে এবং আদি মধ্যযুগের এক নতুন সাংস্কৃতিক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ডি.ডি. কোশাম্বীর মাধ্যমে আদি মধ্যযুগের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচিত হয়। তিনি গুপ্তোত্তর যুগের সামাজিক ধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক নতুন বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে উক্ত সময় থেকে নতুন আদি মধ্যযুগের ঐতিহাসিক পর্যায় শুরু হয়েছে। 'ভাবগত-গীতা'র মধ্যে কোশাম্বী সমাজের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণিগত ও আদর্শগত সংঘাতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে ঐ একইরকম সংঘাত দেখা যায় যা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয়েছিল যেমন শৈব এবং বৈষ্ণব। আবার বিক্ষিপ্ত কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গভীর আর্থ-সামাজিক সংকটকে নিয়ে এই সংঘাতের শেষ হয়েছিল গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে। কোশাম্বী গুপ্তোত্তর যুগের গভীর সংকটের কালে ভাগবত-গীতার বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তবুও তিনি স্বীকার করেছেন যে ভক্তিবাদের আবির্ভাব নিশ্চিতভাবে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে ফলপ্রসূ করেছে যা ব্যক্তিগত ভক্তির দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করেছে যে ভক্তি সহজেই রূপান্তরিত হয়েছে ব্যক্তিগত আনুগত্যে যা আশ্রিতকে প্রভুর সঙ্গে, প্রজাকে ভূস্বামীর সঙ্গে এবং সামন্তকে রাজার সঙ্গে বেঁধে রাখে।

২.৩ ভক্তিবাদের অভ্যুত্থান

কোশাম্বী কর্তৃক ভক্তিবাদ ও ভাগবত-গীতার সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণের সূত্র ধরে এম. জি. এস. নারায়ণন এবং কেশবন ভেলুথাট ভক্তিবাদের উত্থানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবণতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, যে ভক্তিবাদ দক্ষিণভারতের শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁদের বিশ্লেষণ ভক্তিবাদের উত্থানকে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে যার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়—

১) সঙ্গম-উত্তর যুগে ব্রাহ্মণ-সমর্থিত নূতন সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বৃদ্ধি ও সংগঠন

২) বিশাল ভূসম্পত্তির উপর বিভিন্ন মন্দিরের উদ্ভব যেগুলি ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং সেইসব ব্রাহ্মণরা মন্দিরসংলগ্ন স্থানে বসবাস করতেন যেখানে বেশিরভাগ প্রজারা ছিল অব্রাহ্মণ।

৩) কয়েকটি জেলা সদর দপ্তরে এবং অর্ধস্বাধীন ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে বণিক ও কারিগরদের সম্পদশালী সমবায় সংঘ বা 'গিল্ড'-এর আবির্ভাব।

৪) ব্রাহ্মণ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ-জৈন কলহের নিষ্পত্তি।

৫) সকলকে গ্রহণ করার মত জাত ব্যবস্থার উদ্ভব যা দক্ষিণ ভারতের আদিম গোষ্ঠী ও উপজাতিদের আকৃষ্ট করেছিল।

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং এক স্ফীত জাতব্যবস্থার পটভূমিকায় ভক্তিবাদের উত্থান ঘটে। এই সমস্ত ঘটনাবলী ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু হয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর অব্যাহত ছিল। নবম শতাব্দীর শেষভাগে ভক্তি আন্দোলন সমগ্র তামিলনাড়ুকে আচ্ছন্ন করেছিল। এই সময়কালকে নারায়ণন ও ভেলুথাট দক্ষিণ ভারতীয় সমাজের গঠনমূলক পর্যায় বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাঁরা দক্ষিণ ভারতে এক কৃষিভিত্তিক সামন্তপ্রথার প্রতিষ্ঠাকেও লক্ষ্য করেছেন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নতুন যুগের ইঙ্গিতবাহী যাকে 'আদি মধ্যযুগ' বলে অভিহিত

করা হয়েছে। ভক্তি ব্যক্তিগত বন্ধনের ধর্মীয় বহিঃপ্রকাশ হয়ে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। ঐতিহাসিকগণ তান্ত্রিক মতবাদের উত্থানকেও আদি মধ্যযুগীয় পর্যায়ের একটি বলিষ্ঠ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য বলে সনাক্ত করেছেন। আদি মধ্যযুগের প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় ডি.এন.ঝা এবং আর.এস.শর্মা আদি মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে তান্ত্রিক মতবাদের কারণগত উপাদান ও অর্থের অনুসন্ধান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক মতবাদ কিছু প্রচলিত ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম থেকে বিবর্তিত হয়েছে যে সমস্ত ক্রিয়াকর্মের অনুষঙ্গী ছিল জাদুবিদ্যা, গুপ্ত পানোন্মত্ত কোলাহলপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠান, গুপ্ত অভ্যাস, ডাকিনী বিদ্যা, মায়াবিদ্যা প্রভৃতি। শর্মা তন্ত্রবিদ্যার যে ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন তা হল নিম্নস্তরের দরিদ্র মানুষদের ঔষধ প্রদান বা জ্যোতিষী হিসেবে তাদের সান্ত্বনা প্রদান। চিকিৎসক এবং জ্যোতিষী হিসেবে তান্ত্রিকদের ভূমিকা সাধারণ মানুষদের সামাজিক ও আবেগজনিত চাহিদা মেটানোর কাজ করতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক সংহতি রক্ষা করে। দেখা যায় তান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে উপজাতি অধ্যুষিত অনগ্রসর স্থানে যেখানে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা বিশাল জমি অনুদান পেয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এর ফলে ব্রাহ্মণ ও উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আদানপ্রদান চলতে থাকে এবং আর্য্যাবর্তের বাইরে ব্রাহ্মণ্য বর্ণভিত্তিক সমাজে নিজেদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য সংগঠিত করার জন্য ব্রাহ্মণরা উপজাতি গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে থাকে। এই সমগ্র অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া আদি মধ্যযুগ পর্বে তান্ত্রিক মতবাদের অংশ ছিল যা ধীরে ধীরে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ধর্মীয় প্রণালী যেমন মহাযান বৌদ্ধধর্ম বা বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জৈনধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।

২.৪ রাজসভার রীতিনীতির উত্থান

আদি মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত হল ক্রমোচ্চস্তরে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণিবিন্যাসের সঙ্গে রাজসভার রীতিনীতির বিকাশ যা উচ্চকুলোদ্ভবদের ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের বিবর্তনের মধ্যে লক্ষণীয়। সাহিত্যধর্মী নটক, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, জীবনী, উপন্যাস এবং অভিধান রচনার বিকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যাচ্ছিল। রাজসভা, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চবর্গের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংস্কৃতের উপর এবং সংস্কৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতীকস্বরূপ। আদি মধ্যযুগে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের সমর্থকগণ সেই পটভূমিকার উপর আলোকপাত করেছেন যেখানে ঐ পর্বের সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা নতুন শিল্পরীতি প্রভাবিত হয়েছিল। দেবাঙ্গনা দেশাই লক্ষ্য করেছেন পুরাণের প্রামাণ্য তথ্য যা সাধারণ স্তরে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ প্রকাশের মাধ্যম ছিল, তার দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় এটি ছিল সেই সময় যখন যজ্ঞ বা তপস্যায় আহূতি দেওয়ার চেয়ে মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ সহজ ছিল। মন্দির নির্মাণ, জলাশয় ও জনহিতকর কার্য্য ছিল পূর্তধর্ম এবং মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে শিল্পকর্মের বিকাশ শুরু হয়। গুপ্তযুগে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল উজ্জয়িনীর উদয়গিরির স্থাপত্য-ভাস্কর্যে নতুন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতিফলন এই যুগ পরিবর্তনের কালে দেখা যায়। কোশাম, দেওগড়, বেসাং প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্যশিল্পে এ যুগের যে প্রতিফলন দেখা যায় তার শিল্পরীতি বর্ণনা করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন যে, এ শিল্প কিছু কম সুরুচিপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক, সারনাথ শিল্পীগোষ্ঠীর সৃষ্ট শিল্পের চেয়ে কম সূক্ষ্ম বা রুচিসম্মত ও দীপ্তিমান। কিন্তু এই শিল্প ছিল অধিক সাধাসিধা ও অন্তরঙ্গ। এই প্রবণতা পূর্বেই গুপ্তযুগে পরিলক্ষিত হলেও তা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছিল আদি মধ্যযুগে। দেশাই লিখেছেন যে, অভিজাত সমাজ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত এই শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছিল অলঙ্করণে

তাদের রুচি, মর্যাদাপূর্ণ মুখাবয়ব; প্রশস্ত কেশবিন্যাস, উৎসবের দৃশ্য, মহিলাদের উপস্থিতি, পানপাত্র ইত্যাদি যা ঐ যুগের সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত করে দেয়। আদি মধ্যযুগের শিল্প যা হারিয়েছিল তা হল আধ্যাত্মিকতা, সরলতা এবং স্বাভাবিক মাধুর্য বা সৌষ্ঠব। এটি প্রচলিত রীতি বা তার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডল শিল্পের ঐতিহ্যীকরণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উভয় শিল্পে আঞ্চলিক রীতিনীতির বিকাশের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক আঞ্চলিক রাজনীতির উদ্ভবকে সাথে নিয়ে আদি মধ্যযুগের শিল্পে ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণ, বিশুধতা ও উৎকর্ষতার ছাপ। আদি মধ্যযুগীয় শিল্পের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল যৌনতার প্রকাশ এবং মানবশরীরের বিভিন্ন ভাবাবেগ যা কঠিন ও স্থির বলে মনে হত।

২.৫ আদি মধ্যযুগীয় সামাজিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের উপর আরও আলোচনা

সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বের সমর্থকগণের মতানুসারে আদি মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক) রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামন্ত ও মহাসামন্তের মত এক বৃহৎ অর্ধস্বাধীন শাসকদের উত্থান ও সেইসঙ্গে রাজপুরুষ নামে ক্রমোচ্চ স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন পদের উদ্ভব।

খ) বিশেষত আদি মধ্যযুগে মধ্যবর্তী ভূস্বামী, ব্রাহ্মণ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির অনুপ্রবেশ।

গ) বাজার বা মুদ্রা অর্থনীতি থেকে অর্থনৈতিক একক হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য ব্যবস্থায় রূপান্তর যা গ্রামীণ সমাজকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছিল, পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্য এবং পুরোহিত ও গৃহস্থের নির্ভরশীলতার মত এক নতুন যজমানি সম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছিল।

ঘ) কৃষকদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার এই প্রক্রিয়াকে ইউরোপীয় ভূমিদাস প্রথার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আনুষঙ্গিক হিসেবে ছিল বলপূর্বক শ্রম আদায় ও অত্যাচারমূলক কর আদায়ের সঙ্গে কৃষকদের উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ।

ঙ) জাতের সংখ্যা বৃধি - বর্ণসংকর নামে নতুন জাতের সৃষ্টি, বিস্তীর্ণ জাত ব্যবস্থার মধ্যে অনেক নতুন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি যা সামাজিক সংকট এবং জাত ব্যবস্থার মধ্যেকার সংকট বৃধি করেছিল।

চ) ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃধি এবং অবৈদিক ও অসংযত উপজাতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিভাজন এবং তান্ত্রিক মতবাদের বিকাশ। অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া ধর্মীয় আদর্শ হিসেবে ভক্তিবাদের উত্থান ঘটায় বা ব্যক্তিগত পূজাপদ্ধতির জন্ম দেয় যা শুধুমাত্র ঈশ্বর বা পুরোহিতের মধ্যে নয়, ভূম্যধিকারীর পক্ষে যুধ করার শর্তে জমি ভোগকারী প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে ব্যক্তিগত আনুগত্য ও শ্রদ্ধাভক্তির বন্ধনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ছ) আদর্শ ও সংস্কৃতির স্তরে রাজসভাকেন্দ্রিক স্বতন্ত্র মাধ্যম সংস্কৃতের বিকাশ ঘটেছিল। সংস্কৃত ছিল অতি উচ্চ সম্প্রদায়ের জন্য সৃষ্ট সাহিত্য যা ছিল আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ। আদি মধ্যযুগে দেখা যায় সামন্ত সমাজে রাজসভাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির অধঃপতন এবং সামন্তসমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য। এই প্রসঙ্গে আর এস শর্মা যথাযথভাবে আঞ্চলিক ভাষার আবির্ভাব, লিখনপধ্যতি, পুরাতন শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা, নতুন আইনের পুস্তক ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেছেন। এগুলি প্রধানত সামাজিক পার্থক্য ও প্রভেদকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে।

২.৬ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত বিতর্কের উপর আরও আলোচনা

যে সমস্ত ঐতিহাসিক সামন্ততন্ত্রকে আদি ঐতিহাসিক যুগ থেকে আদি মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যান্বিত করেছেন তাঁদের সঙ্গে ডি. সি. সরকার, হরবংশ মুখিয়া এবং ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় একমত পোষণ করতে পারেননি। উক্ত গবেষণা গ্রহণে ডি.সি. সরকারের আপত্তি তাঁকে আদি মধ্যযুগে নতুন এবং স্পষ্ট সাংস্কৃতিক পর্যায় সম্পর্কিত ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছে। মুখিয়া ভূমিদাস প্রথার আবির্ভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে সামন্ততন্ত্রের সমালোচনার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং এশিয়ার উৎপাদন প্রণালীর তত্ত্ব ব্যতীত ভারতীয় সমাজের আদি ঐতিহাসিক যুগ থেকে আদি মধ্যযুগে গতি ও পরিবর্তনের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেননি। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম আদি মধ্যযুগের নতুন পর্যায়কালের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। এই পর্যায়কে আদি মধ্যযুগ থেকে পৃথক করার জন্য তিনি যে শুধু আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্ণনা করেছেন তা নয়, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার সমর্থক ঐতিহাসিকগোষ্ঠীর গবেষণা সম্বন্ধে তিনি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। চট্টোপাধ্যায় নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে একমত যে আধুনিক অর্থে ভারত ইতিহাস চর্চা প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক পরিবর্তনবিমুখতাকে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়ার প্রাচ্য ধারণাকে বাতিল করে এবং একথা বলে যে একধরনের রূপান্তর ঘটেছিল যা হল 'প্রাচীন' থেকে 'মধ্যযুগে' যার আদি পর্যায় শুরু হয়েছিল গুপ্তোত্তর যুগ থেকে। নীহাররঞ্জন রায় এই সময়কালকে সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এক আদি মধ্যযুগের কথা বলেছেন যা আদি ঐতিহাসিক যুগ (খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগ থেকে গুপ্তযুগ) থেকে পৃথক। সামন্ততন্ত্রের সমর্থকগণ এই রূপান্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা কারণ হিসেবে যা তুলে ধরেছেন তাঁর বক্তব্য তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ক) স্থানীয় রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমাজের বিস্তার, খ) উপজাতিদের কৃষকে রূপান্তর এবং জাতসংগঠন, গ) ধর্মবিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতির অধিকারভুক্তিকরণ এবং জাতিগোষ্ঠীর একীভবন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চট্টোপাধ্যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তীকালে স্থানীয় রাষ্ট্রগঠন এবং তাদের কয়েকটির প্রধান আঞ্চলিক রাষ্ট্রে রূপান্তরকে উল্লেখ করেছেন। তিনি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন বর্ণসংকরের বিবর্তন এবং রাজনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস। তিনি এই যুক্তি দিয়েছেন যে আদি ঐতিহাসিক যুগের শেষার্ধে ব্রাহ্মণ্য রাজতান্ত্রিক আদর্শের বিনাশ এবং আঞ্চলিক স্তরে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে বর্ণ সম্পর্কে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ সমর্থিত হয়েছিল এবং যার অনুষঙ্গী হয়েছিল আঞ্চলিক স্তরে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান। রাষ্ট্র এবং প্রাক-রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থার প্রসার অঞ্চল এবং গোষ্ঠীর মধ্যে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণসংকরের সঙ্গে উপজাতি থেকে রূপান্তরিত কৃষকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। চট্টোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক রাষ্ট্রগঠন এক সহায়ক কাজ করেছে বলে লক্ষ্য করেছেন। এই ঐতিহাসিক পরিবেশ ভিতর থেকে Domination ও Subordination -এর সম্পর্কের কয়েকটি স্তরকে চিহ্নিত করেছে। চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় "The formation of relationships of domination and subordination thus cannot be viewed entirely as the superimposition of extraneous elements upon a community; nor is stratification simply a dichotomous relationship between such elements and a pristine community." শেষ পর্বে চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজ নিজেই অনেকটা জটিল। সুতরাং সামাজিক স্তরবিন্যাসের জটিলতা শুধুমাত্র গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভূমিদানের মাধ্যমে গঠিত সামন্ত

ভূস্বামী মধ্যবর্তী শ্রেণির সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সমাজের সৃষ্টি এমন এক প্রক্রিয়া শুরু করেছিল যার দ্বারা domination ও subordination এর জটিল সম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছিল যা আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমাজ হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে। তিনি আরো জোর দিয়ে বলেছেন স্থানীয় বা আধা আঞ্চলিক অথবা আঞ্চলিক রাষ্ট্রগঠন এক স্বীকৃত রাষ্ট্র কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয় নি। এটি ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের তত্ত্ব থেকে আর একটি বিচ্যুতি যেখানে এই প্রক্রিয়া রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিচ্ছিন্নতার দ্বারা চিহ্নিত। আর. এস. শর্মা আদি মধ্যযুগের কৃষকদের যেভাবে চিহ্নিত করেছেন চট্টোপাধ্যায় তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে আদি মধ্যযুগে বিভিন্ন বর্ণের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল এবং শূদ্রের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য ছিল তেমনি কোন একক বর্ণের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য ছিল। বস্তুত আদি মধ্যযুগ একধরনের কৃষক ও কৃষিশ্রমিক শ্রেণির অভ্যুত্থান লক্ষ্য করেছিল যা আঞ্চলিক সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা আর এস শর্মা কর্তৃক প্রদত্ত দুটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব যথা ক) কৃষকদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা ও ক্রীতদাস প্রথা এবং খ) আদি মধ্যযুগ আদি ঐতিহাসিক যুগের শূদ্রদের ঊর্ধ্বগত সামাজিক গতিশীলতার প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চট্টোপাধ্যায় আঞ্চলিক রাষ্ট্রগঠনের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার এক প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন যা নতুন অঞ্চলের মধ্যে বর্ণব্যবস্থার বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত এবং যার ফলশ্রুতি হল ধর্মীয় বিশ্বাস বা পূজাপদ্ধতির একীভবন ও অধিকারভুক্তিকরণ - যাকে তিনি মুখ্য ঐতিহাসিক সামাজিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। আদি মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক সংগঠন এক নতুন গতিপথ পেয়েছে অপর এক ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দ্বারা যাঁরা পূর্ববর্তী আদি ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ধারণার বিরোধিতা করেছেন। এই গোষ্ঠীর কর্ণধার ছিলেন বার্টন স্টেইন। স্টেইনের আদি মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক সংগঠনের ধারণা দক্ষিণ ভারতের ভৌগলিক এলাকার দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক ক্ষেত্র বর্ণনার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আদি মধ্যযুগের প্রাসঙ্গিকতায় দক্ষিণ ভারত ছিল এমন একটি অঞ্চল যার জটিলতা এবং পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সহজলভ্যতা ঐতিহাসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্টেইনের তত্ত্ব জন মিডলটন ও ডেভিড টেট কর্তৃক পেশ করা পিরামিডাকৃতি ও বিভিন্ন বৃত্তাংশে বিভাজিত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। স্টেইন আদি মধ্যযুগে স্তরবিন্যাসহীন পারস্পরিক আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ কৃষিসমাজের অস্তিত্বকে গ্রহণ করেছেন যে সমাজ অসংখ্য বৃত্তাংশে বিভাজিত এবং পরস্পরবিরোধী অন্তর্নিহিত উপাদানের দ্বারা সমতা রক্ষিত। এগুলি সামগ্রিকভাবে এমন এক ভিত্তি স্থাপন করেছে যার উপর বৃত্তাংশে বিভক্ত রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠিত। স্টেইনের মতে বৃত্তাংশে বিভাজিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

ক) যথার্থ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং আচার-অনুষ্ঠানগত সার্বভৌমত্ব নিয়ে গঠিত দ্বৈত সার্বভৌমত্ব, যা প্রথম প্রস্তাবিত হয়েছিল রবার্ট লিঙ্গাট কর্তৃক, যা রাজধর্মের ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি হচ্ছে রাজতন্ত্রের নৈতিক ক্ষেত্র যা যোদ্ধা-নায়ক হিসেবে সক্রিয় রাজার ভাবমূর্তির বিপরীত।

খ) 'কেন্দ্রে'র সংখ্যাধিক্য এবং প্রতিটি কেন্দ্র রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন নির্দিষ্ট অংশের উপর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তাদের মধ্যে একটি অন্যগুলির উপর আচার-অনুষ্ঠানগত সার্বভৌমত্বের উৎস স্বরূপ অপরের উপর কর্তৃত্ব করে।

গ) শুধু প্রাথমিক কেন্দ্রে নয় প্রত্যেক বৃত্তাংশের মধ্যে বিশেষজ্ঞ কর্মচারীগণ কর্মরত থাকবেন।

ঘ) পিরামিডাকৃতি সংগঠনসহ বৃত্তাংশে বিভাজিত রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অধীনস্থ স্তর বা 'অঞ্চল', যা ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের বিপরীত, তা কেন্দ্র এবং বিভাজিত অংশের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ।

স্টেইনের গবেষণা প্রধানত চোল রাষ্ট্রের উপর নিবদ্ধ যেখানে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর আচার-

অনুষ্ঠানগত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত যখন প্রকৃত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিটি অংশের উপর পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত যাদের প্রধান (Chief) বা 'ক্ষুদ্র রাজা' সে অধিকার ভোগ করেন।

এই তত্ত্ব আর. চম্পকলক্ষ্মী এবং কেশবন ভেলুথাট প্রমুখ গবেষকগণ, যাঁরা আদি মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের উপর প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করেছেন, তাঁদের দ্বারা নিম্নোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হয়েছে।

ক) প্রকৃত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং 'আচার-অনুষ্ঠানগত কর্তৃত্বে' রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিভাজনের ধারণা 'leads to a confusion between the ideal and the actual in terms of the ground reality of political authority in the context of early medieval India, or for that matter the early historical phase'

খ) সীমাবদ্ধ বৈবাহিক এবং আত্মীয়তার বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত সংকীর্ণ রাজ্যাংশের সামাজিক বন্ধনের উপর ভিত্তি করে আদি মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের নাড়ু বিভাজনের উপর স্টেইনের আলোচনা সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নি। নাড়ুর অধীনস্ত সামরিক একক বা নাড়ুর বৈশিষ্ট্যও যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নি।

গ) কেন্দ্রের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যেকটিতে নিজেদের কর্মচারী নিয়োগের বিষয়টি সম্পর্কে স্টেইনের ধারণা সত্য বলে অনুমোদনযোগ্য নয়।

ঘ) পরিশেষে, স্টেইন কৃষকসমাজের মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সুতরাং বার্টন স্টেইনের তত্ত্ব আদি মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে না। স্বাভাবিকভাবে আদি ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে আদি মধ্যযুগীয় পর্যায়ে পরিবর্তন উপলব্ধি বা ব্যাখ্যা করার জন্য এই তত্ত্ব বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এছাড়া এই তত্ত্ব আদি মধ্যযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশ করে না।

স্টেইনের চোল রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা হিসেবে বৃত্তাংশে বিভাজিত রাষ্ট্রের নমুনাকে আর. চম্পকলক্ষ্মী বাতিল করেছেন এবং তিনি চোলযুগে তামিলকম প্রসঙ্গে আদি মধ্যযুগের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যা সামন্ততন্ত্রের সমর্থকরা কল্পনা করেছিলেন তা গ্রহণ করেছেন। ১৯৯৫ সালে চম্পকলক্ষ্মী আদি মধ্যযুগীয় পর্যায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করেছেন সেগুলি হল প্রাক-চোল যুগে যা ছিল তার থেকে সমাজ ও অর্থনীতিতে পরিবর্তন, অনেক বেশি স্তরবিন্যস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত পৃথক সমাজ, ভূমির উপর অধিকারের নমুনার পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ। বিভিন্ন বাহ্যিক গঠন এবং ক্ষমতার উপব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। চম্পকলক্ষ্মীর ভাষায়, "The evolution of Tamil macro-region and regional culture coinciding with the evolution of the mature Chola state another dimension to the study of medieval state societies namely, the study of culture region. For, in the early medieval context, that is, the post-Gupta period, the evolution of distinctive culture regions coincided with the formation of regional states as in the case of Orissa under the Eastern Ganges and Tamil Nadu under the Cholas." তিনি স্বীকার করেছেন যে, ব্রাহ্মণ অথবা ব্রহ্মদেয়দের ভূমিদান একটি প্রতিষ্ঠানগত চরিত্র অর্জন করেছে দক্ষিণ ভারতে ও অন্ধ্রে চতুর্থ শতাব্দীর পর এবং তামিলনাড়ুতে সপ্তম শতাব্দীর পর। জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার বৃদ্ধি, ক্রমোচ্চ স্তরে নাড়ু প্রধানদের কর্তৃত্বের বিকাশ, বলিষ্ঠ কৃষকগোষ্ঠীর জন্য তিনি বিগত দিনের স্থিতিশীল পরিকাঠামোর অবক্ষয়ের কথা বলেছেন। এটি সামরিক পাট্টা নেওয়া ভূসম্পত্তি এবং মন্দিরের ইজারা নেওয়া বৃদ্ধির আকারে কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে যা বিভিন্ন স্তরের ভূস্বামীদের উত্তেজনার কারণ হয়েছে তেমনি ভূস্বামী এবং অধীনস্থ কৃষকদের মধ্যেও উত্তেজনার সঞ্চার করেছে। এছাড়া নির্যাতনমূলক বর্ধিত করের বোঝা কৃষকদের উপর পড়লে সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হয়। জাত এবং মন্দিরকেন্দ্রিক ritual ranking আদি মধ্যযুগীয় তামিলকম সমাজে অপর এক ধরনের সামাজিক পৃথকীকরণ ঘটিয়েছিল। আদি মধ্যযুগে আর এস শর্মার বিনগরায়ণ (deurbanization) তত্ত্বের বিপরীতে

চম্পকলক্ষী সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত আদি মধ্যযুগের নগরায়ণের পক্ষে কথা বলেছেন যদিও সেই যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য সমশ্রেণিভুক্ত নগরায়ণ প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয় না। চম্পকলক্ষী তাঁর পরবর্তী কাজে প্রতিষ্ঠান বা পরিকাঠামোগত আকৃতির মধ্যে মন্দিরকে গ্রাম্য-নাগরিক জীবনের মুখ্য বিষয় হিসেবে বর্ণনার মাধ্যমে এই নতুন নগরায়ণ প্রক্রিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আদর্শগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নারায়ণন ও ভেলুথাটের সঙ্গে চম্পকলক্ষী একমত যে মন্দিরকেন্দ্রিক ভক্তি ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক পার্থক্য অতিক্রম করে এক সার্বজনীন আকৃতিতে বিকশিত হয়েছে এবং সাধারণ কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সমাজ ও রাজনীতির পুনর্গঠন এবং রাজকীয় ক্ষমতার চিহ্নিতকরণের জন্য চম্পকলক্ষীর নিজস্ব গবেষণা তাঁকে এই সিদ্ধান্তে এনেছে যে ধর্মের ক্ষেত্রে মন্দির অধ্যাদেশ এবং নতুন কিছু প্রবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু।

যাই হোক, স্টেইনের স্তরবিন্যাসজনিত নমুনা বাতিল করলেও চম্পকলক্ষী আদি মধ্যযুগে তামিলকমে বিশেষত চোল ঐতিহাসিক পর্যায়ে এমনকি সামগ্রিকভাবে আদি মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাস ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের সমর্থকগণ কর্তৃক প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সতর্ক হয়েছেন।

তিনি লিখেছেন যে, রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির পঠনপাঠন এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে মধ্যযুগের রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, তত্ত্ব, নমুনা প্রভৃতি গুরুত্বসহকারে বিচার করা উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে, "...Studies of a micro level nature based on refined statistical methods and historical geography have partially met this need. Neither the segmentary state nor feudalism have been found adequate in explaining the South Indian state and society over the long period of Pallava-Chola rule, that is, over 600 years." এ সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে চোল রাষ্ট্রের বিবর্তন (১১১৮-১২৭৯ খৃঃ) এক 'কৃষি সংকট'-এর মুখোমুখি হয় যার কারণ ছিল ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক পৃথকীকরণ, ব্যক্তিগত ভূমির মালিকানা, 'মন্দির' নগরায়ণ এবং প্রধানদের ক্ষমতার পুনরুত্থান। এই পরিবর্তনগুলিকে 'রাজনৈতিক সামন্ততন্ত্রীকরণ'-এর দিকে অগ্রসর হওয়া বলা যেতে পারে। চোল রাষ্ট্রের শেষ তিন পর্যায়ের বিবর্তনমূলক বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে আদি মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক জটিলতার কথা উল্লেখ করেছেন যা উপর থেকে কোন বিমূর্ত তত্ত্ব বা নমুনা আরোপ করে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক সামন্ততন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া সুব্বারাইয়ালু এবং জেমস হিটজম্যানের প্রদর্শিত পথ ধরেই এগিয়েছে।

সুব্বারাইয়ালু এবং হিটজম্যান চোল রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন তা হল 'আদি রাষ্ট্র' (Early State) যার সংজ্ঞা এইচ ক্লেসেন ও পিটার স্কালনিকের অনুসৃত পথেই নিরূপিত হয়েছে। আদি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হিসেবে তারা বলেছেন, এক জটিল স্তরবিন্যস্ত এবং অন্তত দুটি স্তরে বিভক্ত সমাজের মধ্যে অথবা উদীয়মান শ্রেণি যেমন শাসক ও শাসিত, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে প্রথমটির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও দ্বিতীয়টির করদানের বাধ্যবাধকতার দ্বারা এবং যা একটি সাধারণ আদর্শ দ্বারা বৈধতাপ্রাপ্ত ও যার মূল নীতি হল পারস্পরিকতা, তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন হল আদি রাষ্ট্র। যদিও এটি আদি পর্যায়ের 'রাজনৈতিক সামন্ততন্ত্র'কে তুলে ধরে তা সত্ত্বেও এটি খুবই সরল এবং সুব্বারাইয়ালু ও হিটজম্যান চোল রাষ্ট্রের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এই নমুনা প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু চোল রাষ্ট্র বা আদি মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতের সমগ্র দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করার উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত নন।

দক্ষিণ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আদি মধ্যযুগীয় অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করার জন্য আবার সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বে ফিরে আসা যেতে পারে। কেশবন ভেলুথাট এব্যাপারে নোবার্ণ কারাশমা কারাশিমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন।

এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততন্ত্রকে উপলব্ধি করার জন্য কারাশিমা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও পরিশুদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে চারটি মূল বৈশিষ্ট্য আছে যা সামন্তসমাজের প্রেক্ষাপটে আদি মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতের অবস্থা সঠিকভাবে বর্ণনা করে। সেগুলি হল-

১) মূল প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীরা দাস নয়, কৃষক যারা উৎপাদনের উপায়ের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

২) স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সম্পদশালী ব্যক্তি যারা কৃষকদের চাষ করা জমির উপর উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এরা কৃষকদের নিজেদের অধিকারে আনে এবং অর্থনীতি বহির্ভূতভাবে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছিনিয়ে নেয়।

৩) রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসগত পরিকাঠামো অধিগ্রহণ করে যা শাসকশ্রেণির মধ্যে ভূমিদান এবং কতিপয় আদর্শ দ্বারা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

৪) পণ্যসামগ্রী উৎপাদন সার্বজনীন নয়, উদ্বৃত্ত অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা শোষকশ্রেণির দ্বারা অধিগৃহীত হয়।

দক্ষিণ ভারতের নায়ক যুগের জন্য কারাশিমা এইসকল বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছেন। ভেলুথাট চোল সমাজের প্রসঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি যথাস্থানে রাখার চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, কারাশিমা কর্তৃক কথিত প্রথম বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একমত হয়ে ভেলুথাট দেখেছেন যে, আদি মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের মুখ্য উৎপাদকরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত স্বাধীন যা তাঁর মতে সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। একই সময়ে তিনি দেখেছেন বেশ বড় আয়তনবিশিষ্ট শ্রমশক্তির অস্তিত্ব যা ভূমিদাসদের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি উল্লেখ করেছেন শ্রমকর থেকে পণ্যের মাধ্যমে উৎপাদন-করে ক্রমশ পরিবর্তন উভয়েই সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার আদর্শ দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, ভেলুথাট চোলযুগে বিশেষত প্রথম রাজরাজের আমলে বহু সংখ্যায় ভূসম্পত্তির অধিকারী সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের কথা বলেছেন। তাঁর যুক্তি হল, এই ভূসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদক না হওয়া সত্ত্বেও, তারা কৃষক কর্তৃক চাষ করা জমির উপর কিছু উচ্চ অধিকার ভোগ করতেন।

ক্রমশ জমির উপর বিভিন্ন অধিকারের মাত্রা বা স্তর সৃষ্টি হতে থাকে। উভয় অধিকারই উপর থেকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এবং যা অভ্যন্তরেও বিবর্তিত। এই সমস্ত ভূম্যধিকারী ব্যক্তিরা নানাবিধ প্রশাসনিক, বিচারবিষয়ক, অর্থবিষয়ক অধিকার প্রয়োগ করতেন। ভেলুথাট আদি মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারতে প্রশাসনিক ও বিচারবিষয়ক দপ্তরকে বেশি মাত্রায় বিকেন্দ্রীভূত বলেছেন এবং এই পরিস্থিতিতে করস্থাপন ও আদায় অর্থনীতি-বহির্ভূত বলপ্রয়োগের প্রকৃতি গ্রহণ করেছিল। আইন, ধর্ম ইত্যাদির চাপ দিয়ে বার্ষিক কর বলপূর্বক আদায় করা হত।

সুতরাং ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সমাজ ছিল প্রকৃতপক্ষে জমির অধিকারগত স্তরবিন্যাসের প্রতিফলন। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন পদমর্যাদার ক্রমোচ্চ স্তর সামাজিক ও আচার-অনুষ্ঠানগত রাষ্ট্রের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। এই পরিকাঠামোয় জাতি ছিল প্রধান অবলম্বন যা বর্ণাশ্রমধর্ম ও ভক্তির আদর্শ দ্বারা গ্রথিত ছিল। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল জমির উপর অধিকার প্রসঙ্গে প্রভু ও অধীনস্থ প্রজার সম্পর্কের প্রতিফলন। ধর্মীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলায় আদর্শ ও সাংস্কৃতিক প্রস্ফুটন অন্যান্য উন্নতির উপাঙ্গ স্বরূপ।

পরিশেষে, ভেলুথাট পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, আদি মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে উৎপাদন ছিল সীমিত, যাকে মার্কস সামান্য উৎপাদন (petty-production) বলে অভিহিত করেছেন এবং যা বাজারের জন্য প্রেরণ করা হোত না। তবে সেখানে স্পষ্টত উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছিল, যা শোষকশ্রেণি অধিগ্রহণ করত। কারিগর কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বেশিরভাগ জনগণ ভোগ করত এবং সেগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরায় আবর্তিত হত না। সুতরাং বদ্ধ গ্রাম্য অর্থনীতির প্রাচীর অক্ষুণ্ণ ও অটুট ছিল।

ভেলুথাটের ভাষায়, "On the whole therefore, it would appear that the best description of

society and polity in medieval South India would be that is was feudal." কিন্তু তাঁর বিশ্বাস বা ধারণা সময়-স্থানের আপেক্ষিকতার এক সুষম গ্রহণযোগ্যতাকে স্বীকার করেছে। তিনি স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন, "However, in saying this one need not assume that there was a one-to-one correspondence between the archetypal feudalism of, say, France and that of South India." অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও একই প্রকার গবেষণা প্রয়োজন। আদি মধ্যযুগীয় পর্যায়ের বাংলা ও রাজস্থানের উপর কিছু গবেষণা হয়েছে। যাই হোক মুখ্য গবেষকগোষ্ঠীর মতামত উপরে আলোচিত হয়েছে।

আদি মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে কারণগত উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মুখ্য মতামত আমরা আলোচনা করেছি। দেখেছি ইতিহাসের বিভিন্ন বিচিত্র দৃষ্টরূপ বা আকৃতি প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে এটি নির্ণয় করা সম্ভব নয় যে তাঁরা প্রত্যেকে বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্য থেকে কোনগুলিকে কারণগত উপাদান হিসেবে দেখাতে চান। কারণগত উপাদানগুলি প্রায়শই বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয় না। তাই বলা যায় যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন সেগুলি আদি মধ্যযুগীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য আবার সেগুলিই ছিল পরবর্তী কোন পর্যায়ের কারণগত উপাদান।

২.৭ অনুশীলনী

১) 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' এবং 'নিচু থেকে সামন্ততন্ত্রে'র পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশে ডি ডি কোশাম্বীর বক্তব্য আলোচনা করুন।

২) ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আর এস শর্মার ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

৩) আদি মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল?

৪) 'আদি মধ্যযুগীয় ভারতে'র ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. R.S. Sharma : Indian Feudalism
2. Kesavan Veluthat : The Political Structure of Early Medieval South India
3. B.D. Chattopadhyay : The Making of Early Medieval India
4. V.K. Thakur : Historiography of Indian Feudalism
5. Burton Stein : Peasant State and Society in Medieval South India
6. D.C.Sarkar (ed.) : Land System and Feudalism in Ancient India
7. Do : Landlordism and Tenancy in Ancient India and Medieval India as Revealed by Epigraphic Records
8. R.S.Sharma : Social Changes in Early Medieval India
9. Do : Urban Decay in India, c.300 - c. 1000
10. B.D.Chattopadhyay : Aspects of Rural settlements and Plural Society in Early Medieval India
11. R.Champakalakshmi : Trade, Ideology and Urbanization : South India 300 BC to 1300 AD

একক ৩ ❑ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে বিতর্ক এবং ইতিহাসচর্চা

গঠন :

৩.০ ভূমিকা

৩.১ বিতর্কে হরবংশ মুখিয়ার অবদান

৩.২ ইরফান হাবিব এবং ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণা

৩.৩ বি.ডি.চট্টোপাধ্যায় এবং আদি মধ্য ভারতের সত্তা

৩.৪ ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যাকার : আর.এস.শর্মা এবং ডি. এন. ঝা

৩.৫ উপসংহার

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসে আদি মধ্যযুগের প্রকৃতি প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের এ যুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বোক্ত আলোচনা তাঁদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত করেছে, বিশেষত আদি মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক পর্যায় কি সত্তার দ্বারা গঠিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদি মধ্যযুগ মনে করা কি আদৌ প্রয়োজনীয় ছিল? ডি সি সরকার এবং হরবংশ মুখিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগকে পৃথক বন্ধনীর মধ্যে রেখেছেন এবং এই দুই যুগের মধ্যে আদি মধ্যযুগের বিচ্ছিন্নতার কথা সামান্যই উল্লেখ করেছেন। সরকারের মতে, গুপ্তশাসনের পরবর্তী শতাব্দীতে বাণিজ্যের তেমন অবনতি হয় নি, যদিও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে ধাতুমুদ্রার চলাচল অনেকটা কমে গিয়েছিল। ধাতুমুদ্রার স্থলে কড়ির মাধ্যমে আদানপ্রদান চলত। তিনি যুক্তিসহ দেখিয়েছেন যে সমুদ্রপথে ভারতের সঙ্গে আরবদেশের সম্পর্ক সমুদ্র ও স্থলপথে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গুপ্তোত্তর যুগে ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃষি প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি হল যদিও সেখানে জমিদারতন্ত্র ছিল, তবুও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা গ্রামের জনগণকে বেঁধে রাখে নি। সুতরাং আদি ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে 'সামন্ততন্ত্র' শব্দটি ভুল অর্থে প্রযুক্ত। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বকে বাতিল করে ডি.সি.সরকার ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন-অর্থনীতি এবং ভূমি ব্যবস্থার চলমানতাকে মেনে নিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর যুক্তি হল ভারতীয় সামন্ততন্ত্র জমিদারতন্ত্র থেকে পৃথক নয় এবং যা ভারতের সমগ্র প্রাক-ঔপনিবেশিক ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ডি. সি. সরকারের মত হল, গুপ্তোত্তর যুগে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কোন পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল না। তাই তাঁর বক্তব্যে কোন নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ের উল্লেখ নেই। ভারতীয় ইতিহাসের পরিবর্তনের উপাদানগুলিকে মেনে নিতে যে সকল ঐতিহাসিক অনিচ্ছুক তাঁদের সমালোচনা করেছেন ডি. এন. ঝা। শচীন্দ্রকুমার মাইতি প্রাচীন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিব্যবস্থা এবং কৃষিসম্পর্কের বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীন ভারতে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র ও ম্যানরপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে বিশাল ভূসম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে পুরোহিতদের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যদের হাতে ক্রমশ সঞ্চিত জমি এক ধরনের ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণির বিকাশে সাহায্য করেছিল যাঁরা পরবর্তীযুগে জমিদার হিসেবে অভিহিত হন।

মাইতি কৃষি সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে একটি স্পষ্ট ক্রমোন্নতির উল্লেখ করেছেন যা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সমর্থকদের দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। তবে তিনি এই বিষয়টির যুক্তিসঙ্গত উপসংহারে আসেন নি অথবা তাঁর তত্ত্বে নতুন ঐতিহাসিক পর্যায়ের আবির্ভাবের প্রত্যক্ষকরণ ঘটে নি।

বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়, আর. চম্পকলক্ষী, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং এম. আর. তরফদার প্রমুখ চলমান বাণিজ্য, মাধ্যম হিসেবে বিকল্প বিনিময়মুদ্রা এবং দূর দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সাক্ষ্যপ্রমাণাদি অন্বেষণে রত হয়েছেন। চট্টোপাধ্যায় গুপ্তোত্তর যুগে পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং নগরকেন্দ্র সম্পর্কিত লেখমালার সাক্ষ্য অন্বেষণ করেছেন। অপরদিকে চম্পকলক্ষী দক্ষিণ ভারতের প্রসঙ্গে মন্দির-নগর ও বাণিজ্যিক সমাবেশের কথা বলেছেন। ব্রতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রৌপ্যমুদ্রার প্রবহমানতার উপর জোর দিয়েছেন এবং এম.আর.তরফদার একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন ও অপরদিকে আরব জগতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের যোগসূত্রের প্রসঙ্গ তুলে উক্ত সাক্ষ্যকে সমর্থন করেছেন।

গুপ্তোত্তর যুগে বাণিজ্যের প্রবহমানতা সম্পর্কিত ডি.সি.সরকারের বক্তব্য ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত 'Indian Feudalism Retouched' প্রবন্ধে আর.এস.শর্মা সমালোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের প্রাচীন ভারত অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে বিজয় ঠাকুর এম. আর. তরফদারের গবেষণাকে সমালোচনা করেছেন। ঠাকুর দেখিয়েছেন যে, গবেষণায় উল্লিখিত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় দূর-বাণিজ্যের সহায়ক অবস্থা আদৌ বাস্তবসম্মত বা সাক্ষ্যপ্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, গুপ্তোত্তর যুগে নগর কেন্দ্রের উত্থান এবং প্রবহমানতা ছিল। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযুক্ত করেছেন যে, এই নগরকেন্দ্রিকতার ধর্মনৈতিক পটভূমিকা ছিল এবং এর উত্থান ঘটেছিল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী থেকে। তিনি আরও বলেছেন যে, আদি মধ্যযুগের বাংলায় কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণ বৃদ্ধির মধ্যে এইরূপ বাণিজ্যিক ঘটনা এবং নগরকেন্দ্রিকতার শুধুমাত্র প্রান্তীয় গুরুত্ব আছে। ঠাকুর তরফদারের গবেষণা বাতিল করে দিয়েছেন। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সমর্থক হিসেবে বিজয় ঠাকুর আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত এবং জটিলতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের অন্বেষণের উপর জোর দিয়েছেন। আমরা দেখব যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে আদি মধ্যযুগের এই জটিল বিষয় নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সুষম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

৩.১ বিতর্কে হরবংশ মুখিয়ার অবদান

হরবংশ মুখিয়ার প্রবন্ধ 'Was there Fudalism in Indian History?' -তে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক থেকে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ধারণার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যদিও তা বিতর্কের পরিধিকে বিস্তৃত করে প্রশ্ন তোলে, যে প্রশ্ন প্রশাসনিক বিষয়কে অতিক্রম করে যা এযাবৎকাল ভারতে সামন্তসমাজ গঠনে প্রতিনিধিত্ব করে আসছিল। সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে স্বাধীন কৃষি অর্থনীতির ধারণা তৈরি হয়েছিল, যা মধ্যযুগের ভারতকে মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতি ও সমাজ থেকে পৃথক করেছিল। মুখিয়া এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতকে সামন্ততান্ত্রিক বলা যায় না। যা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধারণা, যেখানে সামন্ততন্ত্রের নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল প্রভুর উপর সমগ্র কৃষক সমাজের নির্ভরশীলতা। কিন্তু, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল স্বনির্ভর অথবা মুক্ত কিংবা স্বাধীন কৃষি উৎপাদন।

মুখিয়ার প্রাথমিক যুক্তি হল যে সামন্ততন্ত্রকে কি স্পষ্টত পুঁজিবাদের মত বিশ্বজনীন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা

যায়? প্রকৃতপক্ষে মুখিয়া যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা হল সামন্ততন্ত্রের ধারণা মার্কসীয় কল্পনায় পুঁজিবাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে এসেছে এবং তা তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং প্রাথমিক উৎপাদক শ্রমিকশ্রেণির উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনকারী হিসেবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করেছে। মুখিয়ার মতে সামন্ততন্ত্রের ধারণা একধরনের অর্থনীতি বহির্ভূত বলপ্রয়োগের আকারে পুঁজিবাদের বিপরীত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রকে তার নিজস্ব পরিভাষায় সংজ্ঞা দেওয়া যায় না কিন্তু পুঁজিবাদের বিপরীত হিসেবে মনে করা যায়।

মুখিয়া এরপর ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করে তিনি মৌর্যোত্তর যুগের ভারত ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছেন। এখানে যে কৃষি প্রেক্ষাপট দেখেছেন তাকে তিনি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। যেমন,

১) প্রাকৃতিক সম্পদযুক্ত জমি এবং আপেক্ষিক উন্নত যন্ত্রপাতি এবং কৌশলের দ্বারা পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদন।

২) আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র জমি যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের অপচয়কে এড়িয়ে যেতে পারে যেমন ঘটেছিল ইউরোপে। তিনি বলেছেন যে শর্মা এবং যাদব তাঁদের সাক্ষ্যপ্রমাণাদির সাহায্যে এই উপসংহারে এসেছেন যে দাসপ্রথা ভারতে কোন প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাই শূদ্র কৃষক মধ্যযুগীয় ইউরোপের পরাধীন ভূমিদাসদের সমকক্ষ ছিলনা।

৩) জলবায়ুগত কারণে জীবনধারণের নিম্ন মান।

৪) প্রাক-ঔপনিবেশিক বা প্রাক-আধুনিক ভারতে স্বাধীন কৃষি উৎপাদন থাকার কারণ ছিল উৎপাদনের উপায় এবং প্রক্রিয়ার উপর কৃষকদের আধিপত্য। স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর বা কৃষকদের চলাচলের উপর বাধানিষেধ মুখিয়ার মতে, ভারতে তখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। জমি বা শ্রমের বাজার না থাকায় কৃষকরা এই আইনত অধিকার ভোগ করত কিনা তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কৃষকদের নিজেদের জমি, লাঙল ও শ্রমের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এই কারণেই মুখিয়া স্বাধীন কৃষি উৎপাদনের ধারণা পোষণ করেছেন। কৃষি উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন কৃষক ক্রমশ মৌর্যোত্তর যুগে বিবর্তিত হয়েছে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের কৃষি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

যাই হোক অপর বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি স্বীকার করেছেন,

৫) সামাজিক স্তরবিন্যাস, বিশেষত জাত ব্যবস্থা প্রাচীন ও মধ্যযুগে এক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে জাত ব্যবস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল বিশেষত বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের জমি চাষের জন্য কৃষি শ্রমিককে সহজলভ্য করতে।

তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে,

৬) কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং

৭) প্রাক-আধুনিক যুগে কৃষি অর্থনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপারে মুখিয়া বলেছেন যে, যখন বৌদ্ধ সাহিত্যে বৃহৎ খামারের কথা বলা হয়েছে এবং অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রীয় খামারের কথা বলা হয়েছে যেখানে শ্রমিক ও কৃষকরা কর্মরত থাকত, তখন কিন্তু গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর যুগের উপাদানগুলি এই সমস্ত খামারের কথা উল্লেখ করেনি। পরিবর্তে সেখানে শূদ্ররা ক্ষুদ্র উৎপাদকে রূপান্তরিত হয়েছে। অপর বৈশিষ্ট্য হল কৃষির বিস্তার এবং শূদ্রের কৃষকে রূপান্তরিত হওয়া।

৮) মুখিয়া আরও বলেছেন যে, অত্যধিক উর্বরতা, জীবনধারণের নিম্নমান এবং স্বাধীন কৃষি উৎপাদন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে আপেক্ষিক স্থিতাবস্থা এনেছিল। উৎপাদনের উপায়, পদ্ধতি বা উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্য সেখানে খুবই অল্প সামাজিক প্রচেষ্টা বা উত্তেজনা ছিল বা আদৌ ছিল না।

৯) মুখিয়ার মতে প্রাক - ব্রিটিশ যুগে ভারতে যে সংঘাত অর্থনৈতিক ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ছিল, সে সংঘাত উৎপাদনের উপায়ের পুনর্বন্টনকে কেন্দ্র করে নয় বরং সে সংঘাত উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বন্টন বা পুনর্বন্টনকে কেন্দ্র করে। প্রথম সংঘাতটি প্রচলিত সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। তাই আর.এস.শর্মা এবং বি.এন.এস. যাদব কর্তৃক উপস্থাপিত সামজিক সংকটের ধারণা মুখিয়া গ্রহণ করেননি।

মুখিয়া মধ্যযুগের ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামন্ততন্ত্রের ধারণাকে গ্রহণ করেননি তেমনি তিনি এশীয় উৎপাদন প্রণালীর তত্ত্বকেও মেনে নেন নি। পরবর্তী তত্ত্ব জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যা সাধারণত একটি ভ্রান্ত ধারণা হিসেবে প্রমাণিত। মুখিয়াকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল গুপ্তোত্তর যুগ থেকে প্রাক-ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত সামাজিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে নতুন যুগ বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ করবেন অথবা প্রাচীন ও মধ্যকে একসাথে মিলিয়ে দেবেন যাকে তিনি সম্পর্কের স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনের উপায় বলে অভিহিত করেছেন। সঠিকভাবে বলা যায় যে মুখিয়া প্রত্যক্ষভাবে আদি মধ্যযুগ বা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বন্ধনীর মধ্যে ভারত ইতিহাসের গতিধারার পরিবর্তনের বিষয় উল্লেখ করেন নি। ইরফান হাবিবের মধ্যযুগীয় ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণার পরোক্ষ উল্লেখ করে তিনি উপসংহারে এসেছেন এবং তিনি বিশেষভাবে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতের নমুনা সংক্রান্ত তত্ত্বের অনুসন্ধানের উপর জোর দিয়েছেন এবং ইতিহাস পাঠে ইউরোপীয় কেন্দ্রাভিমুখীনতা থেকে সরে এসেছেন।

৩.২ ইরফান হাবিব এবং ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণা

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্বের সমর্থক ইরফান হাবিব আদি মধ্যযুগীয় ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততন্ত্রের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ডি. ডি. কোশাম্বী, আর. এস. শর্মা বা বি. এন. এস. যাদব তুলে ধরেছেন, সেগুলির পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। তিনি যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির স্বীকৃতি দিয়েছেন সেগুলি হল রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং বংশানুক্রমিক ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানের মাধ্যমে সার্বভৌম শক্তির আর্থিক অধিকারের হস্তান্তরকরণ, নিয়মিত অর্থ ও বাণিজ্যের সংকোচন এবং নগরের অবক্ষয়। তিনি এ বিষয়ে একমত যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আদি মধ্যযুগ থেকে মধ্যযুগকে পৃথক করে কারণ পরবর্তী যুগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি, পণ্যসামগ্রীর পর্যাপ্ত চলাচলের দ্বারা চিহ্নিত যা পূর্বেকার সামন্ত শাসকশ্রেণিকে জমিদারদের নীচে নামিয়ে আনে। যাই হোক, তিনি আর. এস. শর্মার মত দাসপ্রথাকে এককভাবে সার্বজনীন কৃষিশ্রম বা কৃষকশ্রেণি হিসেবে বেছে নিতে সতর্ক ছিলেন এবং তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন তা হল "existence of both peasant cultivation and use of semisurvil hired labour as alternative means of rent extraction, along with the menial ostracized castes who were compelled to offer labour on the field of others as another victim to rent extraction." দ্বিতীয়ত, তিনি কোশাম্বীর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যেখানে কোশাম্বী ভারতে ম্যানর প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি একটি বিষয়ে শর্মা ও অন্যান্যদের মতের বিরোধী যখন তাঁরা দেশীয় সমাজ এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে আদি মধ্য থেকে মধ্যযুগে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পতনের জন্য আভ্যন্তরীণ কারণকে দায়ী করেন। ইরফান হাবিবের মতে, দিল্লীর সুলতানগণ কর্তৃক

বহির্বিজয় ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে নতুন আকার দিয়েছে। তিনি এ বিষয়ে একমত যে বহিরাগত অনুপ্রবেশের ফলে ঘটিত এই ধরনের উগ্র পরিণতি আদি মধ্য ভারতের জন্য এক ধরনের 'nondialectic project' মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি বলেছেন যে প্রথমতঃ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে কোনটি বহির্দেশীয় এবং আধুনিক রাজনৈতিক সীমান্ত আভ্যন্তরীণ থেকে বহির্দেশীয় পৃথক করতে পারে কিনা। দ্বিতীয়ত, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সকল সামাজিক পরিবর্তন আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের ফলশ্রুতি নয়।

পরিশেষে ইরফান হাবিব বলিষ্ঠভাবে মন্তব্য করেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সকল প্রকার সমালোচনামূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র মধ্যযুগের পূর্ববর্তী যুগের অর্থনৈতিক গঠনের একমাত্র বিদ্যমান ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন যে এখনও ঐ যুগের আর্থ-সামাজিক বাহ্যিক গঠন ম্লানভাবে প্রজ্জ্বলিত এবং নির্দিষ্ট সম্পত্তিগত সম্পর্ক, বৈপরীত্য এবং আদর্শ ঐকান্তিক ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে অনুসরণ করতে হবে।

৩.৩ বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় এবং আদি মধ্য ভারতের সত্তা

আমরা দেখেছি যে বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় ভারত ইতিহাসের আদি মধ্যযুগীয় পর্যায় উপলব্ধি করার জন্য আঞ্চলিকতা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলির উপর জোর দিয়েছেন। তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণাদির দ্বারা প্রধান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলি শনাক্তকরণের এবং নির্দিষ্ট জাগতিক ও স্থানসংক্রান্ত প্রসঙ্গে তাদের কেলাসিতকরণের গুরুত্বের দিকে নির্দেশ করেছেন। এইসব প্রধান ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ সাক্ষ্যপ্রমাণাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নতুবা যে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তা তাঁর ভাষায় 'বিধিবহির্ভূত বিমূর্তন' বা 'arbitrary abstraction'। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে অঞ্চল গঠনের প্রক্রিয়ার প্রধান বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে যা তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ থেকে ছয় শতাব্দী পূর্বে দেখা গিয়েছিল যদিও তা ওই সময় শুরু বা শেষ হয় নি। বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়ের আদি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত মতামত আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখন শুধুমাত্র প্রধান বিষয়গুলি যা নিয়ে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ধারণার সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য আছে সেগুলি উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, তিনি এইমত পোষণ করেন যে, আদি মধ্যযুগীয় ভারতে স্থানীয় বা উপআঞ্চলিক অথবা আঞ্চলিক রাষ্ট্রগঠন প্রচলিত রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অংশবিশেষ থেকে উদ্ভূত হয় নি। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর সুপ্রতিষ্ঠা বিভিন্ন মাত্রার পরিবর্তন বোঝায়। তৃতীয়ত, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কৃষি সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে কৃষকদের গঠন, মর্যাদা ও কৃষিশ্রম ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে শূদ্র শ্রেণিগোষ্ঠীর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত। তিনি আঞ্চলিক সামাজিক স্তরবিন্যাসগত সমস্যার উপর জোর দিয়েছেন যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল আঞ্চলিকভাবে স্বীকৃত কৃষকগোষ্ঠী যারা গুপ্তোত্তর যুগের পূর্বে বর্ণসমাজের বৈশিষ্ট্যভুক্ত ছিল না তাদের অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য। সুতরাং চট্টোপাধ্যায় ধর্মশাস্ত্রীয় বর্ণের বাহ্যিক গঠন দূরে সরিয়ে দেওয়ার দিকে জোর দিয়েছেন এবং আদি ঐতিহাসিক সমাজগোষ্ঠীর বাইরে আঞ্চলিক কৃষি পরিকাঠামোর বিবর্তনের গবেষণার কাজে হাত দিয়েছেন।

চতুর্থত, চট্টোপাধ্যায় একইভাবে বর্ণসংকরের উদ্ভব, ভক্তিবাদ এবং তান্ত্রিক মতবাদের আবির্ভাবকে ধর্মশাস্ত্র থেকে বিপথগমন বলে উল্লেখ করতে গিয়ে সামাজিক সংকট, সংঘাত এবং উত্তেজনা সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। বরং এটি ছিল আঞ্চলিক দেশীয় অ-বর্ণবাদ যা অধিকতর বৃহৎ বিশ্বাসের কেলাসিতকরণের পথ দেখিয়েছে এবং যা আদি মধ্যযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় মঞ্চকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কলিযুগের যে সমস্ত

সমর্থকেরা মনে করেন যে ধর্মশাস্ত্রীয় নমুনা আদি মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক পরিস্থিতি বা সমগ্র ভারতীয় সমাজের কেন্দ্রবিন্দু তাকে তিনি সমালোচনা করেছেন। এই মত যে কোন ধর্মশাস্ত্র থেকে বিচ্যুতিকে সামাজিক বিপথগামিতা হিসেবে দেখবে, মূর্ত আঞ্চলিক বাস্তব হিসেবে নয়। চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগের বাংলায় তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রসঙ্গটিকে উদাহরণ হিসেবে এনেছেন এবং স্পষ্ট করে বলেছেন, "instead of assuming that Tantric Saktism made the position of varnasramadharma critical in eastern India, a more contingent quary would have been to understand the reason for the reappearance and pervasiveness of Sakti in eastern India." সুতরাং তিনি আদি মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে আঞ্চলিক উপাদানের উপর জোর দিয়েছেন যা "begin to take shape through local assimilation as well as through the adoption of transregional idiom thereby actually turning the thesis of social crisis resulting due to aberrations against Dharmashastric format to the exact opposite direction."

কিভাবে আদি ঐতিহাসিক সমাজের প্রকৃতি আদি মধ্যযুগীয় সমাজে পরিবর্তিত হল সে সম্পর্কে চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বের সমর্থক গোষ্ঠীর থেকে পৃথক। তবে তিনি এটি স্বীকার করেছেন যে ভারত ইতিহাসের কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে এইসব ঐতিহাসিকগণ যে প্রথম উদ্যোগ দেখিয়েছেন এবং নতুন যুক্তির অবতারণা করেছেন তা প্রশংসনীয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, "continuing with the term 'early medieval', rather than using terms such as 'Local Hindu' or 'Late Classical' has an advantage. This term goes beyond the narrowly political and cultural dimensions of history, and further, it clearly projects continuities in the operation of major societal processes well into later phases of Indian history."

সুতরাং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে আঞ্চলিক সংগঠনকে সাংস্কৃতিক বিবর্তন হিসেবে দেখা হয় যা আলোচ্য যুগের সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির চরিত্রচিত্রণ হতে পারে বা নাও হতে পারে। চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান যুক্তি হল যে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস-চর্চা ক) প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় এবং খ) প্রধানত ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসচর্চা কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল, সেই কারণে তা আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্যহীনতার দোষে দুষ্ট। ভারতীয় প্রাসঙ্গিকতায় এবং ইউরোপ-কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বৈধ যুক্তি দ্বারা প্রধান সামাজিক প্রক্রিয়ার পন্থা অবলম্বনের উপর চট্টোপাধ্যায় জোর দিয়েছেন।

৩.৪ ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ব্যাখ্যাকার : আর. এস. শর্মা এবং ডি. এন. ঝা

১৯৯৭ সালে সামন্ততন্ত্রের উপর বিতর্কে চট্টোপাধ্যায়ের অবদান প্রকাশিত হয় এবং আর. এস.শর্মা নিজেই ২০০১ সালে কিছু বিষয় উত্থাপন করেছেন।

প্রথমত, শর্মা রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও রাষ্ট্রের উত্থান সম্পর্কে তাঁর ভূমিদান সম্পর্কিত তথ্যের বিষয়ে বি.ডি চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আদি মধ্যযুগ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ধারণা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় প্রধানত ভিন্নমত পোষণ করেছেন। শর্মা উল্লেখ করেছেন যে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর এক প্রবন্ধ 'Land System in Medieval Orissa' (c750-1200) -তে উড়িষ্যার প্রসঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেছেন এবং সীমান্ত প্রদেশে এই সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন যে ভূমিদান রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করেছে। তিনি বলেছেন যে গুপ্তোত্তর যুগে উড়িষ্যায় সুপরিচালিত রাষ্ট্র, শ্রেণি বা সমাজের রূপান্তর ঘটেছে এবং উপর থেকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কোন অস্তিত্ব ছিল না। যাই হোক

শর্মা এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে ভূমিদান ব্যবস্থা ক্ষমতাকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করে এবং প্রচ্ছন্ন স্বায়ত্বশাসনের সঙ্গে রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতার ফাঁক সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, শর্মা উল্লেখ করেছেন যে কেন তিনি কোশাম্বীর ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উত্থান সম্পর্কে দ্বি-স্তর তত্ত্ব সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন যে পরবর্তী পর্যায়ে নীচু থেকে সামন্ততন্ত্র সংঘটিত হয় নি, শুরু হয়েছিল প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে। এর কারণ রাজা এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীরা ভূমিদানের নথি রেখে গেছেন প্রস্তরাদিতে লেখা লিপিতে এবং তা থেকে আমরা জানতে পারি যে জমিদারের সৃষ্টি হয়েছে শাসক কর্তৃক। রাষ্ট্রের আশীর্বাদ ছাড়া জমিদারদের উত্থানের সম্ভাবনার মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয়ত, বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত বিতর্ক প্রসঙ্গে শর্মা এই পর্যায়কে বৃত্তাংশে বিভাজনের সমকক্ষ রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে জমি ও তার উৎপাদনের অসমবণ্টন সামাজিক শত্রুতা এবং রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তিনি বার্টন স্টেইনের আচার-অনুষ্ঠানগত এবং জাতিবর্গ নিয়ন্ত্রিত রাজনীতি সম্পর্কিত গবেষণা সমর্থন করেন নি যেখানে স্টেইনের মতে কৃষক এবং ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রেণি মিলেমিশে বাস করে। শর্মা মেনে নিয়েছেন যে ভারতে আদি মধ্যযুগে এইরূপ বৃত্তাংশে বিভাজিত রাজনীতির অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তা ভূমিদানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ভূমিদানের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'The Segmentary Theory and the Indian experience' -এ ভারতীয় পরিস্থিতিতে বৃত্তাংশে বিভাজন সম্পর্কিত ধারণার প্রয়োগকে খন্ডন করেছেন।

চতুর্থত, শর্মা এরপর বিচ্ছিন্নতার ধারণায় ফিরে গেছেন যাকে তিনি বৃত্তাংশে বিভাজনের ধারণার সমকক্ষ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে এই প্রক্রিয়াগুলিকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের শেষ বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করা উচিত নয়। তিনি মার্ক ব্লথের উদাহরণ দিয়েছেন যাঁর কাছে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজন প্রথম বা ধ্রুপদী পর্যায়ে সামন্ততন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় পর্যায় বা অবক্ষয়ের পর্যায়ে কেন্দ্রীকরণ এবং রাজকীয় সার্বভৌমত্বের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তাই শর্মা দেখিয়েছেন যে চিরস্থায়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী বৈশিষ্ট্য হিসেবে নানা অংশে বিভাজনকে তুলে ধরা তাঁর অভিপ্রায় নয়। বস্তুত তিনি বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে উল্লেখ করেছেন যে আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠনের প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপাদানের মিলন বা বিচ্ছেদ উভয়ই হতে পারে। শর্মা 'acculturation'-এর মাধ্যমে ভূমিদানের সংহত ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে সংহতির দিকে লক্ষ্য দিয়েছেন। একথা বলা হয়েছে যে, "fragmentation of political authority at the local level was a divide and rule device to maintain the overall authority of the state over its landed beneficiaries and also the mass of peasantry-albeit in a tenuous manner." শর্মা এখানে উল্লেখ করেছেন যে কেমন করে হেরম্যান কুলকে ভূমিদানের প্রশ্নবোধক ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন এবং একই সময়ে মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সামন্ততন্ত্রীকরণের উপর ও তার ফলশ্রুতিস্বরূপ শাসকের ক্ষমতার অবক্ষয়ের উপর জোর দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে অমীমাংসিত প্রশ্ন বা সমস্যা হল এই যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তি গ্রাহ্য না করে শর্মা ভূমিদানের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে রূপান্তরের একটি বৃহৎ উপাদান হিসেবে ভূমিদান প্রমাণিত। এটি সামন্ততান্ত্রিক ধারায় রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজ এবং অর্থনীতির পুনর্গঠনের দিকে নিয়ে যায়। নতুন প্রতিষ্ঠান ধর্ম, শিল্প, সাহিত্যকে গঠন করে এবং আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দেয়। সে কারণে ভূমিদান প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চমত, চট্টোপাধ্যায়ের মতো শর্মা আঞ্চলিকতাকে আদি মধ্যযুগে রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বস্তুত তিনি স্বীকার করেছেন যে আদি মধ্যযুগীয় সমাজের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করার

অন্যতম পথ হতে পারে আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সত্তার মাধ্যমে। তিনি আঞ্চলিকতার প্রতি চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু তিনি মধ্যযুগীয় প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আঞ্চলিকতা বেমানান ছিল না। তাঁর যুক্তি হল আঞ্চলিক সংগঠনের বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে অঞ্চল অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন রূপ প্রকাশের প্রতিফলন এবং এই সমস্ত পার্থক্য আঞ্চলিক সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর উদ্ভবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নয়। চট্টোপাধ্যায় এবং চম্পকলক্ষীর micro studies এর উপর জোর দেওয়া প্রসঙ্গে শর্মার মত হল সূক্ষ্ম এবং নির্দিষ্ট অভিগমনের একটি মূল্য আছে এবং সূক্ষ্ম বা সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ষষ্ঠত, আদি ঐতিহাসিক থেকে আদি মধ্যযুগে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিনগরায়ণ (deurbanization) একটি মুখ্য উপাদান - শর্মার এই ধারণার সমালোচনার বিরুদ্ধে শর্মা তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে ৫০০ খৃঃ থেকে ১০০০ খৃঃ পর্যন্ত নগরের অবক্ষয়ের সঙ্গে মুদ্রার স্বল্পতা জড়িয়ে ছিল। এই পর্যায়ে দেখা যায় এক ধরনের বাজারবিহীন বা বাজার অর্থনীতির মধ্যে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ। শর্মা নগরকেন্দ্রের অবক্ষয় সংক্রান্ত সাধারণ তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কভাবে বিরত থেকেছেন এবং স্বল্প ব্যবহৃত ধাতুমুদ্রা এবং সুদূরপ্রসারী বাণিজ্যের পতন সংক্রান্ত ঘটনার উপর জোর দিয়েছেন যা আদি মধ্যযুগীয় পর্যায়ে রূপান্তর চিহ্নিত করেছে। নগর ও বাণিজ্যের পতন সর্বতোভাবে ভূমিদান প্রথার জন্য নয়, তাই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সমর্থকগণ আভ্যন্তরীন সামাজিক প্রগতিশীলতার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন যা আদি মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক পর্যায়ের ব্যাখ্যা হিসেবে কলিযুগের প্রসঙ্গ এনেছে। তবুও শর্মা বাণিজ্য ও নগরের অবক্ষয় দিয়ে শুরু করেছেন যখন তিনি আদি ঐতিহাসিক থেকে আদি মধ্য পর্যায়ের রূপান্তরের সমগ্র প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্তসার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "Fewer towns, less trade and cash money suggest economic stagnation leading to land grants. Although grants promoted agrarian expansion and agricultural production, trade continued to suffer because agricultural surplus was mainly diverted to support religious constructions and the production of idols." শর্মা সামাজিক সংকটের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন যা কলিযুগকে চিত্রায়িত করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে একদিকে প্রভাবশালী ভূম্যধিকারী মধ্যবর্তী শ্রেণির উত্থান ও অপরদিকে অধীনস্ত কৃষকশ্রেণি যারা কর, শ্রম এবং নজরানার ভারে জর্জরিত, তারা অবিরাম সামাজিক উত্তেজনা ও সংঘাতের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এই বিষয়টি পুনরায় তাঁর সঙ্গে বি.ডি চট্টোপাধ্যায়ের বিতর্ককে জোরাল করেছিল যিনি আঞ্চলিক পরিকাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তরকে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন এবং পরিবর্তনকে দেখেছেন অপর দিক থেকে, যাকে বলা যায় অ-শাস্ত্রীয় উপাদানের দৃষ্টিকোন থেকে।

উপজাতীয় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে একীভবনের উদাহরণ হিসেবে শর্মা আদর্শগত ক্ষেত্রে তান্ত্রিক মতবাদের উত্থানের কথা বলেছেন। কিন্তু এই একীভবনের প্রক্রিয়ায় উপজাতীয় ধর্মবিশ্বাস তান্ত্রিকতা এবং সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে যার সম্পর্কে চট্টোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গুপ্তোত্তর যুগে আর্য এবং অনার্য শ্রেণিকে যুগ্ম হিসেবে দেখার ক্ষেত্রেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কারণ ড্যানিয়েল ইনগালসের সঙ্গে তিনি একমত যে প্রাক-আর্য ভারতীয়দের পূজার্চনা সেই সময় আর্যদের মধ্যে ভালভাবেই বিস্তার লাভ করেছিল। ইনগালস তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে দেবীপূজার বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাদির নিরিখে সাধারণভাবে ভারত ইতিহাসের অগ্রগতি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্টভাবে আদি মধ্য ঐতিহাসিক পর্যায়ের কারণ এবং বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আর. এস. শর্মার অবদানের মূল্য

অস্বীকার করা যায় না। শর্মা নিজেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্যসন্ধানের সমতুল্য বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, তিনি সামন্ততান্ত্রিক model -এর ভিত্তিতে আদি মধ্যযুগের সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন যা প্রাক-শিল্পায়ন ভারতের প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশ অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজনীয়। তাঁর মন্তব্য তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একজন প্রকৃত ঐতিহাসিক হিসেবে যিনি মনোনীত পথ ধরে ঐতিহাসিকের অস্ত্র নিয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবের গভীর অনুপুঙ্খ বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন।

ডি. এন. ঝা

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের অপর এক ঐতিহাসিক ডি. এন. ঝা কর্তৃক বিতর্কিত বিষয়গুলির অসাধারণ আলোচনা দিয়ে আমরা শেষ করব। তাঁর বিশ্লেষণ এবং বিরোধী তত্ত্বের প্রতি তাঁর গুণগত প্রতিক্রিয়া প্রচলিত ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের ধারনার উপযোগিতার সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্বীকৃত।

প্রথমত, ডি. এন. ঝার মত হল এই যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের ভারতীয় সমাজের প্রগতিশীল প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক model-ই সর্বোৎকৃষ্ট। আদি ভারতীয় সামন্ততন্ত্র যে সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই সূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সব ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে এসেছে যারা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের স্তরের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের স্বভাবগত পরিবর্তন দেখতে অনিচ্ছুক, ডি. এন. ঝা সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি মুখ্যত ডি. সি. সরকারকে উল্লেখ করে বলেছেন যে, গুপ্তোত্তর যুগে বাণিজ্যের পতন ঘটেনি এবং আদি বৈদিক যুগ থেকে শাসকগণ কর্তৃক ভূমিদান করা হয়েছিল এবং যাকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বলা হয়েছে তা ভূম্যধিকার বা জমিদারী ছাড়া আর কিছু নয়। এর সঙ্গে কোন বৃহত আর্থ-সামাজিক সত্তা বিজড়িত নয়। যাই হোক ঝা যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে এই সমস্ত সমালোচনা আদি ভারতীয় সমাজকে স্থবির অপরিবর্তনীয় হিসেবে দেখিয়েছে এবং পরিবর্তনহীন প্রাচ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ধারণাকে পরিপুষ্ট করেছে। এই সমস্ত সমালোচকদের বিরুদ্ধে ঝা-এর যুক্তি আদি মধ্যযুগে পরিবর্তনের প্রকৃতির উপর আরও বেশি করে আলোকপাত করেছে। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের আরও পরিমার্জিত ধারণার যুক্তিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে ঝা সমালোচকদের বক্তব্যের যুক্তিযুক্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন।

ম্যানর প্রথা ও ভূমিদাস প্রথার প্রশ্নে ঝা একথা মেনে নিয়েছেন যে, আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দান করা গ্রাম বা ভূমি ইউরোপীয় ম্যানর প্রথার সমকক্ষ হতে পারে না। ইউরোপীয় ম্যানর প্রথা এবং ভূমিদাস প্রথার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামন্ততন্ত্র ভারতে আবির্ভূত হয়েছিল, শর্মার এই অভিমত প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন হরবংশ মুখিয়া। ঝা মুখিয়াকে সমালোচনা করে বলেছেন যে, মুখিয়া শর্মার বক্তব্যকে বাড়িয়ে দেখেছেন। ঝা ভারত প্রসঙ্গে ম্যানর প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এখানে ভূমিদাস অধ্যুষিত ম্যানরের পরিবর্তে কৃষক পরিবারগুলি নিজেরাই উৎপাদনের একক হয়েছে এবং তারা ভূম্যধিকারীদের কর দিত যাকে ঝা 'seignurial taxation' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে জমিদারদের সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক বন্ধন দেখা গেছে। ঝা স্বীকার করেছেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের উৎপাদন প্রক্রিয়া আদি মধ্যযুগের ভারতের থেকে পৃথক ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক চীন বা জাপানেও উৎপাদন প্রক্রিয়া ইউরোপীয় প্রক্রিয়া থেকে পৃথক ছিল। তবে ঐ দুই ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র ছিল না একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সঠিকভাবে বলতে গেলে 'structured dependence of the entire peasantry on the lords' সামন্ততন্ত্রের নির্দেশক নয়, তাই এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বহীনতা বা অনুপস্থিতি বোঝায় না। বস্তুত, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঝা বিভিন্ন রকমের কৃষিশ্রম ও কৃষকশ্রেণির শোষণের উপর জোর দিয়েছেন

যেমন, বলপূর্বক শ্রম, ক্রমবর্ধমান করের বোঝা প্রভৃতি। এ সবই ছিল জমিদার এবং জমির উপর তার উচ্চতর অধিকার সম্পর্কিত অস্তিত্বের ফলস্বরূপ। এটি উপসামন্ত ও ভাড়াটে উচ্ছেদের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। ঝা আদি মধ্যযুগের ভারত প্রসঙ্গে এই সমস্ত শোষণ বা নির্যাতনের অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণাদিসহ প্রচুর উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে, মুখিয়া অধিকারের মাত্রা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, যে অধিকার এই সমস্ত শোষণমূলক প্রণালীর দ্বারা প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষকদের উপর কার্যকরী ছিল। যাই হোক ঝা দেখিয়েছেন যে যদিও কৃষকদের স্বাধীনতা এবং গতিশীলতার উপর বাধা একইরকম সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটায় নি, যা ঘটেছিল ইউরোপে, যেখানে ভূমিদাস প্রথার বিবর্তন ঘটেছিল। এটি স্পষ্ট যে আদি মধ্যযুগের ভারত প্রসঙ্গে বাধ্যতামূলক শ্রম একধরণের অশুভ অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, 'ভিত্তি' বা বাধ্যতামূলক শ্রমের আঞ্চলিক বিভিন্নতা ছিল যা আদি মধ্যযুগ ধরে কৃষকদের উপর বলবৎ হয়েছে।

ঝা স্বীকার করেছেন যে, আদি মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রূপান্তর হিসেবে স্বনির্ভর অর্থনীতির ধারণাকে সর্বাত্মক হিসেবে দেখা ঠিক নয়। ডি. কে. ঝা এবং বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগের ভারত প্রসঙ্গে পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য পেশ করেছেন। কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী এবং আর. চম্পকলক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যের পুনরুত্থান প্রসঙ্গে যুক্তি ও সাক্ষ্য দিয়েছেন। বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় উত্তর ভারতে ঐ একই পুনরুত্থানের প্রমাণ দিয়েছেন। ঝা উল্লেখ করেছেন যে, স্বনির্ভর অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র আদি মধ্যযুগীয় ভারতের জন্য আপেক্ষিক হতে পারে। তাই মুদ্রা অর্থনীতির আবির্ভাব এবং বাণিজ্যও আপেক্ষিক। ঝা আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশ বা পতন শুধুমাত্র বাণিজ্যিক সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করা যায় না। আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজের জটিলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবার জন্য ঝা একইসঙ্গে মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং 'ভিত্তি' বা বাধ্যতামূলক শ্রমের দিকে নির্দেশ করেছেন। আবার তিনি নবম শতাব্দীর পর থেকে আনুষঙ্গিক বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের উন্নতির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেইসঙ্গে ভূমিদান প্রথার তীব্রতা বৃদ্ধি ভূম্যধিকারী মধ্যবর্তী শ্রেণির বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে যার ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষকদের প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। ঝা দেখিয়েছেন যে, এ অবস্থা বেশি দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সংস্থাকে দ্রুত স্বায়ত্বশাসন হারাতে দেখা গেছে। এই আভ্যন্তরীণ জটিলতার মধ্য থেকে আদি মধ্যযুগের আবির্ভাব যা ঝা-এর মতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে (১০-১২ খৃঃ) বাণিজ্যিক পুনরুত্থানের উপর জোর দিয়েছেন যা একটি বাহ্যিক উপাদান ছাড়া আর কিছু ছিল না এবং একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা কোনভাবে সামন্তব্যবস্থাকে শেষ করে দিতে পারে নি। বাণিজ্যের বিকাশ সত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাই হোক ডি. এন. ঝা স্বীকার করেছেন যে, এই সমস্ত ভিন্নমুখী স্রোতধারার জন্য সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তনগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে যা বাঁধাধরা গতানুগতিক ইতিহাস রচনা থেকে ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বকে রক্ষা করবে।

পরবর্তী প্রধান বিষয় হল, সার্বভৌমত্বের খণ্ডীকরণ সম্পর্কিত ধারণা। আমরা দেখেছি আদি মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক সংগঠনের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের মধ্যে বার্টন স্টেইন ছিলেন অন্যতম। স্টেইনের বৃত্তাংশে বিভাজিত রাষ্ট্র সম্পর্কে ঝা যা বলেছেন তা হল স্টেইনের গবেষণা সাক্ষ্যপ্রমাণাদির মাধ্যমে বিভিন্ন পন্ডিতেরা খন্ডন করেছেন। এই ধরণের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আচার-অনুষ্ঠানগত সার্বভৌমত্ব ঝা-এর মতে গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ। ঝা প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে, হেরম্যান কুলকে যিনি বৃত্তাংশে বিভাজিত রাষ্ট্রতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনি আচার-অনুষ্ঠানগত সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দেহাহীতত নন।

ঝা আরও উল্লেখ করেছেন যে, বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় যখন স্টেইন এবং শর্মা উভয়ের গবেষণার মূল্যকে খণ্ডন করেছেন, তখন তিনি, ঐতিহাসিকের ভাষায় "recognizes the shift from Gupta pattern of culture and release of kings ('grahanamoksha') towards a situation which 'samanta's were integrated into a political structure marked by the domination of 'the overlord-vassal relationship'." আদি মধ্যযুগের প্রসঙ্গে 'integrated polity' সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে ঝা দেখিয়েছেন চট্টোপাধ্যায় কুলকের পথ অনুসরণ করেছেন এবং ঝা এই যুক্তিতে এইভাবে ইতি টেনেছেন যে স্টেইন, কুলকে এবং চট্টোপাধ্যায় সকলেই আদি মধ্যযুগকে খণ্ডিত সার্বভৌমত্বের যুগ হিসেবে দেখেছেন যা তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক ধারণার কাছাকাছি এনে ফেলেছে। কিন্তু ঝা, কুলকে এবং চট্টোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেছেন কারণ তাঁরা সামন্ত পরিকাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহতকরণের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অবজ্ঞা করেছেন। স্টেইন পরোক্ষভাবে সমস্যাটিকে স্পর্শ করেছেন। ঝা এইভাবে শেষ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে 'বৃত্তাংশে বিভাজিত রাষ্ট্র' এবং 'সংহত রাজনৈতিক সংগঠন' - এই দুই তত্ত্ব ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিকল্প নমুনা হিসেবে একে অপরকে ধরে রাখতে পারে কিন্তু বাস্তবে তাদের পক্ষে একে অপরের স্থান গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে, তিনি ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সমর্থকগণের দ্বার প্রতিষ্ঠিত কলিযুগের ধারণার প্রসঙ্গে হাত দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় কলিযুগের ধারণাকে খণ্ডন করেছেন, যে ধারণাকে সামন্ততন্ত্রের সমর্থকগণ সামাজিক সংকটের (যা ক্রমশ রাষ্ট্রক্ষমতার সংকটকে ত্বরান্বিত করে) মাধ্যমে সামন্তসমাজের আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করেছেন। চট্টোপাধ্যায় দেখেছেন যে, কলিযুগের তত্ত্বের একটি ত্রুটি হল যে এই তত্ত্বে প্রাচীন সভ্যতার সম্পূর্ণ ও আকস্মিক ভাঙনের কথা বলা হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় সেই কারণে কলিযুগের ধারণাকে গ্রহণ করেন নি যা অতীতের সঙ্গে আকস্মিক বিচ্ছিন্নতার কথা বলে থাকে। ঝা অবশ্য বলেছেন যে চট্টোপাধ্যায় একথা মনে করে ভুল করেছেন।

প্রথমত, এই তত্ত্বের সমর্থকগণ যাঁদের মধ্যে ডি. এন. ঝা নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরা শুধুমাত্র সামাজিক সংকটের দিক থেকে আদি মধ্যযুগের রূপান্তরকে ব্যাখ্যা করেন নি। এই পরিবর্তনের মধ্যে আরও অনেক কারণগত উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা ক্রমশ সামাজিক সংকটের তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করেছিলেন যার অস্তিত্ব দেখা গেছে খৃষ্টপূর্ব যুগে। যেমন আর. এস. শর্মা তাঁর গবেষণায় বর্ণপ্রথার মধ্যে চাপা উত্তেজনার বিষয়টিকে স্পর্শ করেছেন। এইভাবে এই সমস্ত ঐতিহাসিকগণ সংকটজনক অবস্থার ক্রমশ কেলাসিতকরণ এবং প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়কে লক্ষ্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, সামন্ততন্ত্রের সমর্থকগণ প্রবহমানতার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে উদ্বৃত্ত টেনে বার করার নতুন যান্ত্রিক উপায়, যেমন ঝা উল্লেখ করেছেন, সামাজিক সংকটের সমাধান করতে পারে নি। তাই তা পরবর্তীকালেও থেকেছে এবং নতুন সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদি মধ্যযুগীয় সামাজিক সংগঠনের 'কারণ' এবং 'আভ্যন্তরীণ বিষয়' কে পৃথক হিসেবে ব্যবহার করার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবণতাকে ঝা সমালোচনা করেছেন। ডি. এন. ঝা-র মতে চট্টোপাধ্যায় সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যাইহোক, ঝা প্রথমত স্বীকার করেছেন যে, কলিযুগের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সাহিত্যিক উপাদানের সমালোচনামূলক এবং তীব্র পরীক্ষা প্রয়োজন, কারণ কলির বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত জটিল এবং কলির বর্ণনায় তিনটি সময়সীমার যেমন তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দী, অষ্টম এবং দশম শতাব্দীর কলি বর্ণনা প্রাপ্তিসাধ্য। দ্বিতীয়ত, ঝা মেনে নিয়েছেন যে, ভারতে প্রাক-সামন্ত (আদি ঐতিহাসিক) থেকে সামন্ত (আদি মধ্য) সমাজে বিবর্তনে

কলিযুগের ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করা উচিত কারণ প্রতিটি সামাজিক সংকটের প্রকৃতি এবং সামাজিক গঠনের প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়।

পরিশেষে ঝা বলেছেন, ভারতে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র তুলনামূলক এবং বিপরীতধর্মী সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতায় পাঠ করা উচিত। আর তা শুধুমাত্র ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, অ-ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও পাঠ করা উচিত, যাতে এই ধারণার সার্বজনীন প্রয়োগ এবং লক্ষ্য ও মর্ম উপলব্ধি করা যায়।

আদি মধ্যযুগের সমাজের রূপান্তরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বের সমালোচকদের নিয়ে ঝা-এর আলোচনা আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে অনেক ধারণা ও বৈশিষ্ট্যকে আলোকিত করেছে। ঝা সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক প্রশ্নকে বিচার করেছেন এবং আদি মধ্যযুগের ভারত প্রসঙ্গে বিতর্কের এক সুন্দর বিশ্লেষণ আমাদের উপহার দিয়েছেন।

বর্তমানে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক যাঁরা ভারত ইতিহাসের বিবর্তন ও কালনির্ণয় সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাঁরা আদি ঐতিহাসিক থেকে মধ্যযুগের রূপান্তরের পর্যায় সম্পর্কে একমত। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, ভারত ইতিহাসের প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্যায় স্থিতিশীল নয়। এটি রূপান্তরের পথ পার হয়েছে যেখানে ধারাবাহিকতার মধ্যে পরিবর্তন ছিল বাস্তব।

৩.৫ উপসংহার

উপরিউক্ত পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার জন্য একশ্রেণির ঐতিহাসিক ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের নমুনাকে সমর্থন করেছেন। কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক যদিও আদি ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এবং আদি মধ্য থেকে মধ্যযুগে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করছেন তবুও তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে উক্ত নমুনাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণিবর্গ কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত যাঁরা আদি মধ্যযুগীয় সামাজিক-রাজনৈতিক গঠনের বিকল্প নমুনা প্রদান করেছেন যা পরিবর্তনবিমুখ ধারণা, স্থিতিশীল প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সমাজের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং যা ভারত ইতিহাসের গতি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যথাযথ নয়। ভারত ইতিহাসের গুপ্তোত্তর পর্যায় থেকে রাজপুতদের উত্থান পর্যন্ত জটিল ঘটনাগুলিকে উপলব্ধি করার জন্য একমাত্র প্রথম নমুনাটি ছিল সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রচেষ্টা। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত তত্ত্বের পরিকাঠামোর মধ্যে সামাজিক সংগঠনের প্রক্রিয়া উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এঁরা বিসদৃশভাবে বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের গবেষণা ও গবেষণার নানা রূপ এবং সমালোচনার উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা ভারত ইতিহাসের এক জটিল যুগকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের কারণগত উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিতর্ক নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা চলবে। ইতিহাসের এক প্রধান বিতর্কিত ধারণা হিসেবে এর নিশ্চিত সমাধান এখনও হয়নি।

৩.৬ অনুশীলনী

১. আদি মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক গঠন সম্পর্কিত বিতর্ককে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
২. 'আদি মধ্যযুগীয় ভারত'-এর সত্তা সম্পর্কে অধ্যাপক বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথমিক যুক্তিগুলি কী ছিল?

৩. আপনি কি হরবংশ মুখিয়ার সঙ্গে একমত যে আদি মধ্যযুগের ভারতে সামন্ততন্ত্র নয়, স্বাধীন কৃষি অর্থনীতি প্রচলিত ছিল?

৪. আদি মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক গঠনের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিতর্কে অধ্যাপক আর এস. শর্মার মূল অবদান কী ছিল?

৫. কীভাবে অধ্যাপক ডি. এন. ঝা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন?

৬. ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসচর্চা বিশ্লেষণ করুন।

৭. 'আদি মধ্যযুগীয় সামাজিক গঠন'-এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার উপাদানগুলির মূল্যায়ন করুন।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.	R.S. Sharma	:	Indian Feudalism
২.	D.N.Jha (ed.)	:	The Feudal Order
৩.	Harbans Mukhia (ed.)	:	The Feudalism Debate
৪.	D.D.Kosambi	:	An Introduction to the study of Indian History
৫.	V. K. Thakur	:	Historiography of Indian Feudalism
৬.	D.N.Jha	:	Early Indian Feudalism : A Historiographical critique, Presidential Address, Indian History Congress, 40th session, Waltair, 1979
৭.	D.N.Jha	:	Feudal Social formation in Early India
৮.	Hermann Kulke (ed.)	:	The States in India, 1000-1700.
৯.	J. S. Grewal (ed.)	:	State and Society in Medieval India
১০.	Burtan Stein	:	Peasant State and Society in Medieval South India

অষ্টম (খ) পত্র

পর্যায়—২

একক—১ ❑ কৃষির সংগঠন ও ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদান

গঠন

১.০. প্রস্তাবনা
১.১. ব্যক্তিকে ভূমিদান
১.২. প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদান
১.৩. ধর্মবহির্ভূত ভূমিদান
১.৪. ভূমিদানের পরিণতি ও কৃষিভূমির সংগঠন
১.৫. গ্রন্থপঞ্জি
১.৬. অনুশীলনী

১.০. প্রস্তাবনা

কৃষি প্রধান ভারতের অবস্থা খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে কৃষিবহির্ভূত অর্থনীতি দ্বারা খুব একটা প্রভাবিত হয় নি। বরং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অবক্ষয় ও মুদ্রা অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি হওয়ার ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। বাণিজ্যের অকথা বণিক ও কারিগরদেরও কৃষির উপর নির্ভরশীল করে তোলে। ফলে প্রাচীন যুগের তুলনায় কৃষির সংগঠনে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীদের ভূমিদানের মধ্য দিয়ে আদি মধ্যযুগের ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার নতুন মাত্রার সৃষ্টি করেছিল।

১.১. ব্যক্তিকে ভূমিদান

রাষ্ট্রের প্রতি কোন ব্যক্তির বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভূমির নিষ্কর স্বত্বপ্রদান (Rent free land grant) ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে নতুন কোন বিষয় না। বৈদিক আমলে ভূমির মালিকানা ছিল গোষ্ঠীর হাতে। ফলে গোষ্ঠীর অনুমতি ছাড়া ভূমিদান সম্ভব হতো না। তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ছিল খুব পরিচিত দৃশ্য। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। একইভাবে মৌর্যযুগে বিশেষ করে পালি সাহিত্য থেকে মগধ ও কোশলে ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের কথাও জানা যায়। খ্রিস্ট পূর্ব প্রথম শতকে সাতবাহন শাসকদের শিলালিপিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের দান হিসাবে গ্রাম দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামদানের সঙ্গে দান গ্রহীতাকে ঐ গ্রামের শাসনতান্ত্রিক অধিকারও দেওয়া হতো কিনা তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের ভূমিদানগুলিতে দেখা যায় যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের ভূমি দেওয়া হতো তারা ঐ দান প্রাপ্ত ভূমির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সমস্ত কিছু (খনিজ পদার্থ ইত্যাদি) রই ভোগ করার অধিকার পেতেন। গুপ্ত শাসকদের আমলে মধ্যভারতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে দানগ্রহীতা কৃষক ও কারিগরসহ প্রত্যেকের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারবেন।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে গ্রামদানের সঙ্গে সঙ্গে দান গ্রহীতাকে গ্রামগুলির শাসনতান্ত্রিক অধিকার দান করার প্রথা চালু হয়। সাতবাহন রাজ গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের গ্রামদানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের গ্রামগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও দান করেছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। একইভাবে বুধঘোষের (পঞ্চম শতক)রচনাতেও দেখা যায় দানগ্রহীতা দান প্রাপ্ত জমির শাসনতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছিলেন। দানপ্রাপ্ত ভূমি থেকে কর আদায় সহ শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার রীতি পরবর্তীকালে বিশেষকরে পঞ্চম শতক থেকে একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়। কিন্তু পঞ্চম শতক পর্যন্ত দানপ্রাপ্ত ভূমির স্বত্বাধিকার হস্তান্তর যোগ্য ছিল না।

গুপ্ত পরবর্তী যুগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের প্রথা বিশেষ ভাবে বৃধি পায়। বাংলার পালরাজাগণ তাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পালরাজা দেবপাল (৮১০ - ৮৫০) শাসনতান্ত্রিক অধিকার সহ ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছিলেন বিহারের মুঙ্গের অঞ্চলে। পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহার বংশের বিভিন্ন রাজাও অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। পশ্চিমভারতে শিক্ষক (ব্রাহ্মণ) দেরও ভূমিদান করা হতো। ৯১৪ খ্রিঃ কাথিয়াবারে চালুক্যদের দেওয়া ভূমিদান তার স্বাক্ষ্য বহন করে। রাষ্ট্রকূট রাজগণও অনুরূপ ভূমিদান করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় (৮২১ খ্রিঃ)। তবে রাষ্ট্রকূট রাজগণ সবচেয়ে বেশী গ্রাম দান করেছেন ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে তাদের দেওয়া ৭৯৪, ৮০৬ - ০৭, ৮৭১, ৯৭২ - ৭৩ খ্রিস্টাব্দের ভূমিদানগুলি তার স্বাক্ষ্য বহন করে। ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৪-২২) পূর্ববর্তী রাজাদের দেওয়া ৪১৫ টি গ্রাম পুনরায় দান করেছিলেন। তার পরবর্তী শাসক চতুর্থ গোবিন্দ ব্রাহ্মণদের কমকরেও ৬০০টি গ্রাম দান করেছিলেন।

ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের প্রথা শুধুমাত্র উত্তর ভারতেই সীমাবধ ছিল না। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তার ও উত্তর ভারতের মত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদলে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার (Brahmanical model of State) বিস্তার এর পরোক্ষ ফল হিসাবে এখানেও ব্রাহ্মণদের গ্রাম দানের প্রথা চালু হয়। এবং দক্ষিণভারতে ব্রাহ্মণদের একক বা একসঙ্গে গ্রামদান বা ব্রাহ্মদেওয়া সুবিদিত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে দাক্ষিণাত্য ও অন্ধ্র অঞ্চলে ও সপ্তম শতক থেকে তামিল অঞ্চলে ব্রাহ্মদেওয়ার প্রথা ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করে। ব্রাহ্মদেওয়া গ্রামগুলি মূলতঃ দেওয়া হত পতিত (অকর্ষিত) অঞ্চলে কোন মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করে কেননা এই দানগুলি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈধতাকরণ (Legitimisation of political authority) পধতির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

একইভাবে উত্তরপূর্ব ভারত বিশেষ করে কামরূপ (নিম্ন আসাম) ও উড়িষ্যাতে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের প্রথা চালু করা হয়েছিল। কামরূপে ভূমিদানের প্রথা চালু করে ছিলেন মহাভূতি বর্মণ (ষষ্ঠ শতক) যা ভাস্কর বর্মন (সপ্তম শতক), তৃতীয় বলবর্মন (নবম শতক) ও রত্নপাল (একাদশ শতক) ধরে রেখেছিলেন। এই ভূমিদানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কামরূপের অক্ষত্রিয় রাজবংশকে যাতে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচিত করে তাদের শাসনকে বৈধ বলে প্রচার করে। কৃষিজমির উপর ব্রাহ্মণদের মালিকানা প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদনে তারা উৎসাহী হয়েছিল ও ভাগ, ভোগ, হিরণ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকর সংগ্রহ করত।

১.২. প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদান

ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের পাশাপাশি গুপ্ত পরবর্তীযুগে ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভূমিদানের প্রথা চালু হয়েছিল ঐ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন হিসাবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের

মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির ও বৌদ্ধ মঠকেও পূর্বেই ভূমিদানের পঞ্চম শতকের পূর্বেকার বহু নিদর্শন থাকলেও প্রতিষ্ঠানের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় পঞ্চম শতক থেকে। ব্রাহ্মণদের ধর্মসম্পর্কীয় পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূমিদান সহ মন্দির স্থাপন এর বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময় বাংলা, বিহার ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মন্দিরগুলিতে ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায় সমসাময়িক লিপি ও সাহিত্যে। চালুক্য, গুর্জরপ্রতিহার বংশের রাজাগণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই মন্দিরকে ভূমিদানের প্রথা অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে রাষ্ট্রকূট রাজগণ এক্ষেত্রে একটু বেশী এগিয়েছিলেন। রাজা চতুর্থ গোবিন্দ ৬০০টিরও বেশী গ্রাম দান করেছিলেন বিভিন্ন মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

দক্ষিণভারতেও মন্দির নির্মাণ ও তাদের উদ্দেশ্যে ভূমিদান উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছিল। পল্লব-পাণ্ড্য ও চোল রাজাদের শাসনকালে নির্মিত মন্দিরগুলিকে বেশ বড় বড় আকারের জমি দেওয়া হয়েছিল। এখানকার মন্দিরের জমিগুলি সাধারণত ব্রাহ্মণদের সভা বা বেল্লাল (অব্রাহ্মণ কৃষি নিয়ন্ত্রক) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।

মন্দিরের পাশাপাশি বৌদ্ধ মঠ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভূমিদানের পরিমাণও কম ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের যে প্রগতির চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (সপ্তম শতক) বর্ণনা করে গেছেন তার ভিত্তিতে বলা যায় যে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তা সম্ভব ছিল না। হিউয়েন সাঙের সময় নালন্দা মহাবিহারের ব্যয় সংকুলানের জন্য মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ১০০ যা হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকালে বেড়ে গিয়ে ২০০ গ্রামে ছাড়িয়ে ছিল। আশ্রফাপুর তাম্রফলক (পূর্ব বাংলা) থেকে জানা যায় যে সপ্তম অষ্টম শতকে ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধ মঠের উদ্দেশ্যে ভূমিদান ছিল অতি পরিচিত দৃশ্য। পাল আমলে বিকশিত বৌদ্ধমঠ (ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, ভাসু ইত্যাদি) গুলিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা ছিল উল্লেখযোগ্য। পাল সম্রাট দেবপাল (৮২০ - ৮৫০) সুমাত্রার কালদেব পুত্রের অনুরোধে নালন্দা মহাবিহারে ভূমিদান করেছিলেন। পাশাপাশি ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট মহীপাল (৯৮৮ - ১০৩৮) বৌদ্ধমঠের জন্য তিনটি গ্রাম দান করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত গ্রাম দান করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ তার প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসাবে মধ্যস্বত্বভোগী একটি শ্রেণির উৎপত্তি হয়েছিল ঐ দানপ্রাপ্ত গ্রামগুলিতে। যারা একদিকে প্রতিষ্ঠান ও অন্যদিকে প্রকৃত কৃষকের মধ্যে যোগাযোগ রাখত। অর্থাৎ চিরাচরিত জমিদারী ব্যবস্থার সূত্রপাত ও বিকাশের সহায়ক হয়েছিল এই ভূমিদানের প্রথা। এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার যে ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যে গ্রামগুলি দান করা হয়েছিল তা পাল বা প্রতিহারদের রাজ্যের মোট কর্ষন যোগ্য জমির একটা সামান্য অংশ ছিল মাত্র। তবে রাষ্ট্রকূট বা চোলদের ক্ষেত্রে দান প্রাপ্ত গ্রামগুলিতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণের কৃষিজমি ছিল।

১.৩. ধর্মবহির্ভূত দান

ব্রাহ্মণ ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গুপ্ত আমল থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন আধিকারিকদের বেতনের পরিবর্তে ভূমি দানের প্রথা চালু হয়েছিল। বিভিন্ন লিপিতে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করার বিনিময়ে রাজকর্মচারীদের ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া রাষ্ট্রকে সামরিক ও বেসামরিক সেবা (Military and civil service) প্রদানের বিনিময়ে সেবক তার পৃষ্ঠপোষক (patron) এর কাছ থেকে ভূমির স্বত্বভোগের অধিকার পেতেন। প্রতিহার রাজ প্রথম ভোজ সামরিক সেবা প্রদানের বিনিময়ে এক কলচুরি সেনানায়ককে ভূমি দান করেছিলেন বলে জানা যায়। একই ভাবে পাল রাজা মহীপাল ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তার সাম্রাজ্যের কৈবর্ত্য সম্প্রদায় (প্রথাগত মৎস্যজীবী/কৃষক সম্প্রদায় জাতি)কে জমি দান করেছিলেন নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের বিনিময়ে। কৈবর্ত্যদের প্রথাগত দক্ষতা (নৌচালনা) থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে মহীপাল কৈবর্ত্যদের নৌসেবার বিনিময়ে ঐ জমি দান

করেছিলেন। সামরিক সেবা ছাড়াও যুদ্ধে সেনানায়কদের বীরত্ব প্রদর্শনের পুরষ্কার স্বরূপও ভূমি দান করার রেওয়াজ ছিল।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদাধিকারী আমলা ও সামরিক ব্যক্তিবর্গ ভূমির স্বত্ব পাওয়ার ফলে অধিকতর অর্থনৈতিক আধিপত্য অর্জন করেছিলেন বলা যায়। এমনকি তারা অন্যকে ভূমিদান করার ক্ষমতাও অর্জন করেছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের উচ্চমর্যাদাপূর্ণ উপাধি গ্রহণ করতে থাকেন। পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহার গণ বা দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটদের আদি পুরুষগণ এই ধরনের পদাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

১.৪. ভূমিদানের পরিণতি

কৃষিউৎপাদনের প্রধান উপাদান ভূমির মালিকানার যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আদি মধ্যযুগীয় সমাজে লক্ষ্য করা যায় তার উপর নির্ভরশীল ছিল কৃষির সংগঠন (Agrarian Structure)। ভূমির উপর কৃষকের চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব ভূমির স্বত্বভোগীর। অন্যদিকে কৃষকদের হাতে ছিল শ্রম, হালবলদ সহ কৃষিকাজের অন্যান্য সরঞ্জাম। কৃষকরা এই সব সামগ্রী ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রেখেছিল।

বিভিন্ন সম্রাট, রাজা বা সামন্ত প্রভুদের ভূমিদানের প্রক্রিয়ার দ্বারা যেসমস্ত দান প্রাপ্ত গ্রামে দানগ্রহীতা জমির মালিকে পরিণত হয়েছিলেন সেখানে তারা কৃষকদের ও কারিগরদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের কর বা রাজস্ব আদায় করতেন। কর আদায়ের অধিকার অর্জনের পেছনে তাদের প্রধান উৎস ছিল রাজাদের দেওয়া রাজশাসন (Royal Charters) সমূহ। যেহেতু ভূমির মালিক হিসাবে রাজা ভূমি রাজস্ব আদায় করার অধিকারী ছিলেন তাই দানগ্রহীতাগণ নতুন মালিক হিসাবে কর আদায়ের অধিকার পেতেন।

প্রথম দিকে রাজশাসনগুলির দ্বারা ভূমিদিয়া/ভূমিদাতা (Land donar) গণ মূলত ভূমির স্বত্ব ভোগের অধিকার দান করতেন। দান গ্রহীতাগণ শাসনতান্ত্রিক অধিকার তেমন কিছু পেতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষত সপ্তম শতক থেকে ভূমিগ্রহিতাগণ প্রাপ্ত ভূমির মূল শাসকে পরিণত হন। তারা সবধরনের নিয়মিত অনিয়মিত, বৈধ অবৈধ কর এমনকি বেগার শ্রম (ভিষ্টি) ও অনির্দিষ্ট কর আদায় করার অধিকারী হয়ে ওঠেন। অনির্দিষ্ট এই কারণে বলা হচ্ছে যে রাজশাসনে নির্দিষ্ট করগুলোর তালিকার শেষে আদি (ইত্যাদি et cetra) শব্দটির উল্লেখ থাকত। এই বিশেষ অধিকার অর্জনের ফলে দান প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই সিধান্ত নিতেন তার নিয়ন্ত্রন জমির শাসন বা কর আদায় করার পধ্বতি নিয়ে। এমনকি গ্রাম থেকে কৃষককে উৎখাত করার ক্ষমতাও তাদের হাতে ছিল। মধ্যপ্রদেশ, উত্তর মহারাষ্ট্র, কোংকন ও গুজরাটে গুপ্ত পরবর্তী যুগে জমির মালিক কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করেছেন বা এক জনের জমি আরেক জনকে দিয়েছেন এমন সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যায়।

সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে ভূমির সঙ্গে ফলের গাছ সহ, উর্বর ও জলাভূমি ও চারণক্ষেত্রও দান করা হতো। জলাভূমি ও চারণক্ষেত্রে দানগ্রহীতার মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে পশু নির্ভর কৃষি কাজ দানগ্রহীতার অনুমতি ছাড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। এককথায় বলা যায় যে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহ উপাদান (Subsidcary elements) গুলির উপরও দানগ্রহীতার নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজশাসনগুলিকে আরো বলা হতো যে কৃষকরা যেন দানগ্রহীতার সবধরনের আদেশ মেনে চলেন। শুধুমাত্র কর প্রদান নয়, কৃষি উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ও সহ উপাদানগুলির উপভোগের ব্যাপারেও তারা দানগ্রহীতার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকতেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি দান করার পরিণতি হিসাবে জমিতে ক্রমে ক্রমে বহুস্তর বিশিষ্ট একটি শ্রেণির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরে। তার পর ছিলেন দান গ্রহীতা

ও তাদের অধীনে ছিলেন উপস্বত্বভোগী গণ। সবশেষে ছিলেন যারা জমি চাষ করতেন বা করাতেন। শ্রেণি স্তরে (Class heinarchy) অবস্থানের ভিত্তিতে ভূমিস্বত্ব বা উপসত্বভোগী গণের বিভিন্ন সামাজিক পদ (Social rank) এর অস্তিত্বের কথা জানা যায় আলোচ্য সময়ের ভূমি ব্যবস্থায় যেমন— প্রধান ব্রাহ্মণ, মহাত্মা, উত্তম, কৃষিবল, কর্ষক, ক্ষেত্রকার, কুটুম্বিন, কারুক ইত্যাদি। তাছাড়া ছিল প্রান্তিক কৃষক বা ক্ষুদ্র প্রকৃতি (Marginal peasantry)। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে আদি মধ্যযুগের গ্রামগুলিকে কারো হাতে জমি ছিল অনেক বেশি। যারা ভাগচাষী বা উপস্বত্বভোগীদের সাহায্যে জমি চাষ করতেন। প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি হলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন না।

গুপ্ত পরবর্তী ভারতে কৃষি সংগঠন বা ভূমি ব্যবস্থায় ভূমিদানের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আসে তার প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মূলত দুটি মত দেখা যায়। ডি ডি কোসাম্বি, রামশরন শর্মা বা যাঁরা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের (Indian Feudalism) মূল প্রচারক তাদের মধ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদানের ফলে কৃষি উৎপাদনের মূল নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অকৃষিজীবী শ্রেণি বিশেষ করে উচ্চ বর্গীয়দের হাতে। তবে আদি মধ্যযুগের ভূমি ব্যবস্থা ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জোড় করে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের (European Feudalism) ভাবধারার আদলে ভাবার প্রচেষ্টা কখনই বিজ্ঞান সম্মত নয় বলে সমালোচনা করেছেন অনেকেই। তবে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক বিভিন্ন বিভিন্ন কারণে পরজীবী শ্রেণিকে ভূমি দানের প্রথা কৃষি উৎপাদনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। দান গ্রহীতা উৎপাদনে সরাসরি অংশ গ্রহণ না করেও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

১.৫. গ্রন্থপঞ্জি

১। R. S. Sharma : Indian Feudalism (Calcutta 1965)

২। R. S. Sharma : Early Medieval Indian Society (Calcutta, 2001)

৩। R. K. Barman : From Tribalism to State (Delhi, 2007)

৪। D. N. Jha (ed) : Feudal Order (New Delhi, 2000)

১.৬. অনুশীলনী

১। আদি মধ্যযুগের ভারতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমি দানের বিবরণ দিন।

২। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমি দানের অর্থনৈতিক পরিণতি ব্যাখ্যা করুন।

৩। আপনি মনে করেন যে আদি মধ্যযুগীয় সমাজের কৃষি উৎপাদনের মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন ভূমিদান গ্রহীতাগণ?

একক—২ ❑ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি, সেচ প্রযুক্তি ও কৃষি বসতির বিস্তার

গঠন

২.০. সামন্ততন্ত্রের ধারণা
২.১. ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি
২.২. সেচ ও প্রযুক্তি ও কৃষি বসতির বিস্তার
২.৩. গ্রন্থপঞ্জি
২.৪. অনুশীলনী

২.০. সামন্ততন্ত্রের ধারণা

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ ও ধরণ নিয়ে মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। মার্কসের মতে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হল এমন একটি অবস্থা যেখানে কায়িক পরিশ্রম না করেও ভূস্বামীগণ তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের কৃষক ও কারিগরদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত শ্রম (Surplus labour) ভোগ করে। এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমজাত পণ্য বা উদ্বৃত্ত শ্রম ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মত অর্থনীতির নিয়মনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বরং উৎপাদক শ্রেণির উপর মালিকানা স্বত্বপ্রতিষ্ঠিত হয় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক, আইন ও সমসাময়িক শক্তির দ্বারা। মার্কস মূলত ইউরোপীয় সমাজ বিবর্তনের ধারায় প্রবাহমান মানবেতিহাসের 'দাস সমাজ' ও 'পুঁজিবাদী সমাজের' মধ্যবর্তী পর্যায় হিসাবে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অবতারণা করে ছিলেন।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন বিষয়ে বিশিষ্ট্য মার্কসীয় চিন্তাবিদ মার্ক ব্লক এর মতে সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্র ও সমাজের বিকেন্দ্রিকরণ। সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ নির্ধারিত হয় পরস্পরের অধিনতা (Vassalage) ও রক্ষণাবেক্ষণের (Patronage) সম্পর্কের দ্বারা। অন্যদিকে মরিসওব মনে করেন সামন্ততন্ত্রে উৎপাদক গোষ্ঠি ভূমিদাসের সমার্থক। বাধ্যতামূলক কায়িক শ্রম আদায় ছাড়াও আইন ও রাজনীতির মাধ্যমে ঐ শ্রম ভোগ করার অধিকার ভূমি নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠির হাতে থাকে। আধুনিক মার্কসীয় গবেষকগণ বিশেষ করে পেরী অ্যান্ডারসন ও রর্বাট ব্রেনার সামন্ততন্ত্রের এই সরলীকৃত সাংগা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ চিত্র বহন করেন বলে মনে করেন। ব্রেনারের মতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হল Social property systems characterised by peasant possession and surplus extraction by extra economic compulsion. কৃষি ও কারিগরি শ্রম আত্মসাৎ করা ছাড়াও ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে অধীনতা (Vassalage) ও সামরিক সেবা (Military service) প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিনিময়ে সেবকের ভরনপোষণের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতেন তাদের প্রভু (Patron)।

ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকৃতি নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বিকেন্দ্রিভূত শাসন ব্যবস্থা এবং ভূমি ও তার ব্যবস্থাপনাই ছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। আর এই বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখেই ডি. ডি. কোসাম্বী (**An Introduction to the study on Indian History, 1956**) ও পরবর্তীকালে রামশরন শর্মা (**Indian Feudalism, 1965, Early Medieval**

Indian Security, 2001 ইত্যাদি) এবং তার অনুগামীগণ (D. N. Jha, B. N. S. Yadav, K. M. Srimaly) তাদের অসংখ্য রচনার মাধ্যমে আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় অর্থনীতিকে সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দিয়েছেন।

২.১. ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল ভূমির মালিকানা ও উৎপাদনের কৌশল ও উপায় (Technology and means of production) সমূহের নিয়ন্ত্রণ। রামশরণ শর্মার মতে এই ধরনের অর্থনীতি ভারতের শুরু হয়েছিল খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ব্যাপক হারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমি দান করার ফলে। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ ব্রাহ্মণ ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে যে ভূমি দান করেছিলেন তার প্রকৃত নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছিলেন দানগ্রহীতাগণ। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণ তাদের অগ্রহার গুলিতে শাসনতান্ত্রিক অধিকারও অর্জন করেছিলেন। সপ্তম শতক থেকে ব্রাহ্মণসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাম দানের পরিমান বাড়তে থাকে। তাছাড়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন আধিকারিকদের ও ভূমিদানের প্রথা চালু হয় যার ফলে দানপ্রাপ্ত জমিতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বভাগের অধিকার জন্মলাভ করে।

দানগ্রহীতাগণ ভূমি লাভের পাশাপাশি দানপ্রাপ্ত ভূমিতে ধনজন অর্থাৎ মানুষজনের উপর তাদের শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কৃষি উৎপাদনের উপায়গুলির উপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মদেওয়া ভূমির সঙ্গে সঙ্গে সেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও চলে যায় ব্রাহ্মণ সভা (Assembly of the Brahman Village) ও বেল্লাল (অব্রাহ্মণ ভূস্বামী) দের হাতে। তাছাড়া পশু চারণ ভূমি ও অন্যান্য সাধারণ অর্থনৈতিক সম্পদ (Common resource) এও দান গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কৃষকগণ হয়ে পড়েন দান গ্রহীতার নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন শক্তি যারা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফল ভোগ করার অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়া তাদেরকে জোর করে বেগাড় (ভিস্তি Forced labour) খাটান হতো। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে এই সাদৃশ্য থাকার জন্য আদি মধ্যযুগীয় ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক বলার প্রবণতা তাই এখনও বিদ্যমান। তবে হরবন্স মুখিয়া মনে করেন যে কৃষি উৎপাদনের উপায়গুলির উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ কখনই শিথিল হয়নি। তাই একে সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নয় (Was there Feudalism in India)। তাছাড়া ব্রাহ্মণরা যে জমি পেতেন তার বেশিরভাগই দেওয়া হত অকৃষি অঞ্চলে যাতে করে কৃষিসম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হয়। তাই অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে কর্ষিত জমির পরিবর্তে কর্ষনযোগ্য পতিত জমিই বেশী দান করা হতো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে।

আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল বাণিজ্য, নগর ও মুদ্রা ব্যবস্থার অবক্ষয়। গুপ্ত পরবর্তী শাসকগণ বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রভূত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও তারা যথেষ্ট সংখ্যক স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা চালু করতে পারেন নি। পাল, রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার, পল্লব ও চোলদের রাজনৈতিক আধিপত্য উল্লেখযোগ্য হলেও তাদের স্বর্ণমুদ্রা নেই বললেই চলে। মুদ্রা স্বল্প, তার পরিণাম ছিল নগর ও বাণিজ্যের অবক্ষয়। রামশরণ শর্মার মতে এই অবক্ষয়ের ফলে কৃষি অর্থনীতিতে চাপ বেড়েছিল কারণ বণিক ও কারিগর শ্রেণিও কৃষিতে ভীড় করেছিল। বাণিজ্যকেন্দ্রিক নগরের স্থান তখন দখল করেছিল সামরিক কেন্দ্র (স্কন্ধভার) ও মন্দিরগুলি যেখানে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল সীমিত।

এই অবস্থায় কৃষি উৎপাদন হয়ে পড়ে অর্থনীতির মূল কেন্দ্র যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলির নিয়ন্ত্রণ কৃষকের হাতে ছিল না। ফলে ভারতীয় অর্থনীতি আরো বেশি করে সামন্ততান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তবে মুদ্রা স্বল্পতা নিয়ে রামশরণ শর্মা ও তার অনুগামীদের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়। তিনি গুপ্ত পরবর্তীযুগেও মুদ্রা

ও ব্যবসা বাণিজ্যের চলমানতার উপর জোর দিয়েছেন (Trade and Urban Centers of Early Mideaval India, IHR, 1974, pp – 203 - 09)। পাশাপাশি রোমিলা থাপারও মনে করেন যে গুপ্ত পরবর্তী যুগে পূর্বতন বাণিজ্যকেন্দ্র তথা শহরগুলির অবক্ষয় হলেও নতুন নতুন কেন্দ্র বাণিজ্যের স্থান হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

রামশরণ শর্মা, ডি. এন. ঝা, বি. এন. এস. যাদব প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ তত্ত্ব ও তথ্যগত ভাবে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ প্রমাণ করতে সমর্থ হলেও হরবন্স মুখিয়া, দীনেশ চন্দ্র সরকার, বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় বা রোমিলা থাপারের গবেষণা সমূহ ভারতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অস্তিত্বের যুক্তিসমূহকে নস্যাৎ করে দেয়। ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল নির্ণায়ক ছিল ভূমিদাস (Serfdom) যারা ভারতের আজ্ঞাধীন কৃষককুলের সমার্থক নয়। তাই কৃষকরা নানাভাবে শোষিত হলেও ভারতের জমির উর্বরতা শক্তির দৌলতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি বলে হরবন্স মুখিয়া মনে করেন।

ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিককুলে বিতর্ক থাকলে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি উৎপাদন। গ্রামীন অর্থনীতি স্বাভাবিক ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতো কৃষি ভূমির নিয়ন্ত্রকের দ্বারা। ফলে কৃষককুল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রিত জমিতে পরাধীন থাকলেও ভারতের সর্বত্র এই অবস্থা প্রচলিত ছিল না। কারণ ভূমিদানের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অঞ্চলও সময় ভেদে ছিল ভিন্ন। তাছাড়া ভারতের সর্বত্র জমির উৎপাদনশক্তি ও সামাজিক গঠন (Social structure) একরকম ছিল না। তাই ভৌগোলিক অবস্থানের তারতম্য অনুযায়ী অর্থনীতির তারতম্য ছিল। ফলে পাল, রাষ্ট্রকূট বা প্রতিহার সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য কামরূপ, উড়িষ্যা বা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে তার স্বরূপ ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই বলা যায় যে তত্ত্ব ও তথ্যগত ভাবে ইউরোপীয় সমাজ বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় এর অস্তিত্ব ভারতের মত ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিবিধতার (Geographical and Cultural plurality) দেশে খুঁজতে যাওয়ায় কোন দোষ না থাকলেও সাধারণীকরণের (Generalisation) ক্ষেত্রে জটিলতা আছে।

২.২. সেচ প্রযুক্তি ও কৃষি বসতির বিস্তার

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন এই বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকার কথা নয় যে আদি মধ্যযুগের কৃষি উৎপাদন কোন বদ্ধ অর্থনীতি (Closed / Stagnant economy) ছিল না। বরং কৃষিকাজ ও কৃষিবসতির বিস্তার ঘটেছিল সেচব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে কৃষিকাজে জল সেচের গুরুত্ব অতি প্রাচীন কাল থেকেই স্বীকৃত। নদী, হ্রদ, ঝর্ণা বা বৃষ্টির জল —জলের এই প্রাকৃতিক উৎসগুলিকে কৃষির কাজে লাগানোর কৌশল অতি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। তবে ভারতের সর্বত্র প্রাকৃতিক জলের উৎস ছিল না বা নেই। উত্তর, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃষ্টিপাত ও জলের প্রাচুর্য্য থাকলেও মধ্যভারত ও উত্তরপশ্চিম ভারতে জলের উৎস অপেক্ষাকৃত কম। তাই কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ বা পানীয় জলের চাহিদা পুরণের প্রযুক্তি এখানে স্বাভাবিকভাবেই উন্নতিলাভ করেছিল। তাছাড়া বিভিন্ন প্রযুক্তিতে প্রাকৃতিক জলকে কৃষি বিস্তারের কাজে লাগানোর প্রয়াস ঘটেছিল আদি মধ্যযুগের ভারতের সর্বত্র।

গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তীযুগে লিখিত স্মৃতিগুলিতে জলসেচের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। জলের উৎস ও সেচ ব্যবস্থার অনিষ্টকারীকে কঠোর শাস্তি দানের বিধান দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে (law book)। নারদ ও বৃহস্পতি স্মৃতিতে জলাধার নির্মাণ ও তার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে গুপ্তযুগের জলাধার নির্মাণ বা সংস্কারের স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে। এই লিপি থেকে জানা যায় যে গুজরাটের গিরনার (রৈবতক) পাহাড়ে মৌর্যযুগে নির্মিত সুদর্শন নামের জলাধারটির সংস্কার করা হয় শকরাজ রুদ্র দমনের সময়। অতিবর্ষণের ফলে স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে ঐ জলাধারটির দেওয়াল ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা চক্রপালিত গুরুত্ব সহকারে আগের চেয়েও শক্তপোক্ত ভাবে ঐ জলাধারের সংস্কার করেন।

জালাধার ছাড়াও নালা (জলনিরগম), কূপ, বাপি, তরঙ্গ, দীর্ঘিকা, অরহট্ট জলসেচের প্রভৃতি উপায় প্রচলিত ছিল গুপ্ত যুগে। গুপ্তপরবর্তী যুগেও জলসেচের গুরুত্ব অপরিবর্তিত ছিল। গুজরাট ও রাজস্থানে বাপি ও আরহট্টের প্রচলন অবিচ্ছিন্ন ছিল। দশম একাদশ শতকেও দিল্লীর মেহেরুউলি অঞ্চলে অসংখ্য বাপির অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুপ্তপরবর্তীযুগে উত্তর ভারতের কাশ্মীরের নদীবাঁধ ও জলসেচের কিঞ্চিত আভাষ পাওয়া যায় কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য (৭৪০ - ৭৭৬) ও অবন্তীবর্মন (৮৫৫ - ৮৮৩) কাশ্মীরের নদীবাঁধ ও কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ এবং নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাপালন করেছিলেন। তবে নদীমাতৃক বাংলায় কৃষিকাজে নদীর জল খালের সাহায্যে কাজে লাগানো হতো। পাশাপাশি আসাম বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নদীবাঁধ নির্মাণ করে ত্রয়োদশ শতকে জল সিক্ত ধান চাষ (Wet rice Cultivation বা Hydralic Culture)-এর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন উত্তর ভারত থেকে কামরূপে আগত কায়স্থ কৃষকগণ। পঞ্চদশ ষোড়োশ শতকে লিখিত শংকরদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব ও অনন্তকন্দলীর বৈষ্ণব সাহিত্যে তার বিবরণ পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতের মত দক্ষিণভারতেও কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তবে সপ্তম শতক থেকে সেচ ব্যবস্থার প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। জলাধার নির্মাণ করে জলকপাট (Sluice gate) এর সাহায্যে জলকে প্রয়োজনানুসারে কৃষিক্ষেত্রে বাহিত করার প্রযুক্তি সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। তাছাড়া বৃষ্টির জলে পুষ্ট জলাধারকে নালাবাহিত জলের সাহায্যে সারা বছর জল ধরে রাখার প্রক্রিয়া চালু হয় এখানে। নঞ্জনগুড় তালুকলিপি (কর্ণাটক, ৯০৪ খ্রিঃ) থেকে জানা যায় যে স্থান গুড়ুর অগ্রহারের অধিকর্তা (ব্রাহ্মণ) একটি বিশাল আকারের জলাধার নির্মাণ করেছিলেন যেখানে জল আসত নিকটবর্তী অরণ্যে অবস্থিত তিনটি ছোট্ট ধারা থেকে। এই জলাধার স্থানীয় কৃষকদের জলের চাহিদা পূরণ করত।

পরবর্তী পল্লব শাসকদের লিপিগুলিতে সেচব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। কর্ণাটকের মুলবাগাল তালুক লিপি (৭৫০ খ্রিঃ) জলসেচের বিশেষ প্রযুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে হিরিয়ুর তালুক লিপি (৮৯০) এক্ষেত্রে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আভাষ দেয়। এটি থেকে জানা যায় যে জলাধার থেকে বহু খাতের সাহায্যে জল নিয়ে যাওয়া হত দুরান্তে কৃষি ক্ষেত্রে।

জলাধার নির্মাণ করাই যথেষ্ট ছিল না। প্রয়োজন ছিল রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করা। দক্ষিণভারতে প্রাপ্ত লিপিগুলি থেকে জানা যায় যে মাটির বাঁধ, খাত ও খাল ভেঙ্গে গেলে তা মেরামতি করা হত পাথর বা ইটের দ্বারা। কৃষকরা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত ভাবে মেরামতির কাজ করতেন। কখনও আবার জমির মূল নিয়ন্ত্রক (দানগ্রহীতা) ও কৃষকগণ সম্মিলিতভাবে মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন। গ্রাম প্রধান (Village chief) ও সরকারী প্রতিনিধিদেরও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত।

আদি মধ্যযুগে কৃষিকাজে সেচব্যবস্থার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। তবে কৃষি বসতি বিস্তারের আরো কয়েকটি কারণ ছিল। বিশেষকরে কর্ষণযোগ্য কিন্তু পতিত জমিতে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান নতুন অঞ্চলে কৃষি বসতি বিস্তারের সহায়ক হয়েছিল। পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অরণ্য পরিষ্কার করে সেখানেও কৃষি বসতির বিস্তার ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে কৃষি বসতির বিস্তারের সবচেয়ে সহায়ক

হয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার (State System) বিকাশ। কারণ রাজ্য গঠন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার সৃষ্টি ও উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করা। আর আদি মধ্যযুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। স্বাভাবিক ভাবে নবগঠিত রাজ্য কৃষিবসতির বিকাশে সহায়তা করত।

২.৩. গ্রন্থপঞ্জি

১। D. N. Jha (ed) : **Feudal Order** (Delhi, 2000)

২। R. S. Sharma : **Indian Feudalism** (Calcutta, 1965)

৩। Herman Kulke (ed) : **The State in India 1000 – 1700** (Delhi, 1995)

৪। R. K. Barman : **From Tribalism to State** (Delhi, 2007)

৫। R. S. Sharma : **Perspectives in the Social and Economic History of Early India,** (New Delhi, 1995)

৬। Harbans Mukhia : **Was there Fudalism in Indian History,** Journal of Peasant Studies 8.3(1981) pp - 273 – 310.

২.৪. অনুশীলনী

১। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র কী?

২। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের তুলনা করুন।

৩। আদিমধ্য যুগে সেচপ্রযুক্তি ও কৃষিবসতির বিস্তার এর বর্ণনা দিন।

একক—৩ ❑ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনের বৈচিত্র্য

গঠন

৩.০. ভূমিকা

৩.১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি

৩.২. নানাবিধ কৃষিউৎপাদন

৩.০. ভূমিকা

আদি মধ্যযুগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমি দান, কৃষিতে অকৃষিজীবী শ্রেণির প্রবেশ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ তৎকালীন কৃষি উৎপাদনে সমৃদ্ধি এনেছিল। অর্থনীতির মূল উপাদানগুলোর নিয়ন্ত্রণ কৃষকদের হাতে না থাকলেও কৃষিতে বিভিন্ন ধরণের শস্য উৎপাদনের ঐতিহ্য অটুট ছিল। তাছাড়া এক অঞ্চলের শস্য অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার চাহিদা বৃদ্ধি ও উপযোগী প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের ফলে। সমকালীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে কৃষি উন্নয়নের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

৩.১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি

খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ভারতে কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন নিমিত্তের (Causative factors) মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা ও আজ্ঞাধীন কৃষি শ্রমিক (Servile agricultural labour, কৃতদাস নয়) শ্রেণির বিকাশ। কৃষি উৎপাদনে ভূমির নিয়ন্ত্রক ও আজ্ঞাধীন কৃষি শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল Symbiotic অর্থাৎ একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব বা বিকাশ সম্ভব ছিল না। ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেয়েছিল মূলত পুরোহিত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মন্দির-মঠ) ও রাজকর্মচারীদের ব্যাপক হারে ভূমিদানের ফলে (আমরা ইতিপূর্বে ভূমিদান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি)। কৌনাজের মৌখারী, কামরূপের বর্মন, ম্লেচ্ছ ও পাল রাজাগণ, বাংলার পাল, পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহার, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, চালুক্য এবং দক্ষিণভারতের পল্লব চোল রাজাগণ ভূমিদানের মাধ্যমে কৃষিউৎপাদনকে সামন্ততান্ত্রিক করে তুললেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে সেগুলো সহায়ক হয়েছিল। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে পুরোহিত বা মঠ মন্দিরকে যে সমস্ত ভূমিখণ্ড দান করা হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে সেগুলো ছিল অকর্ষিত পতিত জমি। দানগ্রহীতাগণ দানপ্রাপ্ত জমির পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব অর্জন করার ফলে কৃষি উৎপাদনে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাছাড়া রাষ্ট্র দানগ্রহীতাদেরকে কৃষি বিস্তারের জন্য কৃষিশ্রমিক ও হালের বলদ সহ অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করতেন ভূমিদাতা বা ভূমিদিয়া গণ। চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েনের (পঞ্চম শতক) রচনায় এর বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মদেওয়া, অগ্রহার ও দেবদান জমিতে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রন বৃদ্ধি পায়। এমনকি দেবদান ভূমিখণ্ড (মন্দিরের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভূমি) গুলির স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য ছিল। ১০৭০ খ্রিস্টাব্দের একটি লিপিতে দেখা যায় যে দেবদান জমির স্বত্ব ক্রয় করছে অগ্রহারের ব্রাহ্মণ সভা (Assembly)। তাই

প্রতিষ্ঠানগুলিও পুরোহিতদের মত কৃষি বিস্তারে উৎসাহী হয়েছিল। তবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ করেছিল রাজকর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে বংশ পরম্পরায় নির্দিষ্ট পরিমাণের ভূমির স্বত্ব ভোগের অধিকার। অর্থাৎ অতিরিক্ত উৎপাদনের দ্বারা অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সৃষ্টি (Generation of extra agricultural surplus) করে তার ভোগের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আদি মধ্যযুগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় নিমিত্ত ছিল আজ্ঞাধীন কৃষি শ্রমিক। এই কৃষি শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা ছিল হীন। এরা দান প্রাপ্ত গ্রামের দান গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া গ্রাম ত্যাগ করতে পারতেন না। এমনকি বেগার শ্রম দানেও বাধ্য থাকতেন। তবে এদেরকে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের আদলে ভূমিদাস (Serdom) বলা সঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে রামশরণ শর্মার কৃতদাসতুল্য কৃষিশ্রমিকের প্রকল্পকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া যায় না। পাশাপাশি হরবন্স মুখিয়ার বক্তব্য অর্থাৎ কৃষিতে সাধারণ কৃষকের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাও গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু সবচেয়ে মজার প্রশ্ন হল উদ্বৃত্ত উপভোগকারী ভূমি নিয়ন্ত্রক পরজীবীশ্রেণি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদগ্রীব ছিলেন কেন? এর সহজ উত্তর হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ। তৎকালীন ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাপের কোন সঠিক উপায় আমাদের কাছে না থাকলেও পরোক্ষ প্রমানের সাহায্যে ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমন দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মনদের সভাগুলিতে যেখানে প্রথম দিকে সদস্য সংখ্যা ছিল খুব অল্প পরবর্তীকালে একই অঞ্চলের সভাগুলির সদস্য সংখ্যা ৩০০, ৫০০, ১০০০, ১৩০০, ২০০০, ৩০০০ এমনকি ১২০০০ পর্যন্ত ছিল বলে বিভিন্ন লিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে শিকারপুর তালুকের গৌতম অগ্রহারের কথা বলা যায় যেখানে ৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সভার সদস্যসংখ্যা ছিল ১০০০ সেখানে ঐ অগ্রহারের মোট জনসংখ্যা ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২০০০ এ দাড়ায়। তবে অবশ্যই তারা সবাই সভার সদস্য ছিলেন না।

ব্রাহ্মণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেড়েছিল অব্রাহ্মণ ভূমি নিয়ন্ত্রক (ভল্লাল) দের সংখ্যাও। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই তত্ত্ব কৃষিশ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে কৃষিশ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল আরো বেশি। কেননা শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে এখনও জন্ম-মৃত্যুর হার বেশি। কৃষি শ্রমিক শ্রেণির অতিরিক্ত মানবশক্তি অতিরিক্ত উৎপাদনের শ্রমের চাহিদা পূরণ করেছিল এবং উদ্বৃত্তভোগীদের অতিরিক্ত উৎপাদনে আরো বেশি উৎসাহী হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির চালিকা শক্তি ছিল।

ব্রাহ্মণ বা ভূমিনিয়ন্ত্রকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপন অবশ্য প্রয়োজনীয় পড়ে। আর এই সুযোগ এসেছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে মন্দির তৈরী ও ভূমিদানের মধ্য দিয়ে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমভারতের এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। কামরূপের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের নিয়ে আমার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন রাজা মহাভূতি বর্মন (ষষ্ঠ শতক) ব্রাহ্মণদের প্রভূত পরিমানে জমিদান করে। ভাস্কর বর্মন (সপ্তম শতক) এর নিধনপুর তাম্রফলকে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কামরূপের প্রত্যন্ত ও ব্রাহ্মণহীন অঞ্চলে ভূমিদানের প্রথা শুরু হয় নবম শতকে। রাজা তৃতীয় বলবর্মন (৮৭৫ - ৮৯০) এর নঁগাও লিপি, রত্নপালের (আ ১০০০ - ১০৩০) বড় গাও তাম্রফলক ও সুর্যলিকুচি লিপি এর সাক্ষ্য বহন করে। দক্ষিণ ভারতেও এই অবস্থার তারতম্য ছিল না। আগে সেখানে মন্দিরগুলি তৈরী হতো শহর বা ব্যবসাকেন্দ্রের কেন্দ্রস্থলে অষ্টম শতক থেকে মন্দিরগুলি তার স্থলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে তৈরী হতে থাকে। উড়িষ্যার গঙ্গ রাজাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে মন্দির তৈরী প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ঐ সব অঞ্চলে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকাশ ও শাসকের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে বৈধতা (Legitimacy of political authority) দান করার জন্য মন্দির নির্মাণ সহ ব্রাহ্মণদের ভূমি দান ছিল চিরাচরিত প্রথা। কামরূপ বা উড়িষ্যার ক্ষেত্রে একথা সর্বোতো ভাবে প্রযোজ্য। নতুন

অঞ্চলে ব্রাহ্মণ বসতি ও মন্দির স্থাপনের ফলে নতুন দানপ্রাপ্ত ভূমিতে কৃষির বিস্তার সম্ভব হয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির আরো কতগুলি সহায়ক কারণ ছিল। বিশেষ করে সেচ ব্যবস্থার উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার। জলসেচের মাধ্যমে জলসিক্ত ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব ছিল। তাছাড়া চাষবাসে নতুন নতুন পরিক্ষানিরীক্ষা ও লৌহ নির্মিত কৃষি সরঞ্জামের আধুনিকীকরণের দ্বারা পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

৩.২. নানাবিধ কৃষি উৎপাদন

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের পুর্বে ভারতের কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে যে বিবরণ সমসাময়িক সাহিত্যগুলি থেকে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে কৃষি পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র ছিল। বরাহমিহির খনা ও কালিদাসের (রঘুবংশ) রচনা অনুসারে বলাযায় যে গুপ্তযুগে ভারতে সাধারণত ধান, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, ডাল, তৈলবীজ, তুলা, মশলা, ফল-মূল, শাকসবজী, ভেষজ প্রভৃতি ছিল সাধারণ কৃষি উৎপাদন।

বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও জলহাওয়ায় ধান উৎপাদনের প্রাচুর্য্য ছিল। কালিদাসের রঘুবংশে তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চম শতকের প্রথমদিকে লিখিত মা-লুয়ান (চীনা) এর বিবরণে বাংলা থেকে মালদ্বীপে চাল রপ্তানির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (কামরূপ, নিম্ন আসাম) ও ধান উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। তবে এখানে আধুনিক প্রযুক্তিতে জলসেচ নির্ভর ধান চাষ (Wetrice cultivation) এর উন্নতি ঘটে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে উত্তর ভারত থেকে কায়স্থ কৃষকদের দ্বারা। শংকরদেব (পঞ্চদশ - যোড়শ শতক), মাধবদেব (যোড়শ শতক) ও দামোদর দেব (যোড়শ শতক)এর রচনা সমূহে ত্রয়োদশ শতকের নিম্ন আসামের বিভিন্ন ধরনের ধান চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে ধান উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল দক্ষিণভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও। এখানে অষ্টম শতক থেকেই সেচব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ধান চাষে উল্লেখযোগ্য প্রগতি ঘটে। নবম শতকের আরব পর্যটক ইবন খুরদাবহ (Ibn Khurdabeh) উল্লেখ করেছেন যে, অন্ধ্রের কিছু অঞ্চল থেকে চাল রপ্তানি হতো সরনদীপ অর্থাৎ শ্রীলংকায়।

সেচকেন্দ্রিক ধান উৎপাদনের উল্টো ভূ প্রকৃতিময় অঞ্চলে গম চাষের প্রচলন ছিল বিশেষ করে রাজস্থান, উত্তর ভারতে ও উত্তর পশ্চিম ভারতে। খাদ্যশস্য হিসাবে ঐসব অঞ্চলে এখনও গম অনেক বেশী জনপ্রিয়। আদিমধ্যযুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কৃষি উৎপাদন ছিল জোয়ার, রাগি, বিভিন্ন প্রজাতির জোয়ার চাষ হত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত পিয়াংগু আদি মধ্যযুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। কর্ণটিকের রাগি (তেলেগুতে রাগালু, মারাঠী গুজরাটীতে নাগলি বলা হয়) চাষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আঁখ (Sugarcane) চাষ আলোচ্য সময়কালীন ভারতের একটি বহুধাবিস্তৃত ফসল ছিল। উত্তর ভারত ছাড়াও পুর্ব ভারতেরও এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চাষ হতো। দক্ষিণ ভারতেও আঁখ চাষের প্রচলন ছিল। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের তামিল কবিতা পুরনানুড়ু-তে উল্লিখিত আদিগমান নেড়ুমান আনজি মালাবার অঞ্চলে আঁখ চাষের সূত্রপাত করেন। ধীরে ধীরে আঁখ এই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় (বাগিচা) চাষে পরিণত হয়। গাথাসপ্তসতীতে আঁখ চাষ ও আখের রস থেকে তৈরী বিভিন্ন সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পান সুপারী ও নারিকেল ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে ওৎপোতভাবে জড়িত। এই উৎপাদনগুলি পূজাপার্বন ও সামাজিক উৎসবের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে এদের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন পড়েছিল। খ্রিঃ পূর্ব যুগে পান সুপারীর খুববেশী প্রচলন ছিল না। তবে তাম্বুল (পান) ও গুভক (সুপারী) এর চাষ বৃদ্ধি পায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম -ষষ্ঠ শতক থেকে। 812 খ্রিস্টাব্দে গুবি তালুক লিপি (দঃ ভাঃ) দেখা যায় যে পান চাষ দক্ষিণ ভারতেও প্রভূত

পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছিল। রাজা রাজা চোলের লিপিতে ও তাম্বুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজক Chou J. U. Kua (12th century) এর বর্ণনাতেও ভারতীয় রাজাদের মধ্যে পানের জনপ্রিয়তার আভাষ পাওয়া যায়। ফলে সামাজিক জীবনে পান ও সুপারির ব্যাপক চাহিদা ছিল বলা যায়। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে পান এর সামাজিক মূল্য এখনও অপরিসীম। ভেষজ গুণের জন্যও পান সুপারির চাহিদা ছিল। আলবেরুণী লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতীয়রা আহারের পর চুনসহযোগে পান খেতেন হজমীকারক হিসাবে। তার মতে সুপারী দাঁতের মাড়ীকে শক্ত ও পাকস্থলীকে সুস্থ রাখত।

সুপারীর মত ঐ প্রজাতির উল্লেখযোগ্য কৃষি উৎপাদন ছিল নারিকেল ও তাল। উৎসব পার্বনে নারিকেলের ব্যবহার ছিল সর্বভারতব্যাপী। তবে এদের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল উপকূলবর্তী অঞ্চলে। কালিদাসের রঘুবংশে দেখা যায় যে কলিংগ রাজ্যে (উড়িষ্যা) উৎকৃষ্ট মানের নারিকেল উৎপন্ন হত। অন্যদিকে গ্রামীন জীবনে তাল ও খেজুরের রস ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। উপকূলবর্তী অঞ্চলে তালের চাষ ছিল বেশি। ফলের চেয়ে তালের চাহিদা ও কম ছিল না। লেখার উপকরণ হিসাবে তালপাতার ব্যবহার অতিপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল।

ফলের মধ্যে কমলালেবুর চাষ এই সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দার্জিলিং, আসাম, নাগপুর ও আসামে কমলা লেবুর চাষ। কিন্তু দশম একাদশ শতকের লিপিতে উল্লিখিত তথ্যের সাহায্যে বলাযায় যে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কমলা লেবুর চাষ হত। কমলা লেবুর জনপ্রিয়তা আরব জগতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আলমাসুদী (৯১৫ খ্রিঃ) নামের আরবীয় পর্যটক এর বিবরণে জানা যায় যে দক্ষিণভারতের কমলালেবুর চারা ওখানে নিয়ে লাগানো হয়েছিল। আদি মধ্যযুগের ভারতে উৎপাদিত আরো কয়েকটি ফল ছিল আম, কাঠাল, পেয়ারা, পেঁপে, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি। আদি মধ্যযুগের সাহিত্যে এদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

ফলের চাষও বেশি উল্লেখযোগ্য কৃষি উৎপাদন ছিল বিভিন্ন প্রজাতির ডাল, তৈলবীজ ও বিভিন্ন ধরনের মসলা। তৈলবীজের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল সরিষা, তিল, রেড়ি ইত্যাদি। মসলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আদা, হলুদ, গোলমরিচ, জিরে, তেজপাতা, এলাচ প্রভৃতি।

৩.৩. গ্রন্থপঞ্জি

১। D. N. Jha (ed) : Peudal order (New Delhi, 2000).

২। R. S. Sharma : Early Medieval Indian Society (Calcutta, 2001)

৩। R. K. Barman : From Tribalism to state. (Delhi, 2007)

৩.৪. অনুশীলনী

১। আদি মধ্যযুগে ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলিকে চিহ্নিত করুন।

২। আদি মধ্যযুগের কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কতটুকু যুক্তিযুক্ত।

একক—৪ ❑ ইক্তাদারী প্রথা ও উদ্বৃত্ত পুনঃবিতরণ

গঠন

৪.০. সূচনা
৪.১. দিল্লী সুলতানীতে ইকতা ব্যবস্থার বিবর্তন
৪.২. ইক্তা ব্যবস্থার বিবর্তন
৪.৩. পর্যবেক্ষন
৪.৪. গ্রন্থপঞ্জি
৪.৫. অনুশীলনী

৪.০. সূচনা

দিল্লী সুলতানী শাসন ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কেন্দ্রিভূত উদ্বৃত্ত (Concentrated Surplus) পুণঃবিতরণের (redistribution) মধ্য দিয়ে সুলতানী শাসককে বৈধ ও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ইক্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন। ইক্তা কথাটির অর্থ হল 'অংশ' কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা দিল্লী সুলতানীর ক্ষেত্রে এটা ছিল নির্দিষ্ট পরিমাণের জমি যার ভোগের অধিকার দেওয়া হতো সেনানায়ক বা প্রাদেশিক স্বত্ব শাসন কর্তাকে তাদের নির্দিষ্ট সেবার বিনিময়ে। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধারণত দুই ধরনের ইক্তার অস্তিত্ব ছিল—

১। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের জমির খাজনা ভোগ করার অধিকার দেওয়া বা কোন ব্যক্তিকে একটা জমির অংশ ভোগ করার অধিকার দেওয়া যারা রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

২। কোন ব্যক্তির সেবা প্রদানের বিনিময়ে বেতন, অবসরকালীন ভাতা বা সেবার স্বীকৃতির পুরস্কার হিসাবে কোন জমির রাজস্ব ভোগ করার অধিকার দেওয়া।

দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই মুসলমান জগতে ইক্তা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছিল। ইসলামের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এর সামরিকীকরণ ঘটতে থাকে। বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্তাদের মধ্যে বিতরণ এর প্রক্রিয়াও চালু করেছিল তুর্কীরা। ইক্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা মুক্তি (ওয়ালি) তার ইক্তার রাজস্ব ভোগ করার পরিবর্তে শুধুমাত্র কেন্দ্রিয় শাসক বা সুলতানের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তাছাড়া মুক্তিকে শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। মুক্তিরা যাতে খুববেশি শক্তিশালী না হতো তার জন্য তাদের স্থানান্তর করার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠার বহু আগেই।

৪.১. দিল্লী সুলতানীতে ইক্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন

দ্বাদশ শতকের শেষ ও ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় সামরিক অভিযানের মাধ্যমে দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠার পর দিল্লীর সুলতান বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসক হলেও শাসনভুক্ত এলাকার তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল অনেক

কম। কারণ দিল্লী সুলতানীর আওতাভুক্ত অঞ্চল সমূহে তখনও পর্যন্ত ভূমিরাজস্ব সংগ্রহকরার ক্ষেত্রে রাজপুত সামন্ত শাসকরাই ছিলেন প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। তাই দিল্লীর তথাকথিত 'দাস' বা 'তুর্কী' সুলতানগণ শীঘ্রই উপলব্ধি করলেন যে সুলতানীর আয় বৃদ্ধি সহ নববিজিত রাজ্যকে রক্ষা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য এবং সামরিক শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইক্তা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে সুলতানীর আশু প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

সুলতান কতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬ - ১২১০) ও ইলতুতমিশ (১২১০ - ৩৬) ইক্তা ব্যবস্থার পূর্ণসদ্ব্যবহার করেছিলেন। তারা ভারতীয় প্রথাগত সামন্ত ব্যবস্থার কার্যকারিতার সঙ্গে নবপ্রতিষ্ঠিত সুলতানীর সুরক্ষার জন্য ইক্তা ব্যবস্থার মিশ্রন ঘটিয়ে কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। ইক্তা প্রদানের মাধ্যমে তুর্কী অভিজাত ও শাসক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রেখে তাদের সুলতানীর প্রতি দায়বদ্ধ করার ব্যবস্থা করে সুলতানীর আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য ইক্তা ব্যবস্থার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

দিল্লী সুলতানীর প্রথম দিকে দুই ধরনের ইক্তাদার বা মুক্তির অস্তিত্ব ছিল। প্রদেশ বা বড়কোন অঞ্চল এর ইক্তার মালিক (মুক্তি বা ওয়ালি) ভার প্রাপ্ত অঞ্চলের শাসনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়াও সুলতানকে সামরিক ও সেবা প্রদান ও অর্থের যোগান দিতে বাধ্য থাকতেন। এই ধরনের মুক্তিগন তাদের ইক্তা থেকে আদায়ীকৃত ভূমি রাজস্ব থেকে নিজস্ব ব্যয় সংকুলানের পর অতিরিক্ত সংগ্রহ (Fazail, উদ্বৃত্ত, Surplus) সুলতানের কোষাগারে পাঠিয়ে দিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণির মুক্তিগণ ছিলেন সাধারণত ছোট ইক্তার মালিক। এরা সামরিক সেবার পরিবর্তে যে ইক্তা পেতেন সেখানে তার শাসনতান্ত্রিক বা অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা থাকত না। তারা তাদের সেবার বিনিময় বেতনের পরিবর্তে ইক্তা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ভোগ করতেন।

৪.২. ইক্তা ব্যবস্থার বিবর্তন

সুলতান ইলতুতমিশ দোয়াব অঞ্চলে তুর্কী অভিজাতদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ইক্তা প্রদান করেছিলেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। কিন্তু তার মৃত্যুর পর দিল্লী সুলতানীর আভ্যন্তরীন গোলযোগের ফলে ইক্তাগুলির উপর দিল্লীর সুলতানদের আধিপত্য হ্রাস পায়। মুক্তিগণ সুলতানের প্রতি তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাই শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রিকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে ইক্তাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও এখন ত্রয়োদশ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ তা বিকেন্দ্রিকরণের সূচকে পরিণত হয়।

কিন্তু সুলতান বলবন (১২৬৬ - ৮৭) সুলতানীর দুর্বলতা ও আভ্যন্তরীন গোলযোগের সুষ্ঠু মীমাংসা করে সুলতানীকে শক্তিশালী করে তোলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ইক্তা ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রিকরণের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বলবন তাকে সমূলে উৎপাটিত করার কাজে লিপ্ত হন। দোয়াব অঞ্চলে তুর্কী অভিজাত দের ইলতুতমিসের দ্বারা প্রদত্ত ইক্তাদার ও তাদের বংশধর ইক্তা ভোগের অধিকার নিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। ঐ অঞ্চলের দুই হাজার মুক্তি ও তাদের বংশধরগণ ইক্তার উপর তাদের বংশপরম্পরায় সত্ত্বভোগের অধিকার দাবি করেন।

কিন্তু বলবনের মত ছিল অন্যরকম। তার মতে মুক্তিদের ইক্তা দেওয়া হতো সামরিক সেবা প্রদানের পরিবর্তে। তাই সামরিক সেবা প্রদান ছাড়া মুক্তিগণ কখনও বংশপরম্পরায় ইক্তার রাজস্ব ভোগ করার অধিকার পেতে পারেন না। যেহেতু এখানকার মুক্তিগণ আর সামরিক সেবা প্রদান করছেন না তাই ইক্তার উপর তাদের অধিকার কখনই বৈধ নয়। কিন্তু মুক্তিদের বক্তব্য ছিল অন্যরকমের। তারা মনে করতেন যে ইলতুতমিশ তাদের পূর্বপুরুষদের

ইক্তা প্রদান করেছিলেন সামরিক সেবার উৎকর্ষতার পুরস্কার হিসাবে যার সঙ্গে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা প্রদানের কোন সম্পর্ক নেই। শেষ পর্যন্ত বলবন দিল্লীর কতোয়াল ফক্‌রুদ্দিনের পরামর্শে দোয়াবের মুক্তিদের সঙ্গে একটা মধ্যস্থতায় এসেছিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত মুক্তিদের ২০-৩০ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তবে বলবান ইক্তার উপর বংশ পরম্পরায় স্বত্ব ভোগের দাবি কখনই স্বীকার করেননি।

বলবন ইক্তার উপর নিয়ন্ত্রন বৃধি করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'খাজা' নামের একটি তত্ত্বাবধায়ক পদ (Superintendent) সৃষ্টি করেছিলেন। এর পেছনে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইক্তার আয় নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত রাজস্ব (ফাজাইল) সুলতানের কোষাগারে স্থানান্তর করা। খাজা সুলতানীর প্রতিনিধি হিসাবে ওয়াজিরের (Prime Minister) নিয়ন্ত্রনাধীনে ইক্তার অর্থনৈতিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু মুক্তিগণ আগের মতই শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক ব্যাপারে সুলতানের কাছে দায়বধ্ব থাকতেন।

বলবনের পরবর্তী শক্তিশালী সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬ - ১৩১৬) ও ইক্তা ব্যবস্থাকে ধরে রেখেছিলেন। তিনি দিল্লী সুলতানীর আওতাভুক্ত ইক্তা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে তার নব বিজিত অঞ্চলে বহু মুক্তি বা ওয়ালি নিযোগ করেছিলেন। নববিজিত অঞ্চলের মুক্তি গণ সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তবে মুক্তিদের উপর কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রন আরো বাড়িয়েছিলেন আলিউদ্দিন খলজি। শুধুমাত্র স্থানান্তর নয় এবার সুলতানীর দ্বারা নিয়মিত অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিদের উপর চাপ বাড়ানো হয় ইক্তা থেকে অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য।

তুঘলক সুলতানদের শাসনকালে বিশেষ করে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সময় ইক্তাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটা ভাগ নির্দিষ্ট করা হয় মুক্তিদের দ্বারা নিয়োজিত সেনাবাহিনীর খরচ সংকুলানের জন্য। অপর ভাগটি নির্দিষ্ট থাকত মুক্তিদের বেতনের জন্য। সমস্ত খরচ সংকুলানের পর আরো উদ্বৃত্ত থাকলে তা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে পাঠানো হতো। তবে মহম্মদ বিন তুঘলক একটু আলাদা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মুক্তিদের শুধুমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমিরদের উপর যারা সেনাবাহিনী ও নিজের বেতন পেতেন মুক্তিদের কোষাগার থেকে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে মহম্মদ বিন তুঘলক মুক্তিদের সামরিক ক্ষমতাকে সংকুচিত করে সুলতানের কর্তৃত্বকে আরো বেশি জোরদার করেছিলেন।

৪.৩. পর্যবেক্ষণ

ইক্তা ব্যবস্থা দিল্লীর সুলতানীর ক্ষেত্রে একটা নতুন সংযোজন ছিল। যদিও মুসলমান জগতে এই ব্যবস্থা সুপরিচিত ছিল। এই ব্যবস্থা সুলতানদের হাতে ধরে ভারতে কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা (State System) গঠনের দুটো শর্ত পূরণ করেছিল—

(১) ভারতে নব প্রতিষ্ঠিত দিল্লীসুলতানীকে কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য তুর্কী অভিজাত ও সেনা নায়কদের সহযোগিতা ও আনুগত্য অক্ষুন্ন রাখা।

(২) কৃষকদের দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্তকে রাষ্ট্র কর্তৃক সংগ্রহ ও পুনঃবিতরণের মধ্য দিয়ে শাসক গোষ্ঠিকে সন্তুষ্ট রাখা।

ইক্তা ব্যবস্থার এই কার্যকারিতার জন্যই দিল্লী সুলতানী একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে বিকেন্দ্রিকরণের বীজ নিহিত থাকলেও দিল্লী সুলতানী এক কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরীর পথ প্রস্তুত করেছিল।

৪.০. গ্রন্থপঞ্জি

১। I. H. Querishi : The administration of the Sultanate of Delhi (Lahore, 1944)
২। K. A. Nizami : Some Aspects of Religion and Polities in India during the Thirteenth Century. (Aligarh, 1961)
৩। U. N. Day : The government of the Sultanate (New Delhi, 1972).
৪। G. J. S. Grewal (ed) : The State and Security in Medieval India (New Delhi, 2005)

৪.০. অনুশীলনী

১। আপনি কি মনে করেন যে ইক্তা ব্যবস্থা দিল্লী সুলতানীর অর্থনৈতিক ভিতকে শক্ত করেছিল?
২। ইক্তাব্যবস্থার বিবর্তনের বিরণ দিন।
৩। আপনি কি মনে করেন যে ইক্তা ব্যবস্থা কেন্দ্রিভূত উদ্বৃত্ত পুনঃবিতরণের একটা কৌশল ছিল?

অষ্টম (খ) পত্র

পর্যায়—৩

একক ০১ ❒ পূর্বাবলোকন : প্রাচীন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদিযুগ

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ হরপ্পা যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

১.২ বৈদিক যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

১.৩ প্রাক্-মৌর্য যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

১.৩.১ মুদ্রা : প্রাক্-মৌর্য যুগ

১.৪ মৌর্য-যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

১.৪.১ মুদ্রা : মৌর্য যুগ

১.৫ মৌর্যোত্তর যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

১.৫.১ মুদ্রা : মৌর্যোত্তর যুগ

১.৬ নগরায়ণ

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.৮ অনুশীলনী

১.০ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য তার বৈচিত্র্যগত ঐক্যে। তবে ভারতবর্ষের সনাতন ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার বর্তমান কালের ভারত এবং প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের সীমা এক নয়। বর্তমানের ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপালের সামগ্রিক ভূখণ্ডের সংহত রূপই হল প্রাচীন ভারতবর্ষ। এই উপমহাদেশের উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয়, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এবং দক্ষিণে বিরাজমান ভারত মহাসাগর। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানে বৈচিত্র্য থাকলেও প্রাচীন ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি আঞ্চলিক ঐক্য ছিল। সম্পদের বৈভবে ঐশ্বর্যশালী এই উপমহাদেশে সম্পদের উৎসকে কাজে লাগিয়ে নানাধরনের শিল্পের উন্মেষ ঘটে, গড়ে ওঠে কারিগরী শিল্প-নির্ভর জীবিকা, যাকে আশ্রয় করে সমাজের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী জীবন-জীবিকা অর্জনের উপায় খুঁজে নিতে সমর্থ হয়। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বাড়তি পণ্য উৎপাদন হবার পর উৎপাদক ভোক্তার কাছে তা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করত বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে। এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের তাগিদেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব এবং তা সম্প্রসারিত হয় ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে, একাধিক অধ্যায়ে।

১.১ হরপ্পা যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

হরপ্পা-সভ্যতার আদি পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যভাগে এবং আদি পর্যায় থেকে পরিণত পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ নাগাদ। মোটামুটিভাবে আমাদের কাছে যা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এই সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। হরপ্পার নগর-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক জীবনের তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যবসা-বাণিজ্য। সিন্ধু উপত্যকায় বিভিন্ন ধাতুশিল্পে সিদ্ধহস্ত কারিগরের উপস্থিতির সাক্ষ্য থাকলেও সে সকল ধাতু অর্থাৎ কাঁচামালের অস্তিত্ব হরপ্পা সভ্যতার আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে নেই, অনুমান করা যেতে পারে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে বিভিন্ন ধাতু সিন্ধু উপত্যকায় আমদানি করা হত। এই ধারণার সপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণও পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে ব্যবহৃত সোনা সম্ভবত আসত দাক্ষিণাত্য থেকে। রূপার প্রাপ্তিস্থান ছিল সম্ভবত আফগানিস্তান। তামা আসত রাজস্থানের ক্ষেত্রী অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য ও বালুচিস্তান অঞ্চল থেকে, জেড পাথরের প্রাপ্তিস্থল পশ্চিম-এশিয়া, এ্যাগেড, চ্যালসিডনী, কার্ণেলিয়ন পাথর পাওয়া যেত সম্ভবত সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিম ভারত থেকে, লাপিসলাজুলি আনা হত আফগানিস্তানের বদ্‌খ্‌শান এলাকা থেকে। আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। বিভিন্নরকমের ধাতু ও মূল্যবান পাথরের প্রাপ্তিস্থান-এর উপর নির্ভর করে ব্রিজিৎ অলচিন্ এবং রেমন্ড অলচিন্ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হরপ্পা-সভ্যতায় ধাতু সরবরাহের জন্য এক বিরাট এলাকা জুড়ে বাণিজ্য চলত।

আলোচ্য যুগে দূরপাল্লা বাণিজ্যের নজিরও কম নেই। ১৯২৩ সালে সি. জে. গ্যাড মেসোপটেমিয়ার উর নামক অঞ্চল থেকে চব্বিশটি সিলমোহর আবিষ্কার করেন। এগুলি অবিকল হরপ্পীয় সিলমোহরের অনুরূপ। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী বলেছেন এই সীলমোহরগুলি প্রকৃত হরপ্পীয় জনগণের হাতে তৈরি হতে পারে অথবা হরপ্পার সিলমোহরের অনুকরণে মেসোপটেমিয়াতে নির্মিত হতে পারে। এই সিলমোহরের উপস্থিতি সিন্ধু উপত্যকা ও টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপত্যকার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণ দ্বারা আরও অনুমান করা যেতে পারে, মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পা-সভ্যতার মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমেই লেনদেন হত বেশি। সমুদ্র-বাণিজ্যের অপর নিদর্শন পাওয়া যায় গুজরাটের লোথালে। কাদামাটি ও ইট দিয়ে তৈরি একটি বৃহদায়তন পীঠিকা লোথালে পাওয়া গেছে। পুরাতাত্ত্বিক এস. আর. রাও মনে করেন এই ইমারতটি আসলে প্রাচীন পোতাশ্রয়ের অংশবিশেষ। গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত লোথাল হরপ্পা সভ্যতার সমুদ্র-বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা নিত বলে তাঁর অনুমান। তবে শিরীন রত্নাগর অবশ্য এস. আর. রাও এর এই ধারণা সমর্থন করেন না। যাইহোক, লোথালের সঙ্গে বহির্ভারতীয় বাণিজ্যিক যোগাযোগ হরপ্পীয় যুগে ছিল একথা তথ্যপ্রমাণ দ্বারা স্বীকৃত।

হরপ্পা সভ্যতার নাগরিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। দূরদূরান্তের অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বজায় রাখার জন্য উন্নত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল বলে অনুমান করা হয়। পুরাতাত্ত্বিক

খননকার্য দ্বারা প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈরি এক্কাগাড়ির ক্ষুদ্র অনুকৃতি (model) দেখে মনে হয় স্থলপথে পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্ভবত দ্বিচক্রচালিত এক্কাগাড়ি ব্যবহার করা হত। হরপ্পার যুগের জলযানগুলির প্রতিকৃতি হরপ্পীয় সিলমোহরে উৎকীর্ণ আছে। এই সিলমোহরগুলি বাণিজ্যিক কারণেই বিশেষত ব্যবহৃত হত। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে, পণ্যসামগ্রীর ওজন ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার জন্য ব্যবসায়ীরা পণ্যের উপর সিলমোহরের ছাপ দিতেন, যা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণেরও ইঙ্গিত বহন করে।

১.২ বৈদিক যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

ভারতবর্ষের ইতিহাসে হরপ্পা তথা সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী অধ্যায়টি বৈদিক-সভ্যতার যুগ। হরপ্পা যুগের নগর ভিত্তিক অর্থনীতির অবসান ঘটার পর যে নগর বিমুখ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সন্ধান আমরা পাই তার গতিপ্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে গেলে আমাদের নির্ভর করতে হবে বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যবিবরণের উপর। ফ্রিডরিশ ম্যাক্সম্যুলার প্রাচীনতম ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করেছেন ১২০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তাঁর মতে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের আগে বৈদিক সাহিত্য রচনার কাজ শেষ হয়।

ঋগ্বেদের যুগে সম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষায় বণিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করছেন এমন ধরনের বিবরণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (১.৫৬.২)। বণিকগণ 'শতধন' লাভ করার জন্য দূরদেশে পাড়ি দিতেন। পথিমধ্যে তাঁদের বিপদ-আপদের আশঙ্কা অবশ্যই ছিল। সম্ভবত এই বাণিজ্য অভিলাষী মানুষগণের কল্যাণ এবং নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করে ঋগ্বেদে বহু প্রার্থনা মন্ত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। সুদূর বাণিজ্যে যাতায়াতের পথে দস্যু তস্করের উপদ্রবের ইঙ্গিত এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। বণিকদের চিহ্নিত করতে ঋগ্বেদে 'পণি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

ঋগ্বেদে সমুদ্র বাণিজ্যের উল্লেখ পরিষ্কারভাবে না পেলেও 'সমুদ্র' কথাটি বহুবার পাওয়া যায়। শতদাঁড় যুক্ত জলযান বা 'শতারিত্র নৌ'-এর উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। 'ধনপ্রার্থী' ব্যক্তি সমুদ্রে চলাচলের জন্য সমুদ্রের স্তুতি করে এরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদে আছে। তবে সমুদ্রে যাতায়াতের সম্ভাবনা থাকলেও নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। আর্থার ব্যারিডাল কীথ সহ বহু পন্ডিতের মতে, ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'সমুদ্র' কথাটি আসলে নিম্ন-সিন্ধু উপত্যকার বা সিন্ধু মোহনার সুবিস্তীর্ণ জলরাশিকেই বোঝায়। কিন্তু ম্যাক্সম্যুলার, লাসেন ও জিমার কীথের মত সমর্থন করেননি। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য সমুদ্র বলতে নিঃসন্দেহে সাগরকেই বোঝানো হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'কুসিদ' এবং 'কুসীদিন' শব্দ দুটির উল্লেখ দেখা যায়। কুসিদ বলতে বোঝায় 'ঋণ' এবং কুসীদিন হলেন সুদের কারবারী। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত 'কৃষ্ণল' ও 'শতমান' শব্দ দুটি সম্ভবত ওজনের একককে চিহ্নিত করেছে। কোনো ঐতিহাসিকের মতে কৃষ্ণল ও শতমান দুই প্রকার মুদ্রার নাম। তবে সেযুগে ধাতবমুদ্রার প্রচলন ছিল কিনা তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে।

১.৩ প্রাক্-মৌর্য যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রাক্-মৌর্য যুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক এবং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের অন্তর্বর্তী দুইশত বছর ভারতবর্ষে বাণিজ্য-প্রগতির একটি সম্ভাবনাময় যুগ হিসাবে পরিগণিত করা যেতে পারে। পালি সাহিত্যে কৃষির তুলনায় বাণিজ্যকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, জীবিকার্জনের অধিকতর লাভজনক পন্থা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পালি সাহিত্য। এই তথ্যসূত্রে অগাধ বৈভবশালী বণিক 'সেট্ঠি' বা 'শ্রেষ্ঠী'—অভিধায় ভূষিত, ছোট ব্যবসায়ীকে অভিহিত করা হয়েছে 'পাপনিকো' নামে। প্রধান বণিক এবং ভ্রাম্যমান বণিকদের বলা হত 'সার্থবাহ'। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে 'গো-বণিজ' এবং 'অশ্ব-বণিজ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমকালীন তথ্যসূত্রে অবশ্য স্থল-বাণিজ্য বিষয়ক বিবরণই বেশি পাওয়া যায়। তবে পালি-সাহিত্যে 'সমুদ্দবণিজ্জ' বা সমুদ্র বাণিজ্য ও 'সমুদ্দিকায়া নাবা' অর্থাৎ সমুদ্রগামী জলযানের বর্ণনাও লিপিবন্ধ হয়েছে। প্রাক্-মৌর্য যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতার ইঙ্গিত বহন করে ধাতব মুদ্রার অস্তিত্ব। নির্দিষ্ট ওজন ও ধাতবমান বিশিষ্ট মুদ্রার প্রচলন ইতিহাসের আলোচ্য যুগে সম্ভব হয়েছিল সম্ভবত বাণিজ্যের ব্যাপকতায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সমাজে পেশাদারী সংগঠনেরও উদ্ভব হয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্র, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পালি সাহিত্যে এই জাতীয় বৃত্তিমূলক সংগঠন, শ্রেণি, পূগ, সংঘ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। এই সংগঠনগুলিকে পরবর্তীকালে গঠিত 'গিল্ড' জাতীয় সংগঠনের সমধর্মী বলে মনে করা যেতে পারে।

১.৩.১ মুদ্রা : প্রাক্-মৌর্য যুগ

পালি সাহিত্যে কার্ষাপণ এই মুদ্রানামটি একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। পাণিনি 'রূপ্য' বলতে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রাকেই বুঝিয়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত হবার সাহিত্যগত প্রমাণ এখন প্রত্নতত্ত্ব দ্বারাও সমর্থিত। তক্ষশিলার উৎখননে আবিষ্কৃত হয় একটি মৃৎপাত্র, ১১৭১টি মুদ্রা এর মধ্যে সংরক্ষিত। এই মুদ্রাগুলির কয়েকটি মুদ্রা আলেকজান্ডার এবং গ্রীক অধিকৃত গান্ধারের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ফিলিপের। তাদের নির্মাণ খুব সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে। ছাঁচে ছাপ দেওয়া মুদ্রার সংখ্যা ১০৫৫টি, বাকি ৭৯টি মুদ্রাও ছাঁচে ছাপমারা তবে আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। মুদ্রাগুলিতে কোনো রাজা বা ব্যক্তির নাম নেই, আছে নানারকম নক্শা। মুদ্রার অপর পিঠে কোনো লেখ বা নক্শা নেই। এই জাতীয় মুদ্রাগুলি Punch-marked coin বা অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রা নামে অভিহিত। প্রাচীন ভারতে এই প্রকার মুদ্রা বহুল প্রচলিত ছিল। তক্ষশিলার ছাঁচে ছাপমারা মুদ্রাগুলি গড়পড়তা ৫৪ বা ৫৫ গ্রেণ ওজনের। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকেই ভারতে নিশ্চিতভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে নির্দিষ্টমানের ধাতবমুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। বাণিজ্যের অগ্রগতির সমর্থনে এটি একটি অবিসংবাদী প্রমাণ।

১.৪ মৌর্য যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

গ্রীক লেখকদের বিবরণীতে 'এ্যাগোরানোময়' নামক এক শ্রেণির কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল পথঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ করা। সম্ভবত মৌর্য যুগের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থায়

বাণিজ্যিক প্রসারণের পক্ষে অপরিহার্য বিষয় হিসাবে পথঘাটের উন্নতিসাধন তথা যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা হয়েছিল। এরাটোস্থেনেস্ লিখেছেন পালিমবোথরা বা পাটলিপুত্র থেকে একটি সুদীর্ঘ রাজপথ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম এশিয়ার দিকে গিয়েছিল। সমকালীন সূত্রগুলি অনুধাবন করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মৌর্য আমলে যাতায়াত ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল।

অর্থশাস্ত্র-রচয়িতা কৌটিল্য বাণিজ্য-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত 'পণ্যাধ্যক্ষ' নামক এক শ্রেণির রাজকর্মচারীর উল্লেখ করেছেন। সাধারণ পণ্যের লেনদেন ছাড়াও 'রাজপণ্য' (অর্থাৎ রাজকীয় খেতখামার ও কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি) বিক্রয়ের দায়িত্বও পণ্যাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজকীয় দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যাধ্যক্ষ বেসরকারি বণিক বা বৈদেহককে নিয়োগ করতে পারেন ; তবে তাঁরা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজপণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য থাকতেন। এ যুগের ইতিহাস রচনার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপাদান অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে পণ্যাধ্যক্ষের কর্তব্য হল দেশীয় বণিকদের জন্য শতকরা পাঁচভাগ এবং বিদেশি বণিকদের জন্য শতকরা দশভাগ লাভের হার ধার্য করা। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভবত রাষ্ট্র উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। অশোকের অনুশাসনে তাম্রপর্ণী বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যোগাযোগ ও পশ্চিম এশিয়ার পাঁচজন গ্রীক রাজার সঙ্গে অশোকের দৌত্যের কথা জানা যায়। এই দৌত্য অবশ্য 'ধম্ম' প্রচারের জন্য হয়েছিল তবে এই জাতীয় সাংস্কৃতিক দূত বিনিময় দূরপাল্লার যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদান না থাকলে বাস্তবায়িত হত না।

১.৪.১ মুদ্রা : মৌর্য যুগ

মৌর্য আমলে বাণিজ্যিক বিকাশের অন্যতম চাক্ষুষ প্রমাণ হল পর্যাপ্ত পরিমাণে মুদ্রার উপস্থিতি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অঙ্ক চিহ্নিত মুদ্রার উদ্ভব ও বহুল প্রচলন ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে, এই মুদ্রা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও মৌর্য অধিকৃত ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল। এছাড়া Cast coin বা ছাঁচে ঢালা মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌর্যযুগের মুদ্রায় শাসকের নাম ও পরিচয় উল্লিখিত নেই। তবে মুদ্রার ধাতব মান, নির্দিষ্ট ওজন ও পরিমাপ, বিশুদ্ধি এবং সর্বোপরি সমধর্মিতা (Uniformity) এতই নিয়মিত যে মুদ্রা উৎকীর্ণ করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে মনে হয়। সাধারণত যে মুদ্রাটিতে তোরণের উপর বসা ময়ূরের নক্শা দেখা যায় তাকে মৌর্য মুদ্রা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। উত্তর-পশ্চিম ভারত, গাঙ্গেয় অববাহিকা, উত্তরবঙ্গ, মধ্যভারত এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলে নানা স্থান থেকে এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে মুদ্রা প্রস্তুত করার অধিকার অবশ্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই অর্পণ করা হয়েছে, যে রাজকর্মচারী এই কর্তব্যের ভার নিতেন তিনি 'রূপদর্শক' নামে অভিহিত।

১.৫ মৌর্যোত্তর যুগ : ব্যবসা-বাণিজ্য

আলোচ্য সময়কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার এবং অগ্রগতির তথ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়েছে সমকালীন লেখমালায় যার অধিকাংশই দানপত্র। অবশ্য এই যুগের সাহিত্যিক তথ্যসূত্র-ও নেহাৎ কম না

বৌদ্ধ অবদান-সাহিত্য, জাতক-সাহিত্য, পেরিপ্লাস-এর বিবরণ, গ্রীক লেখকগণের রচনা সম্ভার, চীন দেশীয় সাহিত্যে চিয়েন-হান-শু, হৌ-হান-শু প্রভৃতি থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। জাতকের কাহিনীতে বারংবার 'বণিক', 'সার্থবাহ' এবং 'শ্রেষ্ঠী'র উল্লেখ আছে। সম্ভবত বণিক ছিলেন সাধারণ মাপের ব্যবসায়ী, সার্থবাহ বলতে সাধারণত 'সার্থ' বা কাফেলা (বাণিজ্য শকট)-র নায়ক বা প্রধানকে বোঝানো হত। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল 'সেট্‌ঠি' বা শ্রেষ্ঠীর।

ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবার ফলস্বরূপ বাণিজ্যিক সম্প্রসারণও ঘটেছিল দ্রুতগতিতে। বৌদ্ধ আকরগ্রন্থাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যবিবরণের উপর ভিত্তি করে অতীন্দ্রনাথ বসু এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে অন্তত চারটি বাণিজ্যপথ বা যোগাযোগের প্রধান পথ ও তাদের বহু শাখাপ্রশাখা দূরদূরান্ত ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ভারতবর্ষে অন্তর্বাণিজ্য সম্পর্কের পাশাপাশি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষদিকের থেকে ভারতবর্ষ দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বৈদেশিক তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলের ক্ষেত্রে তৎকালীন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। অন্যদিকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে ভারত মহাসাগরে মৌসুমি বায়ুর গতিপ্রকৃতি বণিক ও নাবিকদের কাছে বোধগম্য হবার ফলে পশ্চিম থেকে প্রাচ্যে আসার জন্য একমাত্র স্থলপথের উপর নির্ভরশীলতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

'পেরিপ্লাস অফ্ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক এবং টলেমি তাঁর 'জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস' গ্রন্থে খ্রিস্টীয় প্রথম দুই শতকের ভারতীয় উপকূলের প্রধান বন্দরের তালিকা পেশ করেছেন। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে 'গ্যাঙ্গে' বা গঙ্গা বন্দরের উল্লেখ পেরিপ্লাসে পাওয়া যায়। এই বিবরণে বলা হয়েছে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল গঙ্গাদেশ নামে পরিচিত ছিল, ওই দেশের প্রধান বন্দরের নামও গঙ্গা। এই অঞ্চলের পণ্য, বিশেষত মসলিন রোমের বাজারে রপ্তানি হত সম্ভবত ভৃগুকচ্ছ বন্দরের মাধ্যমে। টলেমির বিবরণে 'টামেলিটিস' নামক যে বন্দরের নাম পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দর (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক)।

রোম-ভারত বাণিজ্যের পণ্যতালিকা প্লিনী, পেরিপ্লাস এবং টলেমির রচনায় পাওয়া যায়। চাল ও গম কোঙ্কনের বন্দর থেকে পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে রপ্তানি হত। রোমের বাজারে ভারতীয় গোলমরিচের বিশেষ চাহিদা ছিল। দারুচিনি রপ্তানি হত মালাবার থেকে। চন্দনকাঠ, সেগুনকাঠ এবং মেহগিনি কাঠও রপ্তানিযোগ্য পণ্যতালিকায় স্থান করে নিয়েছিল। ভারত থেকে সাধারণ মোটা কাপড় এবং মসলিন রোমে পাড়ি দিত। চীনের রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন বন্দরের মাধ্যমে রোমে পৌঁছাত। দামি পাথর, এ্যাগেড, কার্ণেলিয়ন প্রভৃতি ছাড়াও বিলাসদ্রব্যের বহু উপকরণ রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত হত।

পক্ষান্তরে রোম অথবা পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে আগত বা আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল খেজুর, সুরা, কাচের পাত্র, আলেকজান্দ্রিয়া ও ব্যাবিলনের সূচীশিল্প শোভিত বস্ত্র, তামা, টিন, সিসা, সোনা,

রূপা প্রভৃতি। রোমের স্বর্ণমুদ্রাও বুলিয়ন হিসেবে আমদানি হত। রোম-ভারত বাণিজ্যে আমদানির তালিকাটি রপ্তানির তুলনায় বৈচিত্র্যহীন এবং সংক্ষিপ্ত। ২২ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট টাইবেরিয়াস অভিযোগ করেছিলেন যে বিলাসব্যসনের চাহিদা মেটাতে রোম সাম্রাজ্যের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্ধশতাব্দী পরে প্লিনীর রচনাতেও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

১.৫.১ মুদ্রা : মৌর্যোত্তর যুগ

আলোচ্য যুগে প্রস্তুত অগণিত বহুরকমের মুদ্রা বাণিজ্য বিস্তার এবং সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। উত্তরভারতে কুষাণ মুদ্রা ব্যবহৃত হত সবচেয়ে বেশি, এইসব মুদ্রা সোনা, রূপা এবং তামা এই তিনটি ধাতুনির্মিত ছিল তবে ইন্দো গ্রীক রাজারাও সোনা ও রূপার মুদ্রা নিয়মিতভাবে প্রচলিত করেন। সম্ভবত কুষাণ স্বর্ণমুদ্রার প্রবক্তা ছিলেন বীম কদফিসেস। তথ্যপ্রমাণের সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা হয় কুষাণ স্বর্ণমুদ্রা রোমক স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত করা হত। কুষাণ রাজারা রোমের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। বীম কদফিসেসের আমলে একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল যার ওজন সমসাময়িক রোমান স্বর্ণমুদ্রার মতো, এ থেকে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কুষাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যথেষ্ট তৎপর ছিল। রৌপ্যমুদ্রার ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা পার্থক্য ধরা পড়ে। কুষাণরাজ হুবিষ্ক-এর সমকালীন মথুরা লিপিতে (কাণষ্কাব্দ ২৮-১০৬ খ্রিস্টাব্দ) পুরাণ নামে যে রৌপ্যমুদ্রার উল্লেখ আমরা পাই তা বোধহয় সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়নি। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন এই মুদ্রাগুলি বেসরকারিভাবে প্রস্তুত হয়েছিল, বণিকদের দ্বারা। অপরদিকে নিম্ন-সিন্ধু উপত্যকায় যে কুষাণ রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল তা নিঃসন্দেহে কুষাণদের রাজকীয় টাঁকশালে তৈরি। সম্ভবত দূরপাল্লার বাণিজ্য তথা আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার হত। কুষাণ আমলের তাম্রমুদ্রাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। দৈনন্দিন আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তাম্রমুদ্রার ব্যবহার স্বভাবতই বহুল প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রা শুধুমাত্র কুষাণ-অধিকৃত এলাকাতেই পাওয়া যায়নি, এই সাম্রাজ্যের বাইরে ভারত এবং অ-ভারতীয় অঞ্চলেও কুষাণ তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তাম্রমুদ্রাগুলির যথাক্রমে ওজন ছিল ১৭ গ্রাম, ৮-৮.৫ গ্রাম এবং ৪-৫ গ্রাম।

রোম-ভারত বাণিজ্যের জোরালো প্রমাণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে রোমক মুদ্রার আবিষ্কার। স্যার মর্টিমার হুইলার খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে উৎকীর্ণ আটষট্টিটি রোমান মুদ্রাভাণ্ডারের তালিকা দিয়েছেন যার সবকটিই ভারতবর্ষে প্রাপ্ত। এর মধ্যে সাতান্নটি বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারত থেকে ১২৯টি রোমক মুদ্রাভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, মৌসুমি বায়ুর উন্নততর ব্যবহারের ফলে পাশ্চাত্যের জাহাজগুলির পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে দক্ষিণ ভারত পাড়ি দেওয়া সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। তাই দক্ষিণভারতীয় বন্দরগুলি রোমের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশীয় রাজারা এবং শক-ক্ষত্রপ শাসকগণ নিয়মিত মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক প্রয়োজনে মুদ্রার ধাতব প্রকারভেদ দেখা যায়। অন্ধ্র এবং করমণ্ডল উপকূলের বন্দরগুলি এই সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ নিতে থাকায় ওই অঞ্চলে মুদ্রাশ্রিত অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটে।

কুষাণ এবং সাতবাহন রাজারা ছাড়াও মধ্যভারতের নাগ রাজবংশ, কৌশাম্বী, মথুরা, অবন্তী ও অহিচ্ছত্রের মিত্রবংশীয় রাজারা বহু তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করেছিলেন। মধ্যভারতের অনেকগুলি অরাজনৈতিক কৌম সংগঠন (যেমন—যোধেয়, মালব, অর্জুনায়ন প্রভৃতি) তাম্রমুদ্রার প্রচলন করে।

১.৬ নগরায়ণ

গ্রাম এবং নগর এই নিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের জীবনধারা—তৈরি হয় একটি নতুন সভ্যতা, জন্ম নেয় বসতিধর্মী সংস্কৃতি। গ্রামের আয়তন ক্ষুদ্র, সেখানে কৃষিজীবী মানবগোষ্ঠীর সাদামাঠা জীবন, প্রাচুর্য কম, বিলাস উপকরণ নেই বললেই চলে। অপরদিকে নগরের আয়তন অপেক্ষাকৃত বড়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বহুগুণ প্রসারিত ; সেখানে কারিগর, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারীর বাস, সেখানে কৃষির স্থান নেই তাই কৃষিজীবীরও বসতি নেই, নগরজীবনের জনসমাজ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। কৃষিজাত শস্যের উদ্বৃত্ত গ্রামের থেকে আসে নগরে, নগরবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য, গ্রামের লালন-পালনে গড়ে ওঠে নগর, সূচনা হয় নগরায়ণের, ভারতবর্ষেও তা-ই ঘটেছিল।

ভারতবর্ষে নগরায়ণের সূত্রপাত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় সহস্রাব্দ নাগাদ। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, ধোলাবীরা, কালিবঙ্গান, লোথাল, কুনতাসি প্রভৃতি অঞ্চলে উন্নতমানের নগর গড়ে উঠেছিল, ইতিহাসে যা হরপ্পার নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা রূপে পরিচিত। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় দফার নগরায়ণ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে। এই দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের মূল বা কেন্দ্রীয় স্থল ছিল মধ্য গঙ্গা উপত্যকা, পরবর্তীকালে এই নগর গড়ে ওঠার প্রবণতা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। প্রধানত কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে এবং কখনও প্রশাসনিক কার্যালয় বা রাজ্যের রাজধানী বা তীর্থস্থান হিসেবে কোনো অঞ্চল নগরের চরিত্র ধারণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণের ফলশ্রুতিরূপে উল্লেখযোগ্য যেসব নগর গড়ে ওঠে তার মধ্যে ছিল বারাণসী, কৌশাম্বী, চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, অত্রঞ্জিখেড়া। পরে এই নগরগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় পাটলিপুত্র, মথুরা, পুষ্কলাবতী, অহিচ্ছত্র, চন্দ্রকেতুগড়, মঙ্গলকোট, অমরাবতী, নাগার্জুনিকোন্ডা, মাদুরাই, কাবেরীপত্তনম প্রভৃতি নগর।

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. রণবীর চক্রবর্তী — প্রাচীনভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, ইতিহাস গ্রন্থমালা, আনন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৯।

২. অতীন্দ্রনাথ বসু — সোস্যাল এন্ড রুরাল ইকনমি অফ নর্দান ইন্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৪২-৪৫।

৩. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — দ্য ইকনমিক ফ্যাক্টরস্ ইন কুষাণ হিস্ট্রী, ১৯৭০।

৪. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় — কয়েনস্ এন্ড কারেন্সী সিস্টেমস্ ইন সাউথ ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৭৭।

১.৮ অনুশীলনী

১. হরপ্পার যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কী জানেন ?

২. বৈদিক যুগের আদি পর্বে কোন্ সাহিত্য থেকে আমরা এই যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে জানতে পারি ? এ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৩. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল ?

৪. মৌর্য যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কীরূপ ছিল ?

৫. মৌর্যোত্তর যুগের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৬. ভারতবর্ষে প্রথম এবং দ্বিতীয় নগরায়ণ সম্পর্কে কী জানেন ?

একক ০২ ❐ ব্যবসা-বাণিজ্য, বণিকগোষ্ঠী, বাণিজ্যপথ, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বিনিময়ের মাধ্যম

গঠন

২.০ প্রস্তাবনা

২.১ ব্যবসা-বাণিজ্য

২.২ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

২.৩ বহির্বাণিজ্য বা সমুদ্র-বাণিজ্য

২.৪ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বণিকগোষ্ঠী

২.৪.১ বণিকগোষ্ঠী

২.৫ বিনিময়ের মাধ্যম

২.৫.১ গুপ্তোত্তর যুগ : উত্তর-ভারতীয় রাজবংশের মুদ্রা

২.৫.২ দক্ষিণ ভারতের রাজবংশীয় মুদ্রা

২.৫.৩ বাংলার মুদ্রা

২.৫.৪ মুদ্রার স্বল্পতা

২.৫.৫ আদি মধ্যযুগে বিনিময় ব্যবস্থা

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.৭ অনুশীলনী

২.০ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককটিতে হরপ্পা-সভ্যতার যুগ থেকে শুরু করে মৌর্যোত্তর যুগ পর্যন্ত কালসীমায় ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা বাণিজ্য সম্পর্কিত যেটুকু তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আমাদের হাতে তথ্য প্রমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রাচীন ভারতবর্ষে সহস্রাধিক বৎসরব্যাপী নিরন্তর প্রবহমান জীবনধারা সৃষ্টি করে সমাজ, গড়ে তোলে অর্থনীতির নির্দিষ্ট গতিপথ। এই সমাজ ও অর্থনীতির কালক্রমিক বিবর্তনে সমাজ যেমন বৃহত্তর রূপ ধারণ করে তেমনই ব্যাপকতা লাভ করে অর্থনীতি। এই সমাজব্যবস্থায় কৃষির সাথে সংযোগ ঘটে শিল্পের, শিল্পের সাথে বাণিজ্যের। কৃষি উদ্বৃত্ত থেকে জন্ম নেয় শিল্প। শিল্প উদ্বৃত্ত থেকে

আন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সমাজবদ্ধ মানুষ। ফলতঃ বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ অর্থনৈতিক জীবনধারার মূল স্রোতে মিশে ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রটিকে একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র করে তোলে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় যে, অর্থনীতির ধারাবাহিকতার একটি অপরিহার্য অংশ হল বাণিজ্য। কৃষি উদ্বৃত্ত যার উৎস। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতিতে বাণিজ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে আলোচ্য এককটিতে। এই সময়কার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সমকালীন অর্থনীতিকে ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, শিল্প বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি যেমন নাগরিক সমাজের জন্ম দেয়, তেমনই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি গ্রামীণ সমাজ গড়ে তোলে। একইভাবে বাণিজ্যের সাথে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিরও সৃষ্টি হয়। আবার বৈদেশিক বা বহিরাগত অর্থনীতি অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্য জন্ম দেয় মিশ্র সংস্কৃতির। সুতরাং আলোচ্য কালপর্বের একটি সামগ্রিক ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য বাণিজ্য সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

২.১ ব্যবসা-বাণিজ্য

কৃষি অর্থনীতির এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে কাজ করে। মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক কারণে কৃষি-উদ্বৃত্ত শিল্পও বাণিজ্যের প্রসারণের সহায়ক হয়ে ওঠে ; এই অঞ্চলের গঙ্গা-যমুনা বিধৌত উর্বর পলিঅঞ্চল, চাষের প্রয়োজনীয় সেচ-ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাত, বনজ কাঠ, ছোটনাগপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে আহরিত লোহা এবং লৌহজাত কৃষি সরঞ্জাম কৃষি-উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে জনবল ও স্থলপথ ও জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার। সবকিছু মিলে শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই চিত্র ভারতবর্ষের অন্যান্য নদীবিধৌত অঞ্চলেও দেখা যায়। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতক বা সপ্তম খ্রিস্টীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কালে এবং তার পরবর্তী সময়েও 'অগ্রহার' ব্যবস্থার ফলে কৃষি ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তির মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ব্যাপকহারে পতিত জমি চাষযোগ্য হয়ে ওঠে। অনেক ঐতিহাসিক বিশেষত রামশরণ শর্মা এবং তাঁর অনুগামীরা এই পরিস্থিতিকে সামন্ততন্ত্রের সূচনাকাল বলে মনে করেন। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা সমীচীন, কারণ এই বিভাজন বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপকে আরও প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। প্রথম পর্যায়টি হল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং দ্বিতীয়টি বহির্বাণিজ্য বা সমুদ্রবাণিজ্য।

২.২ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

আলোচ্য সময়সীমার আন্তর্প্রাদেশিক বা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল লিপিমালা। অবশ্য সাহিত্যিক উপাদানও এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট প্রামাণ্য তথ্য সরবরাহ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে বণিকদের কর্মতৎপরতা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল স্থলপথে যোগাযোগব্যবস্থা উন্নততর হবার জন্য। বৌধ্ সাহিত্যিক উপাদানের ওপর ভিত্তি করে অতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দেখিয়েছেন সমগ্র ভারতবর্ষে অন্তত চারটি প্রধান বাণিজ্যপথ এবং অগণ্য শাখাপথের অস্তিত্ব। সার্থবাহ পাঁচশ বা হাজার গোশকট নিয়ে পূর্বন্ত (পূর্বসীমা) থেকে অপরান্ত (পশ্চিম সীমা) পর্যন্ত বাণিজ্য-পরিক্রমা করছেন এমন বর্ণনা জাতক কাহিনীতে বারবার এসেছে। বভেরু জাতকে দেখা যায় দক্ষিণে সাতবাহনদের রাজধানী পইট্‌ঠান বা প্রতিষ্ঠান থেকে একটি পথ টগর, নাসিক, সেতব্য, বনসভয়, উজ্জয়িনী হয়ে সাঁচীর মধ্য দিয়ে মধ্যগঙ্গা উপত্যকায় যেত ; পথটি উত্তরে কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। অপর একটি পথ অঙ্গের রাজধানী চম্পা (ভাগলপুর) থেকে পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিমে গন্ধার দেশের পুষ্কলাবতী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই পথের কিছুটা বর্ণনা রামায়ণে রামের বনবাস যাত্রার মধ্যেও দেখা যায়। পূর্ব দিক থেকে অপর একটি পথ পাটলিপুত্র থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমপ্রান্তে সিন্ধু নদের বদ্বীপ অঞ্চলে পাটল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অতীন্দ্রনাথ বসুর মতে এই পথটিই জাতকে বর্ণিত পূর্বন্ত-অপরান্ত যোগাযোগের পথ। পশ্চিম উপকূলের বিখ্যাত বন্দর ভৃগুকচ্ছ-এর সঙ্গে কাবুল অঞ্চলের স্থলপথে যোগাযোগের কথা পেরিপ্লাসে পাওয়া যায়। কাবুল থেকে পুষ্কলাবতী ও তক্ষশিলা হয়ে পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্য দিয়ে মালব অতিক্রম করে পথটি ভৃগুকচ্ছে শেষ হত।

সাহিত্যিক উপাদান এবং লেখমালার বিবরণ থেকে বণিকদের স্থান থেকে স্থানান্তরে পণ্য নিয়ে যাবার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে "স্কন্ধক" নামক করটি অনুধাবনযোগ্য। সম্ভবত স্কন্ধ বা কাঁধে করে পণ্য পরিবহনের সময়ে এই কর দিতে হত। "স্কন্ধক" বা "মার্গনিক" কর সাধারণত স্থলপথে বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। "বৃষভ-ভারিতি" শব্দের দ্বারা সম্ভবত বৃষের পিঠে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্য পরিবহনকে সূচিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাণিজ্য-পথগুলি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত কালিদাসের কাব্যে নানাপ্রকার 'বিপণি' বা দোকানের বর্ণনা আছে। তিনি সুরার দোকানেরও বর্ণনা দিয়েছেন। কালিদাস 'আপণমার্গ' বলতে সম্ভবত এমন এক পথের কথা বলেছেন যার দুই পাশে দোকান ছিল। অমরসিংহ রচিত অমরকোশে ব্যবসা-বাণিজ্য বোঝাতে 'ক্রয়বিক্রয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। অমরকোশে 'শ্রেষ্ঠী'র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত অর্থবান এবং অভিজাত বণিক হিসেবে। সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠীর পার্থক্য সম্পর্কে অমরকোশ যথেষ্ট সচেতন। যাইহোক, চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং পরবর্তীকালে হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে ধারণা করা যেতে পারে, মোটামুটিভাবে সমগ্র উপমহাদেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুগম বাণিজ্য পথ ছিল। হিউয়েন সাঙ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে স্থলপথে পরিভ্রমণ করেছিলেন। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য নদীপথের ব্যবহারও হত। প্রাচীন বাংলার (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও অধুনা বাংলাদেশ) তাম্র শাসনগুলিতে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে

নদীপথ বহুলাংশে ব্যবহৃত হত, তবে প্রাচীন বাংলা নদীমাতৃক অঞ্চল হবার সুবাদে সর্বত্রই নদীপথের ব্যবহার সুলভ ছিল। সেজন্য এই অঞ্চলে "নাবাতক্ষোণী" অর্থাৎ জলযান প্রস্তুত বা মেরামত করার জায়গারও সাক্ষ্য এবং তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। নৌকা বা জলযান যেখানে নিয়মিত নোঙর করত তা লিপিমালার সাক্ষ্যে "নৌদণ্ডক" বা "নৌবন্ধ" বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বিভিন্ন লেখমালা ও সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, সেই সময় উত্তর ভারত থেকে বেশ কয়েকটি পথ পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিয়াতানের চৈনিক বিবরণে কামরূপ থেকে পুণ্ড্র, কজঙ্গল হয়ে মগধ পর্যন্ত একটি বাণিজ্যপথের বিবরণ পাওয়া যায়। অলবিরুণী তাঁর রচনায় কনৌজের সাথে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ পথের উল্লেখ করেছেন। এই সকল পথের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কনৌজ -অযোধ্যা-বারাণসী-পাটলিপুত্র-মুঙ্গের-গঙ্গাসাগর পথ এবং কনৌজ-প্রয়াগ-উড়িষ্যা-দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত আরেকটি পথ। গুজরাট-এর সোমনাথ বন্দর থেকে মথুরা পর্যন্ত একটি পথের কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। দুধপাণি লেখ থেকে জানা যায় যে অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর পর্যন্ত সরাসরি একটি পথের অস্তিত্ব ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে কামরূপ থেকে উত্তরবঙ্গে গমনাগমনের একটি পথের হদিশ মেলে। এটি পশ্চিমভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। হিউয়েন সাঙ কামরূপ এবং সমতট হয়ে তাম্রলিপ্ত যাবার একটি পথের উল্লেখ করেছেন। অল-বিরুণীর রচনা থেকে জানা যায় কনৌজের সঙ্গে স্থলপথে জেজাহুতি (জেজাকভুক্তি), কাশ্মীর, তিরহুত, কামরূপ ও নেপালের পথসংযোগ ছিল। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বাণিজ্যপথের কথাও বিভিন্ন সাহিত্যে বলা হয়েছে। এই পথ দিয়েই চৈতন্যদেব পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন বলে কথিত আছে। এ তথ্য যদি সত্য হয় তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, আলোচ্য পথটির অস্তিত্ব কয়েক শতক ধরে বিদ্যমান ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সকল স্থলপথের সঙ্গেই প্রাচীন ভারতবর্ষের নদীগুলির সংযোগ ছিল, এই নদীসমূহ বাণিজ্যের প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বংশীদাসের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য এবং বিভিন্ন চৈতন্যচরিত এ বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করে।

২.৩ বহির্বাণিজ্য বা সমুদ্র-বাণিজ্য

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী সময়কালে রোম-ভারত বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনে দেয়। কিন্তু খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ দিকে ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য ক্রমশ তার পূর্ব গৌরব হারায় ; রণবীর চক্রবর্তীর মতে রোম-ভারত বাণিজ্যের ক্ষীয়মান অবস্থার জন্য দায়ী দুটি কারণ, প্রথমত, রোম সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থা এবং দ্বিতীয়ত প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যে রোমের ক্রমবর্ধমান অনীহা। এর ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে সমুদ্র বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। তবে অধ্যাপক চক্রবর্তী মনে করেন, রোম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে মন্দা আসার কারণে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাতে সম্ভবত খানিকটা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কনস্টান্টিনোপল অর্থাৎ বর্তমান ইস্তাম্বুলে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর। কনস্ট্যান্টিনোপলের শাসকরা প্রাচ্যের সঙ্গে সমুদ্র

বাণিজ্যে আগ্রহী ছিলেন। তবে রোম-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কের তুরীয় পর্যায়ে ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য চলত মূলত লোহিত সাগরের ভিতর দিয়ে, এই বাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা নিতেন আরব ও ইথিওপিয়ার বণিকগণ। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য প্রধানত পারস্য উপসাগরের মারফত শুরু হয়। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এই সময়ে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল ইরানের সাসানীয় বংশ। আরব সাগরে সমুদ্র বাণিজ্য সম্পর্কে বাইজানটাইন ও সাসানীয় শাসক উভয়েই আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এই বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যের উত্থানে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কিছু বন্দর আবার পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে। ষষ্ঠ শতকের শেষে রচিত কস্‌মস্ ইন্ডিকোপ্লয়েস্টেস্-এর ক্রিশ্চিয়ান টপোগ্রাফী গ্রন্থে কোঙ্কন উপকূলের চৌল (সিবোর) ও কল্যাণ (ক্যালিয়ানা) বন্দরের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। কসমসের বিবরণীতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কা সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে।

পূর্ব উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং সপ্তম শতকে আগত দুই চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণে প্রাচীন বাংলার প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। বস্তুত, তাম্রলিপ্ত (তমলুক) এই সময়ে বাণিজ্যবন্দর হিসেবে বিশ্ববিশ্রুত হয়ে উঠেছিল। ফা-হিয়েন ভারত থেকে চীনে প্রত্যাবর্তনের সময় তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজযোগে শ্রীলঙ্কা যান, শ্রীলঙ্কা থেকে একটি চৈনিক বাণিজ্যযানে সওয়ার হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে শেষপর্যন্ত পৌঁছান চীনদেশে। এই তথ্য প্রমাণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাম্রলিপ্ত বন্দর বঙ্গোপসাগর এবং ভারতমহাসাগরের পূর্বাংশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলও (কুমিল্লা-নোয়াখালি এলাকা, বর্তমান বাংলাদেশ) ক্রমশ আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বাণিজ্যে স্থান করে নেয়। হিউয়েন সাঙ জানিয়েছেন যে সান-মো-তা-তা অর্থাৎ সমতট দেশটি প্রধানত বাণিজ্যের কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। তাঁর বর্ণনা থেকে অনুমান করা হয় যে, ওই অঞ্চলগুলি নিম্ন বর্মা উপকূলভাগ এবং শ্যামদেশের উপকূল অঞ্চলকে বোঝাত। হিউয়েন সাঙ আরও জানিয়েছেন যে ওড্র বা উৎকল দেশের (বর্তমান উড়িষ্যা) চরিত্র এবং কঙ্গোদ বন্দর দুটি দূরপাল্লা সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিত।

আরব সাগরে সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির ভূমিকা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই সমুদ্র-বাণিজ্যে পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ, সোপারা, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মুসুলিপত্তনম, মালাবার উপকূলে কুলমমালি বা কুইলন, প্রতিষ্ঠান, পূর্ব উপকূলে তাম্রলিপ্ত ছাড়াও সপ্তগ্রাম, কল্লকলিঘাট (উড়িষ্যা) প্রভৃতি বন্দর বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। বিভিন্ন লেখমালা এবং অল্ মাসুদি (৯১৫ খ্রিস্টাব্দ), সুলেমান (৮৫১ খ্রিস্টাব্দ), অল্-ইদ্রিসি (১১৬২ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি আরব লেখকদের বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। অপর দিকে ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে আগত চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিং এবং অন্যান্য লেখকদের বিবৃতি থেকেও সমুদ্র-বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আহরণ করা যেতে পারে।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য ব্যবস্থায় যে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয় তার

নেপথ্যের পটভূমিকা রচনা করেছিল একটি বিশেষ ঘটনা, তা হল ইসলাম ধর্মের উদ্ভব। ইসলামে নগর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলত নব-ধর্মাবলম্বীদের তৎপরতায় ভারত মহাসাগরে সমুদ্র বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতে শুরু করে। আরব বণিকদের উত্থান ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা যার পরিচয় পাওয়া যায় জর্জ এফ. হৌরাণীর গবেষণায়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পারস্য উপসাগর থেকে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছানোর সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ পথটি আরব বণিকগণ ব্যবহার করতে শুরু করেন। অখব্‌র-আ-সিন-ওয়া-ল্ হিন্দ গ্রন্থে বলা হয়েছে পারস্য উপসাগরীয় বন্দর মাস্‌কট্ থেকে মালাবারের কুইলন্ বন্দরে জাহাজ আসতে সময় লাগত ২৯ বা ৩০ দিন। কুইলন ও কালিকট পর্যন্ত আরব 'ধাও' জাহাজগুলি আসত, চীনা জাহাজগুলির গন্তব্য ছিল এই দুটি বন্দর পর্যন্ত। এখানেই চীন ও আরব জাহাজগুলি পরস্পর পণ্য বিনিময় করত। এখানে লক্ষণীয় যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার জাহাজের মিলনস্থল হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে আন্তর্জাতিক সমুদ্র-বাণিজ্যে ভারত মধ্যবর্তীর ভূমিকা গ্রহণ করে, যা এই উপমহাদেশকে বৈদেশিক বাণিজ্যে অপরিহার্য করে তোলে। ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দের "ছিত্তুরাজ" তাম্রশাসনের বিবৃতি অনুসারে অনুমান করা যায় আরব ও ভারতবর্ষের সমুদ্র বাণিজ্য খ্রিস্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত বিশেষ গতিশীল ছিল। এস. ডি. গয়টাইন একটি ব্যবসায়িক নথির মাধ্যমে পমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, পারস্য উপসাগরের কিশ অঞ্চলের সাথে গুজরাটের বন্দরগুলির ব্যাপক সমুদ্র-বাণিজ্য চলত। মালদ্বীপ এবং নিকোবর অঞ্চলের সঙ্গেও আরব বণিকদের লেনদেন হত।

উক্ত সময়কালে গৌড়দেশীয় বন্দরের বণিকরা পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে একটি উন্নত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কর্ণসুবর্ণের বণিক বুধগুপ্তের বাণিজ্য যাত্রার ইঙ্গিত আমরা পাই খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে উৎকীর্ণ মালয়ের ওয়েলেসলি প্রদেশে প্রাপ্ত একটি লেখ থেকে। তাম্রলিপ্তের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এই বন্দরের খাড়িটি সমুদ্র থেকে অনেকটা ভিতরে অবস্থিত হবার সুবাদে জাহাজ নোঙর করা এবং পণ্য ওঠানো-নামোনোর কাজটি সুবিধাজনক ছিল, সম্ভবত এই কারণে চীনা বা আরব বণিকরা এই বন্দরটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। দক্ষিণ ভারতীয় জাহাজগুলিও গভীর সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে (জাভা, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা) যেত না, পক্ষান্তরে বিদেশি বণিকরা উপকূল ধরে চলে আসতেন তাম্রলিপ্তে, ব্যবসা চলত তাম্রলিপ্তের মাধ্যমে। তাম্রলিপ্ত থেকে বেশ কয়েকটি সমুদ্র বাণিজ্যপথ সরাসরি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বন্দরগুলির সাথে যুক্ত ছিল।

আরব বিবরণীতে বঙ্গদেশের সমন্দর নামক একটি বাণিজ্য-বন্দরের উল্লেখ আছে। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরই আদি মধ্যযুগের সমন্দর বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। ইবন বতুতার রচনায় এই বন্দরটি 'সুদকাওয়ান' নামে অভিহিত। হুডুড্-অল্-আলমের রচয়িতা (৯৮২ খ্রিঃ), ইবন খোরদাদ্‌বা এবং অল্-ইদ্রিসির বিবরণে সমন্দর এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। আরব রচনা থেকে জানা যায় এই বন্দরটির সাথে সংযুক্ত ছিল একাধারে উড়িষ্যা ও কাঞ্চীভরমের বন্দরগুলি,

অপরদিকে কামরূপ এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল। এছাড়া সপ্তগ্রাম এবং সঙ্গো বন্দরের সুবিস্তৃত hinterland বা পশ্চাদ্ভূমি সমুদ্র বাণিজ্যের সহায়ক ছিল। ভারত পর্যটক পেরিগ্রাম, ইবন বতুতা, ফ্রেডরিক বারবোসার বিবরণ থেকে দুর্লভ বাণিজ্যপণ্য হিসাবে গৌড়দেশীয় রেশমের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোম, আলেকজান্দ্রিয়া এবং আরবে এর বিশেষ চাহিদা ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দর হয়ে কামরূপের গুয়া বা সুপারি পশ্চিম উপকূলের সোপারা বন্দরে গচ্ছিত হত, এখান থেকে রপ্তানি হত আরবদেশ ও ইউরোপে। এই সময়ে গঙ্গানদীর মোহানা থেকে উপকূল হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ামুখী সমুদ্রপথটি আরও অগ্রসর হয়ে আরাকান ব্রহ্মদেশ পার হয়ে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অন্য একটি পথ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে কলিঙ্গ করমণ্ডল উপকূল বরাবর দক্ষিণভারত ও সিংহলে ব্যপ্ত ছিল। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গো খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকে প্রাচীন বাংলার সমুদ্র-বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

সমুদ্র-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের পূর্বাঞ্চলের বন্দরগুলিও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পল্লব রাজাদের রাজত্বকালে কাঞ্চীপুরম, চোল রাজত্বকালে করমণ্ডল উপকূল চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গো বাণিজ্যে অগ্রণী ছিল। চোলরাজ রাজরাজ এবং রাজেন্দ্রচোল সমুদ্র-বাণিজ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। রাজেন্দ্রচোলের পুত্রের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে কম্বোজদের সাথে চোলদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। হলের লেখা থেকে জানা যায় চীনদেশের সঙ্গো চোল রাজ্যের বাণিজ্যিক তথা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ সমুদ্র বাণিজ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখেন, তাঁর সময়ে বিখ্যাত বন্দর ছিল— "কুলোত্তুঙ্গচোল পট্টনম" যা আধুনিক বিশাখাপট্টনম্। রাজরাজ শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে নৌ অভিযান প্রেরণ করার পরবর্তী সময়ে এই সকল দেশের সাথে চোল রাজত্বের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেডা বা কটাহ বন্দর এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

২.৪ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বণিকগোষ্ঠী

আদি মধ্যযুগের বাণিজ্যের আলোচনা বাণিজ্যকেন্দ্র এবং বণিকগোষ্ঠীর উল্লেখ ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সময় নানাপ্রকার বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং বিপণন এলাকার উদ্ভব হয়। এ বিষয়ে জানার প্রধান দুই উপাদান সাহিত্যসূত্র এবং লেখমালা। সংস্কৃত তথ্যসূত্রে আমরা হট্ট বা হট্টিকার উল্লেখ প্রায়শই পাই। হট্ট বলতে মূলত গ্রামীণ ও আয়তনে ক্ষুদ্র বাজার এলাকাকে বোঝায়, এককথায় আমাদের অতি পরিচিত হাট। আদিমধ্যযুগে তেলুগু ভাষায় ব্যবহৃত 'অড্ড' শব্দটি সংস্কৃত 'হট্টে'র সমর্থক। সংস্কৃত সাহিত্যে 'যাত্রা' নামে যে বিপণন এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার অর্থ মেলা বা মেলাচলাকালীন বাজার। এই যাত্রার সমতুল হল কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের 'সন্থে'। সম্ভবত গ্রামীণ হাট বা হট্ট নিত্যনৈমিত্তিক বসত না। উত্তরভারতে 'মণ্ডপিকা' নামে বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ আমরা তথ্যসূত্রে পাই, সম্ভবত মণ্ডপিকা আরও বৃহত্তর ও নিয়মিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র ছিল।

বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে মণ্ডপিকার উল্লেখ ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতকের আগে বিশেষ পাওয়া যায় না। লেখমালার সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে কাংরা, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, জব্বলপুর, রাজস্থান ও গুজরাটের নানা অঞ্চলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের মণ্ডপিকা গড়ে ওঠে। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজস্থানের চব্বিশটি লিপি (৬৪৪-১২৯৬ খ্রিঃ) বিচার করে বারোটি মণ্ডপিকা ও সমসংখ্যক হট্টের সন্ধান পেয়েছেন। মণ্ডপিকাগুলি অনেক ক্ষেত্রে 'শুল্কমণ্ডপিকা' নামেও আখ্যাত। অনুমান করা হয় মণ্ডপিকাতে বাণিজ্যের ওপর শুল্ক ধার্য ও আদায় করা হত।

দক্ষিণভারতে মণ্ডপিকার অনুরূপ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে চোল লেখমালায় নগরমের উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিমধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে সণ্থে বা অড্ড-এর তুলনায় বৃহৎ কিন্তু বৃহৎ নগরের বাজারের চেয়ে ক্ষুদ্র একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় যা আঞ্চলিক তথ্যসূত্রে 'পেণ্ঠা' বা 'পিণ্ঠা' বা 'পেংটা' নামে অভিহিত। 'পেঠ' শব্দটি অবশ্য খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকেই লেখমালায় আপন স্থান করে নিয়েছে।

'পেঠ' বা পেণ্ঠাতে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় জৈন লেখক সোমদেবসূরি রচিত 'যশস্তিলকচম্পূ' গ্রন্থে (আ. ৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। এই রচনায় পেণ্ঠার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় এটি একটি উৎকৃষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র, যেখানে পণ্যসামগ্রী মজুত রাখারও সুব্যবস্থা ছিল। সোমদেবসূরি তাঁর অপর একটি রচনায়ও পিণ্ঠার উল্লেখ করেছেন প্রথমোক্তের সঙ্গে যার অর্থের কোনো পার্থক্য নেই। 'পেণ্ঠা' বা 'পিংটা' শব্দটি অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি লিপিতেও পাওয়া যায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এই সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশে রাজত্ব করতেন কাকতীয় বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গণপতি (১১৯৯-১২৬১ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রাজধানী বরঙ্গলে তিনটি পিংটা অবস্থিত ছিল। 'আকু-পেংটা'য় 'সসিরবরু' নামক ব্যবসায়ীরা থাকতেন, তাঁদের পান, নারকোল, আম ও তেঁতুলের কারবার ছিল। 'নুবুল-পেংটা'য় এই সসিরবরু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 'স্বদেশী-পরদেশী' বণিকরা গম, ধান, ছোলা এবং ভোজ্যতেলের কারবারে লিপ্ত থাকতেন। 'উপ্পু-পেংটা'য় লবণের ক্রয়বিক্রয় হত বলে জানা যায়। এখানে লক্ষণীয় এই তিনটি পেংটাতেই কিন্তু লেনদেন চলত দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর। কাকতীয় লিপিতে পেংটাগুলিকে 'সুঙ্কস্থান' অর্থাৎ সুঙ্ক বা বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের কেন্দ্ররূপেও বর্ণনা করা হয়েছে।

আদিমধ্যযুগে বাংলাদেশে প্রাপ্ত তথ্যবিবরণে বাণিজ্যিক কেন্দ্র সম্পর্কে যেটুকু ধারণা করা যায় তাতে বলা যেতে পারে মণ্ডপিকা বা পেণ্ঠা জাতীয় কোনো কেন্দ্র সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় ছিল না তবে হট্ট বা হট্টিকার অস্তিত্ব ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী ৯৭১ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই তাম্রশাসনে 'সম্ভাণ্ডারিয়ক' শব্দটি পাওয়া যায়, যার অর্থ এমন একটি স্থান যেখানে পণ্যসামগ্রী সযত্নে ভাণ্ডার বা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে, 'মণ্ডপিকা' বা 'পেণ্ঠা'র মতোই সম্ভাণ্ডারিয়কটি সম্ভবত গ্রাম ও শহরের মধ্যবর্তী মাঝারি মাপের একজাতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র, কারণ আলোচ্য তাম্রশাসনে সম্ভাণ্ডারিয়কটি গ্রাম বলে অভিহিত নয় আবার তার অবস্থান নগরেও নয়। এই লিপিটি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরের কাছে সাভার গ্রামটি থেকে

প্রাপ্ত। এই সাভার নামক স্থানটি নদীবন্দর রূপেও বিখ্যাত ছিল। প্রাচীনবাংলার আর একটি বিখ্যাত নদী বন্দর ছিল দেবপর্বত (বর্তমান বাংলাদেশের ময়নামতী অঞ্চল)। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে দশম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন লিপিতে এই বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে শ্রীমড্ডোমনপালের লিপি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় গঙ্গাসাগরের নিকট নদীসন্নিহিত এলাকায় একটি হাট অবস্থিত ছিল (দ্বারহাটক)। এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, সমুদ্রের অতি নিকটে বা দ্বারদেশে অবস্থিত ছিল।

২.৪.১ বণিকগোষ্ঠী

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতকে বাংলার তাম্রশাসনসমূহে বণিকদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় বিষয়পতির (জেলার আধিকারিক) অধীনে জেলাস্তরে নগরশ্রেষ্ঠী এবং সার্থবাহ প্রশাসনে সক্রিয় অংশ নিতেন। শ্রেষ্ঠী এবং নগরশ্রেষ্ঠীর সিলমোহর বৈশালী থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ৫৯২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ বিষ্ণুষেণের তাম্রশাসনে বিদেশ থেকে আগত বণিক এবং বিদেশে বাণিজ্যিক স্বার্থে গমনেচ্ছু বণিকদের উপর কর নেওয়ার উল্লেখ আছে।

দক্ষিণভারতে কোলহাপুর (১১৩৬ খ্রিস্টাব্দ), মিরাজ (১১৪৩ খ্রিস্টাব্দ) ও বেলগাঁও (১২০৫ খ্রিস্টাব্দ) তে প্রাপ্ত তিনটি লিপিতে বণিকদের সমাবেশ দেখা যায়, শুধু নামই নয় তাঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে এই সূত্রে। দাক্ষিণাত্যের লাট বা গুজরাট, রাজস্থান এবং কোঙ্কন থেকে এই বণিকরা বাণিজ্য করতে আসতেন। আরব বণিকগণ কোঙ্কন উপকূলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগত লেখক অল মাসুদি চৌল (সৈমুর) বন্দরে কমপক্ষে দশ হাজার মুসলমান বণিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন, এদের মধ্যে ছিলেন সিরাফ, ওমান, বাসরা এবং বাগদাদের বণিকরা। অল মাসুদির বিবরণে মুসা বেন ইশাক অল্ সান্দালুনি এবং আবু সৈয়দ মারুফ বেন জাকারিয়া নামে দুই অগ্রণী বণিকের নাম পাওয়া যায়, এঁরা কোঙ্কন উপকূলের প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। আরব তথ্যসূত্রের এই বিবরণ রাষ্ট্রকূট লিপিমালার তথ্য দ্বারাও সমর্থিত। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র এবং তৃতীয় কৃষ্ণ (খ্রিঃ দশম শতক)-এর রাজত্বকালে আরব বণিকরা কোঙ্কন উপকূলে উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য বিস্তার করেন। পরবর্তীকালে শিলহার বংশীয়দের রাজত্বকালে অর্থাৎ একাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই প্রাধান্য বজায় ছিল। চিনচানি থেকে পাওয়া শিলহার ছিত্তুরাজের ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তিনজন আরব বণিকের উল্লেখ পাওয়া যায়—অল্লীয় (আলি), মহর ও মহুমত (মহম্মদ)। আরব বিবরণ ও ইহুদি বণিকদের পত্রগুচ্ছে 'নাখুদা' শব্দটি বারবার এসেছে। নাখুদার অর্থ জলযানের বা নাও এর প্রধান বা প্রভু। এক্ষেত্রে জাহাজি বণিক অর্থে নাখুদা শব্দটি ব্যবহৃত। দ্বাদশ শতকের ব্যবসায়িক পত্রাবলীতে ইহুদি বণিক ও জাহাজি বণিকদের বাণিজ্যিক তৎপরতা বিধৃত হয়েছে।

আদিমধ্যযুগের ভারত মহাসাগরীয় দূরপাল্লা বাণিজ্য ভারতীয় এবং বিদেশি বণিকদের দূরত্ব ঘুচিয়ে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে তোলে, আপনজন করে তোলে। তার প্রভাব পড়ে সাংস্কৃতিক ইতিহাসে, শিল্পকলার ইতিহাসে। ভিন্নধর্মী বণিকসম্প্রদায়গুলি মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

২.৫ বিনিময়ের মাধ্যম

প্রাচীন ভারতবর্ষে সার্বভৌম গুপ্ত রাজশক্তি শ্রেষ্ঠ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। গুপ্ত মুদ্রাভাণ্ডার পাওয়া গেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে স্বর্ণমুদ্রার ওজন বাড়তে থাকলেও ধাতব বিশুদ্ধি কমে আসতে থাকে, এই অবনয়ন গুপ্ত রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমল থেকে রৌপ্যমুদ্রা চালু হয়, এই জাতীয় মুদ্রা শক ক্ষত্রপ মুদ্রার আদলে তৈরি। গুপ্তরাজত্বে উৎকীর্ণ রৌপ্যমুদ্রাগুলি গুজরাট অঞ্চলে বহির্বাণিজ্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। সমসাময়িক গুজরাট অঞ্চলে শাসনকারী ক্ষহরাত শক ক্ষত্রপরাও রূপা ছাড়া সিসা ও তামার মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাইজানটাইন্ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে কেরল ও তামিলনাড়ুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলসহ দক্ষিণভারতে প্রাপ্ত পূর্ব রোমান সম্রাটদের মুদ্রাগুলি। গুপ্তবংশীয় রাজারা তাম্রমুদ্রা অবশ্য খুব বেশি পরিমাণে প্রচলন করেননি। কিন্তু দূরদূরান্তের বাণিজ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার থাকলেও সমাজের সাধারণ গৃহস্থদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাম্রমুদ্রার ব্যবহারই স্বাভাবিক। রামশরণ শর্মার মতে এইসময় মুদ্রার ব্যবহার অনেকটাই হ্রাস পায়। তিনি ফা-হিয়েনের বিবরণের উপর ভিত্তি করে বলেছেন দৈনন্দিন ক্রয়বিক্রয়ে কড়ির ব্যবহার হত। গুপ্তদের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যে বাকাটক রাজত্বকালের কোনো মুদ্রার অস্তিত্ব এখনও পাওয়া যায়নি।

২.৫.১ গুপ্তোত্তর যুগ : উত্তর ভারতীয় রাজবংশের মুদ্রা

পঞ্চম শতকের শেষ দিকে ভারত আক্রমণকারী হুনরাজ তোরমান এবং মিহিরকুল বিজিত অঞ্চলগুলিতে তামা ও রূপার মুদ্রার প্রবর্তন করেন, এই মুদ্রাগুলি কুষাণ এবং গুপ্তমুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাব, রাজস্থান, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটের কিছু অংশে হুনমুদ্রা পাওয়া গেছে। প্রায় সমসাময়িক গুজরাটের দক্ষিণভাগে দহরসেন এবং ব্যাঘ্রসেন নামক দুই ত্রৈকূটক বংশীয় রাজার নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ছত্তিশগড় এবং উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলে নল বংশীয় রাজাদের কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাংলায় সমাচারদেব এবং জয়নাগ স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন। বাংলার শাসক শশাঙ্ক, কনৌজের মৌখরী এবং থানেশ্বর ও পরে উত্তর ভারতের অনেকটা এলাকায় অধিষ্ঠিত একচ্ছত্র পুষ্যভূতি বংশীয় সম্রাট হর্ষবর্ধন খুব অল্প সংখ্যায় খাদমিশ্রিত স্বর্ণমুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাংশ, বাংলাদেশ এবং আসাম থেকে বঙ্গের খড়্গ বংশীয় এবং সমতটের দেব বংশের কিছু খাদমিশ্রিত ধাতুমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলার পট্টিকেড় এবং হরিকেল অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে legend-সম্বলিত কিছু রৌপ্যমুদ্রা।

উত্তর প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা বেশি নয়। তবে মৌখরীবংশীয় রাজারা গুপ্ত আদলে কিছু রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। অষ্টম শতকের শেষভাগে সম্ভবত প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজ পশ্চিম এব মধ্যভারতে ৬৭ গ্রেণ ওজনের রাণা হস্তী মুদ্রিত এক বিশেষ ধরনের রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। প্রি

দ্বাদশ শতকে গুজরাটের চৌলক্য রাজ জয়সিংহ একই ধরনের মুদ্রা চালু করেন। এছাড়াও রাজস্থান, গুজরাট, মালব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে ইন্দো সাসানিদ রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। মূলত ৬৭ গ্রেণ ওজনের এই মুদ্রা পরে হাল্কা হয়ে যায়। এই হাল্কা ও পাতলা মুদ্রাগুলি গধিয়া মুদ্রা নামে খ্যাত। রূপা এবং তামার সংমিশ্রণে প্রস্তুত গধিয়া মুদ্রাগুলি রাজস্থান, গুজরাট, কোঙ্কন ও মধ্যপ্রদেশ থেকে পাওয়া গেছে। একাদশ খ্রিস্টীয় শতকে গুজরাটে কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দের স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন। একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মালবের পরমার বংশ, জেজাকভুক্তির চান্দেল্ল, গহড়বাল এবং চৌহান বংশীয় রাজার গাঙ্গেয়দেবের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রচলন করেন।

২.৫.২ দক্ষিণ ভারতের রাজবংশীয় মুদ্রা

দশম ও একাদশ শতকে মহীশূর ও কানাড়া অঞ্চলে শাসনকারী কদম্ববংশীয় রাজারা অঙ্ক চিহ্ন যুক্ত মুদ্রা এবং ছাঁচে ঢালা স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন করেন। পূর্ব চালুক্যরাজ প্রথম রাজরাজ, কল্যাণীর চালুক্যরাজ জয়সিংহ প্রভৃতি পদ্মটঙ্কার প্রবর্তন করেন।

ছাঁচে ঢালা প্রযুক্তিতে স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নোলম্ববংশীয় শাসকগণ (নবম-দশম শতক), গোয়ার কদম্ব বংশীয় শাসকগণ (একাদশ-দ্বাদশ শতক), হোয়েসল বংশীয় দ্বারসমুদ্রের শাসক বিষ্ণুবর্ধন ও তার উত্তরাধিকারীগণ প্রভৃতি।

আদিমধ্যকালে দক্ষিণ ভারতে রূপার মুদ্রা বিশেষ চোখে পড়ে না। চোল এবং চালুক্যদের কতিপয় রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। দেবগিরির যাদব বংশ ক্ষুদ্রাকৃতি রূপার মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন।

২.৫.৩ বাংলার মুদ্রা

অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট (সিলেট) ছাড়াও ময়নামতীর (কুমিল্লা জেলা) প্রত্নস্থল থেকে ২৯৭টি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে পট্টিকেড় মুদ্রা যা ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। হরিকেল মুদ্রার সংখ্যা ছয়শত, এগুলির অধিকাংশ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রাপ্ত। ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ২৫০০ হরিকেল মুদ্রার সন্ধান দিয়েছেন যেগুলি ৭ম-৮ম শতকে বাংলার আঞ্চলিক শাসক দেব এবং চন্দ্রবংশীয়দের প্রবর্তিত। আর. এস. শর্মা অবশ্য এগুলিকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বিনিময়ের মাধ্যম রূপে গণ্য করেন।

২.৫.৪ মুদ্রার স্বল্পতা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত মুদ্রার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা যায় খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মুদ্রার সংখ্যা প্রায় ৯৭,০০০, পক্ষান্তরে ৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা মাত্র ২০,০০০। আদি মধ্যযুগে মুদ্রার সংখ্যা এত নগণ্য কেন সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আলোচ্য এককটিতে বিশেষ নেই। বরং আমাদের অনুসন্ধান করার দরকার এই সময়ে বিনিময় ব্যবস্থার স্বরূপ কী ছিল।

২.৫.৫ আদিমধ্যযুগে বিনিময়-ব্যবস্থা

আদি মধ্যযুগের ভারতের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য অধ্যাপক রামশরণ শর্মা এবং তাঁর অনুগামীরা ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনীতির অবক্ষয়ের পক্ষে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন তার অন্যতম হল ধাতবমুদ্রাশ্রিত বিনিময়ব্যবস্থার অধোগতি বা অবলুপ্তি। অধ্যাপক শর্মা তাঁর 'Early Medieval Indian Society' নামক গ্রন্থে ৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ভারতে প্রচলিত বিনিময় প্রক্রিয়ায় মুদ্রার মান এবং সংখ্যা কীরূপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং মুদ্রার স্বল্পতার সম্ভাব্য কারণগুলিও উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে শর্মার এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এবং আর. চম্পকলক্ষ্মী। চম্পকলক্ষ্মীর মতে, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে বিশেষত তামিল দেশে লেনদেন চলত বার্টার প্রথায়। খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগের আগে দক্ষিণভারতে ধারাবাহিকভাবে স্বর্ণমুদ্রার উপস্থিতি ছিল না। অন্যদিকে আদিমধ্যযুগীয় রাজস্থানের উপর গবেষণা করে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকেই রাজস্থানের বিনিময়ের অর্থনীতিতে মুদ্রার ব্যবহার হত, তার প্রমাণ রাজস্থানে প্রাপ্ত লিপিমালা। তবে মুদ্রার ব্যবহার ছিল সীমিত। ১০১৮ খ্রিস্টাব্দের শেরগড় লিপি এবং ১০৮০ খ্রিস্টাব্দের অর্থূন লিপিতে দ্রম্ম, রূপক, বিংশপক এবং কড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় বিনিময়ের মাধ্যম রূপে।

আদি মধ্যযুগীয় উত্তর ভারতীয় লেখমালায় পুরাণ, ধরণ, কার্যাপণ, দ্রম্ম, কপর্দক-পুরাণ বা কড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়, অপরদিকে দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় দেখি কাসু বা কলঞ্জু নামক বিনিময় মাধ্যমের উল্লেখ। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মুদ্রার ব্যবহার হত বলে অভিমত পোষণ করেন। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, কড়ির সঙ্গে হরিকেল মুদ্রার বিনিময় যোগ্যতা ছিল, ১২৮০টি কড়িতে একটি রুপোর মুদ্রা এবং ২০,৮৮০টি কড়িতে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যেত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খ্রিস্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতকের বহু লিপিতে (বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন, দামোদরদেবের মেহার লিপি প্রভৃতি) পুরাণ, কার্যাপণ এবং চূর্ণীকে সমার্থক বিনিময়-হার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। চূর্ণী কথাটির অর্থ ধাতুর গুঁড়ো (চূর্ণ <চূর্ণী) বা টুকরো। তবে লেখমালা বা আরবী ও তিব্বতী সাহিত্যে চূর্ণীর উল্লেখ থাকলেও এর কোনো পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও মেলেনি।

সুতরাং, রামশরণ শর্মা ও তাঁর সমর্থকদের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। তবে এ কথা সত্য খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ভারতবর্ষে মুদ্রাল্পতা দেখা দেয়, পুনরায় দশম শতক থেকে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ গতিময় হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে রামশরণ শর্মাও একমত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতক থেকে ১০০০ শতক-এর মধ্যবর্তী সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়, মুদ্রারহিত অর্থনীতির সেটিই সম্ভাব্য প্রধান কারণ। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ মুদ্রাশ্রিত অর্থনীতিতে আবার স্বমহিমায় অবতীর্ণ হয়।

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.	রণবীর চক্রবর্তী	প্রাচীনভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে।
২.	ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়	মার্কেটস্ এন্ড মার্চেন্টস্ ইন্ আর্লি মিডিভ্যাল রাজস্থান, সোস্যাল সায়েন্স প্রোবিংস্, ডিসেম্বর, ১৯৮৫ : ৪১৩-৪০.
৩.	রামশরণ শর্মা	দি মেকিং অফ্ আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া, পার্সপেক্টিভস্ ইন সোশ্যাল এন্ড ইকনমিক হিস্ট্রী এফ আর্লি ইন্ডিয়া, আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়ান সোসাইটি।
৪.	ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	টাকাকড়ি ঃ আবির্ভাবের যুগ
৫.	পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত	কয়েন্স্

২.৭ অনুশীলনী

১. খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

২. জাতক সাহিত্যের বর্ণনায় ভারতের বাণিজ্যপথ সম্পর্কে কী তথ্য পাওয়া যায় ?

৩. আলোচ্য সময়ে সমুদ্র বাণিজ্যে কোন্ কোন্ দেশ ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয় ?

৪. ভারতের পূর্ব উপকূলের বাণিজ্য ব্যবস্থায় তাম্রলিপ্তের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভারতমহাসাগরীয় সমুদ্র বাণিজ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. আদি মধ্যযুগে ভারতবর্ষের বাণিজ্যকেন্দ সম্পর্কে কী জানেন ?

৭. আদিমধ্যযুগে বণিক সম্প্রদায় সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৮. আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত মুদ্রা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৯. আদি মধ্যযুগে ধাতব মুদ্রা ছাড়া বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে আর কী কী ব্যবহৃত হত ?

একক ০৩ ❑ নগরায়ণ এবং নগরের অবক্ষয়

গঠন

৩.০ প্রস্তাবনা

৩.১ নগরায়ণের সংজ্ঞা

৩.২ নগরের অবক্ষয়-সম্পর্কিত মতবাদ

 ৩.২.১ উত্তর ভারত

 ৩.২.২ মধ্যগাঙ্গেয় সমতল এবং পূর্বাঞ্চল

 ৩.২.৩ পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চল

 ৩.২.৪ দক্ষিণ ভারত

৩.৩ আদি মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ও লিপিমালার সাক্ষ্য

৩.৪ নগর-অবলুপ্তির সম্ভাব্য কারণ

৩.৫ নগরায়ণ-তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক মতবাদ

 ৩.৫.১ উত্তর ভারত : নগরায়ণ

 ৩.৫.২ নগরায়ণ : দক্ষিণ ভারত

৩.৬ তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.৮ অনুশীলনী

৩.০ প্রস্তাবনা

আলোচ্য পাঠ্যাংশের প্রথম এককে ভারতবর্ষে প্রথম নগরায়ণ এবং দ্বিতীয় দফার নগরায়ণ প্রসঙ্গে সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাস-ভিত্তিক তথ্যপ্রমাণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে গড়ে ওঠা নগরগুলি গুপ্তযুগের শেষদিক পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত নগরগুলির অস্তিত্ব নিয়ে একটি প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। আলোচ্য এককটি সেই প্রশ্নকে মাথায় রেখে তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সে আলোচনায় যাবার আগে 'নগরায়ণ' বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

৩.১ নগরায়ণের সংজ্ঞা

নগরকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে তার ক্রমবিকাশ ও পরিব্যাপ্তি ঘটে তাকে সংক্ষেপে 'নগরায়ণ' শব্দটি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। জনবসতির দুটি স্থায়ী ঠিকানা হল নগর বা শহর এবং গ্রাম। কোনো নগরের জনসংখ্যা কিন্তু গ্রামের থেকে অনেক বেশি, কারণ নগরের আয়তন গ্রামের তুলনায় বৃহৎ। তবে আয়তনগত তারতম্য বা জনবসতির নিরিখে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য নির্ণয় করা অসমীচীন। বস্তুত গ্রাম ও শহরের মূলগত তফাত নিহিত আছে উভয়ক্ষেত্রেই বসবাসকারী জনমানুষের কর্মধারায়, জীবিকার্জনের অবলম্বনের মধ্যে। গ্রামীণ জনবসতি প্রধানত কৃষিজীবী, তাঁরা খাদ্য উৎপাদন করেন, উৎপাদিত পণ্যশস্যের উদ্বৃত্তাংশ নগরের জনবসতির প্রয়োজন মেটায়। সে দিক থেকে বিচার করলে গ্রামের কৃষিজীবীদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্যের উপর নগর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে নগরবাসী জনগণ মূলত বিভিন্নরকম শিল্প, শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনিক কার্যকলাপ প্রভৃতি অকৃষিজ কাজকর্মে জীবিকা নির্বাহ করেন। সুতরাং বলা যায়, গ্রাম যদি কৃষি অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয় তবে নগর হল শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি—শহর ও গ্রাম এই দুয়ের পারস্পরিক সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সভ্যতা, নগর গড়ে ওঠার নেপথ্য কাহিনীর সূচনা হয় গ্রামে ; নগরের সমৃদ্ধ চিত্রটিই হল নগরায়ণ।

৩.২ নগরের অবক্ষয় সম্পর্কিত মতবাদ

নগরায়ণ এবং নগরের অবক্ষয় সম্পর্কিত বিতর্কের আলোচনায় প্রথমেই যে ঐতিহাসিকের মতবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি হলেন অধ্যাপক রামশরণ শর্মা। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা দূরপাল্লার বাণিজ্যের অবক্ষয়ের সূত্র ধরে নগরের সামগ্রিক অবক্ষয়ের চিত্র উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণকে ভিত্তি করে রামশরণ শর্মা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নগরজীবনের অবনয়ন ঘটেছিল আদি মধ্যযুগে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর অধ্যাপক শর্মা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন ; সেজন্য ধ্বংসাবশেষ থেকে কীভাবে নগরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। নগরের লক্ষণ বহন করে উৎখনন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অনেক পাথর বা মাটির ঢিবি, কুঠার প্রভৃতি নানারকম আয়ুধ, মাটির চুল্লি, কারখানায় ব্যবহারযোগ্য বড় উনুন, কারিগরী শিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী, বিলাসবহুল নগরজীবনের বহুমূল্য অলঙ্কার, শস্যাগার, রাস্তাঘাট, অট্টালিকা, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি। গর্ডন চাইল্ড বলেছেন নগরায়ণের বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, খাদ্য অনুৎপাদক শ্রেণি, শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চা প্রভৃতি। রবার্ট ম্যাক অ্যাডাম্‌স্ অবশ্য নগরায়ণের জন্য জনসংখ্যার পরিমাণ এবং ঘনত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। একাদশ শতকের টীকাকার কৈয়ট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী অনুসরণে উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত এবং পরিখা বেষ্টিত বসতি নগরের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন, যেখানে কারিগর এবং ব্যবসায়ী সঙ্ঘ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। রামশরণ

শর্মা বস্তুগত সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষকে চারটি পৃথক অঞ্চলে বিভাজিত করে প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্যিক নিদর্শনের ভিত্তিতে নগরগুলির উত্থানপতন নির্ধারণ করেছেন।

৩.২.১ উত্তর ভারত

উত্তর ভারতের ভৌগোলিক পরিসীমা মোটামুটিভাবে পাকিস্তান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লীসহ উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমভাগে ব্যাপ্ত। এই অঞ্চলের নগরগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য হল তক্ষশিলা (বর্তমান রাওয়ালপিন্ডির নিকটস্থ)। এখানকার প্রত্নস্থল একাধিক—সিরকাপ, সিরসুখ, এবং ভির মাউন্ড। এছাড়া অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলি হল সাংঘল, সানেট (লুধিয়ানা জেলা), ভগবানপুর (রোপার জেলা), পুরনো কিলা (নতুন দিল্লী), হস্তিনাপুর (মীরাট জেলা), অত্রঞ্জিখেড়া (এটাওয়া জেলা), অহিচ্ছত্র (বেরিলী জেলা), মথুরা, সোনখ, কনৌজ (ফারুকাবাদ জেলা) প্রভৃতি। এই নগরগুলিতে উৎখনন দ্বারা প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সাহিত্যগত সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়কালে এই সকল নগরের বেশির ভাগই অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক পর্যন্ত সম্ভবত এই নাগরিক বৈভব বজায় ছিল। তবে গুপ্ত যুগের শেষ দিক থেকেই এই সব নগর তাদের পূর্ব গৌরব হারাতে শুরু করে। গুপ্তদের পরবর্তী সময়ে নগরগুলির অবক্ষয় স্পষ্টতই চোখে পড়ে। প্রত্নবিদ জন মার্শাল বলেছেন হূণ আক্রমণকারীরা তক্ষশিলা ধ্বংস করে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে আগত হিউয়েন সাঙের সময় মথুরারও আর সেই নগর সুলভ চাকচিক্য ছিল না। হস্তিনাপুর এবং অত্রঞ্জিখেড়া সম্ভবত গুপ্তযুগের সূচনার আগেই তাদের নাগরিক গৌরব হারিয়েছিল।

৩.২.২ মধ্যগাঙ্গেয় সমতল এবং পূর্বাঞ্চল

ভারতবর্ষের আলোচ্য ভৌগোলিক অংশটি উত্তরপ্রদেশের পূর্বভাগ, বিহার, প্রাচীন বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) এবং উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নগরগুলি হল—কৌশাম্বী (এলাহাবাদের ৬০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে), অযোধ্যা (অযোধ্যা জেলা), শ্রাবস্তী (সেট্-মাহেত), এলাহাবাদ (প্রত্নস্থল-ভিটা), শৃঙ্গবেরপুর (এলাহাবাদের নিকট), সোহগৌড়া (গোরক্ষপুর জেলা), বারাণসী (প্রত্নস্থল রাজঘাট), বৈশালী (গঙ্গা-গন্ডক ও পুনপুন নদীর সংগমস্থল), ছিরান্দ (সারণ জেলা), লৌরিয় নন্দনগড় (চম্পারণ জেলা), খৈরদহ (বালিয়া জেলা), রাজগীর (নালন্দা জেলা), শোনপুর (গয়া জেলা), কুমরাহার (পাটনা জেলা), চম্পা (ভাগলপুর), শিশুপালগড় (পুরী জেলা), চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর চব্বিশ পরগণা), দিহার (বাঁকুড়া) প্রভৃতি।

উত্তর ভারতের নগরগুলির মত এই নগরগুলিরও ধারাবাহিকতা বজায় ছিল কুষাণ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত ; কিন্তু অবক্ষয় শুরু হয় গুপ্ত সমসাময়িক যুগ থেকেই। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং চৈনিক বিবরণ (ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ) ও সমসাময়িক অন্যান্য সূত্র থেকে এর সমর্থনযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

৩.২.৩ পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চল

এই অঞ্চলের পরিধি রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশকে নিয়ে সীমায়িত। রাজস্থানের ভরতপুর জেলার নোহ্, জয়পুর জেলার বিরাটনগর (বৈরাট), বিকানীরের নিকট সুরাটগড়, মধ্যপ্রদেশের জাদেরৌ (গোয়ালিয়র জেলা) ত্রিপুরি (জব্বলপুর জেলার তেওয়ার), মল্হার (বিলাসপুর), এরাণ (সগর) নন্দুর (রাইসেন জেলা), নর্মদানদীর উত্তরতীরস্থ মহিষমতী, আরা (মান্দাসোর), সাঁচী, বিদিশা (বেসনগর), কয়থা (উজ্জয়িনীর নিকটস্থ), উজ্জয়িনী, দশপুর, গুজরাট উপকূলের বন্দর-নগর ভৃগুকচ্ছ (ভরুকচ্ছ বা ভরুচ—বর্তমান ব্রোচ), বল্লভী (কাথিয়াবাড়), প্রভাসপতন (জুনাগড় জেলা), দ্বারকা (কাথিয়াবাড় জেলার উপকূল নগরী), পৌনার (মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা—বাকাটক রাজধানী), ভোগবর্ধন (ঔরঙ্গাবাদ), গোদাবরীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত নাসিক, কোলাপুর জেলার ব্রহ্মপুরী, সাতবাহনদের রাজধানী পৈঠান (প্রতিষ্ঠান), নেভাসা (আহম্মদ নগর), টগর (টের ওসমানবাদ জেলা) প্রভৃতি স্থানে নগরায়ণের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত অঞ্চলগুলি কুষাণ এবং শক সাতবাহনযুগে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় শতকের আগে থেকে খ্রিস্টীয় যুগের প্রারম্ভকালে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে। কুষাণ যুগের পরবর্তী সময়ে আলোচ্য নগরসমূহের অধিকাংশ পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে।

৩.২.৪ দক্ষিণ ভারত

বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং কেরালা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। গুলবর্গা জেলার সন্নাথি, রায়চুরের মাস্কি, চিতলদ্রুগের চন্দ্রাবল্লি ও ব্রহ্মগিরি, উত্তর কন্নড়ের বনবাসী, কুরনুলের সাতানিকোটা, গুন্টুর জেলার নাগার্জুনিকোন্ডা, অমরাবতী, ধরণীকোটা, পন্ডিচেরীর নিকটস্থ বাণিজ্যকেন্দ্র আরিকামেদু প্রভৃতি আরও বহু নগরের অস্তিত্ব ছিল আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত। তবে এই সময় থেকেই অল্প কিছু নগর ভিন্ন অধিকাংশই অবক্ষয়িত হতে থাকে।

৩.৩ আদিমধ্যযুগীয় সাহিত্য এবং লেখমালার সাক্ষ্য

তোশীয় ইয়ামায়াকি বাংলা থেকে প্রাপ্ত পনেরোটি তাম্রশাসন পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর নগর বা অধিষ্ঠানগুলি জেলার প্রধান কার্যালয় বা প্রশাসনিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে কিন্তু পরবর্তীকালে পাল এবং সেন রাজত্বকালের লিপিগুলিতে নগরের প্রাধান্য ততটা দৃশ্যমান নয়। পূর্ববর্তী লিপিসমূহে নগরশ্রেষ্ঠী অর্থাৎ নগরবাসী প্রধান বণিক বা বণিককুলের নেতা এবং প্রথম কুলিক বা প্রধান কারিগরদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে গুরুত্ববহ ভূমিকা ছিল পরবর্তীকালে তা অনুপস্থিত। অধ্যাপক শর্মার মতে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারিগরী শিল্পের অবনতি তথা নগরের অবক্ষয়ের জন্যই কারিগর এবং বণিককুল তাদের গুরুত্ব হারায়।

সর্বজনগ্রাহ্য নয়। ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, আর. চম্পকলক্ষ্মী, রণবীর চক্রবর্তী প্রমুখ রামশরণ শর্মার এই অবনগরায়ণের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কালসীমায় ঐতিহ্যমণ্ডিত কিছু নগরের অবক্ষয় হলেও নতুন অনেক নগরীর উন্মেষ হয়, প্রাচীন কিছু নগরও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

৩.৫.১ উত্তর ভারত : নগরায়ণ

ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মূলত আদি মধ্যযুগের লিপিসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে নগরায়ণ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর ভারতের একাধিক প্রসিদ্ধ নগর যে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল সে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কোনো দ্বিমত নেই, তবে তার বিপরীত চিত্রটিও তিনি তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর ভারতকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) গঙ্গা-সিন্ধু বিভাজিকা (২) উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং (৩) মালবের মালভূমি।

সিন্ধু-গঙ্গা বিভাজিকা অঞ্চলের নগর হরিয়ানার কারনাল জেলার পেহোয়া (পৃথুদক)। লেখমালার সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পেহোয়া বা প্রাচীন পৃথুদকে একটি অধিষ্ঠান বা নগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। ৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ থেকে এই নগরের কথা জানা যায়। গবিবনাথ মন্দিরের পেহব লেখতে উল্লিখিত এই নগর গুর্জর-প্রতিহার ভূখণ্ডের অন্তর্গত, এটি 'নিগম' বলেও লেখতে অভিহিত। আলোচ্য নগরটি ছিল উত্তরাপথের প্রধান অশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র। ঘোড়ার কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত বণিকগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসে লেনদেন করতেন ; ঘোড়ার মেলা এবং সংশ্লিষ্ট বণিকদের পরিচয় লিপিটিতে বর্ণিত আছে। পুরাতাত্ত্বিক অমলানন্দ ঘোষের মতে এই নিগম বা বাণিজ্যকেন্দ্রটি গ্রাম এবং নগরের মধ্যবর্তী চরিত্রের, তবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এটিকে অধিষ্ঠান বা নগর বলেই চিহ্নিত করেছেন।

আহারে প্রাপ্ত ৮৬৭ থেকে ৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে উৎকীর্ণ দশটি প্রস্তরলেখ থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার বুলন্দ শহরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত উন্নতমানের একটি নগরের সন্ধান পাওয়া যায়, এটি হল তত্তানন্দপুর। এই নগরটিও গুর্জর-প্রতিহার ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল। লেখমালায় 'পুর' এবং 'পত্তন' শব্দদ্বয় তত্তানন্দপুরকে সর্বাংশে নগর রূপেই চিহ্নিত করে। লেখমালার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনায় দেখা যায় নগরটিতে ছোট রাস্তা (কুরথ্যা), বড় রাস্তা (বৃহদ্রথ্যা), বাজারে গমনাগমনের পথ (হট্টমার্গ), শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত বাজার (পূর্বহট্টপ্রদেশ), বাসগৃহ (গৃহ) এবং বিপণি বা দোকানের (আবরী) অস্তিত্ব ছিল। আহারের উৎখনন থেকে তত্তানন্দপুরের নাগরিক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে ৩৮০০ একরের যে ধ্বংসাবশেষটি আহারে খননকার্য থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কার করেছে, তা এখনও লেখমালার তথ্যের দ্বারা মিলিয়ে দেখা হয়নি।

সর্বজনগ্রাহ্য নয়। ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, আর. চম্পকলক্ষ্মী, রণবীর চক্রবর্তী প্রমুখ রামশরণ শর্মার এই অবনগরায়ণের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কালসীমায় ঐতিহ্যমণ্ডিত কিছু নগরের অবক্ষয় হলেও নতুন অনেক নগরীর উন্মেষ হয়, প্রাচীন কিছু নগরও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

৩.৫.১ উত্তর ভারত : নগরায়ণ

ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় মূলত আদি মধ্যযুগের লিপিসমূহের তথ্যের ভিত্তিতে নগরায়ণ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর ভারতের একাধিক প্রসিধ্ধ নগর যে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল সে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কোনো দ্বিমত নেই, তবে তার বিপরীত চিত্রটিও তিনি তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর ভারতকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) গঙ্গা-সিন্ধু বিভাজিকা (২) উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং (৩) মালবের মালভূমি।

সিন্ধু-গঙ্গা বিভাজিকা অঞ্চলের নগর হরিয়ানার কারনাল জেলার পেহোয়া (পৃথুদক)। লেখমালার সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পেহোয়া বা প্রাচীন পৃথুদকে একটি অধিষ্ঠান বা নগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। ৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ থেকে এই নগরের কথা জানা যায়। গবিবনাথ মন্দিরের পেহব লেখতে উল্লিখিত এই নগর গুর্জর-প্রতিহার ভূখণ্ডের অন্তর্গত, এটি 'নিগম' বলেও লেখতে অভিহিত। আলোচ্য নগরটি ছিল উত্তরাপথের প্রধান অশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র। ঘোড়ার কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত বণিকগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসে লেনদেন করতেন ; ঘোড়ার মেলা এবং সংশ্লিষ্ট বণিকদের পরিচয় লিপিটিতে বর্ণিত আছে। পুরাতাত্ত্বিক অমলানন্দ ঘোষের মতে এই নিগম বা বাণিজ্যকেন্দ্রটি গ্রাম এবং নগরের মধ্যবর্তী চরিত্রের, তবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এটিকে অধিষ্ঠান বা নগর বলেই চিহ্নিত করেছেন।

আহারে প্রাপ্ত ৮৬৭ থেকে ৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে উৎকীর্ণ দশটি প্রস্তরলেখ থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার বুলন্দ শহরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত উন্নতমানের একটি নগরের সন্ধান পাওয়া যায়, এটি হল তত্তানন্দপুর। এই নগরটিও গুর্জর-প্রতিহার ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল। লেখমালায় 'পুর' এবং 'পত্তন' শব্দদ্বয় তত্তানন্দপুরকে সর্বাংশে নগর রূপেই চিহ্নিত করে। লেখমালার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনায় দেখা যায় নগরটিতে ছোট রাস্তা (কুরথ্যা), বড় রাস্তা (বৃহদ্রথ্যা), বাজারে গমনাগমনের পথ (হট্টমার্গ), শহরের পূর্বদিকে অবস্থিত বাজার (পূর্বহট্টপ্রদেশ), বাসগৃহ (গৃহ) এবং বিপণি বা দোকানের (আবরী) অস্তিত্ব ছিল। আহারের উৎখনন থেকে তত্তানন্দপুরের নাগরিক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে ৩৮০০ একরের যে ধ্বংসাবশেষটি আহারে খননকার্য থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আবিষ্কার করেছে, তা এখনও লেখমালার তথ্যের দ্বারা মিলিয়ে দেখা হয়নি।

প্রতিহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ঝাঁসি জেলার ললিতপুরের নিকট সীয়াডোনীতে (মালবের মালভূমির অন্তর্গত) নগরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে ৯০৭ থেকে ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলি সম্বলিত একটি লেখমালার সাক্ষ্যে। সীয়াডোনীতে প্রাপ্ত নবম শতকের এই লেখটিতে নগরায়ণের মূর্তছবি চিত্রায়িত হয়েছে। এখানে সীয়াডোনীকে 'পত্তন' বা শহর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে ; নুনের ব্যবসায়ী (নেমকবণিজ) সহ বিভিন্ন কারিগর এবং বাণিজ্যজীবীর বাস ছিল এখানে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে যাবার পথ বা 'হট্টরথ্যা' ছিল শহরটিতে ; কিছু কিছু রাস্তা ছিল বণিক অধ্যুষিত (বণিজোনিজরথ্যা)। ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে হট্ট এবং মণ্ডপিকার উল্লেখও এখানে পাওয়া যায়। নগরটিতে বসতবাড়ির যে বিবরণ আলোচ্য লেখটিতে পাওয়া যায় তাকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে—'অপরসরক' বা বারান্দাযুক্ত বাড়ি, 'আবাসনিকা' বা সাধারণ বাসগৃহ এবং 'গৃহভিত্তি' বা 'বাস্তু' অর্থাৎ বসবাসযোগ্য এলাকা। বাণিজ্য কেন্দ্র ছাড়াও সীয়াডোনীতে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ চলত তার প্রমাণও লেখটিতে পাওয়া যায়। নগরটিতে বাজারের সংখ্যা দেখে অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে, সীয়াডোনী আয়তনে আহার বা তত্তানন্দপুরের থেকে বৃহৎ ছিল। আহারের মত সীয়াডোনীতে একটি মন্দির এলাকা ছিল। নগরটিতে টাঁকশালের উপস্থিতি দেখে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান এখানে প্রশাসনিক কাজকর্মও হত। গুর্জর-প্রতিহার সামাজ্যে মালবের মালভূমির অন্তর্গত অপর একটি নগর হল গোপগিরি (গোপাদ্রি—আধুনিক গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ)। বৈল্লভট্টস্বামীর মন্দিরে প্রাপ্ত ৮৭৫ এবং ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের দুটি লেখতে এই নগরের বিবরণ আছে। গোপগিরি নগর এলাকার মধ্যে একাধিক তৈলোৎপাদক (তৈলিক) এবং শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। নগরে অন্তত দুটি হট্টিকার অস্তিত্ব ছিল। গোপগিরির চারপাশ সম্ভবত প্রাকার বেষ্টিত ছিল ; তার কারণেই নগরটি 'কোট্ট' বা কেল্লা বলে বর্ণিত। শিল্পোৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে গোপগিরিতে প্রশাসনিক কার্যকলাপও হত। সীমানা তদারকির জন্য নিয়োজিত হতেন মর্যাদাধূর্য ; দুর্গাধিপতি হিসাবে 'কোট্টপাল' গুর্জর-প্রতিহার শাসকদের দ্বারা নিযুক্ত হতেন। অনুরূপভাবে 'বলাধিকৃত' বা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদেরও নিয়োগ করতেন গুর্জর-প্রতিহার-এর রাজা বা শাসক। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে গোপগিরির নগরায়ণের উৎকর্ষতা এবং গুরুত্বের ইঙ্গিত বহন করে। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, পৃথুদকের তুলনায় সীয়াডোনী, তত্তানন্দপুর ও গোপাদ্রি অধিকতর বিকশিত ও পরিণত নগর ছিল। সীয়াডোনী ও গোপাদ্রি ছিল নগর হিসেবে অগ্রগণ্য ; সীয়াডোনী বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছাড়াও প্রশাসনিক গুরুত্ব পায় আর গোপাদ্রি সামরিক সংগঠনের দিক দিয়ে গুরুত্ব লাভ করে।

খ্রিস্টীয় দশম শতকের আগেই মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের কাছে কলচুরি রাজ্যে নগরায়ণের প্রতি ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। করিতলাই থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় লক্ষ্মণরাজের একটি লিপিতে 'পুরপত্তন' বা নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিলহরিতে প্রাপ্ত অপর একটি লিপিতে 'পত্তনমণ্ডপিকা'র কথা জানা যায়, যার অর্থ পত্তন বা নগরের মধ্যে গড়ে ওঠা মণ্ডপিকা বা বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। বিলহরি এবং করিতলাই ছিল ছোট নগর তথা বাণিজ্যকেন্দ্র যেখানে

নিকটবর্তী এলাকা থেকে কৃষিজাত এবং শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এসে পৌঁছাত। বিলহরিতে বিক্রি হবার জন্য আসত নুন, তেল, গোলমরিচ, আদা, নানা ধরনের সবজি ইত্যাদি। এই পণ্যদ্রব্যগুলির উপর পত্তনমণ্ডপিকা কর আরোপ করত। এই পণ্যসামগ্রীর অধিকাংশই ছিল কৃষিজ সামগ্রী, সম্ভবত বিলহরির পশ্চাদ্‌ভূমি (hinterland) থেকে কৃষিজ পণ্য নিয়মিত এই নগরে আসত। কৃষির উন্নতি অনেক ক্ষেত্রে নগরের উৎপত্তির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তার উজ্জ্বল প্রমাণ রাজস্থানের নাডোল। মূলত নড্ডুল ছিল একটি গ্রাম, তার অবস্থান বারোটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে। এই অবস্থানগত সুবিধার কারণে নাডোল সন্নিহিত অঞ্চলের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নড্ডুল বিশেষ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্রমশ নড্ডুল গ্রামটি একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বা বাজার রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এখানে একটি মণ্ডপিকাও গড়ে ওঠে। কার্যত নড্ডুল গ্রাম থেকে বাণিজ্যকেন্দ্র এবং একটি ছোট নগরে পরিণত হয়, কালক্রমে যেটি নাডোলের চহমান রাজাদের শাসনকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়।

উত্তর ভারতের উপরিউক্ত নগরগুলির কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আলোকপাত করেছেন। তত্তানন্দপুর, সীয়াডোনী এবং গোপগিরি পরিকল্পিত নগর রূপে গড়ে ওঠেনি, যত্রতত্র হট্টের অবস্থান থেকে তা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, সীয়াডোনী ছাড়া অন্য কোনো নগরের বর্ণনায় কোনো শাসক বা প্রশাসনিক কর্মচারীর উল্লেখ নেই, সম্ভবত নগরগুলির প্রশাসনিক ভূমিকা অপেক্ষা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, এই নগরগুলি আদি-মধ্যযুগে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে, যদিও এই বাণিজ্যিক চরিত্র আদি ঐতিহাসিক যুগের বাণিজ্যিক প্রকৃতির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, আলোচ্য নগরগুলি কৃষিতে উন্নত, বিস্তৃত পশ্চাদ্‌ভূমি সম্বলিত এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথের ধারে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, আদি-মধ্যযুগে উত্তর ভারতের নগরগুলির অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে তৃতীয় পর্যায়ের নগরায়ণকেই সূচিত করে।

লিপিমালায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেমন আদিমধ্যযুগের একটি পর্বে নগরায়ণের বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও নগরায়ণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত নবগঠিত নগরগুলিই শুধুমাত্র নয়, ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এবং রণবীর চক্রবর্তীর মতে, সনাতন কিছু নগরও আদিমধ্যযুগে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, যেমন অহিচ্ছত্র, দিল্লীর পুরানো কিলা, অত্রঞ্জিখেড়া এবং বারাণসীর কাছে রাজঘাটে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলির উল্লেখ তাঁরা করেছেন।

৩.৫.২ নগরায়ণ : দক্ষিণ ভারত

আদি মধ্যযুগে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণেও নগর গড়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর কর্ণাটকের একটি লেখ থেকে কর্ণাটকের বেণুগ্রাম (বর্তমান বেলগাঁও)-এর যে বিবরণ পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে ঐ অঞ্চলকে একটি নগর বসতি রূপে চিহ্নিত করে। এখানে বলা হয়েছে যে বেণুগ্রামে বণিক, কারিগর বা উৎপাদকেরা বসবাস করতেন। এই বণিকদের মধ্যে শুধু স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই ছিলেন না, ছিলেন

লাট বা দক্ষিণ গুজরাট, মালওয়াল বা কেরলের বণিক গোষ্ঠী। বহু সংখ্যক বিপণির বর্ণনা পাওয়া যায় এই লিপিতে, বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্যের লেনদেন হত এই সকল বিপণিতে ; তাদের সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য সূত্রে। এই দ্রব্যগুলি হল—ধান এবং অন্যান্য ধরনের শস্য, নারকেল, আখ, গোলমরিচ, পানপাতা, বিভিন্ন মশলা, অশ্ব, রকমারি সুগন্ধী দ্রব্য, বস্ত্রসম্ভার প্রভৃতি বেণুগ্রামে কেনাবেচা চলত। এই নগরটির আয়তন ছিল সুবৃহৎ কারণ সন্নিকটস্থ প্রায় সত্তরটি গ্রামের বাণিজ্য নগরী হিসেবে বেণুগ্রাম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের উল্লেখ করেছেন, এটি হল মামল্লপুরম। অন্ধ্র অঞ্চলে খৃষ্টীয় দশম শতক থেকে ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নগর স্থাপিত হবার কারণ অনুসন্ধান করে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে ঐ অঞ্চলের নগরায়ণের ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি কাজ করেছিল তা হল :

প্রথমত, মেলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নগর গড়ে ওঠা, দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি কালক্রমে নগরীর রূপ পরিগ্রহ করে ; তৃতীয়ত, বন্দরের নিকটস্থ কোনো অঞ্চল বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সূত্রে নগরে পর্যবসিত হয় ; চতুর্থত, গ্রামকেন্দ্রিক বসতি ধীরে ধীরে নগরে উন্নীত হয় ; এবং পঞ্চমত, রাজকীয় উদ্যোগে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার মাধ্যমে কোনো স্থান নগর হয়ে ওঠে।

আদি মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতে নগরায়ণ কীভাবে হয়েছিল তার সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করেছেন আর চম্পকলক্ষ্মী। তাঁর মতে সুদুর দক্ষিণে কাবেরী উপত্যকায় নগরের উৎপত্তি হবার ক্ষেত্রে কতকগুলি কারণ বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল যথা (১) নগরের সংলগ্ন সুবিস্তৃত পশ্চাদ্ভূমি যা উদ্বৃত্ত খাদ্যের নিয়মিত সরবরাহে সফল হত (২) কৃষিপণ্য এবং বিভিন্ন স্থানীয় উৎপাদন সামগ্রী বাণিজ্যিক আদান প্রদানে সহায়ক হত (৩) আঞ্চলিক বিত্তশালী, সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাবান মানবগোষ্ঠী এবং মন্দিরের প্রয়োজনীয় নানা বিলাসদ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য দূরবর্তী দেশ থেকে বণিকগণ তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে আসত কারণ স্থানীয়ভাবে এই সকল পণ্য উৎপাদিত হত না (৪) পণ্য লেনদেনের সূত্রে বহু ব্যবসায়ী এবং কারিগরের বাণিজ্যকেন্দ্রে বসতি স্থাপনের সূত্রপাত। এই বণিক ও কারিগরশ্রেণি স্থানীয় মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ছিল, যা নগরের পত্তনের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

আর চম্পকলক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু অঞ্চলে আদি মধ্যযুগীয় নগরায়ণের আলোচনা করেছেন আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণে। দক্ষিণ ভারতীয় লিপিমালা বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে প্রথমে পল্লব-পাণ্ড্য রাজত্বকালে এবং পরে নবম শতাব্দী থেকে চোল রাজবংশের শাসনকালে কাবেরী উপত্যকা অঞ্চলে কৃষিকাজে ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল। ব্রহ্মদেয় এবং মন্দির এলাকাগুলিতে সুসংগঠিতভাবে কৃষির সম্প্রসারণের প্রবণতা দেখা দেয়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূলে ছিল, রাষ্ট্রশক্তি কৃষিকাজে ব্যাপক সহায়তার হাত প্রসারিত করে। একাধিক ব্রহ্মদেয় এবং মন্দির বসতি মিলিতভাবে এক একটি স্বতন্ত্র এলাকা তৈরি করত, যার কেন্দ্রে স্থাপিত হত একটি নগর। এই নগরই নির্দিষ্ট এককটির বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করত।

এভাবেই, চম্পকলক্ষ্মীর মতে, চোল শাসনের সূচনাকালে কাবেরী উপত্যকায় গড়ে ওঠে কুড়ামুক্কু—পালাইয়ারাই নগর এবং দশম শতাব্দীতে তাম্রপর্ণী উপত্যকায় গড়ে ওঠে রাজরাজচতুর্বেদীমঙ্গলম্ এবং চেরবনমহাদেবী চতুর্বেদীমঙ্গলম্। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুই মন্দির নগরী কাঞ্চিপুরম এবং মাদুরাই-এর উদ্ভব হয় আদি ঐতিহাসিক যুগে। সঙ্গম যুগেও এদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। চম্পকলক্ষ্মীর মতে, আদি মধ্যযুগেও এই দুই নগরীর চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটলেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। প্রথমত, মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নগরগুলি পল্লব ও পাণ্ড্যদের রাজধানী ছিল এবং দ্বিতীয়ত, নগর দুটি তাদের আশপাশের অঞ্চলগুলির সাথে আর্থ-সামাজিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তৃতীয়ত, কাঞ্চীপুর-এর সঙ্গে নিকটবর্তী বন্দর মামল্লপুরমের সংযোগ সুদৃঢ় হয়, অপরদিকে মাদুরাই-এর সঙ্গে নিকটবর্তী কোরকাই বন্দরের যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে কাঞ্চিপুরম ও মাদুরাই শুধুমাত্র মন্দির নগরী নয়, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে প্রতিভাত এবং বিকশিত হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ ভারতের পল্লব, পাণ্ড্য এবং চোল রাজবংশের উৎকীর্ণ লিপিসমূহে নগরগুলি কিন্তু 'নগরম' রূপে অভিহিত। প্রথমোক্ত দুই রাজবংশের রাজত্বকাল অপেক্ষা নগরমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল চোল শাসনকালে। তামিলনাড়ুর পরিসীমা ছাড়িয়ে অন্যান্য অধীনস্থ এলাকায় এই ধরনের বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোয়েম্বাটুর এলাকায় মুডিকোণ্ডাচোলাপুরম, মহীশূর এলাকায় নিগারিলি চোলপুরম। এই বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে, এদের মূল উদ্দেশ্য হল—ব্যাপক অঞ্চলে বাণিজ্যিক যোগাযোগকে প্রসারিত করা।

আদি-মধ্য যুগে দক্ষিণ ভারতে নগর বা নগরম গড়ে ওঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বহু পণ্ডিত যে ব্যাপারে একমত তা হল, ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। জর্জ স্পেনসর এবং কেনেথ আর হল কাঞ্চীপুরম নগরীটির অর্থনীতির সঙ্গে তার রাজনীতি এবং ধর্মবিশ্বাসের একটি গভীর সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন। কাঞ্চীপুরমের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য তার অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ক্রিয়াকলাপকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়, তার প্রসারণকে প্রভাবিত করে। ইতিহাসের দুই কালজয়ী রাজবংশ পল্লব এবং চোল রাজশক্তি এই প্রাধান্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তৎপর ছিলেন। আর চম্পকলক্ষ্মীর গবেষণাতেও এই তথ্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

চম্পকলক্ষ্মী তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় দেখিয়েছেন চোল রাজবংশ শৈবধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে লিঙ্গপূজাকে বহুল প্রচলিত করেন, তাঁরা ভক্তিধর্মের সাধক রূপে বৃহদায়তন দেবালয় বা মন্দির নির্মাণে সহায়তা করতেন। মন্দিরগুলির বর্ণাঢ্য, জমকালো ও ব্যয়বহুল অলংকরণে রাজকীয় কর্তৃত্বই শুধু নয়, পৃষ্ঠপোষকতাও পাওয়া যেত। এরূপ মন্দির-নগরীর দুটি উজ্জ্বল প্রমাণ তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ডাচোলাপুরম। এই দুটি নগরী চোলরাজ রাজরাজ চোল এবং রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে খ্যাতি ও প্রাধান্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে, চোল প্রশাসনের বরিষ্ঠ কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়। উক্ত নগরীদ্বয় দ্রাবিড় শৈলীর

মন্দিরে সুশোভিত ছিল। বৃহদায়তন মন্দির দুটি চোলরাজত্বের গরিমা-ই শুধু নয় 'চোলবংশীয় রাজাদের একচ্ছত্র রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতীকস্বরূপ। তাঞ্জোর ও গঙ্গাইকোণ্ডাচোলাপুরম নগরী এবং মন্দিরগুলি চোলরাজত্বের ঐশ্বর্য, বৈভব এবং কর্তৃত্বকে ইতিহাস পরম্পরায় মহিমান্বিত করে রেখেছে।

তাঞ্জোর নগরীটি গড়ে উঠেছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং ব্যাপক সম্প্রসারণেও কালবিলম্ব হয়নি। এই নগরটিতে ছিল মন্দির অংশ বা বৃহদেশ্বর বা উল্লালৈ (যা পুরোহিত এবং শাসক সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল), বহিরাংশের বসতি এলাকা বা পুরামবাড়ি (যেখানে রাজকর্মচারী, বণিক এবং নগরমের অন্যান্য সাধারণ লোক বাস করত), মন্দির নির্মাণ এবং সেই নির্মাণকার্য তদারক ও পরিচালনা করার জন্য প্রায় ছয়শত কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই কর্মীগণ স্থানীয় নয়, পাণ্ড্যরাজ্য, পল্লব রাজ্যাঞ্চল টোণ্ডাইমণ্ডলম এবং চোল সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে উক্ত ছয়শত নির্মাণকর্মীকে আনয়ন করা হয়। বৃহৎ এই সুগঠিত তাঞ্জোরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োজিত হত। চম্পকলক্ষ্মীর গবেষণা থেকে জানা যায়, এই নগরটি প্রকৃতপক্ষে শিল্পোন্নয়নশীল যুগের নগরের চরিত্রকে আত্মীকরণ করেছিল যার কেন্দ্রস্থলে ছিল মন্দির, ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ। তাঞ্জোরের নগর-বিন্যাসে প্রান্তিক বসতি জুটেছিল দরিদ্র শ্রমজীবী এবং সমাজের নিম্নবিত্ত খেটে-খাওয়া জনগণের। তাঞ্জোরের মন্দিরটির পরিচালনার জন্য যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হত তার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করেছিলেন চোলরাজশক্তি। মন্দিরটির জন্য চোল সাম্রাজ্যের বহু স্থানে ভূমিদান করা হত, এই ভূমিদান-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ছিল তাঞ্জোরের মন্দিরটি। চোল রাজ্যের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ স্বেচ্ছায় তাদের সাধ্যানুযায়ী অতুল ঐশ্বর্যের মূর্ত প্রতীক এই মন্দিরটির সেবায় নিয়োজিত হতেন—তাঞ্জোরের বিভিন্ন লিপিতে তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে নগরম বা বাণিজ্যিক কেন্দ্র ভিত্তিক নগর, মানগরম অর্থাৎ বৃহৎ বাণিজ্য নগর, রাজকীয় নগর এবং মন্দিরকেন্দ্রিক নগর গড়ে উঠেছিল। চম্পকলক্ষ্মীর 'নগরম' এর তালিকায় স্থান পেয়েছে বিরিঞ্চিপুরম, তিরুবাড়ি, টোক্কালাম, কোট্টুর প্রভৃতি ; মানগরমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মামল্লপুরম ; ভরায়ুর, পালাইয়ারাই হল রাজকীয় নগর এবং মন্দির নগরী অবশ্যই তাঞ্জোর, গঙ্গাইকোণ্ডাচোলপুরম প্রভৃতি। শেষোক্ত দুই নগরীকে চম্পকলক্ষ্মী 'Urbanisation from above' বলে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং, সুদূর দক্ষিণভারতেও যে নগরায়ণের দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.৬ তুলনামূলক বিশ্লেষণ

অধ্যাপক রামশরণ শর্মা এবং তাঁর অনুগামী বি.এন. এস যাদব, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা প্রমুখ ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতবর্ষে আদি মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। রামশরণ শর্মা খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে দশম শতক পর্যন্ত কালসীমায় নগরের অবক্ষয় সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেছেন তাতেও সামন্ততন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে এ বিষয়ে তিনি একমত যে, নগরের অবক্ষয়ের সাথে সাথে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল এবং পরবর্তীকালে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য নগরায়ণের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। অধ্যাপক শর্মার মতে,

আলোচ্য সময়ে 'Urban Contraction' বা নগরজীবনের সংকোচন এবং 'Agricultural Expansion' বা কৃষির সম্প্রসারণ একই সঙ্গো সমান্তরালভাবে চলেছিল।

অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগের নগরগুলিকে তৃতীয় দফার নগরায়ণের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে নগরায়ণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এবং তার সময়সীমা খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় দফার নগরায়ণের মূল কেন্দ্র ছিল গাঙ্গেয় বা মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা, যে অঞ্চল থেকে নগরায়ণের ধারাটি সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পর্বের নগরগুলির বেশিরভাগই ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌ভূমিসম্বলিত এবং প্রধান বাণিজ্যপথের ধারে অবস্থিত। কিন্তু আদি মধ্যযুগে তৃতীয় দফার যে নগরায়ণ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার কোনো প্রধান বা মূল কেন্দ্র নেই ; অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ণের তুলনায় তৃতীয় পর্বের নগরগুলির মধ্যে আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের প্রভাব অনেক বেশি ছিল। এই পর্বের নগরগুলির অধিকাংশই স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে সক্রিয় ছিল। স্থানীয় রাজশক্তির ক্রমবিকাশ এবং কর্তৃত্ব, ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর প্রভাব বিভিন্ন অঞ্চলে নগর গড়ে ওঠার নেপথ্যে কাজ করেছিল। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, আদি ঐতিহাসিক পর্বের নগরগুলি ছিল অধিকাংশক্ষেত্রেই বৃহদায়তন শক্তির কেন্দ্র, পক্ষান্তরে আদি মধ্যযুগের নগর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নানা স্তরের ও নানা প্রকারের স্থানীয় শক্তির কেন্দ্ররূপে আবির্ভূত। তিনি আরও বলেছেন, ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ মূলত কৃষির ব্যাপক প্রসারের যুগ ; এই কৃষি অর্থনীতির প্রসারই আদি-মধ্য যুগে স্থানীয় শক্তিগুলির উত্থান ও সংখ্যাবৃদ্ধির পথ খুলে দেয়।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. রামশরণ শর্মা — আর্বাণ ডিকে ইন ইন্ডিয়া (৩০০-১০০০ খৃষ্টাব্দ), দিল্লী, ১৯৮৭ ; পার্সপেক্টিভস্ ইন সোশ্যাল এন্ড ইকনমিক হিস্ট্রী অফ্ আর্লি ইন্ডিয়া।

২. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় — 'ট্রেড অ্যান্ড আর্বাণ সেন্টারস্ ইন আর্লি মিডিভ্যাল নর্থ ইন্ডিয়া' ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ, ১ম খণ্ড, ১৯৭৪, ২০৩-১৯ পাতা ; দ্য মেকিং অফ্ আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া।

৩. আর. চম্পকলক্ষ্মী — 'গ্রোথ অফ্ আর্বাণ সেন্টারস্ ইন সাউথ ইন্ডিয়া : কুড়ামুক্‌কু পলাইয়ারাই, দ্য টুইন সিটিজ অফ্ দ্য চোলস্ : স্টাডিজ্ ইন হিস্ট্রী, ১.১, ১৯৭৯, ১-২৯ পাতা ; ট্রেড, ইডিওলজি এন্ড আর্বাণাইজেশন : সাউথ ইন্ডিয়া (৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ-১৩০০ খৃষ্টাব্দ) অষ্টম অধ্যায়।

৪. রণবীর চক্রবর্তী — প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, ইতিহাস গ্রন্থমালা, ১৪০৯।

৫. গর্ডন চাইল্ড — দ্য আর্বাণ রিভল্যুশন, ১২-১৭ পাতা।
৬. রবার্ট ম্যাক্ অ্যাডাম্স্ — দ্য-ন্যাচারাল হিস্ট্রী অফ্ আর্বনাইজেশন, ১৮-২৬ পাতা।
৭. তোশীয় ইয়ামায়াকি — সাম প্রসপেকট্স্ অফ্ ল্যান্ড সেল ইন্স্ক্রিপ্শন্স্ ইন ফিফ্থ্ এন্ড সিক্সথ্ সেঞ্চুরী বেঙ্গল।
৮. বরাহমিহির — বৃহৎসংহিতা (সম্পা) রামকৃষ্ণ ভাট।
৯. জিনপ্রভসূরি — বিবিধার্থকল্প, ৩৯ পাতা।
১০. কে. এ. আশরফায়ন — মিডিভ্যাল টাউন্স্ অফ্ ইন্ডিয়া
১১. অলবিরুণী — অল-বিরুণী'স ইন্ডিয়া (সম্পা) ই. সি. স্যাচাও, ১৯৮ পাতা।
১২. ওয়াই. ডি. শর্মা — রিমেন্স্ অফ্ আর্লি হিস্টোরিক্যাল সাইট্স্
১৩. এস. এন. চৌধুরী — এক্সপ্লোরেশন্স্ অফ্ হিস্টোরিক্যাল সাইট্স্।
১৪. সি. মার্গবন্ধু — আর্কিওলজি অফ্ দ্য সাতবাহন ক্ষত্রপ সাইট্স্।
১৫. বি. এন. যাদব — সোসাইটি এন্ড কালচার ইন নর্দান ইন্ডিয়া ইন দ্য টুয়েলফ্থ্ সেঞ্চুরী।
১৬. জর্জ স্পেনসার — দ্য ইকনমি অফ্ কাঞ্চীপুরম : এ স্যাকরেড্ সেন্টার ইন আর্লি সাউথ ইন্ডিয়া ১৪৮-৪৯ পাতা।

৩.৮ অনুশীলনী

১. নগরায়ণ বলতে কী বোঝেন ?

২. নগরের অবক্ষয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক রামশরণ শর্মার মতবাদ আলোচনা করুন।

৩. কী কী কারণে আদি মধ্য যুগে অব-নগরায়ণ ঘটেছিল ?

৪. উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে কোন্ কোন্ নগর অবক্ষয়ের কবলে পড়ে ?

৫. আদি-মধ্য যুগে উত্তর ভারতে নগরায়ণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতবাদ সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৬. ঐতিহাসিক আর চম্পকলক্ষ্মী দক্ষিণ ভারতে নগরায়ণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

একক ০৪ ❒ শ্রেণি ও জাতিগোষ্ঠীর বিস্তার (Proliferation of Castes & Guilds)

গঠন

৪.০ প্রস্তাবনা
৪.১ জাতি ও শ্রেণি : উন্মেষের প্রারম্ভিক পর্যায় : বৈদিক যুগ
৪.২ বেদ-পরবর্তী যুগ
৪.৩ খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ-৩২৫ অব্দ
৪.৪ খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ-খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫ অব্দ-শ্রেণির ইতিহাস
৪.৫ খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫ অব্দ-৩০০ খ্রিস্টাব্দ : শ্রেণিবিকাশের যুগ
৪.৬ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক—খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক : শ্রেণি ও জাতি
৪.৬.১ লিপিমালার সাক্ষ্য : শ্রেণি ও জাতি
৪.৬.২ শ্রেণি-সম্ভূত জাতি : বৃত্তিগত সামাজিক অবস্থান
৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী
৪.৮ অনুশীলনী

৪.০ প্রস্তাবনা

প্রাচীন ভারতবর্ষে সমবায় ভিত্তিক চেতনার একটি সুপরিস্ফুট রূপায়ণ আমরা অনুধাবন করতে পারি ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই। শুধুমাত্র সামাজিক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, সহযোগিতার বাতাবরণে গড়ে ওঠা মিলিত প্রয়াসে কাজ করার এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনেও। বস্তুত, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কার্যকলাপের প্রবণতা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই স্বাতন্ত্র্য থেকেই উৎপত্তি হয় জাতিগোষ্ঠীর (caste), উদ্ভব হয় 'শ্রেণি' বা Guild-এর। এই শ্রেণি ও জাতির ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিস্তার ঘটে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পর্যায়ে।

মূলত খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে আমাদের পাঠ্যক্রম সীমায়িত। তবে সেই কালসীমার জাতি ও শ্রেণির ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে হলে তার আদি ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আলোচ্য এককে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বিশাল যুগপর্বে ভারতবর্ষের শ্রেণি ও জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সামগ্রিক আলোকপাতের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

৪.১ জাতি ও শ্রেণি—উন্মেষের প্রারম্ভিক পর্যায় : বৈদিক যুগ

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে 'পণি' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক 'পণি' শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জিমার এবং লাডউইগ এর মতে পণি বলতে বণিকদের চিহ্নিত করেছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত স্তোত্র থেকে উক্ত ঐতিহাসিকগণ মনে করেন পণি বা বণিকগণ একটি গোষ্ঠী বা দলবন্ধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত, যে গোষ্ঠী প্রতিপক্ষ বা শত্রুদের বিরুদ্ধে সংঘবন্ধভাবে সংগ্রামে সমর্থ ছিল। পরবর্তীযুগে জাতক সাহিত্যে আমরা পণিদের উল্লেখ পাই। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে অর্থাৎ ঋগ্বেদে বর্ণিত সমাজে কারিগরী পেশায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকলেও তাদের কোনো সঙ্ঘবন্ধ সংগঠন ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই। মধ্যযুগীয় ইউরোপে 'Guild' নামক যে কারিগরী সংগঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়, বৈদিক যুগে সেই চরিত্রের কোনো সংগঠন সম্ভবত ছিল না। তবে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শ্রেষ্ঠী এবং গণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কৌশিতকী এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শ্রেষ্ঠীর বর্ণনা লিপিবন্ধ হয়েছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রেণি (Guild)র প্রধান রূপে শ্রেষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ম্যাকডোনেলের মতে বৈদিক সাহিত্যেও শ্রেণির নেতৃস্থানীয় হিসেবেই শ্রেষ্ঠী সমাদৃত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত গণ শব্দটি ঐতিহাসিক Roth-এর মতে, শ্রেণি বা guild অর্থে প্রযোজিত হয়েছে। অধ্যাপক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, Guild বা শ্রেণি-র ধারণা এবং উৎপত্তি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের পূর্বেই ঘটেছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কারিগরী শিল্পের সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় যজুর্বেদের অন্তর্গত বাজসনেয়ী সংহিতায় (অধ্যায় ৩০)। এখানে শুধুমাত্র বিভিন্ন কারিগর নয় তাদের পেশাদারী বৃত্তির কথাও লিপিবন্ধ হয়েছে ; কিন্তু এদের কোনো সংগঠন বা শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল কিনা সে ব্যাপারে বিশদ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪.২ বেদ-পরবর্তী যুগ

বৈদিক সাহিত্যের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যৌথ বা মিলিত উদ্যোগে কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্যটি আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সূত্র-সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, একই পেশায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠী নিজেদের পারস্পরিক সমর্থনে এক-একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনগুলির নিজস্ব বিধি-নিয়ম তারা মানতে বাধ্য থাকত। গৌতমের ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, কৃষক, বণিক, কুসীদজীবী এবং কারিগরী পেশার জনগণ প্রত্যেকেই নিজেদের গোষ্ঠীর অনুশাসন মান্য করে চলতে বাধ্য। অনুমান করা যেতে পারে উপরিউক্ত পেশাজীবী গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব সংগঠন ছিল এবং তাদের নিয়মকানুনগুলি আইনত বৈধতার দাবি করতে পারত, উপরন্তু এই সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা তাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে রাজার সঙ্গে আলোচনা করারও অধিকার লাভ করেছিল। বৌধায়ন ধর্মসূত্র থেকে জানা যায় 'শ্রেণি' জাতীয় সংগঠনগুলিতে যে নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল, সেইগুলি দেশের আইনের সমমর্যাদা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হত। এই সামান্য তথ্য থেকে 'শ্রেণি' বা সংঘের সাংগঠনিক দিকটির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক জীবনে তাদের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছিল বলেই সংঘের নিয়মাবলি আইনের মর্যাদা পায়।

৪.৩ খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ—৩২৫ অব্দ—শ্রেণির ইতিহাস

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে চতুর্থ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সময়কালে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বৌদ্ধ সাহিত্য। পালি ভাষায় রচিত এই আকর গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তিধারী জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয়পিটকে আমরা 'নলকার' নামক কারিগরের সন্ধান পাই যাঁর বৃত্তি ছিল সম্ভবত কঞ্চি দিয়ে শিল্প সামগ্রী তৈরি করা। মজ্‌ঝিম নিকায় গ্রন্থে কুম্ভকার কীভাবে নদী বা পুকুরের তীরবর্তী মাটি দিয়ে মৃৎপাত্র প্রস্তুত করতেন তার বর্ণনা আছে, যার সমর্থিত তথ্যপ্রমাণ মিলেছে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী আবিষ্কারে। কারিগরী শিল্পের মধ্যে কর্মকারের বৃত্তিতে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছিল কারণ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে সমাজে লৌহ নির্মিত বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পালি সাহিত্যে বর্ণিত 'কম্মকার' বা কর্মকার লোহার তৈজসপত্র তৈরির বৃত্তিতে নিযুক্ত হতেন। স্বভাবতই ভারতীয় সমাজে কর্মকারের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিকায় গ্রন্থগুলিতে লৌহ ছাড়াও অন্যান্য ধাতুশিল্পে কর্মকারের উৎকর্ষতার বর্ণনা পাওয়া যায়। দীঘনিকায়তে 'কম্মারপুত্ত' শব্দটির (কর্মকারপুত্র) ব্যবহার দেখা যায় যার আক্ষরিক অর্থ কর্মকারের পুত্র বা ছেলে। অধ্যাপক রণবীর 'চক্রবর্তীর'-মতে, 'কম্মার' এবং 'কম্মারপুত্ত' কথা দুটি যেখানে প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত যে কর্মকারের পেশা ক্রমশ বংশানুক্রমিক হয়ে উঠেছিল। বস্তুত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে কারিগরি বৃত্তিতে বংশানুক্রমিকতার প্রকাশ অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত কারিগর 'তন্তুবায়', পোশাক নির্মাণের কারিগর 'তুন্নবায়', 'সূচী'শিল্পের কারিগর 'সূচীকার' নামে আখ্যাত। এ ছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের কথা পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন রজক (পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত), নহাপিত বা নাপিত (কেশ মোচনকারী), বেজ্জ (বৈদ্য বা চিকিৎসক) প্রভৃতি।

আলোচ্য সময়কালে কারিগরী শিল্প ও বৃত্তির বিভিন্নতার অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে আবির্ভাব ঘটে পেশাদারী সংগঠনের। বৌধায়ন ধর্মসূত্র, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং পালি সাহিত্যে এই জাতীয় বৃত্তিমূলক সংগঠন শ্রেণি, গণ, পুগ, সংঘ ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় বর্ণিত। এইগুলিকে 'গিল্ড' বা এ ধরনের সংগঠনের সমতুল্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে এই সংগঠনগুলির উন্মেষের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না।

৪.৪ খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দ—খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫ অব্দ—শ্রেণির ইতিহাস

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে শিল্পজগতে গিল্ড বা শ্রেণি বা সংঘের যে ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয় আলোচ্য যুগে অর্থাৎ মৌর্য শাসনাধীন ভারতবর্ষে সম্ভবত তা কিছুটা সঙ্কুচিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কারুসংঘের প্রভাববৃদ্ধির প্রতি যথেষ্ট কঠোর মনোভাব দেখা যায়. তবে কৌটিল্য বণিক শ্রেণি বা বণিক সংঘগুলিকে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দিনমজুরদের শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে শ্রেণির সদস্যদের আচরিতব্য কতকগুলি বিধিনিয়মের কথা আছে। অর্থশাস্ত্রের

তথ্য থেকে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রেণি বা গিল্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের নবম অধ্যায়ে 'শ্রেণিবল' কথাটির ব্যবহার করেছেন। রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সৈন্যদলের প্রসঙ্গে এই শব্দটি ব্যবহৃত। এছাড়া, গিল্ড বা শ্রেণিপ্রধানকেও এখানে শ্রেণিমুখ্য অভিধায় বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে বাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ক্ষত্রিয় শ্রেণির উল্লেখ আছে যারা মূলত কম্বোজ এবং সুরাষ্ট্রে বাস করত।

৪.৫ খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫ অব্দ-৩০০ খ্রিস্টাব্দ : শ্রেণিবিকাশের যুগ

আলোচ্য যুগে কারিগরী শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রাক-মৌর্যযুগে রচিত দীঘনিকায়তে কারিগরী ও সেবামূলক বৃত্তির সংখ্যা ছিল চব্বিশ। কিন্তু মহাবস্তু অবদানে (খ্রিঃ ২য় শতক) এবং মিলিন্দ পঞ্‌হোতে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ছত্রিশ ও পঁচাত্তরে। তবে এ তথ্য প্রামাণ্য নয়। বরং কারিগরী শিল্প বিকাশের বিশ্বস্ত সাক্ষী খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ অগণ্য লেখমালা।

মুগপক্ষজাতকে চারটি জাতি এবং আঠারোটি শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতক সাহিত্যে যে কারিগরী শিল্পসমূহের তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলিই শ্রেণি, গণ, পুগ বা সংঘ জাতীয় সংগঠনের আওতায় ছিল। সংগঠনের আওতায় আসার ফলে এক-একটি শিল্প আঞ্চলিকভাবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। জাতকের কাহিনীগুলিতে শ্রেণি বা সংঘের প্রধান হিসেবে জেঠ্‌ঠক (জ্যেষ্ঠক) বা 'পমুখ'-এর দেখা পাওয়া যায়। এঁরা সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক থেকেই শ্রেণি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিশাস্ত্রে শ্রেণি পরিচালনার ক্ষেত্রে 'কার্যচিন্তক' নামক এক পদাধিকারীর পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সদ্বংশজ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং কর্মোদ্যমী কার্যচিন্তক জেঠ্‌ঠককে বা জ্যেষ্ঠককে শ্রেণি পরিচালনার কাজে সহায়তা করতেন। অনুমান করা যেতে পারে, আলোচ্য যুগে শ্রেণি বা সংঘের গুরুত্বই শুধু নয়, কার্যকারিতাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সমসাময়িক লিপিসমূহের তথ্য বিবরণ থেকে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শ্রেণিগুলি বহুক্ষেত্রে আধুনিক ব্যাঙ্কের অনুরূপ ভূমিকা পালন করত। লেখমালার তথ্য প্রমাণ করে রাজা, রাজবংশজ ব্যক্তি থেকে শুরু করে বণিক, কারিগর এমন কি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই সকল শ্রেণিতে আমানত গচ্ছিত রাখতে পারতেন। আলোচ্য যুগে কারিগরী বৃত্তিগুলির প্রসার ও উন্নতির মূলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি বা সংঘগুলির যথেষ্ট অবদান ছিল।

৪.৬ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক—খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক : শ্রেণি ও জাতি

সাহিত্যিক তথ্য :

খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত ধর্মশাস্ত্রসমূহে পেশাদারী সংগঠনগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নারদ এবং বৃহস্পতির স্মৃতিগ্রন্থের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই স্মৃতিকারদ্বয় শ্রেণির নিয়ম বিধির বিস্তৃত আলোচনার জন্য একটি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায় তাঁদের স্মৃতিগ্রন্থে সন্নিবেশিত

করেছেন। নারদের মতে শ্রেণির যাবতীয় আচারবিধি, কর্তব্য, সদস্যদের উপস্থিতি এবং তাদের জন্য নির্দেশিত বৃত্তি রাজার অনুমোদন সাপেক্ষ। উপরন্তু শ্রেণির অন্তর্গত কোনো সদস্য যদি নিয়মভঙ্গ করে তবে তাকে কঠোর শাস্তিদানের বিধানও নারদ-স্মৃতিতে পাওয়া যায়। এই অনুশাসন থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় সে যুগে সমাজের এবং রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেণি কতটা জরুরী ভূমিকা পালন করত।

শ্রেণি বা সংঘের উৎপত্তি এবং চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক সাহিত্য সম্ভারে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। বৃহস্পতির স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে : গ্রামবাসী, কারিগর প্রভৃতি নিয়ে গঠিত শ্রেণি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে এবং প্রতিটি সদস্য ধর্মীয় এবং ধর্ম বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের কর্তব্যপালন করবে। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বৃহস্পতি বিপদ বা বাধাবিঘ্ন বলতে তস্কর, দস্যু বা সৈন্যদলের অত্যাচারকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা প্রতিহত করতে সমগ্র জনসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ প্রয়োজন ছিল।

একটি নতুন শ্রেণি বা Guild এর গঠনকালে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত সে সম্পর্কে নারদ ও বৃহস্পতি বিস্তৃত অনুশাসন লিপিবদ্ধ করেছেন। বৃহস্পতির স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে :

"কোষেণ লেখক্রিয়য়া মধ্যস্থৈর্বা পরস্পরম।
বিশ্বাসং প্রথমং কৃত্বা কুর্য্যুঃ কার্যাণ্যনন্তরম্।।"

বস্তুতপক্ষে কোনও পেশাদারি ব্যক্তি যখন তাঁর বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও শ্রেণির সদস্য হতে ইচ্ছুক হতেন তখন তাকে চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। বৃহস্পতি উপরিউক্ত শ্লোকে সেই চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল :

(১) কোষ—শুধু বৃহস্পতি নয়, নারদ (১.৩২৯-৩১) এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে (২.১১৪-১৫) কোষের বর্ণনা পাওয়া যায়। কোষ হল চারিত্রিক বিশুদ্ধতার জন্য শুদ্ধিজাতীয় পরীক্ষা।

(২) লেখক্রিয়া—সম্ভবত শ্রেণির নিয়মশৃঙ্খলা মেনেচলার লিখিত প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পত্র।

(৩) মধ্যস্থ—এই পর্যায়টি প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায় তা ধারণা করা কঠিন। তবে অনুমান করা যেতে পারে, নতুন সদস্যকে খুব ভালোভাবে জানেন অথবা তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল এমন কোনো ব্যক্তিকে নতুন সদস্যের নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ বা 'গ্যারেন্টার' হিসেবে থাকতে হত।

চতুর্থত, শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব থাকাটা ছিল অত্যন্ত জরুরী। এখানে লক্ষণীয় যে স্মৃতিকারগণ শুধুমাত্র পেশাগত বৃত্তিসমূহের তালিকা পেশ করে ক্ষান্ত হননি ; বৃহস্পতির অনুশাসনে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যকলাপ (যথা জনসমাবেশের জন্য গৃহনির্মাণ, পর্যটকের বিশ্রামাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পুষ্করিণী খনন, উদ্যান রচনা, মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি) এর দায়িত্বভারও শ্রেণিগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

স্মৃতিশাস্ত্রের বিবরণী থেকে অনুমান করা যেতে পারে আলোচ্য যুগে শ্রেণিগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় সম্ভবত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'প্রমুখ' বা শ্রেণি-প্রধান ক্রমশ কার্যচিন্তকদের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন বলে মনে হয়। 'শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কারিগররা যখন কোনো কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হবেন, নারদের মতে, সেই কাজ সম্পাদিত হবে সমবায় ভিত্তিতে। এ ব্যাপারে নারদ-স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধান আছে। প্রত্যেক

সদস্যই সমান পরিমাণ মূলধন লগ্নী করবেন ; যদি কেউ বেশি বা কম পরিমাণ মূলধান বিনিয়োগ করেন, তাহলে শ্রেণির খরচ, লাভ বা লোকসানের ক্ষেত্রে সদস্যের দায় বা লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে ধার্য হবে। যদি শ্রেণির অপরাপর সদস্যের অনুমোদন না নিয়ে কোনো সদস্যবিশেষ অথবা শ্রেণির আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিসদস্য স্বীয় কাজের দ্বারা শ্রেণির সামগ্রিক সম্পদের ক্ষতি বা হানি ঘটান তবে তিনি যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন বলে বৃহস্পতি অনুশাসন জারী করেছেন। এই বিধানের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, শ্রেণির সামূহিক সংগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত বৃহস্পতি ও নারদ 'শ্রেণি'র সামগ্রিক চরিত্রের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'শ্রেণি' বা 'সংঘে'র সদস্য যদি চুক্তির খেলাপ করেন তাহলে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে বলে বৃহস্পতি ও নারদের স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে 'শ্রেণি'র নিয়মাবলীকে আইনগত মর্যাদাদান করা হয়েছে, যা গুরুত্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। নারদের মতে (১০.৩) 'শ্রেণি'র নিয়মগুলির দ্বারাই 'শ্রেণি'র সদস্যদের আচরণ বিচার করা হবে ; দোষী সদস্যদের বিচার এবং দণ্ডবিধান করার অধিকারও শ্রেণির ছিল, এবং দেশের রাজা বা শাসক 'শ্রেণী'র আইনবিধি অনুযায়ী কোনো দোষী শ্রেণি-সদস্যের বিচারকে অনুমোদন করবেন। এই বিধানের মধ্য দিয়ে গিল্ডের বা শ্রেণির নিয়মকানুনকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 'শ্রেণি'র বিশেষ বা স্বতন্ত্র মর্যাদার ইঙ্গিত এই বিধানের মধ্যেই পরিস্ফুট। তবে সাধারণত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ শ্রেণির ক্রিয়াকলাপে বিশেষ ঘটত না। ধর্মশাস্ত্রকারদের মতে যদি শ্রেণি সভাপতি বা 'প্রমুখ' এবং 'কার্যচিন্তক'দের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য ঘটে, গোলযোগ বাধে অথবা পরিচালকগণ অসৎ হয়ে পড়েন বা শ্রেণির সভাধিপতি যদি শ্রেণিস্বার্থপরিপন্থী কাজে লিপ্ত হন তবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য 'শ্রেণি'র সদস্যগণ আবেদন জানাতে পারেন। তবে এই জাতীয় হস্তক্ষেপের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আলোচ্য আমলে জানা নেই ; ফলে শ্রেণির বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বলে মনে হয় না।[১]

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত শ্রেণি ও জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শ্রেণির গুরুত্ব বা প্রভাব প্রতিপত্তি আলোচ্য আমলে কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। মনুস্মৃতির উপর মেধাতিথির ভাষ্যে লালনজী গোপাল সেই সম্ভাবনার কথা খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে ; শ্রেণির সদস্যদের উপর শ্রেণির প্রভাব আলোচ্য যুগে অতটা কঠোর ছিল না। 'শ্রেণি'-র সদস্যদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা এই যুগে বৃদ্ধি পায়। আমরা পূর্ববর্তী সময়ে শ্রেণির চরিত্র বিশ্লেষণে দেখেছি সেখানে প্রধানত শ্রেণির সামূহিক কার্যকলাপ প্রাধান্য পেত। এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে সংগঠনগত দৌর্বল্যের পরিচায়ক। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার নারদ স্মৃতি (১০.২৭) উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, করদানে বিরত থাকা, দ্যূতক্রীড়ায় ব্যাপৃত থাকলে এবং বারবণিতা রাখলে রাজা 'শ্রেণি'র কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

সাধারণভাবে ধর্মশাস্ত্রকারদের মতবাদ ছিল 'শ্রেণি'র কার্যকলাপে রাজার হস্তক্ষেপের বিরোধী। নারদের পূর্বের স্মৃতিকাররাও রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশ বিশেষ পছন্দ করেননি। কিন্তু নারদ স্মৃতির ব্যতিক্রমী মতবাদ থেকে

১. রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, ১৬৯-৭০ পাতা।

অনুমান করা যেতে পারে 'শ্রেণি'র আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য ক্রমশ কায়েম হচ্ছিল, যার ফলে শ্রেণির বৈশিষ্ট্য সম্ভবত কিছুটা বিঘ্নিত হয়। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে রচিত লেখপদ্ধতিতে 'শ্রেণীকরণ'-এর উল্লেখ আছে, যার অর্থ একটি বিশেষ প্রশাসনিক দফতর বা 'করণ'। এই দপ্তর-এর কাজ ছিল শ্রেণির উপর পর্যবেক্ষণ করা। 'শ্রেণীকরণ' কথাটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে সে যুগে শ্রেণির কাজকর্মের উপর প্রশাসনিক প্রভাব এবং হস্তক্ষেপ ঘটত।

আদি-মধ্যযুগের 'শ্রেণি'গুলিকে বিভিন্ন শাস্ত্রে জাতি অভিধা দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে কার্যত 'জাতি' ও 'শ্রেণি' প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে রচিত বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 'শ্রেণি'গুলিকে সংকর বা মিশ্রজাতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি তে কুম্ভকার, তন্তুবায় (তাঁতী), সুবর্ণকার, রজ্জকার প্রভৃতি মিশ্রজাতির (অর্থাৎ এই পেশায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত 'শ্রেণি' বা গিল্ডগুলি) স্পর্শ শুদ্ধ বলে বিধান দেওয়া হয়েছে ; পক্ষান্তরে চর্মকার, তৈলকার, ইক্ষুপীড়নকারী (আখ মাড়াই-এর কাজে নিযুক্ত), রজাকার, কাংস্যকার প্রভৃতি মিশ্রজাতিকে অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জিনসেনসূরি সুবর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, কারিগর প্রভৃতি জাতিকে সামাজিকভাবে অত্যন্ত নিম্নমানের বলে মনে করেন, তাঁর রচনায় এঁরা অধম পর্যায়ভুক্ত। এই সকল বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় শাস্ত্রকারগণ কখনই মিশ্র বা সংকর জাতিগুলিকে মর্যাদার আসন দেননি।

৪.৬.১ লিপিমালার সাক্ষ্য : শ্রেণি ও জাতি

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে শ্রেণি ও জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সাহায্য নিতে হবে তা হল লিপিমালা। আলোচ্য যুগপর্বে উৎকীর্ণ অসংখ্য লিপিতে শ্রেণি ও জাতির ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান এবং প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়।

পশ্চিম ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন মালবের দশপুর (বর্তমান মান্দাসোর) থেকে গুপ্তসম্রাট কুমারগুপ্ত এবং বন্ধুবর্মনের সময়ে উৎকীর্ণ (৪৩৬ খ্রিস্টাব্দ ও ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ) একটি লিপিতে লাট বা গুজরাট অঞ্চলের অধিবাসী প্রখ্যাত একদল রেশম শিল্পীর উল্লেখ আছে। এই শিল্পীগণ পরে মালব অঞ্চলে চলে আসেন বলে জানা যায় যাঁদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়, একাংশ মূল বৃত্তি ছেড়ে নতুন বৃত্তি অবলম্বন করেন কিন্তু অপর দলটি আদি বৃত্তি অর্থাৎ রেশম বস্ত্র প্রস্তুতের বৃত্তিতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। মালবের দশপুরে রেশম শিল্পীদের বিবরণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় তাঁরা একটি শ্রেণি বা গিল্ডের সদস্য ছিলেন। মান্দাসোর লিপি বর্ণিত বিবরণে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল রেশমশিল্পের পেশায় নিযুক্ত জনগোষ্ঠী ছাড়া যাঁরা পেশা পরিবর্তন করেন তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি গণক, কথক, তীরন্দাজি প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই বৃত্তি পরিবর্তন কিন্তু কোনো শ্রেণির সংঘবদ্ধ চরিত্রের হানি ঘটায়,. কারণ পেশাগত ঐক্য শ্রেণির সার্থকতার প্রধান কারণ। উপরন্তু রেশম শিল্পের বৃত্তি ছেড়ে কিছু সদস্য ধনোৎপাদক বৃত্তি গ্রহণ করেননি। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন, পশ্চিম ভারতে পঞ্চম শতকের দ্বিতীয় পাদে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভবত কোনও সংকট দেখা দিয়েছিল যার ফলশ্রুতি রূপে একটি 'শ্রেণি' তার স্থায়ী এলাকা পরিত্যাগ করে ও তার সদস্যদের একাংশ বৃত্তি বদল করে।

স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসন (১৪৬ গুপ্তাব্দ) থেকে জানা যায় ৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ইন্দ্রপুর বা বর্তমান ইন্দোরে একটি তেল উৎপাদনকারী শ্রেণি বা গিল্ড (তৈলিক শ্রেণি) ছিল। এই শ্রেণিটির প্রধান বা প্রমুখ ছিলেন জীবন্ত। এই লিপি বর্ণিত বিবরণ থেকে জানা যায়, ইন্দ্রপুরের 'তৈলিক' শ্রেণিতে অর্থ লগ্নী করা হয়েছিল চিরকালীন ভিত্তিতে। ওই আমানত করা অর্থ থেকে সুদ বাবদ প্রাপ্য অর্থে স্থানীয় সূর্য মন্দিরে দৈনন্দিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য দুই পলা করে তেলের সংস্থান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মালব দেশে একটি 'শ্রেণি'তে চিরস্থায়ী আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখেন বা লগ্নী করেন ২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের ওই একই পদ্ধতিতে লগ্নীর পরিমাণ ১২ বা ১৩ দিনার। তিনি অবশ্য এই অর্থ দুইবার শ্রেণিতে লগ্নী করেছিলেন। এই জাতীয় আমানতের উদ্দেশ্য ছিল মূল অর্থের দরুন প্রাপ্য সুদ কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কল্যাণমূলক ও পূজার্চ্চনার কাজে ব্যয় করা।

পেশাদারী সংগঠনের আভাস পাওয়া যায় প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতেও। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি (প্রাচীন বাংলার উত্তরাংশ)-র অন্তর্গত গুপ্তকালীন দামোদরপুর তাম্রফলকসমূহের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। এই লিপিসমূহে দেখা যায়, জেলাগুলির শাসনকার্য নির্বাহের জন্য বিষয়পতি বা জেলাশাসককে যে সকল সম্ভ্রান্ত সরকার-বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গ সহায়তা করতেন তার মধ্যে রয়েছে প্রথম কুলিক (সম্ভবত কারিগরদের প্রতিনিধি), প্রথম কায়স্থ (করণিক প্রধান) প্রভৃতি। ৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ এবং ৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ দুটি দামোদরপুর তাম্রফলকে বলা হয়েছে :

> "কুমারামাত্য—বেত্রবর্মণ্যধিষ্ঠানাধিকরণঞ্চ নগরশ্রেষ্ঠি—
> ধৃতিপাল—সার্থবাহ—বন্ধুমিত্র—প্রথম কুলিক—ধৃতিমিত্র—
> প্রথম—কায়স্থ—সাম্বপাল—পুরোগে সংব্যবহরতি—"॥

কুলিক বা কারিগর এবং কায়স্থ বা করণিকগণ যে নিজ নিজ পেশাদারী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না ; স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় তাঁদের অংশগ্রহণ সে সম্ভাবনাকেই প্রমাণ করে। গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর পর্বে শ্রেণি সংগঠনগুলির নিজস্ব বহু সিলমোহর এবং সিলমোহরের ছাঁচ উত্তর বিহারের বৈশালীর প্রত্নক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্তত দুশো সত্তরটি সীলমোহরে 'শ্রেষ্ঠী - সার্থবাহ-কুলিক-নিগম' অথবা 'কুলিক-নিগম' অথবা শুধুমাত্র 'প্রথম কুলিক' শব্দগুলি উৎকীর্ণ আছে। অনুমান করা যেতে পারে, শ্রেষ্ঠী এবং বণিক সম্প্রদায় (সার্থবাহ) নিজ নিজ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, বিভিন্ন সংগঠনের মুখপাত্ররা সম্ভবত একটি বৃহত্তর সার্বিক সংগঠনের অন্তর্গত ছিলেন, এই বৃহত্তর সংগঠনটি 'শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ-কুলিক-নিগম' নামে সিলমোহরে উল্লিখিত। শ্রেণির বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য এবং প্রশাসনিক তাগিদে পেশাদারী শ্রেণি বা সংগঠনগুলি এই সিলমোহর ব্যবহার করত। এই সিলমোহর ব্যবহার আলোচ্য আমলের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যা শ্রেণির গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে।

কারিগরদের মতো বণিকরাও সম্ভবত পেশাদারী সংগঠন গড়ে নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে আগ্রহী ছিলেন। ৫৯২ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুষেণের তাম্রশাসনে আমরা 'বণিকগ্রাম' নামক একটি বণিক সংগঠনের উল্লেখ

পাই। এখানে 'গ্রাম' বলতে সমূহ বা সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। এই লিপিতে বর্ণিত আছে যে, রাজা বিষ্ণুষেণ গুজরাটের উপকূলের নিকটবর্তী লোহাট অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলার জন্য বণিকগ্রাম নামক বণিক সংগঠনটিকে সহায়তা করেন। তাঁর এই পৃষ্ঠপোষকতার মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে লিপি বর্ণিত আদেশনামায় যাকে বিষ্ণুষেণ 'আচারস্থিতিপত্র' নামে অভিহিত করেছেন। এই আদেশপত্রে বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানারকম সুযোগ-সুবিধা, কর মকুব প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল।

শ্রেণির সংগঠনসমূহের সগৌরব অস্তিত্ব খ্রিস্টীয় নবম শতকেও বিদ্যমান ছিল, যার অকাট্য প্রমাণ বহন করছে সমকালীন লিপিমালা। এ ব্যাপারে গোয়ালিয়রের (প্রাচীন গোপগিরি) বৈল্লভট্টস্বামীন মন্দিরে উৎকীর্ণ ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের একটি লিপি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এখানে শ্রেষ্ঠী এবং সার্থবাহদের সংগঠনের কথা আছে যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই দুই গোষ্ঠীর প্রভাব বা গুরুত্ব অব্যাহত ছিল। বস্তুত গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত দুটি লিপিতে (৮৭৫ ও ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) অন্তত কুড়ি জন তৈলিক প্রধান (তৈলিক মহত্তর) ও চৌদ্দজন মালাকার গোষ্ঠী প্রধানের উল্লেখ আছে (মালিকা মহর)। 'সমস্তকল্পপালানাম' অর্থাৎ সুরাপ্রস্তুতকারীদেরও সম্ভবত শ্রেণি সংগঠন ছিল। এমনকি পাথরকাটার পেশায় নিযুক্ত কারিগররাও (শিলাকূট) শ্রেণি ব্যবস্থার আওতায় এসে পড়ে। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, প্রাক্ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কালসীমায় একটি বৃত্তিকে ঘিরে কোনো একটি অঞ্চলে একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি সংগঠন 'শ্রেণি বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু গোপগিরিতে তৈলিক ও মালাকারদের মধ্যে বহু সংখ্যক প্রধানকে দেখা যায়। সম্ভবত একই বৃত্তির মধ্যে একটি অঞ্চলে একাধিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে তিনি বলেছেন যে, আদি মধ্যযুগের 'শ্রেণি' কোনো একটি বৃত্তিতে নিযুক্ত সকল কারিগরের একটি সংগঠন রূপে আর অস্তিত্ব রাখেনি ; এগুলি ক্রমশ এক একটি পরিবারকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে থাকে ; পরিবারগুলি হয়তো একই বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে পারে। তারই ফলে একই পেশায় অনেক সংগঠন ও একাধিক নেতার উদ্ভব দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে শ্রেণি সংগঠনের ভাঙন দেখা দিতে পারে। ভক্তপ্রসাদ মজুমদারের মতে, আদি মধ্যযুগে ভূস্বামীদের উত্থান ঘটায় শ্রমিকদের এক বড় অংশই ভূস্বামীর এলাকায় নিযুক্ত হয়। এইজন্য 'শ্রেণি'র শিল্পসংক্রান্ত কার্যকলাপ নির্বাহে প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও শ্রমে ঘাটতি পড়ে। এটিও 'শ্রেণি'র অবনতির কারণ। গুপ্ত আমলে 'শ্রেণি'গুলির ব্যাঙ্কের ভূমিকা পালনের যে নজির দেখা যায় পরবর্তী আদি মধ্যযুগে চিরকালীন ভিত্তিতে আমানত রাখার সেরূপ দৃষ্টান্ত কম। শ্রেণিগুলির জাতিতে রূপান্তর ঘটায় তাদের সামাজিক অবনতি, শ্রেণিগুলির ক্রমশ পারিবারিক সংগঠনে রূপান্তরিত হওয়া এবং শ্রেণিতে অর্থলগ্নীকরণে অনীহা এই যুগে শ্রেণির অবক্ষয়কেই সূচিত করে।

রাজস্থানের পেহোয়া নামক স্থানে খ্রিস্টীয় নবম শতকে উৎকীর্ণ একটি লেখতে ঘোটক বা ঘোড়া ব্যবসায়ীদের 'শ্রেণি' সংগঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপ একটি সংগঠন বা শ্রেণির অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে হর্ষ প্রস্তরলিপি (৯৭৩-৭৪ খৃঃ) এবং দক্ষিণ ভারতের সাতটি লেখমালায়। খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষার্ধে উৎকীর্ণ সীয়াডোনী লিপিতে পান-ব্যবসায়ী, তৈল প্রস্তুতকারক, পাথর কাটার কারিগর প্রভৃতির সংগঠন বা শ্রেণিকে দানের উল্লেখ রয়েছে। এখানে সুরা প্রস্তুতকারী শ্রেণিতে ১,৩৫০ দ্রম্য লগ্নী করার কথাও পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে চেদীরাজ লক্ষ্মণরাজের করিতলই লিপি বা গুলিক (শিকার

সংগ্রহকারী ?) শ্রেণির অস্তিত্বের কথা লিপিবদ্ধ করেছে। সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে 'শিল্পীগোষ্ঠী'র উল্লেখ আছে ; আপাততদৃষ্টিতে মনে হয় এখানে 'শিল্পীগোষ্ঠী' বলতে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলার পাথর খোদাই করার কারিগরদের গঠিত শ্রেণিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ ভারতের বহু লিপিতে শ্রেণি সংগঠনের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। এই লিপিগুলির মধ্যে যুবরাজ বিক্রমাদিত্যের লক্ষেশ্বর লিপি (৭২৫ এবং ৭৯৩ খ্রিঃ), দ্বিতীয় কৃষ্ণের মূলগোন্ড লিপি (৯০২-৩ খ্রিঃ), রাজাধিরাজদেবের তামিল লিপি, ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের লিপি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে যাদব রাজবংশের লেখমালায় 'চিত্রমেলি' বা 'চিত্রমেড়ি' নামক শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবত এটি কৃষিজীবীদের সংগঠন ছিল। উত্তর ভারতে আদি মধ্যযুগে বণিক সংগঠন বিশেষ দেখা যায় না, তবে সমকালীন দক্ষিণ ভারতে দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বণিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই দুটি সংগঠন 'মণিগ্রামম্' ও 'নানাদেশী' নামে পরিচিত। দশম থেকে দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকের লেখমালায় এই দুই সংগঠনের বারংবার উল্লেখ নিশ্চিতভাবে তাদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের প্রমাণ বহন করে।

হূণ শাসক তোরমানের রাজত্বকালে সঞ্জেলি (গুজরাট) থেকে প্রাপ্ত তিনটি তাম্রশাসনে একটি বিশিষ্ট বণিক সংগঠনের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় পশ্চিম ভারতে বণিক সংগঠনের প্রভাবশালী অস্তিত্বের এটি মূল্যবান প্রমাণ। এখানে দেখা যায়, স্থানীয় এবং বিদেশী (বৈদেশ্য) বণিকরা 'বণিক্ গ্রাম' নামক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'বণিক গ্রাম' বা 'বণিগ্গ্রাম' কথাটি, অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে, এখানে বণিকসমূহ বা বণিকগোষ্ঠী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সঞ্জলি লেখমালার তথ্যবিবরণ থেকে অনুমান করা যায়, পশ্চিম ভারতে ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে একটি বণিকগোষ্ঠী কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপেই নয়, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মেও যথেষ্ট সম্পৃক্ত ছিলেন। লিপি-বর্ণিত বণিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণের বণিকরাও ছিলেন এবং তাঁরা বণিক গোষ্ঠীর সদস্যও ছিলেন। গুপ্ত আমলে বর্ণ-জাতি ব্যবস্থার কঠোর গণ্ডি পেরিয়ে ভিন্নবৃত্তিতে যুক্ত থাকার এটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৪.৬.২ শ্রেণি-সম্ভূত জাতি : বৃত্তিগত সামাজিক অবস্থান

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কারিগরী শিল্পের উপস্থিতি আদিকাল থেকেই উত্তরোত্তর প্রসারিত হয়েছে। স্বভাবতই উদ্ভব হয়েছে অগণ্য কারিগরী বৃত্তির এবং কারিগর শ্রেণির। আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণী এবং লিপিমালার সাক্ষ্যে এ তথ্য স্পষ্টতই প্রমাণিত। কিন্তু এই কারিগরী বৃত্তিকে কোনোদিনই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত ভারতীয় সমাজ সম্মানের আসন দেয়নি, উপরন্তু কারিগর বা শারীরিক পরিশ্রমে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে অত্যন্ত হীন বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভিসন্ধি নিয়ে রচিত হয়েছে আদিমধ্যকালীন একাধিক শাস্ত্রগ্রন্থ। পূর্বভারত তথা প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক শ্রেণি ও জাতিবিন্যাসের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং বৃহদ্ধর্ম পুরাণের তথ্য থেকে। এই দুই গ্রন্থে 'অধমসংকর' বা অন্ত্যজ জাতিসমূহের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে, যাদের অবস্থান ছিল সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে। এদের মধ্যে আছে মলেগ্রাহী (ঝাড়ুদার), কুড়ব (মাঝি), তক্ষক (কাঠুরিয়া), চর্মকার (চামড়ার কারিগর), দোলাবাহী (পাল্কীবাহক) প্রভৃতি। অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যদের তালিকায় ব্রাহ্মণশাস্ত্রগুলি সবক্ষেত্রেই চণ্ডালদের অন্তর্গত করেছে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণেও একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এখানে অন্ত্যজদের তালিকায় রয়েছেন চর্মকার ছাড়াও ব্যাধ, রজক, কুম্ভকার, লোহাকার, সুবর্ণকার এবং তন্তুবায়। জৈনগ্রন্থের উপরও ব্রাহ্মণ্য সমাজ—আদর্শের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করে অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। জৈন সাহিত্য জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তিতে কারিগরদের বিভাজিত করা হয়েছে নরুয়া (স্পৃশ্য) এবং করুয়া (অস্পৃশ্য) এই দুই গোষ্ঠীতে। এখানে কুম্ভকার, সুবর্ণকার, সূপকার, কসবগ (নাপিত) এই সকল বৃত্তিজীবীকে নরুয়া বা স্পৃশ্য জাতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী কারণ সামাজিক দৈনন্দিনতায় এঁদের প্রয়োজন অপরিহার্য। পক্ষান্তরে চন্ময়রু বা চর্মকার, যন্তপিলগ (তেলিক), ঘাণ্টিয় বা অশ্বশকটচালক, ছিম্পায় (রংরেজ), কংসার (কাঁসারি), সীবগ (সীবনশিল্পী), ধীবর (জেলে) প্রভৃতিরা 'করুয়া' বা অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের প্রথমদিকে রচিত অলবিরুণীর বিবরণে উপরিউক্ত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায় রজক, চর্মকার, ঝুড়ি তৈরির কারিগর, নাবিক, মাঝিমাল্লা, ধীবর, ব্যাধ, তাঁতি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী অস্পৃশ্য হিসেবেই সমাজে নিম্নস্তরে ঠাঁই পেয়েছিলেন। সুতরাং এ কথা অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, আদি মধ্যকালে শ্রমজীবী এবং কারিগর শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, কারিগরী শিল্পের মানোন্নয়ন হলেও সমাজে এই সকল বৃত্তিজীবীর স্থান সম্মানজনক ছিল না—ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় এঁরা অবদমিত এবং অনাদৃত ছিলেন, যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত অশুভ সংকেত বয়ে এনেছিল।

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.	রমেশচন্দ্র মজুমদার	কর্পোরেট লাইফ্ ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া, কলিকাতা ১৯৬৯।
২.	রণবীর চক্রবর্তী	প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলকাতা, ১৪০৯।
৩.	পি. ভি. কানে	হিস্ট্রী অফ্ দ্য ধর্মশাস্ত্রজ, ১৯৩০-৪৬।
৪.	লালনজী গোপাল	দ্য ইকনমিক লাইফ অভ্ নর্দান ইন্ডিয়া, বারাণসী, ১৯৬৫।
৫.	ভকতপ্রসাদ মজুমদার	সোশিও-ইকনমিক লাইফ্ ইন-এনশেন্ট ইন্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৬০।

৪.৮ অনুশীলনী

১. জাতি ও শ্রেণির উন্মেষের প্রাথমিক পর্যায়টি বর্ণনা করুন।

২. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ভারতবর্ষের বৃত্তিজীবী শ্রেণিগুলির ক্রমবিকাশ কীভাবে ঘটে?

৩. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শ্রেণি বা গিল্ডের সম্পর্কে কী কী তথ্য পাওয়া যায়?

৪. খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ধর্মশাস্ত্র সমূহে 'শ্রেণি'র যে অনুশাসন লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আলোচনা করুন।

৫. 'শ্রেণি'র পরিচালন ব্যবস্থা ও আইন বিধি সম্পর্কে কী জানেন?

৬. শ্রেণি ও জাতি সম্পর্কে লিপিমালার তথ্যবিবরণ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

অষ্টম (খ) পত্র

পর্যায়—৪

একক ১ ❑ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনীতি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ সূচনা

১.৩ বিজয়নগরের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি

১.৪ বিজয়নগরের কৃষিব্যবস্থা

১.৫ বিজয়নগরের করব্যবস্থা

১.৬ নায়ঙ্কারা (নায়ক) প্রথা

১.৭ বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগরের অর্থনীতি

১.৮ সংক্ষিপ্তসার

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল বিজয়নগরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা। বিজয়নগরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পশ্চাতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, নায়ক প্রথার বৈশিষ্ট্যসমূহ, কৃষিব্যবস্থার সংগঠন ইত্যাদি বিষয়গুলি অলোচিত হবে। বিজয়নগর রাজ্যে আগত বিদেশী পর্যটকগণ সেখানকার অর্থনীতি ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে যেসকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলিও আলোচিত হবে। এর মাধ্যমে একথা বোঝা যাবে, যে বিজয়নগরের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রেক্ষাপট কি ছিল এবং এই সমৃদ্ধির স্বরূপ কি ছিল।

১.২ সূচনা

দিল্লী সুলতানীর ভাঙনের কালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্য অন্যতম। প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিজয়নগরের অবদান ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। বিজয়নগরের অর্থব্যবস্থার ভিত্তি ও প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। সামন্ততান্ত্রিকতার আভাস থাকলেও বিজয়নগরকে সামন্তরাষ্ট্র বলা যায় কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে।

১.৩ বিজয়নগরের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি

দিল্লী সুলতানী যখন মধ্যগগনে সেই সময়ে দক্ষিণভারতে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান হয় যা দীর্ঘ দু'শো বছর ধরে, নানা বিঘ্ন বিপর্যয় অতিক্রম করে টিকে ছিল। ১৩৩৬ খ্রীঃ সঙ্গম বংশের প্রথম হরিহর তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁর স্বাধীন রাজ্য বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একাদিক্রমে সঙ্গম, সুলুভ, তুলুভ এবং আড়বিবু বংশের অধীনে ১৫৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বিজয়নগর মোটামুটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সীমানা ঘেঁষে জন্ম নিয়েছিল আরেকটি স্বাধীন রাজ্য বাহমনী। এই রাজ্যটি ছিল মুসলমান। ফলতঃ দুই ভিন্ন ধর্মী প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছিল। এই তীব্র বিরোধের মধ্যেও বিজয়নগর চমকপ্রদভাবে গড়ে উঠেছিল। বহুবার শত্রুর দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পদের ঘাটতি ছিল না এবং যত বিদেশী পর্যটক বিজয়নগরে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সেই সম্পদের কথা লিখেছেন।

বিজয়নগর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক কে, এ, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এই রাজ্যকে ভারতের ইতিহাসে একমাত্র সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই অবস্থা অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়নি। ত্রয়োদশ শতকে চোল রাজ্যের পতন এবং কাবেরী নদী উপত্যকায় হয়সলদের উত্থান ঐ অঞ্চলে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর ফলে তামিল অঞ্চলের অধিকারের প্রশ্নে কন্নড়ভাষী হয়সলদের সঙ্গে তামিল ভাষী পাণ্ড্যদের এক দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। একদিকে উন্নতমানের কৃষি ও অন্যদিকে বাণিজ্য-দুটোই লোভনীয় ছিল এবং এসবের ফলেই সংঘর্ষ দীর্ঘকালীন রূপ লাভ করে।

চোল রাজারা নানা আভ্যন্তরীণ সংকটে নিমজ্জিত ছিলেন। কাবেরী উপত্যকার বাইরে 'পেরিয়ানাট্টার'গুলি (স্বত্বাধিকারী কৃষকদের সংগঠন 'নাট্যার'গুলির যৌথরূপ) ক্রমবর্ধমান হারে শক্তিশালী হতে থাকায় কেন্দ্রীয় শক্তির প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। এমনকি ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চোলদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে তারা একাধিকবার নাক গলাতেও ছাড়েনি। ফলতঃ কাবেরী উপত্যকায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসন চোলরাজারা বজায় রাখতে পারেননি। বলা চলে যে এই পরিস্থিতির ফলেই বিজয়নগরের উত্থান সম্ভব হয়েছিল। চতুর্দশ শতকে তামিল রাজ্যগুলি আর আগের মত শক্তিশালী ও বৃহৎ থাকতে পারেনি। একাধিক ছোট রাজ্য চোল ও পাণ্ড্য রাজত্বের উত্তরাধিকারস্বরূপ জন্মলাভ করে।

এইরকম পরিবেশে বিজয়নগর এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। তাদের প্রশাসন একই সঙ্গে সমরবিভাগ ও রাজস্ববিভাগকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই কেন্দ্রিকতার প্রবণতা দৃঢ়মূল হতে পেরেছিল। ডঃ ইরফান হাবিব মনে করেন যে, এই দুই ক্ষেত্রেই বিজয়নগর দিল্লী সুলতানীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে তেলেগুভাষী অঞ্চলে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চল বিজয়নগরের রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেখান থেকেই বিজনয়গর দিল্লী সুলতানীর বহু প্রশাসনিক বিধিনিয়ম অনুকরণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

একই সময়ে কৃষ্ণা নদীর উত্তরে মুসলমান রাজ্যের উপস্থিতিও বিজয়নগরের কাজ অনেক সহজ করে দেয়। বাহমনী রাজ্যের উত্থানের ফলে দক্ষিণের হিন্দু রাজ্যগুলি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক কারণে তারা বিজয়নগরের দিকে তাকায়। তাই বিজয়নগরের বিস্তারের ফলে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইসব হিন্দুরাজ্য যেমন, কর্ণাটকের হয়সল রাজ্য, অন্ধ্রের রেড্ডিরাজ্য। বিজয়নগরের বৃদ্ধির কালে এই অঞ্চল থেকেই যুদ্ধের সেনাদের সংগ্রহ করা হত এবং বিজয়নগরের পক্ষে সুদূর দক্ষিণে তামিল এলাকায় এই সেনারা শোষণ চালাত। ডঃ বার্টন স্টেইন বিজনগরের অর্থব্যবস্থায় এই অঞ্চলের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাথমিকভাবে ভাষাগত ও জাতিগত কারণের ফলে এই শোষণ সম্ভব হয়েছিল। কন্নড় ও তেলেগু ভাষীরা বিজয়নগরের প্রতিনিধিস্বরূপ গিয়েছিল তামিলভাষী এলাকায়, দ্বিতীয়তঃ, ছোট ছোট তামিল রাজ্যকে শোষণ করাও সুবিধাজনক হয়েছিল।

১.৪ বিজয়নগরের কৃষিব্যবস্থা

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখেছেন যে বিজয়নগরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বসবাস করতো এবং তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি উৎপাদন। জমির মালিকরা সকল বৃত্তির মানুষের কাছেই সামাজিক মর্যাদার দ্যোতক হিসাবে বিবেচিত হত। এইভাবে গ্রামগুলি কৃষক ও ভূস্বামিদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। অতীতকাল থেকেই এখানে কৃষিযোগ্য জমি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সময়ভিত্তিক বণ্টন করা হত। ছোট বড় ভূস্বামী ছাড়াও ছিল অসংখ্য ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। এই 'কৃষক-সর্বহারা' (agrarian-proletariat) শ্রেণি ছিল কৃষি উৎপাদনের প্রধান শক্তি। তবে এদের অধিকাংশের অবস্থা ছিল ভূমিদাসদের সমতূল্য। সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন এই শ্রেণির মানুষ নিজেদের অবস্থার রূপান্তর ঘটানোর কোনও ক্ষমতাই ধরতো না। কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র কারিগরদের গ্রামে আটকে রাখার জন্য কিছু কিছু জমি চাষের অধিকার দেওয়া হত। নিম্নবর্গের গৃহভৃত্যদের কাজের বিনিময়েও কিছু জমি বরাদ্দ করা হত।

দৈনিক কৃষি মজুরদের সাধারণত উৎপন্ন শস্যে মজুরী দেওয়া হত। বর্গা চাষ বিজয়নগরে জনপ্রিয় ছিল। বিশেষতঃ, মঠ ও মন্দিরের জমিগুলি বর্গা বা ভাগচাষীদের মধ্যে বণ্টন করে চাষাবাদ করা হত। ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরণের বর্গাচাষে কৃষক বা বর্গাদার জমির আংশিক মালিকানার অধিকারী হয়ে যেতেন।

খাদ্যশস্য ও ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিজয়নগরে ফুল, ফল ও অন্যান্য কাঁচা আনাজের চাষ জনপ্রিয় ছিল। কালক্রমে বিভিন্ন অর্থকরী বাণিজ্যিক পণ্য যেমন তুলা, আখ ইত্যাদি চাষের দিকেও বিজয়নগরের কৃষকরা নজর দেয়। বড় বড় বাগিচাগুলিতে পান, সুপারি, আদা, হলুদ ও নানারকম ফল, ফুল চাষ হত। পর্যটক আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরের গোলাপ ব্যবসায়ীদের সংখ্যাধিক্যের কারণ প্রসঙ্গো বলেছেন যে বিজয়নগরে খাদ্যের মতই জনজীবনে গোলাপের ব্যবহার গুরুত্ব পেত।

বিজয়নগরে জলসেচের ব্যবস্থার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। এজন্য নদী ও খালের উপর বাঁধ দিয়ে কৃষি জমিতে জলের যোগান দেওয়া হত। যেসব এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জল যোগানের সুযোগ ছিল না, সেখানে জলাশয় খনন করে জমিতে জলসেচ দেওয়া হত। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

এই সকল জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ নজর রাখতেন। অনাবাদী জমিকে কৃষিজমিতে উন্নীত করার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হত। এই সকল ক্ষেত্রে উদ্যোগী কৃষকদের করভার লাঘব করে কিংবা বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করে উৎসাহিত করা হত।

সাধারণভাবে কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করত। তবে এজন্য কৃষকদের অধীন জমির বন্দোবস্তের শর্তাদি ও রাজস্ব আদায়কারী সংগঠনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জমিতে চাষরত কৃষকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। ভূস্বামী হিসাবে মঠ বা মন্দির কর্তৃপক্ষ অনেক বেশী সহনশীল ও উদার ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা অভিজাতদের মালিকানাধীন জমির কৃষকদের উপর করের বোঝা ছিল সাধারণভাবে নিপীড়নমুলক। নায়ঙ্কর ব্যবস্থা জোরালো হলে কৃষকরা নায়কদের নির্ধারিত মূল্যে নগদ অর্থে শস্য কিনতে বাধ্য হত। এতে কৃষকদের অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে।

কৃষিকাজের পাশাপাশি গো-পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন বিজয়নগর রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কৃষি জমির বাইরে গো-চারণ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা থাকত। মন্দির কর্তৃপক্ষের অধীনে বহু গবাদি পশু থাকত। বিভিন্ন মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের জন্য জ্বালানী হিসাবে ঘি ব্যবহার করা হত। এছাড়া অভিজাত শ্রেণির খাদ্য তালিকায় গব্যঘৃত ছিল অতি আবশ্যিক একটি পদ। স্বভাবতই গো-পালন বিজয়নগর রাজ্যে একটি প্রয়োজনীয় ও লাভজনক বৃত্তি হিসাবে গণ্য হত।

১.৫ বিজয়নগরের কর ব্যবস্থা

বিজয়নগরের কর ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল ভূমি-রাজস্ব। এছাড়াও প্রজাদের কাছ থেকে সম্পদ কর, বিক্রয় কর, যুদ্ধ কর, বিবাহ কর, বেগার শ্রম ইত্যাদি আদায় করা হত।

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সরকার একাধিক বিষয় বিবেচনা করত। উক্ত জমি দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা কিনা, এছাড়া জমির পরিমাণ, উৎপাদিকা শক্তি, জমির চরিত্র অর্থাৎ সেচ বা অ-সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করা হত। জমির উর্বরতার ভিত্তিতে একই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের নির্ধারিত হত। মোটামুটিভাবে পরিস্কার যে, মোট উৎপাদনের উপর রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। ইংরাজ পর্যটক হ্যামিলটনের বিবরণ (১৯ শতক) থেকে জানা যায় যে, রাজা কৃষ্ণদেব রায় জমি জরিপ

করে রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। সম্ভবত, জলাজমি ও শুকনো জমি তিনি পৃথক পৃথক ভাবে জরিপের ব্যবস্থা করেন। সমকালীন শিলালেখ থেকে জমি জরিপের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাপ ব্যবহারের কথা জানা যায়। আবার একই এলাকায় দুধরণের মাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। সরকার অবশ্য একই ধরণের মাপ ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিল। 'বৃধচলম'-এর একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে একইরকম মাপ চালু না থাকার ফলে কৃষকেরা ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করত। এতে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সাধারণভাবে সরকার উৎপাদনের ১/৬ অংশ কর হিসাবে নিত। ব্রহ্মদেয় জমিতে কুড়িভাগের একভাগ এবং মন্দিরের জমিতে তিনভাগের একভাগ রাজস্ব আদায়ের রীতি ছিল। হরিহরের আমলে শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকায় খাজনা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়। জমির উর্বরতা, বীজের ব্যবহার ও শস্যের গড় মূল্যের ভিত্তিতে শস্যকে টাকায় রূপান্তরিত করা হত। পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সহ অনেকেই মনে করেন যে, বিজয়নগরের করের হার ছিল যথেষ্ট উঁচু। বিদেশী পর্যটকরা বিজয়নগরের শাসকদের অতুল সম্পদ ও বিলাস বৈভবের যে বিবরণ দিয়েছেন তার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে প্রজাদের উপর যথেচ্ছ কর আদায় করা হত।

ভূমিরাজস্ব ছাড়াও বিজয়নগর রাজ্যে বৃত্তি কর, সামাজিক কর, ইত্যাদি আদায় করা হত। গ্রামের মোড়ল, মেষপালক, ছুতোর, ধোপা, নাপিত, কুমোর, স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য কর দিতে হত। সদাশিব রাও-এর আমলে নাপিতদের কর প্রদান থেকে রেহাই দেওয়া হয়। পেশাভিত্তিক কর বছরে একবার দিতে হত। কুটির শিল্পের কারিগরদের কর দিত হত। তাঁত, ঘানি, হীরকশিল্প, রেশমজরি, লৌহ-চুল্লি ইত্যাদি শিল্পে কর আরোপ করা হত। তবে এক্ষেত্রে করের পরিমাণ, কর নির্ধারণের ভিত্তি কি ছিল তা স্পষ্ট নয়। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যও কর আদায় করা হত। রাজার পুত্র সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে সামন্ত ও স্থানীয় নেতারা রাজাকে বিশেষ কর দিতেন। বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য প্রাদেশিক কর্তা বা গ্রাম-প্রধান একধরনের কর আদায় করতেন। এই করের একাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল। গ্রামের মন্দিরে অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য 'পিদারিভারী' নামক কর সংগ্রহ করা হত। নীচু জাতের লোকেদের ধর্মীয় কাজকর্ম করার জন্য গ্রাম-প্রধানরা অধস্তন কর্মী নিয়োগ করতেন। এদের বলা হত 'দাসারী'। অনুষ্ঠান শুরুর আগে নিচু জাতের লোকেরা 'দাসরী'দের একটা প্রাপ্য দিতে বাধ্য থাকত। এই অর্থের একটা অংশ রাজাকে দেওয়া হত। এই প্রথাকে বলা হত 'সমাচার'। সরকারি উচ্চ আমলা গ্রাম পরিদর্শনে এলে তাদের কিছু উপঢৌকন দিয়ে বরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

মধ্যযুগের ভারতে বেগার শ্রম একটি বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল। বিজয়নগরেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। এই বিনা পরিশ্রমিকের বাধ্যতামূলক শ্রমকে বলা হত 'উলিয়াম'। রাস্তা নির্মাণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ, জলসেচের খাল খনন, মন্দিরের পাঁচিল নির্মাণ ইত্যাদি কাজ বেগার শ্রম হিসাবেই গণ্য হত। দূর্গ নির্মাণ বা সংস্কারের জন্যও স্থানীয় মানুষ বিনা মজুরীতে শ্রম দিতে বাধ্য হত। তবে এক্ষেত্রে বেগার শ্রম দিতে অপারগ হলে পরিবর্তে 'কৌট্টাজ' নামক কর দিয়ে রেহাই পাওয়া যেত।

বিজয়নগরের রাজস্ব দপ্তরের নাম ছিল 'অথবান'। রাজস্ব-বিষয়ক কেন্দ্রীয় কর্মী এটির তত্ত্বাবধান করতেন। রাজস্ব প্রধানকে সহযোগিতা করতেন প্রদেশ ও জেলাস্তরের আমলাবৃন্দ। কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগকে একজন করে দায়িত্বশীল আমলার তত্ত্বাবধানে রাখা হত। কর সংগ্রহের জন্য বিজয়নগরে চারটি প্রথার প্রচলন ছিল। একটি প্রথানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত কর্মচারী সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেন। দ্বিতীয় প্রথায় সরকার কর আদায়ের দায়িত্ব ইজারা হিসাবে কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করত। তৃতীয় প্রথা অনুযায়ী সরকার গ্রামের কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর সাথে ঐ এলাকার কর আদায়ের জন্য চুক্তিবধ্ব হত। চতুর্থ এবং শেষ প্রথাটি হল 'নায়ক' নামক এক বিশেষ ধরণের ভূস্বামীর হাতে সরকার সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইজারা দিয়ে নির্দিষ্ট সামরিক সাহায্য ও নির্দিষ্ট অংকের টাকা কর হিসাবে গ্রহণ করত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির সময় বিজয়নগর রাজ্যে কৃষককে কর ছাড় দেওয়া হত। এই কর ছাড়ের ক্ষমতা ছিল একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ রাজার। 'ভালুড়ুর লেখ' (১৪০২-০৩ খ্রীঃ) এবং 'আদুতুরাই' লেখ (১৪৫০ খ্রীঃ) থেকে কর ছাড় দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১.৬ নায়ঙ্কারা (নায়ক) প্রথা

বিজয়নগর রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থা ও ভূমিদান রীতির সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল 'নায়ক' বা 'নায়ঙ্কারা' প্রথা। সংস্কৃত সাহিত্যে 'নায়ক' অর্থে নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। কিন্তু বিজয়নগরের 'নায়ক' প্রথা কিছুটা স্বতন্ত্র। নায়কদের অধিকার, কর্তব্য ও নায়কপ্রথার প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে, বিজয়নগরের নায়করা স্থানীয় নেতৃবর্গের থেকে স্বাধীন। ফলে নতুন নতুন মানুষ সহজেই এই রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারত। বিজয়নগরের বিভিন্ন শিলালেখতে 'অমরয়ঙ্কর' শব্দটি পাওয়া যায়। এখানে 'অমর' অর্থে

সৈন্যাধ্যক্ষ, 'নায়ক' অর্থে নেতা এবং 'কর' বলতে সরকারি কাজকে বোঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নায়ঙ্কার প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করা যায়।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ১৯৪৬ সালে লিখেছিলেন যে, ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত নায়করা বিজয়নগর রাজার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন পরে তাঁরা আধা-স্বাধীন হয়ে যান। ১৯৫৫ সালে তিনি বলেন যে, নায়করা মূলত ছিলেন সামন্ত এবং তাঁরা রাজাকে সামরিক সাহায্য দানের শর্তে ভূমির অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পণ্ডিত শাস্ত্রী তাঁর পূর্ব অভিমত থেকে সরে আসেন এবং বলেন যে, বিজয়নগর একটি 'যোদ্ধারাজ্য' বা War state এবং এই সাম্রাজ্যের গঠন তার সামরিক প্রয়োজনই গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিল অসংখ্য সামরিক নেতার মিলিত প্রয়াসের ফল। টি.ভি. মহালিঙ্গাম-এর বক্তব্যেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, বিজয়নগরের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল 'নায়ঙ্কারা' ব্যবস্থা। এই প্রথানুযায়ী রাজা নায়কদের হাতে ভূমি-রাজস্বের অধিকার অর্পণ করতেন। নায়করা একাধারে ছিলেন সামরিক নেতা ও স্থানীয় প্রশাসক। এছাড়া তাঁরা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আদায়ীকৃত রাজস্বের একাংশও কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। তামিল দেশে পনেরো শতকের শেষভাগে ও ষোড়শ শতকের গোড়ায় নায়ঙ্কারা প্রথার ব্যাপকতা দেখা যায়। তামিল এলাকার অধিকাংশ নায়ক ছিলেন বাহিরাগত তেলেগু যোদ্ধা। এই যোদ্ধারা এবং তাদের কৃষকরা তামিল সমভূমি অঞ্চলের সমৃদ্ধ অবস্থা দেখে আকৃষ্ট হয়। তামিল কৃষকরা এই এলাকাকে উর্বর করে তুলেছিল। তেলেগু যোদ্ধারা এইসব এলাকা দখল করলেও সমভূমির উত্তর দিকের তামিল নেতাদের উৎখাত করেনি এবং বহুক্ষেত্রে তাদের জমির উপর অধিকারও মেনে নিয়েছিল।

সমকালীন স্থানীয় লেখমালা এবং বিদেশী এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে বিজয়নগরে দুর্গ ও দুর্গাধিপতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। সমকালীন তেলেগু কবিতায় দেখানো হয়েছে যে, বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায় ও দুর্গ, ব্রাহ্মণ সামরিক নেতা ও বিচ্ছিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন। চোলদের আমলে প্রচলিত ব্যবস্থারই সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত প্রথা হিসাবে সামরিক নেতৃত্বের কাজে ব্রাহ্মণদের উত্থান ঘটে। চোলযুগে নাত্তারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। বিজয়নগরের আমলে ব্রাহ্মণরা সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা করেন। এঁদের সরাসরি দুর্গের অধ্যক্ষ নিয়োগ করে সামরিক নেতৃত্বের অংশীদারে পরিণত করা হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র অঞ্চল থেকেও বহু ব্রাহ্মণ এসে সামরিক নেতৃত্বের কাজে লিপ্ত হন।

ডঃ স্টেইনের মতে বিজয়নগরের অধীনস্থ এক সামন্তের সঙ্গে পরবর্তীকালে মুঘল জমিদারের চরিত্রগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই উর্ধতন শাসক গ্রামীণ উৎপাদনের উদ্বৃত্ত আদায় করে নিত। বিজয়নগরের সামরিক ভিত্তির ফলে নিয়মিত উদ্বৃত্ত যোগান দেওয়া ছিল প্রধান কাজ এবং এই ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সাধারণ কৃষকদের এক নিয়মিত যোগাযোগ বজায় ছিল।

বিজয়নগরের এই রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা সে দেশের কৃষি সম্পর্কের উপরেও প্রভাব ফেলে। প্রধানত, জমির উপর নিয়ন্ত্রণের চরিত্র থেকেই সাধারণ কৃষক, রাজা ও সামরিক নায়কদের ক্ষমতার ভিত্তি ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কর্তৃত্বের সম্পর্ক বিকশিত হয়। ঐতিহাসিক বেঙ্কটরামনাইয়া প্রমুখ কেউ কেউ মনে করেন যে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তাঁরা পূর্ব মারিয়াদে বা প্রাচীন রীতি অনুসরণ করার বিষয়টি উল্লেখ করেন। মুসলমান অগ্রগতির মুখে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন রীতিনীতিকে কঠোরভাবে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা ছিল বলে এরা মনে করেন। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এই আদর্শবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও বিজয়নগরের আমলে পরিবর্তনের দিকটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, চোল আমলে জনপ্রিয় 'সভা', 'উর' বা 'নাড়ু' ইত্যাদির অস্তিত্ব বিজয়নগরের আমলে শিথিল হতে থাকে এবং কালক্রমে প্রায় বিলোপ ঘটে। পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামীর মতে, বিজয়নগর রাষ্ট্রের সামরিক সংস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক পাদ্ধতি থেকে উদ্ভূত অবহেলার ফলে পূর্বেকার স্থানীয় সংগঠনগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এই পুরানো প্রথাগুলির স্থান নিয়েছিল 'নায়ঙ্কারা' ও 'আয়গার' প্রথা, তাঁর মতে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে আসার পর তামিল দেশে 'আয়গার' প্রথার আবির্ভাব ঘটে। এই প্রথার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মচারীদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের মতে 'নাত্তার' নামক গ্রামীণ কর্মচারী পদের বিলোপ এবং 'নায়ক' পদের উত্থান একান্তই স্থানীয় পরিবর্তন হিসাবে আবির্ভূত হয়। এই নতুন নেতা হিসাবে সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তির উত্থানও ঘটে। এইভাবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আমলে প্রচলিত দক্ষিণ ভারতীয় রীতি এবং গোষ্ঠী, নেতা ও গ্রামের সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এর পরিণামে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

নায়ঙ্কারা প্রথার উদ্ভবের সাথে সাথে বিজয়নগর রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক চরিত্র এবং সামন্ততন্ত্রের সাথে এই প্রথার সামঞ্জস্যের বিষয়টি ঐতিহাসিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এসেছে। অধ্যাপক রায়-এর

মতে বিজয়নগরের 'নায়ক' প্রথাকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা সঠিক নয়। কেবল সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে জমি ভোগ করার অধিকার থাকলে নায়ঙ্কারা প্রথাকে সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথার কাছাকাছি বলা যেত। কিন্তু বিজয়নগরের 'নায়ক' এমন একজন যোদ্ধা যে রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থার অঙ্গা এবং যে সবসময় তার নিজের অধিকার একজন জমিদার স্থানীয়। পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীও মনে করেন যে নায়ক ব্যবস্থা তথাকথিত সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমতুল্য ছিল না ; পরন্তু বিজয়নগর রাজ্য ছিল আমলাতান্ত্রিক এবং বহুলাংশে কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা সম্পন্ন। পর্যটক নুনিজ প্রায় ২০০ জন নায়কের সন্ধান পেয়েছেন এবং তিনি এমন কোন ইঙ্গিত দেননি যে বিজয়নগর বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল।

বার্টন স্টেইন 'Cambridge Economic History of India' গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছেন মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতি অনুসারে বিজয়নগর রাজ্যও ছিল একাধিক অংশের সমন্বয় বা Segmentary State। বিজয়নগরকে একটি বৃহত্তর এলাকা বা Macro-region হিসাবে চিহ্নিত করলেও, বিজয়নগরের রাজা কার্যত একটি ছোট্ট এলাকা বা micro-region'-কে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের আঞ্চলিক শাসকরা (নায়ক) রাজার প্রতি আনুগত্য দেখালেও প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করতেন। এই খণ্ডিত অংশগুলি সম্মিলিতভাবে বিজয়নগরের সামগ্রিক রাজ্য সৃষ্টি করেছিল।

তেলেগু ও কন্নড়ভাষীরা যে বিজিত এলাকাগুলিতে গিয়ে পূর্বতন অধিবাসীদের উৎখাত করেছিল, সে তথ্য পাওয়া যায় না। তারা সাধারণভাবে 'আয়গার' ব্যবস্থার মাধ্যমে বিজিতদের শ্রমকে কাজে লাগায় এবং যাবতীয় উদ্বৃত্ত কেন্দ্রে পাঠায়। এইসব অঞ্চলে নতুন নতুন বসতি গড়ে ওঠে এবং হাট-বাজার স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল মন্দির। নায়করা একই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন এবং অধিবাসীদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে মন্দিরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। মন্দিরের ভাণ্ডার থেকে শুরু করে পুরোহিত ও ভক্তমণ্ডলীর উপর তাদের প্রভাব দৃঢ় হয়। এমনকি, মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রামগুলিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থাও তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ নোবুই কারাশিমা বলেছেন যে সবকিছুই করা হচ্ছিল অধিক পরিমাণে রাজস্ব, মন্দিরের প্রণামী ও অন্যান্য সব উদ্বৃত্ত কেন্দ্রে পাঠানোর উদ্দেশ্যে এবং নায়কদের পেট ভরানোর

কাজে। এভাবে গড়ে ওঠা গ্রামগুলির শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। যেমন, (১) 'ভাণ্ডারবড়া' অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল যেগুলি স্থানীয় কেল্লার রসদ যোগাত ; (২) নিষ্কর 'মান্য' গ্রাম যেগুলি দেবস্থান ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির রসদ যোগাত, (৩) 'অন্যরম' এলাকা, যেগুলি নায়কদের হাতে ছিল।

এভাবেই জমির স্বত্ব হস্তান্তরিত না করে জমির উৎপাদনের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়েছিল। মোটামুটি একই কাঠামো মুঘল রাজত্বে ভারতে দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে গ্রামীণ উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর বিভাজন ঘটিয়ে শাসকশ্রেণির জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা স্থায়ী করা হয়েছিল।

অবশ্য উদ্বৃত্ত বণ্টনের কাঠামো সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ডঃ এ. কৃষ্ণস্বামী মান্যকে গ্রামীণ আয়গার শ্রেণির ভরণ-পোষণের একক হিসাবে গণ্য করেছেন। আয়গার বলতে প্রশাসনিক কর্মচারীকেই আর বোঝাল না। ধীরে ধীরে এই শ্রেণির মধ্যে এমন কিছু শ্রমজীবীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা পরোক্ষ কৃষিকাজের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। যেমন কামার, সেচের জল যোগানের শ্রমিক, সেচের ভিত্তি নির্মাতা ইত্যাদি। একইভাবে বহু শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মগুরুকেও মান্য বণ্টন করা হয়েছিল যারা ব্রাহ্মণ ছিল না। ডঃ স্টেইনের হিসাব অনুসারে ১৪৫০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে মন্দির নির্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ ছিল নির্বিচারে মান্য বণ্টন। বলাই বাহুল্য মন্দির ও ব্রাহ্মণকে বিজয়নগর নিজের সাম্রাজ্যের স্বার্থে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিল। এইভাবে ভূমি বণ্টনের ফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি পরগাছা শ্রেণির পালনও সম্ভব হয়েছিল। আবার যথেচ্ছ মন্দির নির্মাণের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির পালনও সম্ভব হয়।

ডঃ বার্টন স্টেইনের মতে নায়কদের হাতে জমির কেন্দ্রীকরণ ঘটলেও, বিজয়নগরের ব্যবস্থাকে, ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সমতুল্য বলা চলে না। বিজয়নগরের পঁচাত্তর শতাংশ জমি বিভিন্ন নায়কদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই ব্যবস্থা জাপানের সামন্ততন্ত্রের কিছুটা কাছাকাছি। তবে এক্ষেত্রেও স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষণীয়। নায়কদের মতই জাপানের সামন্তরা (দাইমিও) সামরিক নেতা ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের উপরে ও নীচে অনেকগুলি আর্থ-সামাজিক স্তর বিন্যাস ছিল। অন্যদিকে বিজয়নগরের নায়করা প্রত্যক্ষভাবে জমি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এখানে কোন স্বীকৃত মধ্যবর্তীর অস্তিত্ব ছিল না। এই বিচারে বিজয়নগরকে একটি 'যুদ্ধরাষ্ট্র' বলা যায়, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়।

১.৭ বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগরের অর্থনীতি

বিদেশী পর্যকদের বিবরণী থেকে বিজয়নগরের ঐশ্বর্য, চাকচিক্য এবং জনসাধারণের আর্থিক প্রাচুর্যের আভাস পাওয়া যায়। এঁদের বর্ণনায় বিজয়নগর ছিল সমকালীন বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী রাজ্য। বিজয়নগরের বর্ণনা প্রসঙ্গো নিকলো কন্টি বলেছেন ঃ "শহরের পরিধি ছিল ৬০ মাইল ; এর দেওয়ালগুলি দূরের পাহাড়ঘেরা উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শহরে প্রায় ৯০ হাজার অস্ত্রধারণে সক্ষম পুরুষ বাস করত। ভারতের যেকোন রাজার থেকে এখানকার রাজা ছিলেন অধিক শক্তিশালী। পারসিক দূত আবদুর রজ্জাক লিখেছেন ঃ "দেশটি এতই জনবহুল যে, তার প্রকৃত চিত্র লিখে বোঝানো কষ্টকর। রাজার কোষাগারে একাধিক প্রকোষ্ঠ আছে, যার প্রতিটি তরল সোনায় পরিপূর্ণ। রাজ্যের সমস্ত উচ্চ-নীচ, এমনকি বাজারের কারিগররাও, দেহের নানা অঙ্গো অলংকারাদি পরিধান করে।" পর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনিগো পায়েজ বিজয়নগরকে বিশ্বের সেরা শহর হিসাবে চিহ্নিত করে এখানকার সমৃদ্ধ বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "এখানকার উন্নত বহির্বাণিজ্যের কারণে বিশ্বের নানা দেশের লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। বাজারগুলিতে নানা ধরনের সামগ্রী, ধান, চাল, ডাল, গম, বার্লি প্রভৃতি মজুত থাকত। খাদ্যদ্রব্যের দাম খুবই সস্তা।" পায়েজ বিজয়নগরের রাজার অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও হাতি, ঘোড়া সহ বিশাল সেনাবাহিনীর কথাও উল্লেখ করেছেন। এডোয়ার্ডো বারবোসা ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন। তিনিও বিজয়নগর রাজ্যের আর্থিক প্রাচুর্য ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "নগরটি ছিল সুবিস্তৃত, জনবহুল এবং বাণিজ্যে অগ্রণী। পেগুর সাথে হীরা, রুবি, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে সিল্ক এবং মালাবারের সাথে চন্দনকাঠ, কর্পূর ও নানা ধরনের মসলার বাণিজ্য চলত।"

বিদেশী পর্যটকদের প্রায় সকলেই একমত যে, বিজয়নগর রাজ্যের লক্ষণীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। সমস্ত মানুষের আয়ব্যয় হয়তো সমান ছিল না ; উচ্চবিত্তের পাশে নিম্নবিত্তের মানুষ অনেক ছিল ; কিন্তু সাধারণভাবে যাকে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বলে, তা বিজয়নগরের কোন মানুষকেই ভোগ করতে হত না। দেশের এই সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি। কৃষিক্ষেত্রে বিজয়নগর ছিল খুবই উন্নত। পায়েজ লিখেছেন ঃ "এদেশে প্রচুর ধান ও অন্যান্য শস্য, শিম-জাতীয় ফসল এবং আমাদের দেশে হয় না এমন সব শস্য উৎপন্ন হয় ; কার্পাসের প্রচুর চাষ হয়। এদেশে অসংখ্য গ্রাম, শহর ও বড় বড় নগর আছে। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে রাজাদের সজাগ দৃষ্টি আছে। বেশি সংখ্যক জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য এবং অনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য সরকার

তরফে নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সরকারি আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। সাধারণভাবে উৎপন্ন ফসলের একষষ্ঠাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। তবে দেশের প্রয়োজনে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করা হত। অবশ্য শস্যভেদে, মৃত্তিকাভেদে এবং সেচভুক্ত ও অসেচভুক্ত এলাকায় রাজস্বের হারে তারতম্য ছিল। যেমন—একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, 'শীতকালে কুরুভয়ি (ধান) উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ, তিল, রাগী, ছোলা, ইত্যাদির এক-চতুর্থাংশ ; জোয়ার ও শুকনো জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিতে হত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও প্রজাদের সম্পদ-কর, বিক্রয়-কর, যুদ্ধ-কর, বিবাহ-কর ইত্যাদি নানা ধরনের অতিরিক্ত কর দিতে হত।" ষোড়শ শতকে আগত রুশ পর্যটক আলেকজাণ্ডার নিকিতিন লিখেছেন : "রাজ্যে বহু লোকের বাস ছিল। পল্লী অঞ্চলের লোকদের অবস্থা ছিল শোচনীয় কিন্তু অভিজাতরা ছিলেন অতি সমৃদ্ধিশালী এবং বিলাসব্যসনে মত্ত।" ডঃ সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, বিদেশী পর্যটকগণ বিজয়নগরের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক ধরনের কথা বলেননি। তার প্রধান কারণ হ'ল অধিকাংশ পর্যটক গ্রামীণ জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্প, খনি শিল্প ও ধাতু ছিল প্রধান। এছাড়া সুগন্ধ দ্রব্য উৎপাদনে বিজয়নগরের খ্যাতি ছিল।

বিজয়নগরের আর্থিক সমৃদ্ধির মূলে কৃষির পরেই ছিল বাণিজ্যের স্থান। অভ্যন্তরীণ ও বাহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিজয়নগর ছিল একটি অগ্রণী দেশ। সারাদেশে একাধিক ব্যস্ত বন্দর ছিল। আবদুর রজ্জাক এখানে তিনশো বন্দরের উল্লেখ করেছেন। মালাবার উপকূলে এ যুগের ব্যস্ততম বন্দর ছিল কালিকট। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, চীন, আরব, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, পর্তুগাল, প্রভৃতি দেশের সাথে বিজয়নগরের বহির্বাণিজ্য চলত। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যাদির মধ্যে ছিল নানাধরনের বস্ত্র, সুগন্ধি মসলা, চাল, চিনি, সোরা, লোহা ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আমদানি হত প্রধানত ঘোড়া, হাতি, তামা, কয়লা, পারদ প্রবাল, ভেলভেট ইত্যাদি। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। স্থলপথে ও জলপথে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য চলত। স্থলপথে ঘোড়া বলদ ও গো-শকটে মাল পরিবহণ হত। সমুদ্রের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিকেও অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে ব্যবহার করা হত। উপকূলের বাণিজ্যে ছোট ছোট জলযান ব্যবহৃত হত। তবে বিজনগরে বড় জাহাজও তৈরী হত। বারবোসা দক্ষিণ ভারতের মালদ্বীপে বড় জাহাজ তৈরীর কারখানা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, রাজাদের উৎকীর্ণ কিছু লিপি থেকেও অনুমান করা হয় যে, জাহাজ নির্মাণশিল্প সেকালে অজানা ছিল না। পর্তুগীজ বণিকদের সাথে বিজয়নগরের সুসম্পর্কের প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে, জাহাজশিল্প ও জাহাজের ব্যবহার সম্পর্কে বিজয়নগরের অধিবাসীরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল। অবশ্য অনেকের অভিযোগ

এই যে, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে দক্ষ নৌবাহিনী গড়ার ব্যাপারে বিজয়নগরের শাসকরা যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন।

এ যুগে শিল্প ও বাণিজ্যে 'গিল্ড' বা বণিকসংঘের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। একই ধরনের শিল্প বা ব্যবসা শহরে নির্দিষ্ট স্থানে গড়ে ওঠার প্রবণতা ছিল। আবদুর রজ্জাক লিখেছেন ঃ "এক-এক ধরনের শিল্প বা ব্যবসার জন্য এক-একটি স্বতন্ত্র গিল্ড বা সংঘ গড়ে উঠত। গিল্ডের তত্ত্বাবধানে এই ব্যবসা শহরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হত। পায়েজের বর্ণনাতেও ব্যবসায়ী সংঘ এবং কেন্দ্রীভূত বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠার কথাও পাওয়া যায়।

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বিজয়নগরে মুদ্রার প্রচলন ছিল। সোনা ও তামার মুদ্রার প্রচলন ছিল বেশি। সামান্য পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। মুদ্রাগুলির গায়ে নানা ধরনের কারুকার্য করা থাকত। মুদ্রাতে দেব-দেবীর মূর্তি ও পশু-পাখির ছবি খোদিত থাকত। সাধারণত উচ্চ ও মধ্য শ্রেণিভুক্ত লোকেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল এবং এঁরা বিলাসব্যসনে জীবন অতিবাহিত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে দেশের সাধারণ মানুষ ছিলেন গরীব। অবশ্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বা জীবনধারণের ন্যূনতম সংস্থানের অভাব কারো ক্ষেত্রে ছিল না। বিজয়নগরের আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হ'ল এই যে, করভারের বোঝাটা মূলত নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হত। অবশ্য বিজয়নগরের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বাহমনী রাজ্যের থেকে অনেক বেশি সুস্থ ও সমৃদ্ধ ছিল।

১.৮ সংক্ষিপ্তসার

দাক্ষিণাত্যে সুলতানী শাসনের ভাঙনের কালে উদ্ভূত স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বিজয়নগর। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয়নগর শুধু সমকালীন ভারতেই নয় সমকালীন বিশ্বেও এক বিস্ময়স্বরূপ ছিল। সামরিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক এক আর্থ-প্রশাসনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিজয়নগর এক সুসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিজয়নগরের সেই উৎকর্ষের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিদেশী পর্যটকরা তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিজয়নগর সম্পর্কে যে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ ও মন্তব্য করেছেন সেখানেও এই সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা লক্ষ্য করা যায়।

১.৯ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

১। বিজয়নগর রাজ্যের অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। বিদেশী পর্যকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১। নায়ঙ্কারা প্রথা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২। বিজয়নগর রাজ্যের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। The Cambridge Economic History of India, Vol—1
—Tapan Roychowdhury and Irfan Habib (ed.)

২। Vijaynagara—Burton Stein.

৩। A History of South India—K. A. Nilkantha Shastri.

৪। সুলতানী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস—অনিরুদ্ধ রায়।

একক ২ ❑ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা (৫০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও বাহমনী রাজ্যের অর্থনীতি

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা
২.২ ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাম্রশাসন
২.৩ অগ্রহার ব্যবস্থা
২.৪ সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব
২.৫ কৃষি ব্যবস্থা
২.৬ শিল্প ব্যবস্থা
২.৭ ব্যবসা-বাণিজ্য
২.৮ মুদ্রা ব্যবস্থা
২.৯ নগরায়ণ ব্যবস্থা
২.১০ বাহমনী রাজ্যের অর্থনীতি
২.১১ উপসংহার
২.১২ অনুশীলনী
২.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ প্রস্তাবনা

গুপ্ত সাম্রাজ্যকে উত্তর ভারতের শেষ সংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উত্তর ভারতে গুপ্তদের পতনের পর একাধিক রাজবংশের নেতৃত্বে আঞ্চলিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে

উঠেছিল। কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য বা নির্ভরতার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রয়োজন, আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপিত হল। সেইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক রাজ্য হিসাবে বাংলার উদ্ভব ও তার নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে এই সময়কে খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং আঞ্চলিক রাজ্য হিসাবে এইযুগে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রসরণের ধারা ছিল পূর্ববর্তীকাল অপেক্ষা জটিল। এই এককের লক্ষ্য হল ৫০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে আদি মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং এর সঙ্গে ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণের বাহমনী রাজ্যের আর্থিক অবস্থার দিকেও আমরা দৃষ্টিপাত করব।

২.২ ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত তাম্রশাসন

কৃষি প্রধান সভ্যতায় ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণি বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভূমি হস্তান্তরের বৃত্তান্ত জানার ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হল অসংখ্য তাম্রশাসন। তামার ফলকে রাজকীয় 'শাসন' হিসাবে ভূমি হস্তান্তরের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই তাম্রশাসন থেকে দাতা ও দানগ্রহীতার নাম, প্রদত্ত জমির বিবরণ, দানের উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জানা যায়। ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে সব পট্টোলী বা তাম্রশাসন প্রাচীন বাংলায় পাওয়া গেছে, ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি ভূমিদান বিক্রয় সম্বন্ধীয়, সেখানে ভূমি বিক্রয় এবং দান সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এই লেখগুলিতে ভূমি সম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি তথ্যগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত ভূমিদান লিপিগুলির সব কয়টিই ভূমিদানের শাসন, একটিও ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের শাসন নয়। পূর্বের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি রাজ্যসরকারের কাছে ভূমি ক্রয়ের জন্য আবেদন করছেন। তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মূল্য দেবেন এবং সর্বত্রই ভূমি ক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য হল ক্রীতভূমি দেবকার্য বা ধর্মাচারণোদ্দেশ্যে দানের ইচ্ছা। ভূমির মূল্যের উপর ক্রেতাকে রাজসরকারকে একটি কর দেওয়াই ছিল প্রথা। কিন্তু যেহেতু ক্রীত ভূমিখণ্ডগুলি প্রায় সমস্তই ধর্মাচারণের উদ্দেশ্যে দানের জন্য, সেহেতু এগুলি করমুক্ত। ভূমি বিক্রয়ের

সমস্ত ঘটনাটি প্রায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সামনেই সম্পন্ন করা হত। কিন্তু অষ্টম শতকের ভূমিদানের তাম্রশাসনগুলির চরিত্র একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতার উল্লেখ নেই। রাজা স্বেচ্ছায় ভূমিদান করছেন গ্রহীতাকে। পাল আমলে দেখা যায় যে, ভূমি দান করা হচ্ছে ব্রাহ্মণ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্যে।

২.৩ অগ্রহার ব্যবস্থা

প্রায় সমগ্র গুপ্ত আমল জুড়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যটি সমকালের আর্থসামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির উপর সুদুর প্রসারী ফল বিস্তার করেছিল তা অগ্রহার ব্যবস্থা নামে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিদান প্রথা প্রচলিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনাবাদী পতিত জমি দান করা হত। প্রাচীন বাংলার গুপ্তকালীন তাম্রশাসনগুলি প্রকৃতপক্ষে জমি বিক্রয়ের দলিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূখণ্ড ক্রয় করার পর তা কোন ব্রাহ্মণ, দেবমন্দির বা বৌদ্ধবিহারে দান করা হত। দানগুলি ছিল নিষ্কর, চিরকালীন এবং অনবসিত জমি দানের শর্তে দেওয়া হত। যেখানে অন্যান্য রাজ্যে চাষাবাদ জমি দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হত, সেখানে বাংলায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পতিত জমি লাভ করতেন এবং জমি দুইবার হস্তান্তরিত হয় (বাজার থেকে ক্রেতা এবং ক্রেতার থেকে দানগ্রহীতা)। যখন একটি ভূখণ্ড দান করা হত, তখন সেই ভূখণ্ডের উপর দানগ্রহীতার মালিকানা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু গ্রামদান করা হলে গ্রামের পূর্ণ মালিকানা দানগ্রহীতার প্রাপ্য ছিল না, তিনি ঐ গ্রামে থেকে তার নির্দিষ্ট রাজস্ব ভোগ করার অধিকারী হন। ব্রাহ্মণ ছাড়াও বৌদ্ধ বিহারগুলি রাজকীয় অনুগ্রহের দ্বারা ভূ সম্পদ লাভ করত। প্রাচীন বাংলার কুমিল্লা জেলায় আবিষ্কৃত বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন থেকে এই বিষয়ে বোঝা যায়।

দানগ্রহীতা ভূমি রাজস্ব ছাড়াও ভূমির অন্যান্য সম্পদ ভোগের অধিকারী ছিলেন। ডঃ রাম শরণ শর্মা তাঁর 'Indian Feudalism' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাজস্বের অধিকার ছাড়াও রাজা সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতেন। দানগ্রহীতা গ্রামীণ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করতেন।

ভূম্যধিকারী হিসেবে দানগ্রহীতাদের প্রতাপ, ক্ষমতা ও আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কৃষকদের ক্রমশই ভূম্যধিকারীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছিল। তাই বলা যেতে পারে যে, অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে রাজা ও কৃষকের মধ্যে দানগ্রহীতার রূপে একটি মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল।

অনাবাদী পতিত ভূখণ্ড ছিল রাষ্ট্রের কাছে একটি অর্থনৈতিক দায়স্বরূপ। অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মতে প্রাচীন বাংলায় রাষ্ট্র পতিত জমিগুলিকে দান করার মাধ্যমে সেগুলিকে আবাদী জমিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। আবার পতিত জমি বিক্রির মাধ্যমে রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ নগদ অর্থ লাভ করত। গুপ্ত লেখমালায় যে সব কর পরিহারের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ভূমি রাজস্ব সর্বপ্রধান। পাল আমলে ভূমিদান করা হত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। কিন্তু সেন আমলে প্রায় সব দানই ব্যক্তিগত দান। দানগ্রহীতা হলেন ব্রাহ্মণ এবং দানের উপলক্ষ হচ্ছে কোন ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। গুণাইঘর, লোকনাথ এবং খালিমপুর লেখর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা ধর্মানুষ্ঠানের জন্য রাজার কাছে ভূমিদানের প্রার্থনা করলে রাজা সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করছেন। আর যেখানে রাজা নিজেই প্রতিষ্ঠাতা, সেখানে তিনি স্বেচ্ছায় কোন অনুরোধ ব্যতীতই ভূমিদান করেছেন। অষ্টম শতকের আশ্রফপুরলিপি এর সাক্ষ্য বহন করে। রাজা যখন ভূমি বিক্রয় করেন এবং সেই জমিকে "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" বা সকল প্রকার রাজস্ব বিবর্জিত করেন, তখন তিনি দানের পুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন, কারণ সেই জমি থেকে যে রাজস্বের এক ষষ্ঠ ভাগের তিনি অধিকারী হতে পারতেন, তা তিনি পরিত্যাগ করছেন এবং ফলস্বরূপ তিনি দানের পুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারীতে পরিণত হন।

অষ্টম শতক পূর্ববর্তী লিপিগুলিতে তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব' গ্রন্থে এই জমিগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। বসবাসের যোগ্য জমিকে বাস্তু জমি বলা হয়ে থাকে। যে ভূমি কর্ষণযোগ্য এবং সেই জমিতে চাষ আবাদ করা হচ্ছে, তা ক্ষেত্র ভূমি। কিন্তু যে ভূমি কর্ষণযোগ্য অথচ অকর্ষিত রয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রকে খিলক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে। জমি নিয়মিত চাষের ফলে ভূমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে গেলে সে ভূমিকে অনেক সময় দু-চার বছর ফেলে রাখলে তার উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং চাষ করা হয়। আর যে সকল জমি কর্ষণের অযোগ্য, তাকে শুধু খিল বা পতিত জমি বলা হয়ে থাকে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে ভূমি মাপের যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হত, সেইগুলি

হল—কুলা বা কুল্যবাপ, দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মাপ আঢ়বাপ। কুল্য, দ্রোণ ও আঢ় সমস্তই ছিল শস্যমান। তাম্রশাসনগুলি যেহেতু বিক্রয় ও দানের মাধ্যমে জমি হস্তান্তরের ঘটনার সাক্ষ্য দেয়, ফলে এই জাতীয় তথ্যসূত্রে জমির মাপ নেবার পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া বারোটি তাম্রশাসনের সাক্ষ্য বিশেষ মূল্যবান। এই তাম্রশাসনগুলি মূলতঃ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গ এলাকায় (গুপ্ত শাসকদের সময়) এবং বঙ্গ অঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকা-বিক্রমপুর, ফরিদপুর (গুপ্ত শাসনের অব্যবহিত পরবর্তী আমলে) অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

'বাপ' কথাটি বীজ বপনের সঙ্গে জড়িত এবং 'কুল্য' পরিমাণ বীজ শস্য যে আয়তনের ভূমিতে বপন করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি এক কুল্যবাপ ভূমি নামে পরিচিত। দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপ ও যথাক্রমে এক দ্রোণ ও এক আঢ় বা আঢ়ক শস্য বপণযোগ্য ভূমি। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে কুল্য শব্দটি পূর্ববাংলার কুলা শব্দের থেকে এসেছে অর্থাৎ একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে তার বীজ যতটা পরিমাণ ভূমিতে বপণ করা হয় তাই কুল্যবাপ। এক কুল্যবাপ ভূমি আট দ্রোণবাপের (দ্রোণ = কলস) সমান এবং এক দ্রোণ বাপ চার আঢ় বাপের সমতুল্য। কুল্য বা দ্রোণ উভয় মাপই ধানের আধার, যেহেতু ধানই বাংলার প্রধানতম শস্য।

হস্তান্তরযোগ্য জমির দানের স্বরূপ জানা যায় বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে। পাঁচটি দামোদরপুর তাম্রশাসনে (দুটি কুমারগুপ্তের সময় ৪৪৪-৪৪৮ খ্রীঃ) দুটি বুধগুপ্তের সময়-একটির তারিখ উল্লেখিত নেই ; অপরটি ৪৯৬ খ্রীঃ ; আরেকটি বিষ্ণুগুপ্তের আমলের ৫৪৪ খ্রীঃ, উত্তরবঙ্গে জমির দাম 'কুল্যবাপ' প্রতি তিন স্বর্ণদীনার। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তীকালে বঙ্গ অঞ্চলে রাজা ধর্মাদিত্য, সমাচারদের এবং গোপচন্দ্রের রাজত্বকালে জমির দাম প্রতি 'কুল্যবাপে' চার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল (রাজা ধর্মাদিত্যের দুটি ফরিদপুর তাম্রশাসন ; রাজা সমাচারদেবের ঘুঘুরাহাটি তাম্রশাসন ও রাজা গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন)। উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে জমির দামের তারতম্য ছিল কারণ উত্তরবঙ্গে হস্তান্তরিত জমি বেশির ভাগই অনাবাদী পতিত জমি কিন্তু বঙ্গের জমি ছিল উর্বর এবং চাষের উপযুক্ত।

সাধারণত তাম্রশাসনের শেষাংশে প্রদত্ত গ্রামের সীমানা বর্ণনা করা হত। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পাল এবং সেন আমলে ভূমির মূল্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে এই মূল্যের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই লিপিগুলিতে ভূমির মোট বার্ষিক আয়ের একটি হিসেব পাওয়া যায় এবং এই বার্ষিক আয় থেকে ভূমির মোট মূল্য কী হতে

পারে, তা অনুমান করতে হয়। পাল ও প্রতিহার রাজাদের আমলের তাম্রশাসন পরীক্ষা করে রামশরণ শর্মা বলেছেন যে, বহুক্ষেত্রে প্রদত্ত গ্রামের সীমা সঠিকভাবে বর্ণিত করা হয়নি। দানগ্রহীতা দানে প্রাপ্ত গ্রামের তৃণভূমি এবং চারণভূমিতে কৃষির পত্তন করতেন। তাহলে তিনি সেই উদ্বৃত্ত রাজস্ব ভোগ করতে পারতেন। তাছাড়া কৃষি এলাকার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে দানগ্রহীতা আরো বেশি পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারতেন এবং অতিরিক্ত উৎপাদনের কোন অংশ রাজকোষে প্রত্যার্পণ করার বাধ্যবাধকতা তার ছিল না। পাল ও সেন আমলের তাম্রপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে, গ্রামদানের সময় গ্রামবাসীরা সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং তাদের কাছে দানগ্রহীতার পরিচয় এবং ভূমিদানের কারণ ব্যাখ্যা করা হত। কিন্তু এটি ছিল আনুষ্ঠানিক একটি প্রথা কারণ রামশরণ শর্মার মতানুযায়ী গ্রামবাসীর মতামতের বা অনুমোদনের প্রয়োজন দাতার ছিল না। গ্রামের উপর সকলের যৌথ অধিকার প্রথা অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং ভূস্বামীর অধিকার দৃঢ় হয়েছিল।

অগ্রহার ব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে কৃষি অর্থনীতির বিস্তারে অগ্রহার ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছিল। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, তাম্রশাসনের মাধ্যমে ভূসম্পদ হস্তান্তরের যে সব নজির পাওয়া গেছে, তার অনেকগুলি অনাবাদী জমিতে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে বিশেষতঃ প্রাক পাল লেখমালায় ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অনাবাদী জমি হস্তান্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে প্রাচীন শ্রীহট্টে (বর্তমানে সিলেট, বাংলাদেশে) সামন্ত লোকনাথ যে জমি অগ্রদান হিসেবে ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন, তা অবস্থিত ছিল এক গহন অরণ্যে এবং তাঁর টিপেরা তাম্রশাসন, (৬৬৫ খ্রীঃ) থেকে আমরা এই বিষয়েও অবগত হই যে, সেই অরণ্য হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ। অরণ্যে জমি দান করলে দানগ্রহীতা ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিরাও এসে বসবাস করবেন এবং ব্রাহ্মণ, রীতি অনুযায়ী যেহেতু নিজে চাষবাসের কাজ করবেন না, সেহেতু জমিতে কর্ষক ও নানা বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর বসবাসের ব্যবস্থা করা হত এবং ক্রমে একটি জনবসতি সৃষ্টি হত। এইভাবে অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক অনাবাদী অঞ্চল চাষবাসের যোগ্য করে তোলা হত। পাল ও সেন আমালের লিপিগুলি থেকে বিশেষতঃ সন্ধাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্ কাব্য থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, এই আমলে লোকবসতি ও কৃষির বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছিল। লোকসংখ্যার বৃধি, রাজার ধর্মীয় এবং সমৃধ ব্যক্তিদের ভূমি দান করে সম্মান বৃধির প্রচেষ্টা, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভূমি সংগ্রহের অভিলাষা গুপ্ত পরবর্তী যুগে বাংলাদেশে ক্রমশঃ বসতি ও কৃষির বিস্তার ঘটিয়েছিল।

২.৪ সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

অগ্রহার ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা বিচার করা জরুরী। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এইরূপ ভূমিদানের ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে—জমির খাজনা আদায় এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের হস্তান্তর। জমি দানের সময় রাজা কেবল জমির রাজস্ব ত্যাগ করেননি, জমি থেকে আদায়ীকৃত অন্যান্য আয়ের উৎসও তিনি দানগ্রহীতাকে প্রদান করতেন। তাছাড়া প্রদত্ত গ্রামের অধিবাসীদের শাসনের অধিকারও পরিহার করতেন। গ্রামে অবস্থিত চাষী এবং কারিগরদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা দানগ্রহীতাকে শুধু প্রথাগত কর দেবে তাই নয়, তার (দানগ্রহীতার) আদেশও পালন করবে। সরকারী কর্মচারী বা সৈনিকগণের অগ্রহার ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাজা এবং প্রজার মধ্যে একদল শক্তিশালী মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী শ্রেণির আবির্ভাব হল। পালদের কয়েকটি অনুদানে গ্রামে রাজপদাধিকারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই দানগুলিতে গ্রহীতাকে তার অঞ্চলে দণ্ড দেবার অধিকারও প্রদান করা হয়েছে। সমকালীন স্মৃতিকাররা ভূমি ব্যবস্থায় তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—'মহীপতি', 'স্বামী' ও 'কর্ষক'। 'মহীপতি' হলেন রাজা, 'স্বামী' হলেন জমির মালিক ও কর্ষক বলতে চাষীদের বোঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ যেহেতু নিজে চাষ করতেন না, তাই প্রাপ্ত জমি থেকে উৎপাদন জাত আয় ভোগের জন্য কৃষক নিয়োগ করা হত। এইভাবে অগ্রহার ব্যবস্থা বাংলায় ব্রাহ্মণ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। ঐতিহাসিক রাম শরণ শর্মার মতে এই ভূমিব্যবস্থায় ভূস্বামীর সুযোগ সুবিধার সঙ্গে প্রকৃত চাষীর সুযোগ সুবিধার ব্যবধান বাড়তে থাকে। ভূস্বামীর অধঃস্তন উপস্বত্বভোগীদের উদ্ভাবনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

দানগ্রহীতা বা ভূম্যধিকারী উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপায়ে জমির মালিক কৃষকদের থেকে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করতেন। রাজার থেকে প্রাপ্ত সনদ তাকে তার জমির প্রকৃত মালিকে পরিণত করেছিল। এইরূপ ব্যবস্থা কৃষকদের জমিতে ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গ্রামে যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা বিছিন্ন হয় এবং উৎপাদক উপভোক্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কৃষকদের শ্রমের উপর দানগ্রহীতার অধিকার সুদৃঢ় হল। কৃষকদেরর "হালকর", "অর্ধশরিক" ইত্যাদিভাবে অভিহিত করা হল। যা থেকে বোঝা যায় যে, জমি নিয়ন্ত্রণের উপর এদের কোন অধিকার ছিল না। দানগ্রহীতার জমি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় ছাড়াও অতিরিক্ত কর

তোলার অধিকার ছিল। দানগ্রহীতা জমির কর ছাড়াও বিষ্টি (বেগার শ্রম) ভূমির কর্ষকদের থেকে আদায় করতেন। ফলে কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি বৃধ্বি পেয়েছিল এবং তাম্রশাসনে কর আদায় ও 'সর্বপীড়া' কথাটি কার্যতঃ সমার্থক ছিল।

ধর্মীয় ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিদানের কথাও আমরা জানতে পারি। রাজা অনেক সময় তাঁর অধীনস্থ সামরিক কর্মচারী বা কোন প্রশাসককে একটি বৃহৎ ভূখণ্ডের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব অর্পণ করতেন। সামন্তদের এক একটি এলাকায় স্বাতন্ত্র দেওয়া হত এবং এই এলাকা থেকে প্রাপ্য রাজস্বের একাংশ নিয়ে সামন্তরা নিজের ব্যয় নির্বাহ করতেন। সামন্তব্যবস্থা উদ্ভবের আগে সামরিক এবং অসামরিক পদস্থ কর্মচারীরা রাজার বেতনভোগী ছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বন্ধ অর্থনীতির উন্মেষ ঘটে, বাণিজ্যের সঙ্কোচন হয় এবং মুদ্রা ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার ফলে নগদে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা রদ হয়। তার পরিবর্তে পদস্থ কর্মচারীদের একটি ভূমি বা এলাকার প্রশাসনিক ও রাজস্ব ভোগের অধিকার দেওয়া হল। এই জাতীয় ব্যবস্থায় একদল অভিজাত ভূস্বামীদের উত্থান ঘটে যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তবে অগ্রহার ব্যবস্থায় জমি যেমন রাজস্ব মুক্ত করে দেওয়া হত। এই ক্ষেত্রে সামন্তরা নিজের এলাকা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর এবং প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর সেবা রাজাকে দিতে বাধ্য থাকতেন।

এর ফলে ভূমি ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক ক্ষমতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে সামন্তদের স্বার্থ ও ক্ষমতা কায়েম হবার প্রশস্ত সুযোগ দেখা যায়। পাল রাজা তৃতীয় বিগ্রহ পালের আমলে (১০৫৫-৭০) এক সামন্ত তাঁর ভোগাধিকার থেকে জমিদান করছেন বলে আমগাছি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। এই ব্যাপারটি ইঙ্গিত করে যে একজন সামন্ত উপস্বত্বভোগী ক্ষুদ্রতর বা অধীনস্থ সামন্ত সৃষ্টি করতে পারতেন। রাজা এবং কৃষকের মধ্যে অনেকগুলি স্তরের উদ্ভব ঘটে এবং রাজনৈতিক কাঠামো, সম্পদ সংগ্রহে বা বিতরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত রূপ নেয়।

সমুদ্রগুপ্তের অধীনস্থ জায়গীরদারদের জন্য সামন্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়নি। বানভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে প্রাপ্ত লেখর যে টীকা লিখেছেন, তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট সামন্তগণ কর্তৃক প্রশাসিত অঞ্চলের প্রজাদের কাছে থেকে কর আদায় না করে সামন্তদের কাছ থেকে বার্ষিক কর আদায় করতেন। পালদের ভূমি অনুদানপত্রে উল্লিখিত রাজা, রাজপুত্র, মহাসামন্ত,

মহাসামন্তাধিপতি ইত্যাদি উপাধিকারীগণ সম্ভবত এমন সামন্ত ছিলেন যাদের মধ্যে অধিকাংশের সম্পর্ক ছিল ভূমির সঙ্গে কয়েকজনকে পরাজিত করার পরে অধীনস্থ সামন্তরূপে স্বস্থ ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আবার কয়েকজন সামন্তকে সৈন্য সরবরাহের শর্তে ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। সামন্তীকরণের এই প্রক্রিয়া সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করেছিল এবং যতক্ষণ না কোন পদকে সামন্তীয় উপাধিতে ভূষিত করা হত, ততক্ষণ তার কোন মহত্ত্ব প্রকাশ পেত না।

দেবপালের সময় থেকে পালরাজাদের দ্বারা জারি করা অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে উত্তরভারতের বহু অধীনস্থ নরপতি নিজ নিজ সৈন্য সহযোগে দেবপালের সাহায্যের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম' কাব্য থেকে জানা যায় যে পালবংশের অন্তিম পর্বে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ঘটলে উত্তরবঙ্গ পালদের হস্তচ্যুত হয়। পাল রাজা রামপালকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য 'সামন্তচক্রের' সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং বহু ভূসম্পদ ও অন্যান্য সম্পত্তি দান করে তিনি সামন্তদের সমর্থন যোগাড় করতে পেরেছিলেন। এইসব আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে ধর্মীয় দান বা ধর্মনিরপেক্ষ দান, এই দুইয়ে মিলে রাজা ও প্রকৃত চাষীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভাবন ঘটেছিল এবং এদের উপস্থিতি বাংলার অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছিল।

২.৫ কৃষি ব্যবস্থা

বাংলা মুলতঃ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে ধান উৎপাদন ছিল সর্বপ্রধান। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে বঙ্গের ধানের প্রশংসা করা হয়েছে। খুব প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় আখের চাষ হত। ইক্ষুর রস থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় প্রস্তুত করে বিদেশে চালান করা হত। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ গ্রন্থে বলেছেন যে অধিক পরিমাণে গুড় উৎপাদিত হত বলে এদেশের নাম 'গৌড়' ছিল। পুন্ড্র (উত্তর বঙ্গের ভূখণ্ড, বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর জেলার অর্ন্তভুক্ত) দেশের আখ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ধান ও আখ একই সাথে চাষ করা হত, অর্থাৎ একই সঙ্গে খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের উৎপাদন পদ্ধতি জানা ছিল। বিভিন্ন ধরনের জমি ও জমির মাপ নেওয়ার পদ্ধতির কথা আগেই বলা হয়েছে। অগ্রহার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে একটি স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয় এবং গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই ভোগ করা

হত। এই আদি মধ্যযুগ পর্বে রচিত কৃষি পরাশর, কৃষিসূক্তি প্রভৃতি কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব এই সময় বৃদ্ধি পেয়েছিল। শূন্য পুরাণে বলা হয়েছে যে অন্ততঃ পঞ্চাশ রকমের ধান প্রাচীন বাংলায় উৎপন্ন হত। আদি মধ্যযুগের বাংলার একটি লেখতে 'বারজিকের' উল্লেখ আছে যা থেকে বলা যায় যে বাংলায় অনেক পানের বরজ ছিল। তুলা ও তৈলবীজের চাষও বহুল পরিমাণে হত। চীনা রাজকর্মচারী চৌ-জু-কুয়া তাঁর চু-কান-চি (১২৫৭ খ্রীঃ) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশ ছিল তুলো উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া নারিকেল ও সুপারির চাষ করার কথা এই সময়ে জানা যায়। কৃষি উৎপাদনের প্রসার ঘটানোর জন্য বড় লাঙ্গল এবং ঢেঁকি ব্যবহৃত হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'হল' কাঠের তৈরী ছিল। উন্নত কৃষি উৎপাদনের একটি আবশ্যিক শর্ত ছিল জলসেচের সুবন্দোবস্ত। জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। রামচরিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজা রামপাল বরেন্দ্র অঞ্চলে এক বিশাল দীঘি খনন করে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্থানীয়ভাবে স্থানীয় প্রয়োজন পূর্ণ করাই ছিল সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি। পালদের আমলে গ্রামগুলির এই অবস্থাই ছিল। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে চাষী, চণ্ডাল, সকল শ্রেণির লোক গ্রামে বসবাস করত। গ্রামের স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম সকল শ্রেণির ব্যক্তিরই আবশ্যকতা ছিল।

২.৬ শিল্প ব্যবস্থা

বাংলা কৃষি প্রধান দেশ হলেও এখানে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হত। বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব আগের যুগের মতই অব্যাহত ছিল। কার্পাস তুলার কাপড়ের জন্য বঙ্গ বিখ্যাত ছিল। খুব প্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। হেমচন্দ্র রচিত 'প্রবন্ধচিন্তামনি' গ্রন্থে তুলো পেঁজার জন্য ধনুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সমকালীন সাহিত্য, লেখমালা এবং আরব পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাংলা বস্ত্র উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। বাংলার কারিগরেরা ধাতু শিল্পের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। লোহা, ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিলাসিতার উপকরণ যোগানোর জন্য স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি শিল্পেরও উন্নতি ঘটেছিল। কাষ্ঠশিল্পে এবং হাতীর দাঁতের কাজ একটি উচ্চশ্রেণির শিল্প ছিল। ধাতুর ব্যবহার অস্ত্র নির্মাণ শিল্পে, বিশেষত তরোয়াল উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

ছিল। রাজা ভোজের 'মুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে পাল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মগধ ও অঙ্গাদেশে উন্নতমানের তরোয়াল নির্মিত হত। অনেক আরব লেখক ও পাল সাম্রাজ্যে নির্মিত তরোয়ালের প্রশংসা করেছেন।

সমসাময়িক লেখমালা, ধর্মশাস্ত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসূত্রে শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই উত্তর ভারতের কারিগরী শিল্পে পেশাদারী সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় যে বরেন্দ্রশিল্পীগণ গোষ্ঠী একটি বিধিবদ্ধ সংঘ ছিল। এইরূপ সংঘবদ্ধ শিল্পী জীবনের ফলে বাংলাদেশে নানা শিল্পীগোষ্ঠী বিভিন্ন বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আদি মধ্যযুগে শ্রেণির প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। শ্রেণির আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থায় শাসকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রেণির স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হয়েছিল। ভূস্বামী শ্রেণির উদ্ভবের ফলে শ্রমিক শ্রেণির বড় অংশ ভূস্বামীর এলাকায় নিযুক্ত হয়। শ্রেণির শিল্পসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও শ্রমিক অপ্রতুল হয়ে পড়ে কারণ অধিকাংশ শ্রমিকেরই কৃষিতে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আদি মধ্যযুগে শ্রেণি সংঘগুলি জাতি ভিত্তিক সংঘে পরিণত হয়। এইভাবে রাজকীয় হস্তক্ষেপ, শ্রেণিগুলির সামাজিক চরিত্রের পরিবর্তন ও শ্রমিকের অপ্রতুলতার ফলে শিল্প সংগঠনগুলি এই সময়ে অবক্ষয়ের শিকার হয়।

২.৭ ব্যবসা-বাণিজ্য

বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। বাংলায় বহু নদনদী থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি নানা স্থানে প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। রামশরণ শর্মার মতানুযায়ী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্কোচন ঘটেছিল। রোম-ভারত বাণিজ্যের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উপমহাদেশে যে ভূমিকা দেখা গিয়েছিল তার তুলনায় পঞ্চম শতাব্দীর বাণিজ্যের পরিধি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার বিকাশের ফলে যে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির উদ্ভব হয় সেখানে লেনদেনের জন্য যথেষ্ট উৎপাদন হত না। উৎপাদন এবং ভোগ গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন কমে যায় এবং এই অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ হিসেবে শর্মা বলেছেন যে, পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে ধাতু মুদ্রার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পতন দেখা দেয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে শিল্পী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদি গোষ্ঠী রাষ্ট্রের আনুকুল্য লাভ করেছিল। ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে ভূমি নির্ভর সামন্তপ্রথা প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্রের সাথে এই ভূম্যাধিকারী শ্রেণির সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হল এবং অষ্টম

শতক থেকে বাংলার শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সাথে ভূম্যধিকারীর সম্পর্কের নিবিড়তা আরো বৃদ্ধি পেল। পাল ও সেন আমলে ভূস্বামী শ্রেণিই রাষ্ট্রের প্রধান সহায় ও পোষক এবং রাষ্ট্রও এদের সহায়ক। ভূমি নির্ভর সমাজে তাই বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণিকে সম্ভবতঃ অবজ্ঞা করা হয়েছিল এবং শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের আর প্রধান সহায় ছিল না বলে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন।

কিন্তু আদি মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের পুরোপুরি অধোগতি হয়েছিল, এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। ৬০০-১০০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে বাণিজ্যের গতিময়তা ও সজীব চরিত্র বজায় ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে বণিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই তাম্রশাসনগুলি থেকে জানা যায় যে, জেলাধিকারিককে সহায়তা করার জন্য জেলাস্তরে একটি সমিতি ছিল এবং তার অন্যতম দুই সদস্য ছিলেন নগরশ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহ। নগরশ্রেষ্ঠী জেলার প্রধান নগরের অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বণিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তৈলিক, তৌলিক, মোদক ও সুবর্ণবণিক ইত্যাদি এবং কারিগরদের মত বণিকরাও সম্ভবত পেশাদারী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

সমগ্র উপমহাদেশেই যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করা মোটামোটি সম্ভব পর ছিল, তা ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙয়ের বিবরণী থেকে জানা যায়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য নদীপথের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা নদীমাতৃক অঞ্চল হওয়ায় নদীপথে যাতায়াত সুলভ ছিল। পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিক সম্পর্ক মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে। প্রাচীন বাংলার প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্ত (তমলুক, মেদিনীপুর জেলা) এই সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ ছিল অপ্রত্যক্ষভাবে। খ্রীষ্টপূর্ব সময়ের শেষের কয়েক শতাব্দী থেকে গুপ্ত যুগ (অর্থাৎ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত) তাম্রলিপ্ত গঙ্গা এবং বঙ্গ দেশের অর্ন্তভুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের আর এক বন্দর ছিল গাঙ্গে যার অবস্থান ছিল খুব সম্ভবতঃ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দেগঙ্গা এলাকায় এবং গঙ্গার এক শাখা যমুনা নদীর উপরে। ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত সূক্ষ দেশের বন্দর হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই বন্দরের প্রশংসা দুই চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের লেখনীতে বিবৃত আছে। এই বন্দর বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলও ধীরে ধীরে দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বঙ্গাদেশ থেকে নানারূপ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির বর্ণনা পাওয়া যায়। রপ্তানির তালিকায় ছিল ঘষা কাঁচ, খুব উঁচুদরের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র ও চাল ইত্যাদি। ষষ্ঠ সপ্তম শতকে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহল প্রভৃতি দেশের সাথে পূর্ব ভারতের যোগাযোগের অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এই তাম্রলিপ্ত বন্দর। পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির সঙ্গে অথবা উপমহাদেশের পশ্চিমে আরব সাগরবর্তী কোন দেশের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির সরাসরি যোগাযোগ যে একেবারে ছিল না, তা বলা যায় না। তাম্রলিপ্ত থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে জাহাজ ভর্তি ঘোড়া নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাত্রা করা হত। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাম্রলিপ্তর সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবস্থা ভাল ছিল। অষ্টম শতাব্দীতেও এই "সামুদ্রিক" বন্দরের গুরুত্ব হয়ত ছিল কিন্তু এর পরে আর কোন প্রাচীন কালের তথ্যসূত্রে এই বন্দর মারফৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নবম শতকের শেষে ও দশম শতকের গোড়া থেকে আরব বিবরণীতে সমন্দর নামক এক অতি সমৃদ্ধ বন্দরের কথা জানা যায়। এই বন্দর বর্তমানে চট্টোগ্রামের কাছে অবস্থিত। ইবন খোরদাদবা বা অল ইদ্রিসির বিবরণে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এই বন্দরে বাণিজ্যরত বণিকেরা যথেষ্ট লাভ করতেন। আরব লেখকেরা সমন্দরের সঙ্গে উড়িষ্যা ও কাঞ্জাভারমের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীলঙ্কা থেকে সমন্দর সমুদ্রপথে পৌঁছনোর কথা আরব লেখাতে পাওয়া যায়। আদিমধ্যযুগে সমন্দর বা সুদকাওয়ানের উত্থান বাংলাকে পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুগপৎ বাণিজ্যিক লেনদেনে যুক্ত করে দেয়।

২.৮ মুদ্রা ব্যবস্থা

জমি দানের তাম্রশাসনের মত মুদ্রাকে রাজনৈতিক এবং কখনও ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে জানার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, অর্থনৈতিক বিনিময় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে জানার ব্যাপারে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই বাংলায় মুদ্রা প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল। ভারতবর্ষের সর্ব প্রাচীন ছাপ কাটা (Punch marked) মুদ্রা বাংলায় অনেক পাওয়া গেছে।

ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা তাঁর 'Early Medieval Society' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম থেকে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা এবং স্বর্ণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। গুপ্ত শাসনের পরবর্তীকালে স্বর্ণমুদ্রার ধাতব

বিশুদ্ধি ক্রমশ কমতে থাকে। স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা সাধারণত বৈদেশিক বা দুরপাল্লার বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। ষষ্ঠ এবং দশম শতকের মধ্যে অনেক আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটে। উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতে গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে মুদ্রা ব্যবহার খুব কম পরিমাণে প্রচলিত ছিল। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে বাণিজ্যের পরিধি সামন্তব্যবস্থার ফলে সঙ্কুচিত হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনে মুদ্রার ব্যবহার কমে গিয়েছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ অনুসারে নিত্যকার লেনদেন কড়িতে চলত। মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতি কার্যতঃ ৬০০-১০০০ খ্রীঃ মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিনিময় ব্যবস্থায় মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত হয় কড়ি যা তাম্রশাসনে কপর্দক বলে উল্লিখিত। কড়ি দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চলা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলে যতটুকু বাণিজ্য ছিল তা স্থানীয় ভিত্তিতে হত এবং তার ফলে সামন্ত ব্যবস্থায় উদ্ভুত সম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির অবসান সম্ভব ছিল না।

হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক এবং সমাচারদেবের আমলে এবং তার পরবর্তীকালে গুপ্ত অনুকরণে তৈরী কিছু স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং বাংলাদেশে পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌন্দর্য্য এবং শুদ্ধতার দিক থেকে এই মুদ্রাগুলি ছিল খুব নিম্ন মানের এবং অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই সব মুদ্রা অচল হয়ে যায়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে বাংলার কোথাও পাল বা সেন রাজাদের প্রবর্তিত একটি স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া যায়নি। সমকালীন সাহিত্যেও কোন স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ নেই।

দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশের ময়নামতীতে আদি মধ্যযুগীয় পর্বের রৌপ্যমুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে নিরবছিন্ন ভাবে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। এই মুদ্রাগুলির উপর হরিকেল (নোয়াখালি, কুমিল্লা), পট্টিক (পাইটকারা) প্রভৃতি স্থানের নাম খোদিত আছে। এই মুদ্রাগুলির উপর আরকানের মুদ্রার প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। মুদ্রাগুলি রৌপ্যনির্মিত এবং এর একপিঠে কুয়মুর্তি এবং অপরদিকে ত্রিশূল জাতীয় বস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। দশম শতকের মুদ্রাগুলির আকার, পরিমাণ ও ওজনে পরিবর্তন করা হয়েছে। সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত 'পুরাণ', 'ধরণ', 'কার্যাপণ' 'দ্রম্ম' নামক রৌপ্য মুদ্রাগুলির সাথে বিনিময়যোগ্য করে তোলার জন্য এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়ায় 'দিরহাম' জাতীয় মুদ্রাগুলির সাথে হরিকেল মুদ্রার ওজনগত সাদৃশ্য ঘটানো হয়। সম্ভবত বাংলাদেশের মুদ্রাগুলিকে উত্তর ভারত ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এই পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। পাহাড়পুর এলাকা থেকে খালিফা হারুণ-আল-রসিদের (৭৮৮ খ্রীঃ) গোলিকৃতি রৌপ্য মুদ্রার আবিষ্কার থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হরিকেলের অংশ গ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে কোন মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রমাণ না পেলেও বহু তাম্রশাসনে 'কর্পদক' শব্দটির উল্লেখ আছে। কর্পদক বা কড়ি ব্যবহারের এটি স্পষ্ট প্রমাণ। কড়ি প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যেত না। মা হুয়ানের চৈনিক বিবরণ (পশ্চদশ শতকের প্রথমদিকে রচিত)

থেকে জানা যায় যে, কড়ি বাংলায় আমদানি হত মালদ্বীপ থেকে, তার বদলে বাংলার চাল মালদ্বীপে প্রেরণ করা হত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দুরপাল্লার বাণিজ্যে কড়ি বেশি ব্যবহৃত হত না কিন্তু এই কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। কড়ি সরাসরি দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যেরই সামগ্রী এবং কড়ির উপস্থিতি সরাসরি দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যেরই সামগ্রী এবং তার ব্যবহার কখনও বন্ধ অর্থনীতির পরিচায়ক ছিল না। পুরাণ জাতীয় রৌপ্যমুদ্রা ও কড়ি (যা হরিকেলের মুদ্রার সাথে সমতূল্য) সহজেই বিনিময় করা যেত। ফলে রণবীর চক্রবর্তীর মতে পাল সেন শাসিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মুদ্রা না থাকলেও বাণিজ্য স্তব্ধ হয়নি, ঐ অঞ্চলের 'পুরাণ কর্পদক' সহজেই হরিকেলের রৌপ্য মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যেত।

ব্যবসার কাজে যে বিপুল পরিমাণ কড়ি লাগত, তা ব্যবসায়ীদের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। ফলে কড়ির একটি সহজসাধ্য বিকল্পের প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বাদশ শতকের শেষে ও ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতে দুটি নতুন শব্দ—কার্যাপণ ও চুর্ণী ব্যবহৃত হতে থাকে। চূর্ণ কথাটির অর্থ চূর্ণ বা গুঁড়ো। সোনা বা রূপোর গুঁড়ো দিয়ে ব্যবসা চালানো হত। একটি রূপার মুদ্রাতে যে পরিমাণ রূপো থাকে তার সমান ওজনের বিশুদ্ধ রূপো চূর্ণ করে বণিকেরা নিয়ে যেতেন এবং লেনদেনের সময় রূপোর মুদ্রার পরিবর্তে সমপরিমাণ 'রৌপ্যচূর্ণ' দিয়ে ব্যবসা করতেন। চূর্ণীর ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণ কড়ি নিয়ে ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের অসুবিধা অনেকটাই লাঘব হয়েছিল। আদি মধ্যযুগে বাংলার বিনিময় মাধ্যমে রণবীর চক্রবর্তী মুদ্রার তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। এই ত্রিস্তর ব্যবস্থার সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল কড়ি বা কর্পদক, মধ্যবর্তী স্তরে ছিল ধাতবচূর্ণ (চূর্ণী) এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে ধাতব মুদ্রা যেমন কার্যাপণ, দ্রম্ম মুদ্রা ইত্যাদি।

২.৯ নগরায়ণ

গ্রামকেন্দ্রিক স্বনির্ভর অর্থনীতির উদ্ভব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপকতা কমে যাওয়ার ফলে নগরের প্রয়োজনীয়তা সীমিত হয়। রাম শরণ শর্মার মতানুযায়ী ৩০০-৬০০ খ্রীঃ, এই সময় সীমার মধ্যে সর্বভারতে নগরের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। কারিগরী ও পণ্যের বিনিময়ের এলাকা হিসেবে নগরের বিশিষ্ট ভূমিকা আদি মধ্যযুগে বিনষ্ট হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব শতক থেকে ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার যতগুলি নগরের খবর পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর। তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রনগর, বর্ধমান, গঙ্গাবন্দর নগর প্রভৃতি সমস্ত নগরেই সুপ্রশস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের পথের উপর অবস্থিত ছিল এবং বাণিজ্য সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করত। গঙ্গা বন্দর ও তাম্রলিপ্তর গুরুত্ব নিরঙ্কুশ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কিন্তু কোটিবর্ষ প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রয়োজনে গড়ে উঠলেও এই নগরের বাণিজ্য ও তীর্থ মহিমা ছিল। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী

ষষ্ঠ সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার সব কয়টি নগরেই মর্যাদা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল সপ্তম শতকও তারপর বাণিজ্যের অবনতি দেখা দিলে বাংলার নগরের আকৃতি ও প্রকৃতি ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। হিউয়েন সাঙ বাণিজ্য নগর হিসেবে তাম্রলিপ্তর নামই উল্লেখ করেছেন। অষ্টম নবম শতকের থেকে আরম্ভ করে হিন্দু আমলের শেষ পর্যন্ত যে কয়টি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইগুলি প্রধানত রাজনৈতিক এবং সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছিল, বাণিজ্যিক কেন্দ্র রূপে নয়।

২.১০ বাহমনী রাজ্যের অর্থনীতি

দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে দিল্লী সুলতানেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কয়েকটি অভিযান দাক্ষিণাত্যে পরিচালনা করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে এর ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাহমনী বংশের সূচনা হয়েছিল। বাহমনী ছাড়া দাক্ষিণাত্যের আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ রাজ্যের নাম ছিল বিজয়নগর। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী ধরে দেখা যায় বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের দ্বন্দ্ব। এই দুটি রাজ্যের সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল কৃষ্ণা ও তুঙ্গাভদ্রা নদী দুটির মধ্যবর্তী উর্বরা রায়চুর দোয়াব অঞ্চল নিয়ে। কৃষ্ণা, তুঙ্গাভদ্রা অঞ্চল ছিল ভীষণ সমৃদ্ধশালী এবং অনেক বন্দরের উপস্থিতি অঞ্চলটিকে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

বাহমনী রাজ্যের প্রধান আয় ছিল ভূমি রাজস্ব। শাসনবিভাগের মূল কার্যই ছিল রাজস্বের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা। বাহমনী রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মামুদ গওয়ন ভূমি রাজস্ব দপ্তরে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা রাজস্ব আদায় করতেন ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাজাকে সরবরাহ করতেন। যুদ্ধের সময় রাজা সৈন্যের জন্য শাসনকর্তাদের উপর নির্ভর করতেন। জমির গুণাগুণ অনুসারে রাজস্ব নির্ধারিত হত। রুশ বণিক অ্যাথানাসিয়াম নিকিতিন বাহমনীর রাজধানী বিদারে কিছুদিন বাস করেছিলেন (১৪৭০-৭৪)। তার নথি থেকে আমরা জানতে পারি যে জমিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ছিল। অভিজাতদের বিলাসবহুল জীবনের তুলনায় সাধারণ মানুষের দুর্বিসহ জীবন ছিল। জমিতে মালিক শ্রেণি ছাড়া ছিল অনেক ভূমিহীন কৃষক যারা অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করত। এবং অনেকের অবস্থা প্রায় ভূমিদাসের মত ছিল। সেচ ব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বড় জলাশয়, বাঁধ ইত্যাদি কৃষি কার্যের জন্য নির্মিত হত।

বাণিজ্যিক রাজস্বের মধ্যে ছিল উৎপন্ন পণ্যের উপর বিভিন্ন আদায়, শুল্ক ও কর। এছাড়া সম্পত্তির উপর কর আরোপ করা হত। কৃষি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তির মানুষদের বৃত্তিকর দিতে হত। গ্রামগুলি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল।

গ্রাম বা শহরের কারিগরেরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ছুতোর, স্বর্ণকার ও কামারদের সম্মান বেশি ছিল। কারিগরদের নিজস্ব সমবায় সংঘ ছিল। সংঘগুলি ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘের জন্যই কাজ করত। বিদেশী বণিকদের নানারকম সুবিধা দেওয়া হত এবং আমদানি করা সামগ্রীর উপর শুল্কের হার চড়া ছিল না। ব্যবসায়ীদের সংঘগুলি কারিগরদের সংঘ থেকে অনেক বড় পরিধিতে কাজকর্ম করত।

বণিকরা ব্যবসার কাজে একস্থান থেকে অপর স্থানে গমন করতেন। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য উভয় থেকেই রাজস্ব আয় হত। ধাতু এবং গহনা শিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। অস্ত্র নির্মাণের জন্য লোহার ব্যবহার হত। হাতী, মুক্তা, হীরা, লবঙ্গ, চন্দন, মশলা এবং সুগন্ধী প্রভৃতি জিনিসগুলি ছিল বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। আরব থেকে ঘোড়াদের আমদানি করা হত এবং বাহমনী রাজ্যের উত্থানের পর এই বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়, বারবোসা জানিয়েছেন যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে গম, চাল, সুক্ষ্ম মসলিন প্রভৃতি বাহমনী রাজ্যে উৎপাদিত হত এবং চাওল বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী করা হত। চাওল বন্দর থেকে অভ্যন্তরে একটি বড় বাজারের অবস্থান ছিল সেখানে ষাঁড়ের পিঠে করে বণিকেরা সামগ্রী নিয়ে আসতেন বিক্রির জন্য।

২.১১ উপসংহার

অবশেষে আমরা সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে বলতে পারি যে, নিষ্কর জমিদানের মাধ্যমে ভারতে সামন্তব্যবস্থার বীজ বপন করা হয়েছে। অগ্রহার দানের রীতি প্রথমে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ; ক্রমশঃ তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভূমি দান প্রথমে জড়িত ছিল ধর্মীয় এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সাথে। পরবর্তীকালে রাজা অনেক ভূমি দান করেছেন সামরিক এবং বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে। জমিকে কেন্দ্র করে রাজা এবং কৃষকদের মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল যা সামন্তপ্রথাকে বিশেষভাবে শক্ত করেছিল। সামন্ত ব্যবস্থার উন্মেষের সময় ধরা হয় ৩০০-৬০০ খ্রীঃ সময়সীমায় ; ৬০০-৯০০ খ্রীঃ সময়েতে এই ব্যবস্থার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং চূড়ান্ত রূপটি ৯০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষিত হয়। তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক মূল বৈশিষ্টগুলি ছিল—ভূমির উপর রাজকীয় ও সামূহিক অধিকারের ক্রমহ্রাসমানতা, ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ, নতুন নতুন কর আরোপ ও বেগার প্রথার জন্য কৃষকদের অবস্থার ক্রমাবনতি, স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা, মুদ্রার অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি। গ্রামীণ জনগণ জমিতে তাদের পূর্বাধিকার হারিয়েছিলেন এবং এই নতুন অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২.১২ অনুশীলনী

১। অগ্রহার ব্যবস্থা কাকে বলে? বাংলার অর্থনীতিকে অগ্রহার ব্যবস্থা কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

২। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের কারণগুলি কি ছিল?

৩। আদি মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর একটি প্রবন্ধ লেখ।

৪। পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী কালে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কিরকম ছিল?

৫। বাহমনীর অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রী রমেশ চন্দ্র মুজমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ (কলিকাতা, ১৯৭০)

২। নীহার রঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) (কলিকাতা, ১৯৬৫)

৩। রামশরণ শর্মা—ভারতের সামন্ততন্ত্র (কলিকাতা ১৯৭৭)

৪। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত (কলিকাতা, ২০০০)

৫। রোমিলা থাপার—ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

৬। রণবীর চক্রবর্তী—প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (কলিকাতা, ১৯৯৭)

৭। Ram Saran Sharma—Early Medieval Indian Society (Kolkata, 2001)

৮। Tapan Ray Chaudhuri, Irfan Habib (ed.)—The Cambridge Economic History of India Vol-I (C.1200–C.1750) (Delhi, 1984)

৯। K. A. Nilakanta Sastri—A History of South India (Oxford University Press, 1966)

১০। R. C. Majumdar (ed.)—The History and Calture of the Indian People : The Classical Age (Bharatiya Vidya Bhavan Series) (Bombay, 1988)

একক ৩ ❒ ভারতের বহিঃবাণিজ্য (৫০০-১৩০০ খ্রিঃ)

৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ বহিঃবাণিজ্যের অবস্থা (৫০০-৯০০ খ্রিঃ)
৩.৩ বৈদেশিক বাণিজ্য (৯০০-১৩০০ খ্রিঃ)
৩.৪ বণিক সংঘ
৩.৫ পরিবহন
৩.৬ উপসংহার
৩.৭ অনুশীলনী
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ প্রস্তাবনা

প্রাকৃতিক, ভৌগলিক বিভিন্ন অবস্থান থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ষের একটি স্বাতন্ত্র অবস্থান আছে। বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্যে ও ভারতের নিজস্ব একটি আঞ্চলিক ঐক্য আছে। উত্তরে পর্বতমালা এবং দক্ষিণের সমুদ্র ভারতকে অন্য অঞ্চল থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং মনে হয় যে এই ভৌগলিক অবস্থানের ফলে ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ খুব নিভৃতে ঘটেছে এবং বহির্বিশ্বের প্রভাব এই সভ্যতার প্রসারকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের মতো বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে আদান প্রদানের উদাহরণ খুব কম দেশেই পরিলক্ষিত হয়। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ও বিদেশের সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সভ্যতার বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছে। প্রায় ত্রিশ শতক ধরে ভারতবর্ষ সামুদ্রিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে। সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে (জাভা, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া) ভারত উপনিবেশ সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ চীন, মালয় উপদ্বীপ, আরবদেশ ও পারস্যের বিভিন্ন শহরে ভারত তার বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। প্রাচ্য বা এশিয়ার দেশগুলি ছাড়াও পশ্চিম জগতের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বণিকদের দক্ষতা, রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা, জাহাজ নির্মানের নিপুণতা সমুদ্রে ভারতের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পঞ্চম শতকের পরবর্তীকালে যেমন কৃষি থেকে নতুন একটি ভূম্যাধিকারী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ও এই আদি মধ্যযুগে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। অষ্টম শতকে আরবদের সিন্ধু বিজয় এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বহিঃবাণিজ্যকে বিশেষ করে প্রভাবিত করেছিল। আমরা এই এককে পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করব।

৩.১ বহির্বাণিজ্যের অবস্থা (৫০০-৯০০ খ্রিঃ)

ঐতিহাসিক রাম শরণ শর্মার মতে পঞ্চম শতকের পর থেকে প্রায় দশম শতক পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্য সেরকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। পঞ্চম শতকের পর থেকে সোনার মুদ্রার মান ছিল নিম্নগামী। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের স্বর্ণমুদ্রা অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়নি। আগের এককে আমরা দেখেছি যে পাল রাজারা বাংলায় চারশত বছর রাজত্ব করা সত্ত্বেও তাঁদের আমলের কোন স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়নি। পাল রাজাদের মত শর্মার মতে রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর প্রতিহার রাজারা ও কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেননি। দক্ষিণ ভারতেও সাতবাহন শাসনের শেষ দিক থেকে মুদ্রা প্রচলন কমে গিয়েছিল। যেটুকু মুদ্রা এই জায়গায় পাওয়া গেছে। সেগুলি বেশির ভাগই তাম্রমুদ্রা এবং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এই আলোচ্য সময়ে ব্যবসার গতি হ্রাস পেয়েছিল। শর্মা মনে করেন যে ষষ্ঠ শতকের পর থেকে প্রায় চারশত বছর দক্ষিণের রাজ্যগুলি সেইভাবে মুদ্রা নির্মাণ করেনি। ধাতব মুদ্রা খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া ভূমিদান প্রথার উত্থানের ফলে বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়েছিল। মুদ্রা ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার অর্থ

ছিল অর্থনীতির সঙ্কোচন যেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি হয়। তাই শর্মা মনে করেন যে ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে দূরপাল্লার বাণিজ্যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের অবস্থা প্রায় একই প্রকার ছিল এবং মুদ্রাও বাণিজ্যের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায় যে, মুদ্রার অভাবে বাণিজ্যের অবস্থান প্রায় তলানীতে ঠেকেছিল।

কিন্তু রামশরণ শর্মা ও তার অনুগামীদের এই অভিমত পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। কবি কালিদাসের কাব্যে নানাপ্রকার বিপনি বা দোকানের বর্ণনা আছে। ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠী ও স্বার্থবাহের (যে সমস্ত বণিক সামগ্রী নিয়ে দূর দূরান্তরে পারি দিতেন, তাদের নেতা ছিলেন সার্থবাহ) উজ্জ্বল ভূমিকার কথা সমকালীন বহু সূত্রে বলা হয়েছে। বণিকরা নিজেদের পেশাদারী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ৫৯২ খ্রিঃ বিষ্ণু সেনের শাসনে 'বণিকগ্রাম' নামে একটি বণিক সংগঠনের উল্লেখ আছে। বিষ্ণু সেনের আদেশনামা থেকে জানা যায় যে মোটামুটিভাবে সমগ্র উপমহাদেশেই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত সম্ভব ছিল। ভারতের সঙ্গে বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে পারস্য উপসাগরের মাধ্যমে প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারস্য উপসাগরের উত্থানের ফলে ষষ্ঠ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কিছু বন্দর আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতকের শেষে চৌল ও কল্যাণ বন্দর দুটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৪২ খ্রিঃ) পারস্যের রাজা দ্বিতীয় খসরুর সাথে দৌত্য সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই সম্পর্ক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও খুব তাৎপর্য পূর্ণ ছিল।

পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ চলত প্রধানত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে। প্রাচীন বাংলার প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলা) এবং দুই চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্ত বন্দরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চল (কুমিল্লা, নোয়াখালি এলাকা, বাংলা দেশ) সমুদ্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিল। হিউয়েন সাঙের লেখা থেকে আরও জানা যায় যে ওড় বা উৎকল দেশে চরিত্র ও কঙ্গোঙ্গা বন্দর দুটি ও দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিত। সুদূর দক্ষিণ ভারতে পল্লব ভূখণ্ডের অন্তর্গত কাঞ্চীপুরম ও মহাবলীপুরম অঞ্চল ছিল প্রধান সমুদ্র বাণিজ্য কেন্দ্র। বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মালাবার উপকূলের বন্দরগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। কারণ এই স্থানে পূর্ব রোমান সম্রাটদের মুদ্রা পাওয়া গেছে। (ভারতের সাথে, এটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের প্রমাণ দেয়)।

খ্রীঃ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে বাণিজ্য চলত, তার পরিমান ও গুরুত্ব ভারত-রোম বাণিজ্যের সাথে তুলনীয় নয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইসলাম ধর্মে নগর ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারত সাগরে আরব বণিকদের উত্থানের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্য ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ভারত মহাসাগরে আরবদের আগমন ভারতের বহির্বাণিজ্যকে প্রভাবিত করেছিল। আরব বণিকেরা অষ্টম শতকে ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মালাক্কা হয়ে চীনে যেত। চীনের ইতিহাসে আরব বণিকদের বাণিজ্যের কথার উল্লেখ আছে। ভারতের উপকূলের বন্দরগুলিতে আরবদের বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল। বাষ্পীয় সমুদ্রযান আবিষ্কারের আগে সমুদ্রে বণিকরা মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করত। পশ্চিম এশিয়ার বন্দরগুলি থেকে রওনা হয়ে (হরমুজ, মোখা, এডেন) আরব জাহাজগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরে আসত এবং এখান থেকে মালাবার ও করমন্ডল হয়ে তারা চীনে যেত। অষ্টম শতকের আগে এই পথে একটি মাত্র আরব জাহাজ যাতায়াত করত। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে একাধিক জাহাজ এই পথে পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু আগের মত দীর্ঘ পথ তারা অতিক্রম করত না। আরব ব্যবসায়ীরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ নিয়ে আসত। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌছানো সহজ ছিল। আখ্বর-আ-সিন ওয়া-ল হিন্দ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে পারস্য উপসাগরীয় প্রসিদ্ধ বন্দর কুলুমমালি বা কুইলনে আসত। ইবন বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে কুলুমমালি বা কুইলন ও কালিকট পর্যন্ত আরব 'ধাত' জাহাজগুলি আসত। চীনা জাহাজ (জ্যাঙ্ক) ভারতীয় বন্দর কালিকট ও কুইলনের বেশি যেত না। আরব জাহাজ থেকে পণ্য নামিয়ে তা চীনা জাহাজে ওঠানো হত এবং চীনা পণ্যদ্রব্য আরব জাহাজে উঠত। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি হয়ে উঠেছিল পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য

বিনিময় কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যে ভারত মধ্যবর্তীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর মতে এর দ্বারা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। আরব থেকে চীন পর্যন্ত পাড়ি দেওয়া ছিল ব্যয় বহুল। তাই আরবরা ভারতকে অন্তবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

গুজরাট, কোঙ্কন ও মালাবার উপকূল আন্তর্জাতিক এশিয় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। সুলেমান, আল মাসুদ্দি, আল ইদ্রিসি প্রভৃতি আরব লেখকেরা ভারতের বন্দর ও বাণিজ্যের উল্লেখ করেছেন। গুজরাটের কাম্বে, কোঙ্কনের সিনদান, সোপারা, চৌল, গোয়ার সিন্দাপুর এবং মালাবারের কুইলন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আরব বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বসরা ও সিরাফ এবং পারস্য উপসাগর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পারস উপসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে আরব জাহাজ গুজরাট ও কোঙ্কনে উপস্থিত হত। প্রায় সব আরব লেখক কামকামের (মাকানকাম) কথা উল্লেখ করেছেন। এটি হল কোঙ্কন উপকূলের অঞ্চল। আরব লেখকদের বিবরণে এই অঞ্চল 'বালহারা' শাসকদের অধীনে ছিল। বালহারা শব্দটি রাষ্ট্রকূট রাজাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটদের কোঙ্কন উপকূলের উপর আধিপত্য লেখমালা দ্বারা সমর্থিত। আল মাসুদীর লেখা থেকে জানা যায় যে, চৌল বন্দরে কমপক্ষে দশ হাজার মুসলমান বণিক বসবাস করত। এঁদের মধ্যে সিরাফ, ওমান, বসরা ও বাগদাদের বণিকেরা ছিলেন। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা দ্বিতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালে (৮৭৮-৯১৫ খ্রিঃ) আরবরা সনজন ও সন্নিহিত উপকূল অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের পরবর্তীকালে ও আরবদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অটুট ছিল এবং চিনচানি থেকে পাওয়া দুটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় ইন্দ্র ও তৃতীয় কৃষ্ণ আরবদের যথেষ্ট সমর্থন করতেন এবং আরব বণিকেরা কোঙ্কন উপকূলে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রকূটদের পরে কোঙ্কনে যখন শিলাহার বংশীয় রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কোঙ্কন উপকূলে আরবদের উপস্থিতি বজায় ছিল।

অষ্টম শতকের পর পূর্ব ভারতের বড়ো বন্দর তাম্রলিপ্তের পতন ঘটে। নবম ও দশম শতকের আরব লেখকদের বর্ণনা থেকে 'সমন্দর' (চট্টগ্রামের কাছে) ছিল বাংলার সমৃদ্ধ বন্দর। আল ইদ্রিসি লিখেছেন যে, এই বন্দরে বাণিজ্য করে আরব বণিকেরা লাভবান হয়। ইবন বতুতা চট্টগ্রামকে 'সুদকাওয়ান' বলে অভিহিত করেছেন। এই বন্দর সমৃদ্ধ ছিল এবং কামরুপের বাণিজ্য এই পথে পরিচালিত হত। আরব লেখকেরা আরও জানিয়েছেন যে, চট্টগ্রামের সঙ্গে উড়িষ্যা ও কাশ্মির বাণিজ্য চলেছিল। শ্রীলঙ্কা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য পাঠানো হত। সমবন্দরের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে বাংলার বাণিজ্য চলেছিল ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাই বলা যেতে পারে যে আদি মধ্যযুগে সমন্দর বা সুদকাওয়ানের উত্থান বাংলাকে পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যুগপৎ বাণিজ্যিক লেনদেনে যুক্ত করে দেয়।

রাধা কুমুদ মুখার্জির মতে গুপ্ত এবং হর্ষবর্ধনের আমল থেকে ভারতের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ পূর্ব দিকে জাভা ও সুমাত্রার উপনিবেশ ছাড়িয়ে সুদূর প্রাচ্যে চীন ও জাপানে বিস্তৃত হয়েছিল। কাকাসু ও কাকুরা মন্তব্য করেছেন যে বাংলা উপকূলের নাবিকেরা সিংহল, জাভা ও সুমাত্রাতে উপনিবেশ স্থাপনের সাথে সাথে চীন এবং ভারতকে একটি গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। ষষ্ঠ শতকের আগে চীন, ভারত, পারস্যে এবং আরবে সেভাবে সামুদ্রিক অভিযান করেনি। গুপ্তদের পরবর্তীকালে অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে ভারতের সামুদ্রিক সম্পর্ক পশ্চিমের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চম শতকে ভারত এবং চীনের জাহাজ প্রায়শই ইউফ্রেটিস অঞ্চলে দেখা যেত। সিন্ধু প্রদেশ এবং গুজরাট বন্দর এই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। এই বন্দরগুলি থেকেই ভারতীয় অভিযানকারীরা জাভায় উপনিবেশ গড়ার লক্ষ্যে রওনা হয়েছিলেন। ৫২৬ খ্রিঃ সিন্ধু বা দেবল সিংহলের সাথে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে শ্রীহর্ষের রাজত্বকালে পারস্যের মুখ্য নগরগুলিতে হিন্দুরা বসবাস করতেন এবং স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতেন। সপ্তম এবং অষ্টম শতকে চীন জাহাজ দিউ অঞ্চলে আসত। একজন চীনা ভ্রমণকারী চাও জুকুয়ার লেখা চু-ফান চী থেকে জানা যায় যে সপ্তম শতকে ভারতবর্ষ থেকে চীনের সুং রাজাদের কাছে নজারানা সমেত দূত প্রেরণ করা হত। ভারত প্রথম জাপানের তুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে পরিচিত করিয়েছিল।

৩.৩ বৈদেশিক বাণিজ্য (৯০০-১৩০০ খ্রিঃ)

রাম শরণ শর্মা মতানুযায়ী দশম শতকের পরবর্তীকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় আবার মুদ্রার ব্যবহারের বৃদ্ধি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের পরিচায়ক। একাদশ শতকের পর থেকে আরবরা উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম থেকে শুরু করে মুলতান পর্যন্ত স্থলপথের বাণিজ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শর্মা এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে দশম শতকের শেষে চোল, চালুক্য, কালচুরী, চান্দেল প্রভৃতি শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান বহির্বাণিজ্য বিস্তারকে আরও প্রভাবিত করেছিল এবং বেশি পরিমাণ মুদ্রা ব্যবহার করা হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে মিশরে ফতিমিদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও সিরাফ ও বাসরার কিছুটা অবনতির ফলে ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল। পারস্য উপসাগরের তুলনায় লোহিত সাগর ক্রমশ অধিকতর গুরুত্বকপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর তাৎপর্য্য ছিল যে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের সাথে ইউরোপের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যের পক্ষে এর প্রভাব অনুকূল হয়ে উঠেছিল। এডেন থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে যাতায়াতের জন্য গুজরাট ও মালাবারের বন্দরগুলি উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইবন বতুতা ও মার্কো পোলো যে সব বন্দরের তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে মালাবার উপকূলের বন্দরের সংখ্যা বেশি ছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলি হল কুইলন, কালিকট, পান্ডারানি, ম্যাঙ্গালোর ও গোয়া। এডেনের এই সকল বন্দর এবং থানা ও কাম্বের সাথে যোগাযোগ ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে মুসলমান বণিকদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দ্বাদশ শতকের একটি ব্যবসায়ী চিঠি থেকে এস. ডি. গয়টাইম ভারতের সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল বিশ্ব-এর ভূমিকার সন্দেহাতীত প্রমাণ পেয়েছেন। বিশ্ব গুজরাটের বন্দরগুলির সাথে নিয়মিত লেনদেন চালাত।

১১৯২ খ্রীঃ টুডেলার বেঞ্জামিন মালাবার উপকূলে ইহুদী বণিকদের বসতি লক্ষ্য করেছিলেন। ইহুদি বণিকদের চিঠি থেকে এই বাণিজ্যের নিশ্চিত প্রমান পাওয়া যায় এবং এডেন ও আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্যের চাহিদা দাম, জাহাজী পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে এই চিঠিগুলি থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। তাই আদি মধ্যযুগের ভারতীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে এই চিঠিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

চোলদের শাসনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চোলদের সময় করমন্ডল উপকূল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। মামল্লপুরম চোলদের রাজত্বকালে একটি বড়ো বন্দর ছিল। পরে নেগাপত্তনের (নাগ পট্টনম) উদ্ভব ঘটলে মামল্লপুরমের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। চীনের সুং বংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে চোলরাজা রাজরাজ চোল চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। দশম শতকের পর থেকে চীনের ভূমিকা এশিয়ার সমুদ্র বাণিজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ভারত পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে অন্তবর্তী ঘাঁটি ছিল।

রাজেন্দ্র চোলের আমলে (১০১২-৪৪) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শ্রী বিজয়ের রাজা চোলদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। শ্রী বিজয়ের রাজা নাগপত্তমে চূড়ামণি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। করমন্ডল ও চীনের মধ্যে অন্তবর্তী ঘাঁটি ছিল শ্রীবিজয় রাজ্য। অর্থনৈতিক কারণে চোল রাজারা কম্বোডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। প্রথম কুলোতুঙ্গ বৈদেশিক বাণিজ্যিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য শুল্ক ছাড়ের কথা ভেবেছিলেন। চীন থেকে ব্রহ্মদেশ হয়ে চোল রাজ্যে যাওয়া যেত। তাই চোলরাজ প্রথম কুলোতুঙ্গ ব্রহ্মদেশের মাঝেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর সময় বেঙ্গি উপকূলে বিশাখাপত্তনম বন্দরের উত্থান ঘটে। কৃষ্ণা-গোদাবরী দ্বীপ অঞ্চলের এই বন্দর দিয়ে সহজে ব্রহ্মদেশ যাওয়া যেত। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চোল নৌবহরের আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাজারাজ ও রাজেন্দ্রচোল নৌ অভিযানের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও শ্রী বিজয় অধিকার করেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মার্কো পোলার (মার্কো পোলো দক্ষিণ ভারতে অনেক মাস ছিলেন এবং তাঁকে 'Prince of medieval travellers' বলা হয়ে থাকে) অভিমত জানা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন যে এই অঞ্চলকে

বিদেশীরা 'মাবার' বলে চিনতেন যার আরবী অর্থ হল 'Passage' বা পথ। এই পথটি সাধারণত ভারতের সেই উপকূল অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে আরব ও পারস্য উপদ্বীপ থেকে ভ্রমণকারী ও বণিকেরা মাঝে মাঝে আসতেন। একজন মুসলমান লেখকের মতে মাবার কুইলন থেকে নেলোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মার্কো পোলো পান্ড্য রাজাদের প্রশংসা করে বলেছেন যে পান্ড্য রাজারা বণিক এবং বিদেশীদের প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করতেন যাতে তারা খুশি হয়ে পান্ড্য রাজ্যে আসেন। ঘোড়া ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে পশ্চিম (এডেন, হরমোস, আরব) থেকে বিভিন্ন জাহাজ 'কয়াল' নগর (পান্ড্য রাজাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র) হয়ে দক্ষিণের অন্যান্য অঞ্চলে যেত। তাই মার্কো পোলো মনে করেন যে 'কয়াল' নগরে বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সংমিশ্রন ঘটত এবং অনেক ব্যবসা হত। তবে বেশির ভাগ সম্পদ অপচয় হত ঘোড়া ক্রয় করতে। মার্কো পোলো ভারতে প্রচুর ঘোড়া আমদানির কথা লিখেছেন। ঘোড়া বিক্রি করে আরবরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। দক্ষিণ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ও আরবদের থেকে ঘোড়া কিনে দেশে বিক্রি করত। সমসাময়িক মুসলমান লেখকেরা এই অভিমতকে সমর্থন করেছেন। চীন, আরব এবং লেভান্ট (ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিক) থেকে বণিকেরা গোলমরিচ, নীল রং প্রভৃতি জিনিসগুলির জন্য এখানে আসতেন। মালাবার উপকূলে জল দস্যুদের আক্রমণের উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রাচ্য থেকে আগত জাহাজগুলিতে তাম্র, রেশম, সোনা, চন্দন এবং বিভিন্ন মশলা এই দেশে আসত এবং বণিকেরা এই দেশের জিনিসের পরিবর্তে তা বিনিময় করতেন।

চোল ব্যবসায়ীরা বর্হিঃবাণিজ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করত। পূর্ব উপকূলে মহাবলীপুরম, কাবেরীপত্তনম, শালিয়ুর এবং কোরকাই বন্দর এবং মালাবার উপকূলে কুইলন বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে বস্ত্র, ঔষধ, দামী পাথর, হাতির দাঁত ও কর্পূর চীনে ও পশ্চিমী জগতে রপ্তানি হত। বাহাত্তর জন চোল বণিকদের নিয়ে একটি মিশন ১০৭৭ সালে চীন দেশে যাত্রা করেছিল। গোলপজল, সুগন্ধী, লবঙ্গ ইত্যাদি উপহারের বিনিময়ে তারা ৮১,৮০০ তাম্র নগদ পেয়েছিল। শ্রী বিজয়ের রাজা ১০৯০ সালে চোল রাজা প্রথম কুলটুঙ্গার রাজসভায় দূত প্রেরণ করেছিলেন হরমুজ, কাইস ও এডেনে যুদ্ধের ঘোড়া পাওয়া যেত। সেখানকার ব্যবসায়ীরা ঘোড়া নিয়ে এদেশে এনে বিক্রি করতেন। কয়েকটি ঘোড়ার দাম ওঠে ৫০০ সোনার 'সাগগি' যার মূল্য ছিল ১০০ রৌপ্য মার্কেরও বেশি। কিন্তু এই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ঘোড়াগুলি বেশিদিন বাঁচত না।

৩.৪ বণিক সংঘ

বণিকরা নিজেদের সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংঘগুলি হল মনিগ্রামম, নানাদেশি ইত্যাদি। কাকতীয় রাজাদের নথি থেকে তিন ধরণের বণিকদের কথা জানা যায় যথা— দেশের বণিক (স্বদেশে বেহেরুলু), অন্যদেশের বণিক (পরদেশবেহেরুলু) এবং বিভিন্ন দেশের বণিক (নানা দেশি)। প্রথম শ্রেণীর বণিকেরা ছিলেন স্থানীয় মানুষ যারা তাদের অঞ্চলে নিজেদের সংঘ গঠন করে ছিলেন। এই সংঘকে বলা হয় 'নগরাম'। দ্বিতীয় শ্রেণীর বণিকেরা অন্য দেশ থেকে আসতেন। তারা প্রতিবেশি রাজ্যে ভ্রমণ করতে এসে কিছুটা ব্যবসাও করতেন। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠিত সংঘগুলি যেখানে বিভিন্ন দেশের বণিকরা সংঘবন্ধ হত এবং বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। 'আইনরুভার' মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য সংঘ। বিখ্যাত রাজাদের মত এই বণিক সংঘের নিজস্ব প্রসস্তি ছিল যেখানে তাদের কৃতিত্ব বর্ণিত আছে। তাঁরা বণিক ধর্মের রক্ষাকর্তা। তারা নিজস্ব পতাকা এবং চিহ্ন ব্যবহার করতেন। সুল ও জলপথে তারা ছয়টি মহাদেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। হাতী, মুক্তো, রুবী, হীরে, মশলা ও সুগন্ধী ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে তারা বাণিজ্য করতেন। ১০৮৮ তে সুমাত্রায় আবিষ্কৃত একটি তামিল লেখর ভগ্নাংশ থেকে এই বণিকদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

৩.৫ পরিবহন

বাণিজ্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যাতায়াত ব্যবস্থা হল জাহাজ। অনেক প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে জাহাজ নির্মাণের শিল্প দক্ষ ও উন্নত ছিল। সমুদ্রের জাহাজগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হত—'দীর্ঘ' অর্থাৎ সেই জাহাজগুলি তাদের দৈর্ঘ্যের জন্য বিখ্যাত এবং 'উন্নত' অর্থাৎ যেই জাহাজগুলি দৈর্ঘ্য বা প্রস্থের চেয়ে উচ্চতার জন্য পরিচিত। দশ ধরনের 'দীর্ঘ' জাহাজ এবং পাঁচ রকমের 'উন্নত' জাহাজের কথা জানা যায়। জাহাজে তিন ধরণের কুঠরি (cabin) দেখা যেত। কুঠরির দৈর্ঘ্য ও অবস্থান অনুযায়ী তিন রকমের জাহাজের কথা জানতে পারি যথা 'সর্বমন্দিরা' জাহাজ (যার কুঠরি সবচেয়ে বড়ো এবং রাজার সম্পত্তি, ঘোড়া ইত্যাদি বহন করতে ব্যবহৃত হত), মধ্যমন্দিরা জাহাজ ও অগ্রমন্দিরা জাহাজ যেগুলি দূরপাল্লার বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত। ভারতে সেগুণ কাঠের গুণাগুণের জন্য সেগুণ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হত। পারস্য উপসাগর এবং দক্ষিণ আরবে এই কাঠ রপ্তানি করা হত। বাংলায় জাহাজ নির্মাণের শিল্প আরব এবং চীনাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে পাওয়া অবশিষ্ট থেকে বোঝা যায় যে জাহাজ নির্মাণে দক্ষ কারিগরী শিল্প ব্যবহৃত হত। পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যে সমুদ্র ভ্রমণের উল্লেখ আছে। নারায়ণ নামে এক কবির লেখা থেকে ত্রয়োদশ শতকে 'চাঁদ সওদাগরের' বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায়। জাহাজগুলিকে 'গঙ্গাপ্রসাদ', 'সাগরফেনা', 'রাজবল্লভ' ইত্যাদি নামে নামাঙ্কিত করা হত।

কোন অলস, রোগগ্রস্ত বা অক্ষম ব্যক্তির বাণিজ্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। বণিক হবেন চতুর, সৎ এবং উদ্যোগী। এই যৌথ ব্যবসায় সেই বণিক যতখানি মূলধন বিনিয়োগ করেছেন। তিনি ঠিক সেই অনুপাতে খরচা করবেন, শ্রম দেবেন এবং মুনাফা অর্জন করবেন। যদি কখনও কোন কারণে বাণিজ্যে লোকসান হয়, তবে সমস্ত অংশীদারগণ তাদের অংশ অনুযায়ী ক্ষতি বহন করবেন। যদি কোন একজন অংশীদারের জন্য বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, তবে তিনি সব অংশীদারের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। যদি কোন বণিক ব্যবসাকে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তবে তার দ্বারা রক্ষিত দ্রব্যের মূল্যের এক-দশমাংশ তাকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে। বণিকরা দেশীয় জিনিসের উপর ৫% মুনাফা এবং বৈদেশিক দ্রব্যের উপর ১০% মুনাফা লাভ করতে পারবেন। বণিকেরা দেশীয় মহাজনদের থেকে টাকা ঋণ নিতেন। বণিকদের ঋণের উপর ১০% সুদ ধার্য করা হত এবং যারা বিদেশে জিনিস নিয়ে যাত্রা করতেন, তাদের উপর সুদের হার দ্বিগুণ করা হত। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে বণিকদের জাহাজ দূরপাল্লার বাণিজ্যে ডুবে যেতে পারে। জলদস্যু বা হিংস্র জন্তু তাদের আক্রমন করতে পারে। তাই মূলধনের কিছুটা আদায়ের জন্য সুদের হার চড়া হত।

তাই বলা যেতে পারে যে নবম শতক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির বহির্বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছিল যা ছিল সমৃদ্ধির পরিচায়ক। ভারত ছাড়াও চীনের সুং রাজবংশ, শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র রাজগণ এবং বাগদাদের আব্বাসীদ খালিফারা এই বাণিজ্যের দ্বারা লাভবান হয়েছিলেন। রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য নবম শতকের শেষ দিকে চীনে বাণিজ্য করা বণিকদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না কিন্তু চিনের জাহাজ নিয়মিত মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রায় আসত বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য। চীনের জাঙ্কগুলিকে মাঝে মাঝেই ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে দেখা গিয়েছে। দশম শতকে চীনের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির পর সুং সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে। ইহুদী বণিক বেঞ্জামিন টুডেলা (১১৭০) চোলদের সময়ে কুইলনের ব্যবস্থার একটি বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর মতে 'এই রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে খুবই বিশ্বাসযোগ্য। কোন বিদেশী বণিক বন্দরে প্রবেশ করলেই রাজার সচিবেরা বণিকদের নাম এবং তার অন্যান্য পরিচয় রাজাকে জানাতেন এবং বিদেশী বণিকদের জাহাজ মেরামতের বন্দোবস্ত করতেন। রাজা তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং এই প্রথা পুরো সাম্রাজ্যেই প্রচলিত ছিল।' কাকতীয় বংশের রাজা গণপতিদের ত্রয়োদশ শতকে অন্ধ্র রাজ্যে বিদেশী বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতেন। তিনি নিরাপত্তার একটি সনদ (অভয় শাসন) জারি করেছিলেন। এই সনদ অনুযায়ী কোন বিদেশী বণিকের জাহাজ ডুবির পর তার সম্পত্তি আর বাজেয়াপ্ত করা হত না এবং আমদানি রপ্তানির উপর এক-তৃতীয়াংশ শুল্ক ধার্য্য করা হত।

৩.৬ উপসংহার

রণবীর চক্রবর্তী বলেছেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের মত এক বৃহদায়ন ভূ-খণ্ডে অর্থনৈতিক জীবন কখনও স্থবির হয়ে যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবন ছিল গতিময় এবং পরিবর্তনশীল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিকতা দেখা গিয়েছিল। সমুদ্র বাণিজ্যে ব্যবসায়ীরা মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আদি মধ্যযুগে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার জাহাজের সংযোগস্থলে পরিণত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। অষ্টম শতক পর্যন্ত পশ্চিমী জাহাজগুলি সরাসরি চীন অবধি যেত। নবম ও দশম শতকে তারা স্বল্পতর দৈর্ঘ্য পাড়ি দেওয়া শুরু করল। ফলে ভারত মালাবার উপকূলস্থ কুইলন ও কালিকটের বন্দরে পশ্চিমী 'ধাও' ও চীনা 'জাঙ্ক' আসত এবং পরস্পরের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের পর দেশে ফিরত। ভারত অত্যন্ত দামী বিলাসবহুল পণ্য (মসলিন, রেশম, সুগন্ধী, মুক্তো, হীরা প্রভৃতি) নিয়েই বিদেশে বাণিজ্য করত না। দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রীগুলি (নুন, লোহা, মোটা কাপড়, শস্য ইত্যাদি) জিনিসও বিদেশে রপ্তানি করত। গয়টাইন অনেকগুলি বাণিজ্যিক চিঠির ভিত্তিতে দেখিতেছেন যে দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অনিরুদ্ধ রায় মনে করেন যে খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালদ্বীপ, ভারত ও পারস্য উপসাগর ক্রমে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে আদি মধ্যযুগে ভারতের বাণিজ্য যথেষ্টই গতিশীল ছিল। বিশেষত দূরপাল্লার বাণিজ্য ভারত ও বিদেশী সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

৩.৭ অনুশীলনী

১। পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?
২। আরব ও ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে কি ধরণের ভূমিকা পালন করেছিল?
৩। পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে ভারতের অবদান কি ছিল?
৪। চোল রাজাদের বাণিজ্যিক নীতিগুলি আলোচনা কর।
৫। ভারতের বহির্বাণিজ্যে বণিকদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(ক) রণবীর চক্রবর্তী — প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (কলিকাতা, ১৯৯৭)
(খ) রোমিলা থাপার — ভারতবর্ষের ইতিহাস (কলিকাতা, ১৯৮০)
(গ) সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় — আদি মধ্য ও মধ্যযুগে ভারত (৬৫০-১৫৫৬) (কলিকাতা, ২০০৮)
(ঘ) K. N. Chaudhury – Trade and Civilization in the Indian Ocean, an economic history from the rise of Islam to 1950. (Cambridge. 1985).
(ঙ) Tapan Ray Chaudhuri & Irfan Habileed – The Cambridge Economic History of India Vol-I (C1200 – C1750) (Cambridge University Press, 1982)
(চ) Bhakat Prasad Majumdar – The Socio-Economic History of Northern India (11th – 12th Centuries) (Kolkata, 1960)
(ছ) Radha Kumud Mukherjee – A History of Indian Shipping (Kolkata, 1957)
(জ) Niharranjan Ray & B. D. Chattopadhyay ed – A Source book of Indian Civilization (New Delhi, 2000)
(ঞ) K. A. Nilakanta Sastri – A History of South India (Madras, 1966)
(ত) R. S. Sharma – Early Medieval Indian Society, A study in feudalism (Kolkata, 2001)

একক ৪ ❑ উপর থেকে সামন্ততন্ত্র ও নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র

গঠন

৪.১ ভূমিকা
৪.২ ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র
৪.৩ ডঃ ডি. ডি. কোশাম্বীর মত
৪.৪ ডঃ কোশাম্বী-র বিরুদ্ধ মতামত
৪.৫ কার্ল মার্কসের মত ও তার সমালোচনা
৪.৬ সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক বিতর্ক
৪.৭ উপসংহার
৪.৮ প্রশ্নাবলী
৪.৯ সহায়ক গ্রন্থসমূহ

৪.১ ভূমিকা

ভারতবর্ষে আদি মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের বিষয়টি ভারতীয় ইতিহাস গবেষণার একটি অতি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিংশ শতকের এক বিস্তৃত সময়কাল ধরে এবং অদ্যাবধি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্ক বর্তমান। ডঃ ডি. ডি. কোশাম্বী এ সম্পর্কে আলোচনাকালে 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' ও 'নিচু থেকে সামন্ততন্ত্রের' তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ রামশরণ শর্মা, ডঃ বি. এন. এস যাদব, ডঃ ডি. এন. ঝা, ডঃ ইরফান হাবিব, ডঃ বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই বিতর্কের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এইভাবে আলোচনা করা এবং সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত বিতর্ক বিষয়ে আলোকপাত করা।

৪.২ ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র

ইয়োরোপের ইতিহাস মধ্যযুগের আবির্ভাবের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভূমি-সম্পর্কের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক বিশেষ ধরণের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন, নির্দিষ্টভাবে, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে যুক্ত করে সামন্তপ্রথা ও মধ্যযুগের সূচনার বিষয়টি আলোচিত হয়। ভারতবর্ষে আদি-মধ্যযুগের সূচনা করল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ইয়োরোপীয় মডেলটি বিচার করা হয়। অগ্রহার দান ব্যবস্থা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হলে ভারতবর্ষেও সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের আবির্ভাব ঘটে। কার্ল মার্কস সামন্তব্যবস্থাকে এক বিশেষ ধরনের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসবাদী পন্ডিতদের মতে, সামন্তপ্রথার মূল উপকরণ ভূমি। ভূ-সম্পদের উপর ভূস্বামীদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এখানে উৎপাদনের উপাদান ও উপকরণের উপর ভূস্বামীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। বলা বাহুল্য উৎপন্ন সামগ্রীর উপরেও ভূস্বামীর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভূস্বামীর নানা স্তরে বিভক্ত। সর্বনিম্ন স্তরে থাকে ভূমিদাসরা। এই ভূমিদাস শ্রেণী জমির সাথে আবদ্ধ। তবে জমির উপর এদের কোন মালিকানা থাকে না। জমি হস্তান্তরিত বা বিক্রী হলে এই জমির সাথে যুক্ত ভূমিদাসরাও হস্তান্তরিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সামন্তব্যবস্থায় রাজা সামন্তদের উপর অর্থ ও সৈন্যবলের জন্য একান্তভাবে নির্ভরশীল

থাকেন। স্বভাবতই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি ঘটলে অনিবার্যভাবেই রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে অর্থাৎ সামন্তব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তির অবনমন ঘটে এবং আঞ্চলিক শক্তির উত্থান অনিবার্য হয়।

৪.৩ ডঃ ডি. ডি. কোশাম্বীর মত

ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী তাঁর An Introduction to the Study of Indian History গ্রন্থে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' ও 'নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র'-এর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। উপর থেকে সামন্ততন্ত্র বলতে তিনি বুঝিয়েছেন এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে একজন সম্রাট বা শক্তিশালী রাজা তাঁর অধীনস্থ শাসকদের কাছ থেকে নজরানা আদায় করেন। এই শাসকবৃন্দ রাজাকে কর বা নজরানা প্রদানের বিনিময়ে নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে পারেন। এই অধস্তন শাসকরা উপজাতি প্রধানও হতে পারেন এবং এক মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামী শ্রেণির সহায়তা ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ শাসনের দ্বারা নিজ অঞ্চলে শাসনকার্য চালাতে পারেন। নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র বলতে ডঃ কোশাম্বী বুঝিয়েছেন এর পরবর্তী স্তর যেখানে গ্রামের মধ্যেই রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্তী স্তরে এক ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে যে শ্রেণি স্থানীয় জনগণের উপর সশস্ত্র ক্ষমতা আরোপ করে। এই শ্রেণী রাষ্ট্রকে সামরিক সেবা দিত। তাই রাষ্ট্রশক্তির সাথে সরাসরি সম্পর্ক দাবী করত এবং এর মাঝে অন্য কোনও স্তরের হস্তক্ষেপ ছিল না। ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগীরা রাজস্ব আদায় করে তার একাংশ সামন্ততান্ত্রিক উচ্চস্তরীয় কর্তৃত্বের কাছে হস্তান্তরিত করতেন। উভয় ক্ষেত্রেই আদিম খাদ্য সংগ্রাহক উপজাতীয় সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার অবশিষ্টই কাযকরী ছিল। কৃষিজীবি গ্রামগুলির উপর ছোটো রাজ্যগুলির উত্থানের সাথে সাথে কিছু সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী ছিল। পরবর্তী সাতবাহন শাসকবৃন্দ কেবল রাজাদের ভাবমূর্তি তৈরির ব্যাপারেই কুষাণ রাজাদের অনুসরণ করেননি। প্রশাসনের ব্যাপারেও উত্তরের পদ্ধতি গ্রহর করেছিলেন। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আমলে ৪০০ খ্রীঃ নাগাদ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে রাজকর্মচারীরা সামন্ত ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করেননি। 'মধ্যদেশ'-এর বাইরের ভূখণ্ডগুলির উপর নিশ্চিত ভাবেই কর আরোপ করা হত, করের হার ছিল মোট উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ। অনুমিত হয় যে, সাম্রাজ্যের মধ্য এলাকায় করের হার কম ছিল। 'অমরকোশ' অনুসারে গ্রামাঞ্চলে মদের ভাটি এবং বিক্রেতা ছিল। জমিতে থাকা বা ছেড়ে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা আবদ্ধ-ভূমিদাসত্বের অনুপস্থিতির স্বাক্ষ্য বহন করে। তবে, তা সত্ত্বেও একথা স্পষ্ট নয় যে বৌদ্ধ মঠগুলি কিভাবে অধিবাসী জনগণ ও তাদের গবাদি পশুসহ জমি অধিকারে রাখত। ভূমিদান পত্রগুলি থেকে বলা যায় যে, বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের উপর রাষ্ট্রের অধিকার দান গ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হত, যার অর্থ হল নির্দিষ্ট নজরানা লাভ কিন্তু মালিকানার অধিকার নয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান লাভের উৎস ছিল সাম্রাজ্যের মূল অংশের বাইরেকার বিজিত উপজাতীয় ও রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলি। 'দক্ষিণপথ' বা দাক্ষিণাত্যের রাজাদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে তাদের গুপ্ত সম্রাটকে কর ও নজরানা দিতে হোত। এই সময়ে উপজাতীয় রাজ্যগুলি তো বটেই এমনকি বনবাসী জনগোষ্ঠীগুলিও রাজতন্ত্র অবলম্বন করেছিল। এরপর রাজার গৌরবের বিষয় ছিল এই যে তিনি প্রতিবেশী শাসকদের অস্ত্র বলে দমন করে করদ শাসকে পরিণত করেছেন। সুতরাং 'সামন্ত' শব্দটি পূর্বে যার অর্থ ছিল 'প্রতিবেশী' বা 'প্রতিবেশী রাজা', তার পরিবর্তিত অর্থ, হয়ে দাঁড়ায় 'উচ্চ অধীনত শাসক' বা 'High-foundatory'। প্রথম গুপ্তরাজ ছিলেন শ্রীগুপ্ত, তাঁর পুত্র ঘটোৎকচগুপ্তের অভিধা কিছুটা উচ্চ ছিল কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়কাল থেকে গুপ্তরাজাদের অভিধা ছিল 'মহারাজাধিরাজ'।

গুপ্ত রাষ্ট্র বেসরকারি বসতিকে উৎসাহিত করে। যার শর্ত ছিল মৌর্য আমলের তুলনায় কম এবং পণ্যে কর প্রদান। তবে এই সমৃদ্ধিই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় সম্পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রিত গ্রামের বিকাশের অর্থ

ছিল মাথাপিছু পণ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস। বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গিল্ডগুলি ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর অবক্ষয় ঘটে। নূতন উপজাতিগুলি থেকে স্থানীয় রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। উচ্চাকাঙ্খী সামন্ত বা অতি সাহসী রাজকর্মচারীদের বাড়বাড়ন্ত সম্ভব হয়। নজরানা আদায় ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ে ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপেই সাম্রাজ্যের অবক্ষয় সূচিত হয়।

নূতন অর্থনীতি সাধারণভাবে বৃহৎ নগরগুলির অবক্ষয় সূচিত করে এবং তার পরিবর্তে গ্রামগুলি ক্রমশ সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ওঠে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের প্রথম সাফল্যের ফলে গড়ে ওঠা নূতন সমাজ কেবল অধিকতর শান্তিপূর্ণ ও কম শোষণমূলক ছিল না, তা নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি সংস্কৃতিবান ছিল।

সম্রাট হর্ষবর্ধন যে প্রয়াগের সঙ্গমে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৌদ্ধ শ্রমণ, দরিদ্র মানুষজন প্রমুখকে তাঁর সব কিছু দান করতেন তারপরে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা সম্রাটকে মণিমুক্তা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করতেন যাতে তাঁর রাজকোষ আবার পূর্ণ হয়। এই দাতব্য মূলক আচার-অনুষ্ঠান নজরানা প্রদান প্রথার সাক্ষ্য তুলে ধরে যা উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

ক্রমশ যখন সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন শাসকবৃন্দ ও জনসাধারণের চরিত্রেও পরিবর্তন আসে। পরবর্তী সময়ে নিচে থেকে সামন্ততন্ত্রের কালে, ক্ষুদ্রতর বণিক অসংখ্য বিধিনিষেধ এবং প্রবঞ্চকদের মাঝে পড়ে নিষ্পেষিত হতে থাকে। বদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির বিস্তারের বড়ো প্রমাণ হল মুদ্রা ছাড়া বিনিময় প্রথাভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রচলন। হর্ষের আমলের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। হর্ষর সাম্রাজ্য ছিল শেষ, মহান, ব্যক্তিগতভাবে শাসিত, কেন্দ্রীকৃত সাম্রাজ্য। এরপর, রাজ্যগুলি হয়ে ওঠে আকারে ছোট এবং সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণী ক্রমশ সংখ্যা ক্ষমতা গুরুত্ব বাড়িয়ে রাজা ও প্রজাদের মাঝে এক মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে গড়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি শ্রেণীতে পরিণত হয়।

এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ভূমিদানগুলির সাথে সামন্ততান্ত্রিক দানের পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। 'জাতকে' বলা হয়েছে অনাথ পিণ্ডকের মতো ধনী বণিকদের একটি গ্রামের উপর বিশেষ অধিকার ছিল। কিন্তু এ থেকে স্পষ্ট যে, রাজা কর্তৃক নিয়োজিত 'গ্রামীণ' গ্রাম থেকে লভ্যাংশ আদায় করলেও এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করলেও, কোনভাবেই সামন্ততান্ত্রিক মালিকানার অধিকারী ছিলেন না। তাম্র শাসনগুলি থেকে জানা যায় যে নবম শতক পর্যন্ত ভূমি মূলত মন্দিরগুলিকে দান করা হলেও অনেক সময়েই কোনও বিশেষ মন্দিরের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই এই এমন ব্রাহ্মণদেরও ভূমিদান করা হোত। এমনকি পরবর্তীকালেও ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের প্রাধান্য দেখা যায়। এই নূতন ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসে সহায়তা করেন। বাৎসরিক পঞ্জিকা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ। উপরন্তু তিনি বীজ, ফসল, গবাদিপশু পালন ও প্রজনন ইত্যাদি বিষয়েও তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। রাজকীয় আমন্ত্রণে কখনও কখনও অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে অনুপ্রবেশের ফলে, দূর অঞ্চলের বাজার এবং বিনিময়ের জন্য কার্যকরী ফসলের মূল্য সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। উপজাতীয় সমাজের ওপরেও ব্রাহ্মণদের বিপুল প্রভাব ছিল।

ভূমিদানের ফলে বৌদ্ধ মঠগুলিও চরিত্রগত পরিবর্তন আসে। বিহারের সম্পত্তির প্রশাসন ক্রমশ একটি বিশেষ পরিবারের লাভজনক একচেটিয়া কর্তৃত্বাধীন হয়ে দাঁড়ায়। কনিষ্ঠতর সন্তানকে মঠাধ্যক্ষ নিয়োগের মাধ্যমে সেই ভূ খণ্ডের নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা সেই পরিবারের হাতে রাখার প্রচেষ্টা করা হয়। বৌদ্ধ সংঘ এখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন উচ্চতর শ্রেণীগুলির উপর নির্ভরশীল একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বুদ্ধদেবের দাঁত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে ক্রমশ সম্পদ ও কুসংস্কারের গহ্বরে ধর্ম হারিয়ে যেতে থাকে।

উচ্চ বর্ণগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ক্রমশ এক মধ্যবর্তী ভূস্বামী শ্রেণি হিসাবে উদ্ভূত হতে থাকে। রাষ্ট্রের পক্ষেও তা সুবিধাজনক ছিল কারণ ব্রাহ্মণগণ সহজেই উপজাতিদের বর্ণাশ্রম প্রথার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম ছিল। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম ও প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে তাদের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব হারাতে থাকে।

বর্ণাশ্রম প্রথার ক্ষেত্রেও ক্রমশ শিথিলতা দেখা দিতে থাকে। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যকার বিভেদ ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে। নতুবা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মতো একজন যোদ্ধা শাসক কিভাবে নিজেকে একজন 'আদর্শ ব্রাহ্মণ' বলে দাবি করতে পারেন? আরেকজন সাতকর্ণি রাজার সঙ্গে শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ অভিবাসীগণ অনেক সময়েই তাদের নারীদের সঙ্গে আনতে পারতো না ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সাত প্রজন্ম ধরে এই ধরণের বিবাহ চলতে থাকলে শূদ্র ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। খাদ্য-সংগ্রাহক আটবিক উপজাতি প্রধানগণ, যারা বাণিজ্য করে অথবা অন্য উন্নততর সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে কাজ করে নিজেদের উপজাতীয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন, তাঁরা কোনও ভাবে সেই সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার উপায় অনুসন্ধান করতেন। তাঁদেরকে কোনও ভাবে উপজাতীয় গোষ্ঠীর অন্যান্যদের তুলনায় উচ্চে উঠতে হোত। তাঁদের জন্য ব্রাহ্মণগণ কোনও পুরাণ বা মহাকাব্য থেকে বংশলতিকা খুঁজে বার করতেন অথবা কোনও প্রাচীন গ্রন্থে তাঁদের বংশের নাম লিখে দিতেন। পুরাণে বর্ণিত 'হিরণ্যগর্ভ' নামক অনুষ্ঠানটি এই ধরণের উপজাতি প্রধানরাই করতেন। এই অনুষ্ঠানে পুরোহিত উচ্চ বংশমর্যাদা অভিলাষী ব্যক্তিকে একটি সোনার কলস, যা গর্ভের প্রতীক, তার মধ্যে প্রবেশ করাতেন। তারপর একজন গর্ভবতী মহিলার জন্য যে ধরণের মন্ত্র উচ্চারণ করা হোত, তা করতেন। এরপর উচ্চারিত হোত জন্মকালীন মন্ত্রাদি, যা শেষ হলে রাজা কলস থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর পুনর্জন্মের জন্য পুরোহিতকে ধন্যবাদ জানাতেন। এইভাবে তিনি উচ্চতর বর্ণে স্থান লাভ করতেন এবং পুরোহিত সেই সোনার কলসটি তাঁর দক্ষিণা হিসাবে পেতেন।

বকাটকরাজ দ্বিতীয় প্রবর সেনের আমলের একটি ভূমিদানপট্ট থেকে জানা যায় যে ভূসম্পত্তি বা গ্রামের অধিকার প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ বিনা করে জমিগুলি চাষ করতে পারবেন তবে এর দ্বারা পূর্বেকার অধিবাসী অর্থাৎ সাধারণভাবে পশুপালকদের উপর কোনও অধিকার দাবী করতে পারবেন না, গ্রামটিকে শান্তিপূর্ণ থাকতে হবে। কখনোই অস্ত্র গ্রহণ করা চলবে না এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের উপর অধিকার বিস্তৃত করা যাবে না। তবে রাজকীয় বাহিনী, রাজকর্মচারী বা পুলিশ সেই গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না। এর ফলে গ্রামগুলিতে দান প্রাপ্ত ব্যক্তির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ খুবই সহজ ছিল।

অন্যান্য কিছু ভূমিদানপট্ট থেকে কিভাবে পতিত জমিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে কৃষি ও বসতিযোগ্য করে তোলা হোত তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের দামোদরপুর তাম্রশাসন বা ফরিদপুর তাম্রপট্ট থেকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভূখণ্ড ক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের দামোদরপুর তাম্রশাসন বা ফরিদপুর তাম্রপট্ট থেকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভূখণ্ড ক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই যে বণিক ব্রাহ্মণকে জমিদান করতে চান তাঁকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হোত। রাজকর্মচারী ও গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের উপস্থিতিতে জমি পরিমাপ করা হলে দানকারী ব্যক্তি রাজার প্রাপ্য জমির এক-ষষ্ঠাংশ মূল্য প্রদানের পরে ব্রাহ্মণ বা মন্দিরকে সেই জমি দান করতে পারতেন। তবে এর দ্বারা জমি নয় কেবলমাত্র জমিতে বংশানুক্রমিকভাবে বিনা করে চাষ করার অধিকার লাভ করা যেত।

ক্রমশ ভূমিদানের পরিমান ও সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে একটি বিষয় অপরিবর্তিত থেকে যায়। তা হল একটি গোটা গ্রাম প্রাপক ব্যক্তি সেই গ্রামের ওপর রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রায় পুরোটাই লাভ করতেন। অর্থাৎ তিনি পূর্বেকার হারে নির্ধারিত করই আদায় করতে পারতেন। কিন্তু সেই করের কোনও অংশই রাষ্ট্রকে দিতে হত না। তবে

দানপ্রাপক খাজনার হার বাড়াতে পারতেন না বা জমি এবং গবাদিপশুর উপর কোনও সম্পত্তির অধিকার দাবী করতে পারতেন না। এক্ষেত্রে বর্ণ ও জাতিপ্রথা অনেক সময়েই কৃষকের উপর শোষণের মাত্রা সীমিতকরণে সহায়তা করত। এইভাবে উপর থেকে সামন্ততন্ত্র ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বহু বিষয়ে পার্থক্য বর্তমান। ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল (১) 'প্রযুক্তির নিম্নমান', যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলি অত্যন্ত সাধারণ ও সাধারণত কম দামী এবং উৎপাদন কর্ম বহুলাংশে চরিত্রগতভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক; শ্রমবিভাজন.........উন্নতির একেবারে প্রাথমিক স্তরে বর্তমান।' এ বিষয়টি ভারতে সকল সময়েই বর্তমান, এমনকি প্রাক-সামন্ততন্ত্র যুগেও (২) 'কোনও পরিবার বা গ্রামীন সম্প্রদায়ের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপাদন, বৃহত্তর বাজারের জন্য নয়।' বৃহদার্থে, এ বিষয়টিও ভারতের ক্ষেত্রে সত্য, যদিও ধাতু, লবণ, নারিকেল, তুলা, পান, সুপারি এবং এই ধরণের অন্যান্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনও লক্ষণীয়। (৩) 'খামার-চাষ', প্রভূর জমিতে চাষ, যদিও সীমিত মাত্রায় এবং বাধ্যতামূলক শ্রমদান দ্বারা'। এই বৈশিষ্ট্য ভারতে অনুপস্থিত। এই ম্যানরীয় ব্যবস্থা ভারতে কেবল সামন্ততন্ত্রের শেষ দিকেই গড়ে উঠতে দেখা যায়। (৪) 'রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ' ভারত ও ইয়োরোপে সমানভাবেই বর্তমান ছিল। উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের কালেই তার সূত্রপাত ঘটেছিল। মৌর্য রাষ্ট্রের প্রচলিত তত্ত্ব ছিল সকল জমিই রাষ্ট্রের বা রাজার মালিকানাধীন। ক্রমশঃ গ্রাম পরিষদগুলির দায়দায়িত্ব ও অধিকার আরও বেশি বেশি করে পার্শ্ববর্তী সামন্তপ্রভুদের দ্বারা অধিকৃত হতে থাকে। ব্যতিক্রম ছিল সেই সকল গ্রাম যারা সরাসরি রাজাকে খাজনা দিত। তাদের জন্য এবং তাদের ব্যক্তি ভূমি মালিকদের জন্য, কোনও পৃথক ধরণের মালিকানাস্বত্ব বা চাষের অধিকার স্বীকৃত হয়। (৫) 'রাজাকে কোনওভাবে সেবা প্রদানের বিনিময়ে ভূস্বামীদের দ্বারা শর্তমূলক জমি মালিকানা লাভ'। এই বৈশিষ্ট্যটি রাজপুত এবং প্রথমদিকের মুসলমান শাসকদের আমলে দেখা যায়। (৭) কোনও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বিচারক বা ছদ্ম-বিচারকের দায়িত্ব সম্পন্ন ভূস্বামীর জমি মালিকানা'। এই অধিকার অংশত সশস্ত্র বাহিনীর উপর ভূস্বামীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অস্ত্রহীন গ্রামের মানুষের উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার এবং অংশত পুরাণো গ্রাম পরিষদকে উচ্ছেদের মাধ্যমে আসত। এই দুটি বিষয়ই পরবর্তীকালে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবে সহায়তা করে। ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের আরো কয়েকটি পার্থক্য হল দাস প্রথার বৃদ্ধি, গিল্ড বা নিগমগুলির অনুপস্থিতি এবং এক সংগঠিত চার্চ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি। গিল্ড এবং চার্চের স্থান নিয়েছিল বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থা। এছাড়া ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ইয়োরোপের মতোই অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

মার্কো পোলো, তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এক নতুন ভূস্বামী শ্রেণির উল্লেখ করে রাজার প্রতি তাঁদের চরম আনুগত্যের নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন যে রাজা মারা গেলে এই সামন্তরাও তাঁর সাথে একই চিতায় আত্মাহুতি দিতেন যাতে পরলোকে গিয়েও তাঁরা তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেন। ১০৫০ খ্রীঃ ও ১২৫০ খ্রীঃ দুটি লেখ থেকেও গ্রামীণ প্রধানের মৃত্যুর পরে তাঁর ভৃত্য বা অনুগামীর নিজ শিরশ্ছেদের প্রমাণ পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে একটি এক আদিম রীতি হলেও এ থেকে বোঝা যায় যে সামন্তপ্রভুর প্রতি আনুগত্য এক চরম রূপ ধারণ করেছিল। উপজাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় অথবা বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সব কিছুর উপরে প্রভূর স্থান নির্দিষ্ট হয়। এই ব্যক্তিগত আনুগত্য এক স্তরীয় বিভাজনে নির্দিষ্ট হয়ে সামন্ততান্ত্রিক স্তর কাঠামো গড়ে তোলে। এই স্তরভেদ গঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে যখন থেকে রাজা তাঁর উচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে সামন্তপ্রভুদের হাতে হস্তান্তরিত করতে শুরু করেন। উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত স্তরের সময়কাল ছিল মোটামুটিবাবে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়টি কারণ রাজা যশোধর্মণ ৫৩২ খ্রীঃ হুণ আক্রমণকারী মিহিরকুলের বিরুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করতে গিয়ে যেখানে সামন্ত বলতে এক 'রাজকীয় প্রতিবেশী' বুঝিয়েছেন, সেখানে ৫৯২ খ্রীঃ নাগাদ 'সামন্ত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'সামন্ত ভূস্বামী'।

সামন্তপ্রথার বিকাশে বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক নাগাদ থেকে দেখা যায় ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও তার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাণিজ্যতরীগুলি নিজেদের পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস করতে শুরু করে। নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাণিজ্যে এই অক্ষমতার কারণ ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির ফল। এর অর্থ ছিল এই যে উৎপাদনের ভিত্তিতে যে কোন পরিবর্তন বৈদেশিক প্রভাবে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। ক্রমশ দেখা যায় বন্দর-বণিকদের কার্যকলাপ পূর্বতন বদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির উন্মুক্তিকরণে সহায়তা করে। বন্দর-বণিকদের অস্তিত্বের অর্থ ছিল ব্যাপক সংখ্যক অভ্যন্তরীণ ক্যারাভান বণিকদের উপস্থিতি, যারা এখন গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের পণ্যের যোগান পেতে সক্ষম ছিল, যা তাদের সীমিত পূর্বসূরীদের পক্ষে গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠার আগে সম্ভব ছিল না। এই পণ্য যোগানের অর্থ ছিল এক শ্রেণির মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত জমা হওয়া, যাদের সাথে বণিকগণ পণ্য বিনিময় করত। এই ব্যক্তিগণ ছিলেন স্থানীয় সামন্তপ্রভু এবং ভূস্বামী। এটি ছিল নিচু থেকে সামন্ততন্ত্রের যুগ। ক্রমশ সামন্তরাজারা কিছু স্থানীয় পণ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন যে সকল পণ্যের বাজার মূল্য খুবই বেশি ছিল যেমন কাশ্মীরের জাফরান, ত্রিবাঙ্কুরের মরিচ, মহীশূরের চন্দনকাঠ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে সামন্তপ্রভুরা নানা পণ্যের বাণিজ্যে যুক্ত থেকে তাঁদের আয় বাড়াতে শুরু করেন।

একাদশ-দ্বাদশ শতক নাগাদ থেকে নিচে থেকে নিয়মিতভাবে উদ্ভূত এক নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় যাঁরা ভূমিদান প্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন চালুক্য ভূমিদান পট্টে উল্লিখিত রাষ্ট্রকূটগণ যারা 'কুমবিণ' বা স্থানীয় সাধারণ কৃষক-বসতি স্থাপনকারীদের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 'কুমবিণ'-এর অর্থ ছিল 'পরিবারসহ' এবং শেষপর্যন্ত তাদের থেকেই 'কুনবি' নামক কৃষক জাতির সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রকূটগণ উৎসগতভাবে এই নামের রাজবংশের যাতে যুক্ত ছিলেন যারা ইলোরার গুহাভাস্কর্যগুলি সৃষ্টি করিয়েছিলেন। এছাড়াও দক্ষিণ ভারতের রেড্ডি নামক কৃষক জাতি বণিকদের সাথেও তাদের যোগসূত্র ছিল। তাদের স্পষ্টতই অস্ত্র রাখার অধিকার ছিল, যা সাধারণ অধিবাসীদের ছিল না। এদের মাধ্যমেই প্রকৃত নিচু থেকে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল।

সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে সামন্ততান্ত্রিক যুগের প্রকৃত উত্তরণ ঘটেছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর শাসনকালে উপর থেকে সামন্ততন্ত্রের শেষ শক্তিশালী অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সুলতানের নির্দেশ ক্রমে মিলক, ইনাম বা ওয়াকফ জমিগুলি সরকার বাজেয়াপ্ত করে এবং সেগুলি সরকারি জমি হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরী নামক গ্রামীণ সামন্তদের সমস্ত অধিকার হরণ করা হয় এবং তাদেরকেও সাধারণ কৃষক বা বল্লাহারদের সমান হারে রাজস্ব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত সুলতান ফিরুজ তুঘলক নিচু থেকে সামন্ততন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর রাজত্বকালে কোনও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি। তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে জমি ও গ্রাম বন্টন করেন। সুলতান ২৩টি পূর্বে প্রচলিত কর বিলোপ করেন তবে অসাধু রাজকর্মচারীরা এর পরেও নানা অজুহাতে এই ধরণের অনেক কর আদায় চালু রেখেছিল। আইনসম্মত করের মধ্যে ছিল খারাজ অর্থাৎ উৎপাদনের ১/১০ শ ভূমিরাজস্ব, জাকাত অর্থাৎ মুসলমানদের প্রদেয় ধর্মীয় কর, জিজিয়া অর্থাৎ হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমানদের প্রদেয় কর এবং যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে লুন্ঠিত দ্রব্য ও খনিজ উৎপাদনের ১/৫ শ যা রাষ্ট্রীয় প্রাপ্য বলে পরিগণিত হোত। তবে ফিরুজ তুঘলকের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়। এমনকি 'জাকাত' কর, যা ইতিপূর্বে শুধুমাত্র আক্রমণকারী মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হোত, ৫৯২ খ্রীঃ গুজরাটে বিষ্ণু সেনের সনদে সেটি সাধারণ করের উপর 'ধার্মিক' উপকর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। বংশানুক্রমিক সামন্ত রাজস্ব-আদায়কারীদের অস্তিত্ব অনেক আগে থেকেই ছিল। এই সামন্তশ্রেণীর অস্তিত্ব জমি জরিপ এবং প্রাচীন রীতি, বলপ্রয়োগ, অথবা সামন্তপ্রভুর দ্বারা সরাসরি করা চাষের মধ্যে পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

দাসপ্রথা ছিল সুলতানের পক্ষে তাঁর ভ্যাসাল বা অধীনস্থ কৃষকদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের একটি প্রচেষ্টা। দাসগণ তাঁকে ব্যক্তিগত কৃষিকর্ম চালাতে সাহায্য করত। এই উৎপাদন কেবল সুলতানের পরিবারের প্রয়োজন মেটাতো না, তার পাশাপাশি খোলা বাজারেও বিক্রি হোত। দাসদের দ্বারা পরিচালিত রাজকীয় কারখানাগুলিতে উৎপাদিত চাদর, বস্ত্র ইত্যাদিও একইভাবে বন্টিত হোত। রাজপ্রাসাদে দাসরক্ষীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। স্ত্রীর সাথে পণ হিসাবে ফিরুজ ইমাদ-উল-মুলক নামে এক দাস পেয়েছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে ফিরুজের আমলে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টঙ্কা। দাসগণ সামন্তপ্রভুর বিশেষ সহায়ক ছিল। প্রভু বৃদ্ধ বা অক্ষম হয়ে পড়লে এই দাসরাই তাঁর দেখাশুনা করত।

এই ধরণের সামন্ততন্ত্রের প্রধান অর্থনৈতিক কাজ ছিল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি করা এবং সামন্তপ্রভুদের নানা ধরণের বিনিয়োগ। যেমন জলাধার নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, ইত্যাদি যা সাধারণত কোনও একটি গ্রামের ক্ষমতা যা আঞ্চলিক সীমার বাইরে ছিল, সেগুলি অনেকগুলি গ্রামের উপরের সামন্তপ্রভু দায়িত্ব নিতেন এবং বছরের পর বছর বজায় রাখতেন। এগুলি ছিল সর্বাধিক লাভজনক বিনিয়োগ এবং ভূস্বামীর আদায়ীকৃত করের পরিমাণ ছিল ৫০% বা তারও বেশি। সাধারণ 'আগোর বাটাই' ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কর আদায় করা হোত। এছাড়াও ছিল 'ভাওলী' ব্যবস্থা, যাতে উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক মূল্য স্থির করে, ভূস্বামীকে নগদে খাজনা দিতে হোত, প্রথমটির অর্থ ছিল ভূস্বামী কোনও বণিকের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে পারতেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ ছিল বণিক সরাসরি রায়তের সাথে ব্যবসা করতে পারতেন।

মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের সামনে সামন্তপ্রভুর কোনও নিরাপত্তা ছিল না। যে কোনও আক্রমণকারী সহজেই সামন্তপ্রভুর বাড়িঘর আক্রমণ করে লুঠতরাজ চালাতে পারতো। তবে এসত্ত্বেও যে আক্রমণকারী বিভিন্ন সময়ে নজরানা চাইতেন তাঁকে কোনও ভূস্বামীর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করতেই হোত। সুতরাং কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয়ের সাথে সাথে সামন্ত প্রভুদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই জমিদারগণ তাঁদের থেকে ক্ষমতাশালী যে কোনও ব্যক্তিকে কর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ক্রমশ এই সামন্তপ্রভুরা আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। সম্রাট আকবরের মতো শক্তিশালী শাসকের আমলে রাজস্ব নগদে আদায় হোত তবে ফসলের দাম নির্দিষ্ট ছিল। বেতনভূক রাজকর্মচারীরা রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। তবে এসত্ত্বেও আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখেছেন যে এই সময়ে সামন্তভূস্বামীদের স্থায়ী বাহিনীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ লক্ষ। তারা রাষ্ট্রের পক্ষে আদৌ লাভজনক ছিল না, কারণ সামন্তপ্রভুরা সবসময় দেখতেন কোন পক্ষ যুদ্ধে জিততে চলেছে। তার পক্ষেই তাঁরা সৈন্য পাঠাতেন। সাম্রাজ্যের সুখের সময়ে জমিদার ছিলেন বিভিন্ন কৃষকের পক্ষে রাজস্ব প্রদানকারী ব্যক্তি। কখনো কখনো গ্রামপ্রধান, মুকদ্দম বা চৌধুরীদের মধ্যে থেকে তাঁর উত্থান হোত। এইসব ক্ষেত্রে জমি একটি 'বিরাদরী'-র দ্বারা কর্ষিত হোত। উনবিংশ শতক পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে জমিদারীর অর্থ ছিল এক ধরণের ভূমিকর্ষণ ব্যবস্থা যেখানে গ্রামের সব জমি সকল গ্রামবাসীর সাধারণ মালিকানার অধীন ও সকলের দ্বারা কর্ষণযোগ্য। জমি আদায়ীকৃত সকল মুনাফা ও খাজনা একটি সাধারণ তহবিলে জমা রাখা হোত, এবং সরকারি খাজনা প্রদানের পর গ্রামের খরচ বাদ দিয়ে বাকী অর্থ গ্রামবাসীর ভূখণ্ডের অংশের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হোত। এর অর্থ ছিল সাধারণভাবে এক ভূস্বামী উচ্চ শ্রেণীর উপস্থিতি বর্তমান ছিল। মূল গ্রামীণ সমাজ থেকে নিম্ন স্তরীয় বিবর্তন ছিল ভাইয়া-চারা কর্ষণ পদ্ধতি যেখানে গ্রামবাসীরা নিজেদের জমির পরিমাণের ভিত্তিতে যৌথ কর প্রদানের দায়িত্ব নিতেন। বুন্দেলখণ্ডের 'ভূজ-বেরার' ছিল আরেক ধরণের যৌথ অংশীদারী যেখানে কোনও ব্যক্তির পরিবারের কতজন কর্মক্ষম তার ভিত্তিতে তার জমির মাপ করা হোত। দক্ষিণ ভারতে মালিকানা 'মিরাসদারি' ব্যবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হোত যার অর্থ ছিল এক নির্দিষ্ট, কিছুটা ভারী রাজস্বহারের বিনিময়ে জমির মালিকানা প্রদান। সেই মালিকানা বিক্রী, বংশানুক্রমিক ভাবে লাভ করা অথবা বন্ধক

রাখা যেত। আরেক ধরনের ব্যবস্থা ছিল যেগুলি সল্পকালীন ভিত্তিতে সাধারণত পতিত বা অকর্ষিত বা কম উর্বর জমির জন্য স্থির করা হোত তা হল শস্য রোপনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বা তার সামন্ত প্রতিনিধি দ্বারা রাজস্বহার স্থির করা, যা অনেক সময়েই পরিবর্তিত হোত।

৪.৪ ডঃ কোশাম্বীর বিরুধ্ব মতামত

ডঃ ইরফান হাবিবের মতে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এইরূপ উপর থেকে সামন্ততন্ত্র ও নিচু থেকে সামন্ততন্ত্রের শব্দ প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা ও ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে এই 'দ্বি-স্তর' ভূমি সম্পর্ক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বিবৃতি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে ক্ষেত্রস্বামী (ভূস্বামী) কৃষকের উপরেই দায়িত্বভার ন্যস্ত করে। দ্বিতীয় শতকের গোড়ায় শক-রাজপুত্র উসবদত্তের একটি দানপত্র থেকেও জমির উৎপন্নের উপর অ-কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকারের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ডঃ ইউ. এন. ঘোষাল তাঁর 'Contributions to the History of Hindu Revenue System' গ্রন্থে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং এর মন্তব্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে সপ্তম শতকে ভারতে 'রাজস্ব প্রদানকারী ব্যক্তিগত ভূমি-কর্ষকের' অস্তিত্ব ছিল।

৪.৫ কার্ল-মার্কসের মত ও তার সমালোচনা

কার্ল মার্কস কথিত এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির সাথে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উপাদানের বিকাশের সম্পর্ক বিষয়ে ঐতিহাসিকদের দ্বিমত আছে। এশীয় রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব, জমির উপর উপজাতীয় গোষ্ঠী-মালিকানা, স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের অস্তিত্ব ও বদ্ধ অর্থনীতির বিকাশ, নগরের অভাব ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। মার্কসীয় বোধের ভিত্তিতে এই উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি উপাদান সক্রিয়— গ্রামীণ গোষ্ঠী এবং প্রাচ্য ঈশ্বরতন্ত্র। ইরফান-হাবিবের মতে প্রথম উপাদানটি বেশি প্রামাণিক। এতে শ্রম-রীতির কাঠামোর সংজ্ঞা আছে। তা হল, একটি নির্দিষ্ট পেশার সাহায্যে ব্যক্তিগত দাসত্ব ছাড়া একটি স্বাবলম্বী খুচরা উৎপাদন এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আদায়ের ব্যবস্থা। এই স্বাভাবিক অর্থনীতি গ্রামের বাইরে পণ্য-সঞ্চালনের মাধ্যমে উদ্বৃত্তের ভোগ দখলকারী একটি শাসক শ্রেণি ও গ্রাম্য গোষ্ঠীর বাইরে বিনিময়ের ভিত্তিতে শ্রম-বিভাজন বিশিষ্ট একটি শ্রেণি সমাজ এই উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক অচলতা ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার সৃষ্টি সহায়ক। ডঃ শর্মা ভারতীয় সমাজের এই স্থানুত্বের অস্তিত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে এশিয় উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা ভারতীয় সমাজের সাথে খাপ খায় না। প্রাচীন ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল এবং রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শাসকশ্রেণী জনসাধারণের উদ্বৃত্ত আদায় করত। আদি-মধ্যকালীন ভারতে নগরের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন স্বয়ং মার্কস কোভালস্কি রচিত (১৮৭৯ খ্রীঃ) গোষ্ঠীগত জমি অধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ভারতীয় গ্রাম্য গোষ্ঠীর অভ্যান্তরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থানকে চিহ্নিত করেছেন। এরফলে গোষ্ঠীর অভ্যান্তরেই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়েছিল। ডঃ হাবিব লিখেছেন, অতএব, ভারতীয় গোষ্ঠী তার গভীর অন্তর্দেশ অবধি সম্পূর্ণরূপে (একটি) অচলায়তন—এ ধারণা দীর্ঘকাল আঁকড়ে ধরে রাখা আর সম্ভব নয়।

৪.৬ সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত আধুনিক বিতর্ক

ডঃ রামশরণ শর্মা, বি. এন. এস. যাদব, ডি. এন. ঝা প্রমুখ মনে করেন যে, তাম্রশাসন জারী করে নিষ্কর ভূসম্পদ দান ব্যবস্থা সপ্তম শতকে ভারতে সামন্তব্যবস্থার বীজ বপন করে। পরবর্তীকালে ধর্মনিরেপক্ষ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব হস্তান্তরেরর ঘটনা বৃদ্ধি পেলে সামন্তব্যবস্থার ভিত সবল হয়। ডঃ শর্মা সামন্ত প্রথার উদ্ভব ও বিকাশের ঘটনাকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তার মতে ৩০০-৬০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে সামন্তব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে। ৬০০-৯০০ খ্রীস্টাব্দে সামন্তব্যবস্থা ব্যাপকতা পায় এবং ৯০০-১২০০ খ্রীঃ একদিকে এর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব জারী হয়। আবার অবক্ষয়ের সূচনা হয়। ডঃ শর্মা পুরাণ গ্রন্থে 'কলিযুগ' সংক্রান্ত বিবরণীটিকে তাঁর মতের সমর্থনে গ্রহণ করেছেন। পুরাণ কথিত চারটি যুগের মধ্যে কলিযুগকে অস্থির, অনিশ্চিত, বিশৃঙ্খলা ও দুর্যোগের কাল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। খ্রীস্টিয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রচিত পুরাণ গ্রন্থে কলিযুগকে যেভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের অস্থিরতার কাল বলা হয়েছে। তাতে সামন্ত ব্যবস্থার আগমনবার্তা শোনা যায় বলে ডঃ শর্মা মনে করেন।

অগ্রহার ব্যবস্থার প্রবর্তনের সূত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ড বা গ্রামের উপর দানগ্রহীতার এক ধরণের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। বস্তুত, তারা ভূস্বামীতে পরিণত হন। প্রাপ্ত ভূখণ্ডের রাজস্ব আদায় ও ভোগের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত বা অলিখিতভাবে আইন শৃংখলা রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব ও দানগ্রহীতা গ্রহণ করেন। ডঃ শর্মা কলিযুগের বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেন যে শাসকদের পক্ষে রাজস্ব আদায় করা তখন সম্ভব হত না বলেই, সম্ভবত ভূস্বামীদের হাতে স্থানীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব ভাগ করে দেবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এই ব্যবস্থা যে রাজার সার্বভৌম কর্তৃত্বের পরিপন্থী ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৬৫০ খ্রীঃ পরে ভূমিদানের রীতি বহুল বৃদ্ধি পায়। পালদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধবিহার, শৈব মন্দির, নালন্দা মহাবিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৌদ্ধভিক্ষু প্রমুখ বহু জমি অগ্রহার দান হিসাবে ভোগ দখল করতেন। সেন বংশ, প্রতিহার বংশীয় রাজাদের আমলেও এই রীতি বহাল ছিল। দাক্ষিণাত্য রাষ্ট্রকূট রাজাদের তাম্রশাসন থেকেও 'ব্রহ্মদেয়' দান, 'দেবদান' ইত্যাদির কথা জানা যায়। ডঃ রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন যে একাদশ-দ্বাদশ শতকের দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি এতটাই ভূ-সম্পদশালী হয়ে ওঠে যে সেগুলি রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

ডঃ শর্মা আসরাফপুর তাম্রশাসনের (৬৭৫ খ্রীঃ) ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে ভূমিদাস সংক্রান্ত আদেশ নামায় মালিকানা ছাড়াও ভোগাধিকারী (ভুজ্যমানক) ও কৃষক (কৃষ্যমানক)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মালিক ও ভোগাধিকারীর বাইরে কৃষকের অস্তিত্বও ছিল। রাজস্থান, মালবদেশ প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দান গ্রহীতাকে বলা হয়েছে, যে তিনি নিজে চাষ করতে পারেন, কিংবা কাউকে দিয়ে চাষ করিয়ে নিতে পারেন ; নিজে ভোগ করতে পারেন বা কাউকে দিয়ে ভোগ করাতে পারেন। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে, এই ব্যবস্থা কৃষি-অর্থনীতিতে স্তরীকরণের গতি বৃদ্ধি করে। এইরূপ স্তরবিন্যাস সামন্ততন্ত্রের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পাল-প্রতিহারদের তাম্রশাসনগুলিতে ভূমিদান করলেও ভূখণ্ডের চতুর্সীমা যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা হোত না। এই সুযোগে দানগ্রহীতা জমির চৌহদ্দি বৃদ্ধি করতে পারতেন। এই অতিরিক্ত রাজস্ব ভূস্বামীর আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হত। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। নোবুরু কারাশিমা ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে চোল যুগে (নবম-দশম শতক) অ-ব্রহ্মদেয় গ্রামগুলি 'উর' নামক গ্রামসভার সমষ্টিগত অধিকারে ছিল। হস্তান্তর-সংক্রান্ত লেখাগুলিতে দানকর্তা হিসাবে 'উর' এর নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে ব্রহ্মদেয় গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ ভূস্বামীদের অস্তিত্ব ছিল। চোল সম্রাট তৃতীয় রাজরাজের আমলে ব্যক্তিগতভাবে ভূমিদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্ন-কাবেরী উপত্যকায় জমি ক্রয়-

বিক্রয়ের দলিলে উর-এর নাম নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক জমি হস্তান্তরের ঘটনা থেকে দক্ষিণ ভারতেও ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

অষ্টম শতক ও পরবর্তীকালে ভূমিদান ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাবল্য প্রসঙ্গে ডঃ শর্মা ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিদান বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে অগ্রহার দান ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে ব্যক্তি মালিকানার সূচনা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসক ও সেনা-কর্মচারীদের রাজস্ব ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হলে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব জোরালো রূপ পায়। অধ্যাপক শর্মার মতে অষ্টম-দশম শতকে বাণিজ্যের সংযোগ ঘটলে মুদ্রা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সরকারি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি-রাজস্ব ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। এই সকল এলাকার উদ্বৃত্ত সম্ভবত রাজকোষে জমা দেওয়া হোত এবং রাজার প্রাপ্য রাজস্ব যথাযথ জমা দিতে পারলে এরা নিজ নিজ এলাকায় ইচ্ছামত কর সংগ্রহ করতে পারতেন। ডঃ রণবীর চক্রবর্তীর মতে, 'সামন্তদের মধ্যে এক একটি এলাকা বরাদ্দ করে দেবার মধ্যে মধ্যযুগের জায়গীর ব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য আছে।' গুর্জর প্রতিহারদের রাজ্যে 'বংশ পোতক ভোগ' অধিকার অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ভাবে জমি ভোগ দখলের অধিকার স্বীকৃত ছিল। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একটি বিশেষ বংশের ধারাবাহিক কর্তৃত্ব বজায় থাকত। এই প্রবণতা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানকে শক্তিশালী করেছিল।

সপ্তম থেকে দশম শতকে ভারতে বাণিজ্যের অধোগতি ও নগরায়ণের অবক্ষয়ের ঘটনাকে ডঃ শর্মা সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভবের অন্যতম প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, এই সময়ে কৃষির উপর এতটাই প্রাধান্য ও নির্ভরতা বেড়েছিল, যে পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই। এর মূলে ছিল বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতি। আলোচ্যকালে মুদ্রা অর্থনীতিও রক্তাল্পতার শিকার হয়। তাঁর মতে কার্যত ৬০০-১০০০ খ্রীঃ মধ্যবর্তীকালে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির বিলোপ চূড়ান্ত হয়েছিল। একই সময়ে নগর-অবক্ষয়ের ঘটনাও সামন্ততন্ত্রের উত্থানতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অধ্যাপক বি. এন. যাদব জিন প্রভাসূরী-র 'বিধিধার্য কল্প'-এর একটি উদ্ধৃতির ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন যে আদি মধ্যযুগে নগরগুলি ভেঙে প্রায় গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল।

ডঃ শর্মা হিউয়েন সাং-এর এর বিবরণের ভিত্তিতে মনে করেন যে খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকের পরবর্তীকালে গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছু সমৃদ্ধ নগর যেমন— শ্রাবস্তী, বৈশালী, কৌশাম্বী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর ইত্যাদি অবক্ষয়ের কবলে পড়েছিল।

ভারতের আদি-মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ছক সম্পর্কে ডঃ শর্মা প্রমুখের মতের বিরোধিতা করেছেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার, হরবনস্ মুখিয়া প্রমুখ। অধ্যাপক সরকারের মতে আদি-মধ্যযুগের তাম্র শাসনগুলিতে এমন কোন কথার উল্লেখ নেই, যা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ভূমিদানের ফলে রাজকোষের আয় হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর মতে দানগ্রহীতা জমির রাজস্ব ভোগ করতেন কিন্তু কর সংগ্রহের অধিকার বা ক্ষমতা একমাত্র রাজার ছিল। তাছাড়া 'করশাসন' নামক সরকারি আদেশনামার ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে এই সকল আদেশনামা দ্বারা রাজা 'অগ্রহার' এলাকা থেকেও প্রয়োজনে কর সংগ্রহ করতে পারতেন। তাঁর মতে সামন্তব্যবস্থার ফলে রাজা বা ভূস্বামীদের তেমনভাবে আর্থিক ক্ষতি ঘটেনি। এই ব্যবস্থায় প্রকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাধারণ কৃষকশ্রেণি। ডঃ রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন, অধ্যাপক সরকারের মতামত খুব স্পষ্ট নয়। কারণ তিনি সামন্ত রাজাদের 'fendatory chiefs' এবং অভিজাতদের প্রাপ্ত ভূখণ্ড (ইনাম) কে 'fief' বলে নানা সময়ে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক হরবনস্ মুখিয়া পশ্চিম ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ডঃ শর্মা কথিত ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারার তুলনা করে ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, সামন্ততন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য হল— (১) উৎপাদনের উপকরণের উপর সামন্তপ্রভুর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং (২) চুক্তি। আদি-মধ্যযুগের ভারতে এদুটি উপাদানের অস্তিত্ব ছিল না। ভারতে উৎপাদনের উপকরণগুলি কৃষকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং ভূমিদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হত না। এমনকি

কৃষক কোনভাবেই জমির সাথে আবদ্ধ ছিল না। ডঃ ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। ডঃ কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে অষ্টম শতকের আগে পশ্চিম এশিয়ার জাহাজগুলি চীনের ক্যান্টন বন্দর পর্যন্ত চলাচল করত। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছানো সহজ হয়। অষ্টম শতকে চীনা জাহাজগুলি দক্ষিণ ভারতের কালিকট ও কুইলন বন্দরে আসত। আরব জাহাজগুলিও এখানেই আসত। এখান থেকে চীনা পণ্য আরব জাহাজগুলিতে তোলা হত। এইভাবে ভারতীয় বন্দরগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ বাণিজ্য হ্রাস, নগরের অবক্ষয় ইত্যাদি তত্ত্ব দ্বারা সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে ডঃ শর্মা প্রমুখের যুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

৪.৭ উপসংহার

সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিতর্ক চলছে। সামন্ততন্ত্রের কালগত কাঠামো এবং আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছাড়া এই বিতর্কের সমাধান সম্ভব নয়। তবে সপ্তম শতকে ভারতে ভূমিদান ব্যবস্থার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জমির উপর যেভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হয়, তাতে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির পোষণ ঘটা সহজ হয়। আক্ষরিক অর্থে আদি-মধ্যযুগের ভারতে সামন্তব্যবস্থা হয়ত গড়ে ওঠেনি ; তবে সেকালে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের পথ ধরে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানগুলির যে আবির্ভাব ঘটেছিল, তা বলা সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না।

৪.৮ প্রশ্নাবলী

১। ডঃ ডি. ডি. কোশাম্বী 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' ও 'নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র' বলতে কি বুঝিয়েছেন ?

২। ভারতে আদি-মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব বিষয়ে বিতর্ক সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪.৯ সহায়ক গ্রন্থসমূহ

1. D. D. Kosambi – An Introduction to the Study of Indian History.
2. Ranabir Chakraborty – Trade and Traders in Early Indian Society.
3. B. D. Chatterjee – The Making of Early Medieval India.
4. R. S. Sharma – (i) Indian Fundalism,
   (ii) Early Medieval Indian Society
5. D. N. Jha (ed.) – The Feudal Order.
6. রণবীর চক্রবর্তী – প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake, Kolkata - 700 064 & Printed at Prabaha, 45, Raja Rammohan Roy Sarani, Kolkata - 700 009.